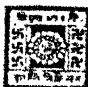
সাহিত্যের স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

এই অভাবপূরণের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। ১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে প্রতিমাসে অন্যূন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য আকারভেদে ছয় আনা ও আট আনা।

॥ প্রকাশিত হইয়াছে ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

সাহিত্যের স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অঙ্কিত

প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫০

—৩২'০—১. ৭. ৪৩

সূচী

সাহিত্যের স্বরূপ

কবিতা ব্যাপারটা কী, এই নিয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে ফরমাশ এসেছে।

সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার পূর্বেই কোথাও কোথাও করেছি। সেটা অন্তরের উপলব্ধি থেকে, বাইরের অভিজ্ঞতা বা বিশ্লেষণ থেকে নয়। কবিতা জিনিসটা ভিতরের একটা তাগিদ, কিসের তাগিদ সেই কথাটাই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। যা উত্তর পেয়েছি সেটাকে সহজ করে বলা সহজ নয়। ওস্তাদ-মহলে এই বিষয়টা নিয়ে যে-সব বাঁধা বচন জমা হয়ে উঠেছে কথা উঠলেই সেইগুলোই এগিয়ে আসতে চায়, নিজের উপলব্ধ অভিমতকে পথ দিতে গেলে ওইগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা দরকার।

গোড়াতেই গোলমাল ঠেকায় "সুন্দর" কথাটা নিয়ে। সুন্দরের বোধকেই বোধগম্য করা কাব্যের উদ্দেশ্য এ-কথা কোনো উপাচার্য আওড়াবামাত্র অভ্যস্ত নির্বিচারে বলতে ঝোঁক হয়, তা তো বটেই। প্রমাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধোঁকা লাগায়. ভাবতে বসি সুন্দর বলে কাকে। কনে দেখবার বেলায় বরের অভিভাবক যে-আদর্শ নিয়ে কনেকে দাঁড় করিয়ে দেখে, হাঁটিয়ে দেখে, চুল খুলিয়ে দেখে, কথা কইয়ে দেখে, সে-আদর্শ কাব্য-যাচাইয়ের কাজে লাগাতে গেলে পদে পদেই বাধা পাওয়া যায়। দেখতে পাই ফলস্টাফের সঙ্গে কন্দর্পের তুলনা হয় না, অথচ সাহিত্যের চিত্রভাণ্ডার থেকে কন্দর্পকে বাদ দিলে লোকসান নেই, লোকসান আছে ফলস্টাফকে বাদ দিলে। দেখা গেল সীতার চরিত্র রামায়ণে মহিমান্বিত বটে কিন্তু স্বয়ং বীর হনুমান, তার যতবড়ো লাঙ্গুল ততবড়োই সে মর্যাদা পেয়েছে। এইরকম সংশয়ের সময়ে কবির বাণী

মনে পড়ে Truth is beauty অর্থাৎ সত্যই সৌন্দর্য। কিন্তু সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি, জ্ঞানে নয় স্বীকৃতিতে, তাকেই বলি বাস্তব। সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব, রামচন্দ্র যিনি শাস্ত্রের বিধি মেনে ঠাণ্ডা হয়ে থাকেন তাঁর চেয়ে লক্ষ্মণ বাস্তব যিনি অন্যায় সহ্য করতে না পেরে অগ্নিশর্মা হয়ে তার অশাস্ত্রীয় প্রতিকার করতে উদ্যত। আমাদের কালোকোলো আধবুড়ো নীলমণি চাকরটা, যে-মানুষ এক বুঝতে আর বোঝে, এক করতে আর করে, বকলে ঈষৎ হেসে বলে ভুল হয়ে গেছে সে বেনারসি জোড় পরে বরবেশে এলে দৃশ্যটা কী রকম হয় সে-কথা তুচ্ছ, কিন্তু সে অনেক বেশি বাস্তব অনেক নামজাদার চেয়ে; এই প্রসঙ্গে তাঁদের নাম উল্লেখ করতে কুণ্ঠা হচ্ছে। অর্থাৎ যদি কবিতা লেখা যায় তবে একে তার নায়ক বা উপনায়ক করলে ঢের বেশি উপাদেয় হবে কোনো বাগ্মীপ্রবর গণনায়ককে করার চেয়ে। খুব বেশি চেনা হলেই যে বাস্তব হয় তা নয়, কিন্তু যাকে চিনি অল্প তবু যাকে অপরিহার্যরূপে হাঁ বলেই মানি সেই আমার পক্ষে বাস্তব। ঠিক কী গুণে যে, তা বিশ্লেষণ করে বলা কঠিন। বলা যেতে পারে তারা জৈব, তারা organic, তাদের আত্মসাৎ করতে রুচি বা ইচ্ছার বাধা থাকতে পারে, অন্য বাধা নেই। যেমন ভোজ্য পদার্থ, তাদের কোনোটা তিতো, কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা কটু; ব্যবহারে তাদের সম্বন্ধে আদরণীয়তার তারতম্য থাকলেও, তাদের সকলেরই মধ্যে একটা সাম্য আছে, তারা জৈবিক, দেহতন্তুর নির্মাণে তারা কাজে লাগবার উপযোগী। শরীরের পক্ষে তারা হাঁ-এর দলে, স্বীকৃতির দলে, না-এর দলে নয়।

সংসারে আমাদের সকলেরই চারদিকে এই হাঁ-ধর্মীর মণ্ডলী আছে,—এই বাস্তবদের আবেষ্টন; তাদের সকলকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে

আমাদের সত্তা আপনাকে বিচিত্র করেছে বিস্তীর্ণ হয়েছে; তারা কেবল মানুষ নয়, তারা কুকুর বেড়াল ঘোড়া টিয়েপাখি কাকাতুয়া, তারা আসশেওড়ার বেড়া-দেওয়া পানাপুকুর, তারা গোঁসাইপাড়ার পোড়ো বাগানে ভাঙাপাঁচিল-ঘেঁষা পালতে মাদার, গোয়ালঘরের আঙিনায় খড়ের গাদার গন্ধ, পাড়ার মধ্য দিয়ে হাটে যাওয়ার গলি-রাস্তা, কামার-শালার হাতুড়ি-পেটার আওয়াজ, বহুপুরোনো ভেঙেপড়া ইটের পাঁজা যার উপরে অশথগাছ গজিয়ে উঠেছে, রাস্তার ধারের আমড়াতলায় পাড়ার প্রৌঢ়দের তাসপাশার আড্ডা, আরো কত কী যা কোনো ইতিহাসে স্থান পায় না, কোনো ভূচিত্রের কোণে আঁচড় কাটে না। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর চারিদিক থেকে নানা ভাষায় সাহিত্যলোকের বাস্তবের দল। ভাষার বেড়া পেরিয়ে তাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় খুশি হয়ে বলি 'বাঃ বেশ হল,' অর্থাৎ মিলছে প্রাণের সঙ্গে, মনের সঙ্গে। তাদের মধ্যে রাজাবাদশা আছে, দীনদুঃখীও আছে, সুপুরুষ আছে, সুন্দরী আছে, কানা খোঁড়া কুঁজো কুৎসিতও আছে; এই সঙ্গে আছে অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া, কোনোকালে বিধাতার হাত পড়েনি যাদের উপরে, প্রাণীতত্ত্বের সঙ্গে শারীরতত্ত্বের সঙ্গে যাদের অস্তিত্বের অমিল, প্রচলিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে যাদের অমানান বিস্তর। আর আছে তারা যারা ঐতিহাসিকতার ভড়ং ক'রে আসরে নামে, কারো বা মোগলাই পাগড়ি, কারো বা যোধপুরী পায়জামা,' কিন্তু যাদের বারো আনা জাল ইতিহাস, প্রমাণপত্র চাইলে যারা নির্লজ্জভাবে বলে বসে 'কেয়ার করিনে প্রমাণ, পছন্দ হয় কি না দেখে নাও';—এ ছাড়া আছে ভাবাবেগের বাস্তবতা,—দুঃখসুখ বিচ্ছেদমিলন লজ্জাভয় বীরত্ব-কাপুরুষতা, এরা তৈরি করে সাহিত্যের বায়ুমণ্ডল, এইখানে রৌদ্রবৃষ্টি, এইখানে আলো-অন্ধকার, এইখানে কুয়াশার বিড়ম্বনা, মরীচিকার চিত্রকলা। বাইরে

থেকে মানুষের এই আপন ক'রে নেওয়া সংগ্রহ, ভিতর থেকে মানুষের এই আপনার সঙ্গে মেলানো সৃষ্টি, এই তার বাস্তবমণ্ডলী, বিশ্বলোকের মাঝখানে এই তার অন্তরঙ্গ মানবলোক, এর মধ্যে সুন্দর অসুন্দর, ভালো মন্দ, সংগত অসংগত, সুরওয়ালা এবং বেসুরো সবই আছে; যখনই নিজের মধ্যেই তারা এমন সাক্ষ্য নিয়ে আসে যে তাদের স্বীকার করতে বাধ্য হই, তখনি খুশি হয়ে উঠি। বিজ্ঞান ইতিহাস তাদের অসত্য বলে বলুক, মানুষ আপন মনের একান্ত অনুভূতি থেকে তাদের বলে নিশ্চিত সত্য। এই সত্যের বোধ দেয় আনন্দ, সেই আনন্দেই তার শেষ মূল্য। তবে কেমন করে বলব সুন্দরবোধকে বোধগম্য করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।

বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আর-একটা দিক আছে সে তার শিল্পকলা। যা যুক্তিগম্য তাকে প্রমাণ করতে হয়, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করতে চাই। যা প্রমাণযোগ্য তাকে প্রমাণ করা সহজ, যা আনন্দময় তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়। খুশি হয়েছি এই কথাটা বোঝাতে লাগে সুর, লাগে ভাবভঙ্গী। এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে, মা যেমন করে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়। কথার শিল্প তার ছন্দে, ধ্বনির সংগীতে, বাণীর বিন্যাসে ও বাছাই-কাজে। এই খুশির বাহন অকিঞ্চিৎকর হলে চলে না, যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে।

অনেক সময়ে এই শিল্পকলা শিল্পিতকে ডিঙিয়ে আপনার স্বাতন্ত্র্যকেই মুখ্য করে তোলে। কেননা তার মধ্যেও আছে সৃষ্টির প্রেরণা। লীলায়িত অলংকৃত ভাষার মধ্যে অর্থকে ছাড়িয়েও একটা বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পায়,—

শুধু তার ধ্বনিপ্রধান গীতধর্মে। বিশুদ্ধ সংগীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই,—ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই। কিন্তু ছন্দে, শব্দবিন্যাসের ও ধ্বনিঝংকারের তির্যক ভঙ্গীতে যে সংগীতরস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে। কিন্তু ছন্দের নেশা ধ্বনিপ্রসাধনের নেশা অনেক কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে বসে, গদ্‌গদ আবিলতা নামে ভাষায়,—স্ত্রৈণ স্বামীর মতো তাদের কাব্য কাপুরুষতার দৌর্বল্যে অশ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে।

শেষ কথা হচ্ছে Truth is beauty। কাব্যে এই ট্রুথ রূপের ট্রুথ, তথ্যের নয়। কাব্যে রূপ যদি ট্রুথরূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয় তাহলে তথ্যের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হলেও কাব্যের দরবারে সে নিন্দিত হবে। মন ভোলাবার আসরে তার অলংকারপুঞ্জ যদি বা অত্যন্ত গুঞ্জরিত হয় অর্থাৎ সে যদি মুখর ভাষায় সুন্দরের গোলামি করে, তবু তাতে তার অবাস্তবতা আরো বেশি করেই ঘোষণা করে, আর এতেই যারা বাহবা দিয়ে ওঠে রূঢ় শোনালেও বলতে হবে তাদের মনের ছেলেমানুষি ঘোচেনি।

শেষকালে একটা কথা বলা দরকার বোধ করছি। ভাবগতিকে বোধ হয় আজকাল অনেকের কাছেই বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে যা-তা। কিন্তু আসল কথা, বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাই-করা জিনিস। নির্বিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা-তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব। আর যে-সব অসংখ্য জিনিস নানা মূল্য নিয়ে নানা হাটে যায় ছড়াছড়ি, বাস্তবের মূল্যবর্জিত হয়ে তারা আমাদের কাছে ছায়া।

পাড়ায় মদের দোকান আছে সেটাকে ছন্দে বা অছন্দে কাব্যরচনায়

ভুক্ত করলেই কোনো কোনো মহলে সস্তা হাততালি পাওয়ার আশা আছে। সেই মহলের বাসিন্দারা বলেন, বহুকাল ইন্দ্রলোকে সুধাপান নিয়েই কবিরা মাতামাতি করেছেন, ছন্দোবন্ধে শুঁড়ির দোকানের আমেজমাত্র দেননি—অথচ শুঁড়ির দোকানে হয়তো তাঁদের আনাগোনা যথেষ্ট ছিল। এ নিয়ে অপক্ষপাতে আমি বিচার করতে পারি—কেননা আমার পক্ষে শুঁড়ির দোকানে মদের আড্ডা যতদূরে ইন্দ্রলোকের সুধাপানসভা তার চেয়ে কাছে নয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের হিসাবে। আমার বলবার কথা এই যে, লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণি-স্পর্শে মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে সুধাপানসভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই। অথচ দিনক্ষণ এমন হয়েছে যে ভাঙা ছন্দে মদের দোকানে মাতালের আড্ডার অবতারণা করলেই আধুনিকের মার্কা মিলিয়ে যাচনদার বলবে, হাঁ, কবি বটে, বলবে, একেই তো বলে রিয়ালিজ্‌ম।—আমি বলছি বলে না। রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে এ-রকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। ধোবার বাড়ির ময়লা কাপড়ের ফর্দ নিয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব, বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তাভরা আদি রস, করুণ রস এবং বীভৎস রসের অবতারণা করা চলে। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুইবেলা বকাবকি চুলোচুলি, তাদের কাপড়দুটো একঘাটে একসঙ্গেআছাড় খেয়ে খেয়ে নির্মল হয়ে উঠছে, অবশেষে সওয়ার হয়ে চলেছে একই গাধার পিঠে, এ-বিষয়টা নব্য চতুষ্পদীতে দিব্য মানানসই হতে পারে। কিন্তু বিষয়-বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজ্‌ম নয়, রিয়ালিজ্‌ম ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে তবে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হতে পারে না। এ নিয়ে বকাবকি না করে সম্পাদকের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, প্রমাণ করুন রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু রিয়ালিস্টিক

ব'লে নয় কবিতা ব'লেই। পূর্বোক্ত বিষয়টা যদি পছন্দ না হয় তো আর-একটা বিষয় মনে করিয়ে দিচ্ছি বহুদিনের বহুপদাহত ঢেঁকির আত্মকথা। প্রাচীনযুগে অশোকগাছে সুন্দরীর পদস্পর্শ-ব্যাপারের চেয়েও হয়তো একে বেশি মর্যাদা দিতে পারবেন বিশেষত যদি চরণপাত বেছে বেছে অসুন্দরীদের হয়। আর যদি শুকিয়ে-পড়া খেজুরগাছের উপর কিছু লিখতে চান, তাহলে বলতে পারবেন ওই গাছ আপন রসের বয়সে কত ভিন্ন ভিন্ন জীবনে কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের নেশার সঞ্চার করেছে; তার মধ্যে হাসিও ছিল কান্নাও ছিল ভীষণতাও ছিল। সেই নেশা যে-শ্রেণীর লোকের তার মধ্যে রাজাবাদশা নেই, এমন কি এম. এ. পরীক্ষার্থী অন্যমনস্ক তরুণ যুবকও নেই, যার হাতে কবজি-ঘড়ি, চোখে চশমা, এবং অঙ্গুলিকর্ষণে চুল-গুলো পিছনের দিকে তোলা। বলতে বলতে আর-একটা কাব্য-বিষয় মনে পড়ল। একটুকু তলানিওয়ালা লেবেল-উঠে-যাওয়া চুলের তেলের নিশ্ছিপি একটা শিশি, চলেছে সে তার হারা জগতের অন্বেষণে, সঙ্গে সাথি আছে একটা দাঁতভাঙ চিরুনি আর শেষক্ষয়-ক্ষয়ে-যাওয়া সাবানের পাতলা টুকরো। কাব্যটির নাম দেওয়া যেতে পারে আধুনিক রূপকথা। তার ভাঙা ছন্দে এই দীর্ঘনিশ্বাস জেগে উঠবে যে কোথাও পাওয়া গেল না সেই খোয়ানো জগৎ। এই সুযোগে সেদিনকার দেউলে অতীতের এই তিনটি উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিশ্ববিধি ও বিধাতাকে বেশ একটু বিদ্রূপ করে নিতে পারে, বলতে পারে শৌখিন মরীচিকার ছদ্মবেশ পরে বাবুয়ানার অভিনয় করত ওই মহাকালের নাট্যমঞ্চের সঙ,—আজ নেপথ্যে উঁকি মারলে তাকে আর চেনাই যায় না; এমন ফাঁকির জগতে সত্য যদি কাউকে বলা যায় তবে তার প্রতীক বাজারদরের বাইরেকার আমরা কটিই, এই তলানি তেলের শিশি, এই দাঁতভাঙা চিরুনি আর ক্ষয়ে-যাওয়া পাতলা সাবানের টুকরো; আমরা রীয়ল, আমরা ঝাঁটানি-মালের ঝুড়ি

থেকে আধুনিকতার রসদ জোগাই। আমাদের কথা ফুরোয় যেই, দেখা যায় নটেগাছটি মুড়িয়েছে ; কালের গোয়ালঘরের দরজা খোলা, তার গোরুতে দুধ দেয় না, কিন্তু নটেগাছটি মুড়িয়ে খায়। তাই আজ মানুষের সব আশাভরসা-ভালোবাসার মুড়োনো নটেগাছটার এত দাম বেড়ে গেছে কবিত্বের হাটে। গোরুটাও হাড়-বের-করা, শিংভাঙা, কাকের-ঠোকর-খাওয়া ক্ষতপৃষ্ঠ, গাড়োয়ানের মোচড় খেয়ে খেয়ে গ্রন্থি-শিথিল ল্যাজওয়ালা হওয়া চাই। লেখকের অনবধানে এ যদি সুস্থ সুন্দর হয় তাহলে মিড-ভিক্টোরীয় যুগবর্তী অপবাদে লাঞ্ছিত হয়ে আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে তাড়া খেয়ে মরতে যাবে সমালোচকের কশাইখানায়।

১৩৪৪

সাহিত্যের মাত্রা

বর্তমান যুগে পূর্বযুগের থেকে মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন তা নিয়ে তর্ক হতে পারে না। এখনকার মানুষ জীবনের যে-সব সমস্যা পূরণ করতে চায় তার চিন্তাপ্রণালী প্রধানত বৈজ্ঞানিক, তার প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে, এইজন্যে তার মননবস্তু জমে উঠছে বিচিত্ররূপে এবং প্রভূতপরিমাণে। কাব্যের পরিধির মধ্যে তার সম্পূর্ণ স্থান হওয়া সম্ভবপর নয়। সাবেক কালে তাঁতি যখন কাপড় তৈরি করত তখন চরকায় সুতো কাটা থেকে আরম্ভ করে কাপড় বোনা পর্যন্ত সমস্তই সরল গ্রাম্য জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলত। বিজ্ঞানের প্রসাদে আধুনিক বাণিজ্যপদ্ধতিতে চলছে প্রভূত পণ্য উৎপাদন। তার জন্যে প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরির দরকার। চারদিকের মানব-সংসারের সঙ্গে তার সহজ মিল নেই। এইজন্যে এক-একটা কারখানার শহর পরিস্ফীত হয়ে উঠছে, ধোঁয়াতে কালিতে যন্ত্রের গর্জনে ও আবর্জনায় তারা জড়িত বেষ্টিত, সেই সঙ্গে গুচ্ছ গুচ্ছ বিস্ফোটকের মতো দেখা দিয়েছে মজুর-বস্তি। একদিকে বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্‌গার করছে অপরিমিত বস্তুপিণ্ড, অন্যদিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে গন্ধে দৃশ্যে স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এর প্রবলত্ব ও বৃহত্ত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারখানা-ঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উপন্যাসে, তার ভূরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভালো লাগুক মন্দ লাগুক আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানা-হাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দেশ করতে পারছে না। এই অপ্রাণ পদার্থ বহু শাখায় প্রকাণ্ড হয়ে উঠে

প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্ছে কোণঠাসা করে। উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে। বলতে পারো বর্তমানে এটা অপরিহার্য, তাই বলে বলতে পারো না এটা সাহিত্য। হাটের জায়গা প্রশস্ত করবার জন্যে মানুষকে ঘর ছাড়তে হয়েছে, তাই বলে বলতে পারো না সেটাই লোকালয়। এখনকার মানুষের প্রবৃত্তি বুদ্ধিগত সমস্যার অভিমুখে, সে-কথা অস্বীকার করব না। তার চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে এই বুদ্ধির আলোড়ন চলছে। চসরের ক্যাণ্টরবরি টেল্‌সে তখনকার কালের মানব-সংসারের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এখনকার মানুষের মধ্যে যে সেই পরিচয় একেবারেই নেই তা নয়। অনুভাবের দিকে অনেক পরিমাণে আছে, কিন্তু চিন্তার মানুষ তার সেদিনকার গণ্ডী অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। অতএব ইদানীন্তন সাহিত্যে যখন মানুষ দেখা দেয়, তখন ভাবে বলায় চলায় সেদিনকার নকল করলে সম্পূর্ণ অসংগত হবে। তার জীবনে চিন্তার বিষয় সর্বদা উদ্‌গত হয়ে উঠবেই। অতএব আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবল হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই। তা হোক, তবু সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন। অর্থাৎ রসসম্ভোগের যে নিয়ম আছে, তা মানুষের নিত্যস্বভাবের অন্তর্গত। যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে যদি প্রকৃতিস্থ থাকে। এই গল্পের বাহন কী, না সজীব মানবচরিত্র। আমরা তাকে একান্ত সত্যরূপে চিনতে চাই, অর্থাৎ আমার মধ্যে যে ব্যক্তিটা আছে সে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিরই পরিচয় নিতে উৎসুক। কিন্তু কালের গতিকে আমার সেই ব্যক্তি হয়তো অতিমাত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পলিটিক্‌সে। তাই হয়তো সাহিত্যেও ব্যক্তিকে সে গৌণ করে দিয়ে আপন মনের মতো পলিটিক্‌সের বচন শুনতে পেলে পুলকিত হয়ে ওঠে। এমনতরো মনের অবস্থায়

সাহিত্যের যথোচিত যাচাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারিনে। অবশ্য গল্পে পলিটিক্‌স্‌প্রবণ কোনো ব্যক্তির চরিত্র যদি আঁকতে হয় তবে তার মুখে পলিটিক্‌সের বুলি দিতেই হবে, কিন্তু লেখকের আগ্রহটা যেন বুলি জোগান দেওয়ার দিকে না ঝুঁকে প'ড়ে চরিত্র-রচনের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। চরিত্রসৃষ্টিকে গৌণ রেখে বুলির ব্যবস্থাকেই মুখ্য করা এখনকার সাহিত্যে যে এত বেশি চড়াও হয়ে উঠছে তার কারণ আধুনিককালে জীবনসমস্যার জটিল গ্রন্থি আলগা করার কাজে এই যুগের মানুষ অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত। এইজন্যে তাকে খুশি করতে দরকার হয় না যথার্থ সাহিত্যিক হবার। প্রহ্লাদ বর্ণমালা শেখবার শুরুতেই ক অক্ষরের ধ্বনি কানে আসবামাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করেই অভিভূত হয়ে পড়ল। তাকে বোঝানো আবশ্যক যে বিশুদ্ধ বর্ণমালার তরফ থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, ক অক্ষর কৃষ্ণ শব্দেও যেমন আছে তেমনি কোকিলেও আছে, কাকেও আছে, কলকাতাতেও আছে। সাহিত্যে তত্ত্বকথাও তেমনি, তা নৈর্ব্যক্তিক, তাকে নিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লে চরিত্রের বিচার আর এগোতে চায় না। সেই চরিত্ররূপই রসসাহিত্যের, অরূপ তত্ত্ব রসসাহিত্যের নয়।

মহাভারত থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। মহাভারতে নানাকালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক্ থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে। এটা স্পষ্টই দেখা যায় ভীষ্মের চরিত্র ধর্মনীতিপ্রবণ—যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, যথাপরিমাণ আলোচনায়, বিরুদ্ধ চরিত্রে ও অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীষ্মের ব্যক্তিরূপ তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার কথা। কাব্য পড়বার সময় আমরা তাই চাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনো এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ

কারণে অতিপ্রবল ছিল। এইজন্যে পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ এক পর্ব জুড়ে নীতি-কথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়। এখনকার উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা করো। মুশকিল এই যে এই সকল নীতিকথা তখনকার কালের চিত্তকে যেরকম সচকিত করেছিল এখন আর তা করে না, এখনকার বুলি অন্য, সেও কালে পুরাতন হয়ে যাবে। পুরাতন না হলেও সাহিত্যে যে-কোনো তত্ত্ব প্রবেশ করবে, সাময়িক প্রয়োজনের প্রাবল্য সত্ত্বেও সাহিত্যের পরিমাণ লঙ্ঘন করলে, তাকে মাপ করা চলবে না। ভগবদ্‌গীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনোকালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রণালী আছে, কিন্তু সৎকথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েছে বললে গীতাকে খর্ব করা হয় না।

যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণে রামের যে দেখা পাওয়া গেছে সেটাতে চরিত্রই প্রকাশিত। তার মধ্যে ভালো দিক আছে, মন্দ দিক আছে, আত্মখণ্ডন আছে। দুর্বলতা যথেষ্ট আছে। রাম যদিও প্রধান নায়ক তবু শ্রেষ্ঠতার কোনো কালপ্রচলিত বাঁধা-নিয়মে তাঁকে অস্বাভাবিকরূপে সুসংগত করে সাজানো হয়নি, অর্থাৎ কোনো একটা শাস্ত্রীয় মতের নিখুঁত প্রমাণ দেবার কাজে তিনি পাঠক-আদালতে সাক্ষীরূপে দাঁড়াননি। পিতৃসত্য রক্ষা করার উৎসাহে পিতার প্রাণনাশ যদি বা শাস্ত্রিক বুদ্ধি থেকে ঘটে থাকে, বালিকে বধ না শাস্ত্রনৈতিক না ধর্মনৈতিক। তার পরে বিশেষ উপলক্ষ্যে রামচন্দ্র সীতা সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উপরে যে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সেটাতেও শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বজায় থাকেনি। বাঙালী

সমালোচক যে-রকম আদর্শের যোলো আনা উৎকর্ষ যাচাই ক'রে সাহিত্যে চরিত্রের সত্যতা বিচার ক'রে থাকে সে আদর্শ এখানে খাটে না। রামায়ণের কবি কোনো একটা মতসংগতির লজিক দিয়ে রামের চরিত্র বানাননি, অর্থাৎ সে চরিত্র স্বভাবের, সে চরিত্র সাহিত্যের, সে চরিত্র ওকালতির নয়।

কিন্তু উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে; কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে মারে তেমনি করে চরিত্রকে দিলে মেরে। সামাজিক প্রয়োজনের গুরুতর তাগিদ এসে পড়ল, অর্থাৎ তখনকার দিনের প্রব্‌লেম। সে-যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধবার দিন এল, তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তার অগ্নিপরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। সেই বাহবার জোরে ওই জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনো মূল রামায়ণের সজীবদেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।

আজকের দিনের একটা সমস্যার কথা মনে করে দেখা যাক। কোনো পতিব্রতা হিন্দু-স্ত্রী মুসলমানের ঘরে অপহৃত হয়েছে। তার পরে তাকে পাওয়া গেল। সনাতনী ও অধুনাতনী লেখক এই প্রব্‌লেমটাকে নিয়ে আপন পক্ষের সমর্থনরূপে তাঁদের নভেলে লম্বা লম্বা তর্ক স্তূপাকার করে তুলতে পারেন। এ-রকম অত্যাচার কাব্যে গর্হিত কিন্তু উপন্যাসে বিহিত এমনতর একটা রব উঠেছে। খাঁটি হিঁদুয়ানি রক্ষার ভার হিন্দু মেয়েদের উপর, কিন্তু হিন্দু পুরুষদের উপর নয় সমাজে এটা দেখতে

পাই। কিন্তু হিঁদুয়ানি যদি সত্য পদার্থই হয় তবে তার ব্যত্যয় মেয়েতেও যেমন দোষাবহ পুরুষেও তেমনি। সাহিত্যনীতিও সেইরকম জিনিস। সর্বত্রই তাকে আপন সত্য রক্ষা করে চলতে হবে। চরিত্রের প্রাণগত রূপ সাহিত্যে আমরা দাবি করবই, অর্থনীতি সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অনুগত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে তবে তার বুদ্ধিগত মূল্য যতই থাক্ তাকে নিন্দিত করে দূর করতে হবে। নভেলে কোনো একজন মানুষকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর পত্র করে তোলা চাই এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থীসিস পড়ার রোগ আছে আমি বলব সাহিত্যের পদ্মবনে তাঁরা মত্ত হস্তী। কোনো বিশেষ চরিত্রের মানুষ মুসলমানের ঘর থেকে প্রত্যাহৃত স্ত্রীকে আপন স্বভাব অনুসারে নিতেও পারে, না নিতেও পারে, গল্পের বইয়ে তার নেওয়াটা বা না-নেওয়াটা সত্য হওয়া চাই, কোনো প্রব্‌লেমের দিক থেকে নয়।

প্রাণের একটা স্বাভাবিক ছন্দোমাত্রা আছে ; এই মাত্রার মধ্যেই তার স্বাস্থ্য সার্থকতা তার শ্রী। এই মাত্রাকে মানুষ জবরদস্তি করে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। তাকে বলে পালোয়ানি, এই পালোয়ানি বিস্ময়কর, কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয় সুন্দর তো নয়ই। এই পালোয়ানি সীমা লঙ্ঘন করবার দিকে তাল ঠুকে চলে, দুঃসাধ্য সাধনও করে থাকে কিন্তু এক জায়গায় এসে ভেঙে পড়ে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই ভাঙনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। সভ্যতা স্বভাবকে এতদূরে ছাড়িয়ে গেছে যে কেবলি পদে পদে তাকে সমস্যা ভেঙে ভেঙে চলতে হয়, অর্থাৎ কেবলি সে করছে পালোয়ানি। প্রকাণ্ড হয়ে উঠছে তার সমস্ত বোঝা এবং স্তূপাকার হয়ে পড়ছে তার আবর্জনা। অর্থাৎ মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের

লয়ে সাধনা করা চলছে। আজ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে কিছুতেই তাল পৌঁছচ্চে না শমে। এতদিন দুন-চৌদুনের বাহাদুরি নিয়ে চলছিল মানুষ, আজ অন্তত অর্থনীতির দিকে বুঝতে পারছে বাহাদুরিটা সার্থকতা নয়,—যন্ত্রের ঘোড়দৌড়ে একটা একটা করে ঘোড়া পড়ছে মুখ থুবড়িয়ে। জীবন এই আর্থিক বাহাদুরির উত্তেজনায় ও অহংকারে এতদিন ভুলে ছিল যে গতিমাত্রার জটিল অতিকৃতির দ্বারাই জীবনযাত্রার আনন্দকে সে পীড়িত করছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে আধুনিক অতিকায় সংসার, প্রাণের ভারসাম্যতত্ত্বকে করেছে অভিভূত।

পশ্চিম-মহাদেশের এই কায়াবহুল অসংগত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা ক'রে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল কসরতের কাজে লেগেছে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয়; বিস্ময়কররূপে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল; প্রয়োজনসাধকও হতে পারে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান নয়। পৃথিবীর অতিকায় জন্তুগুলো আপন অস্থিমাংসের বাহুল্য নিয়ে মরেছে, এরাও আপন অতিমিতির দ্বারাই মরছে। প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টেরও ধর্মও তাই। এই সুমিতিতেই প্রাণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ, এই সুমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা। লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না, লোভ উপকরণবতাং জীবিতং যা তাকেই জীবিত বলে অমৃতকে বলে না। উপকরণের বাহাদুরি তার বহুলতায়, অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্যে, তার হঠাৎ-নবাবী আপন ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল অত্যাড়ম্বরে, সেটা যথার্থ আভিজাত্য নয়, সেটা স্বল্পায়ু মরণধর্মী।

মেঘদূত কাব্যটি প্রাণবান, আপনার মধ্যে ওর সামঞ্জস্য সুপরিমিত। ওর মধ্যে থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেছি, কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্যভাবে গৌণ। রঘুবংশ কাব্যে কালিদাস স্পষ্টই আপন উদ্দেশ্যের কথা ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। রাজধর্মের কিসে গৌরব কিসে তার পতন কবিতায় এইটের তিনি দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। এইজন্ম সমগ্রভাবে দেখতে গেলে রঘুবংশ কাব্য আপন ভারবাহুল্যে অভিভূত, মেঘদূতের মত তাতে রূপের সম্পূর্ণতা নেই। কাব্য হিসাবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসাবে প্রব্‌লেম হিসাবে ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পরে স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রব্‌লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্‌লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকে সম্পূর্ণ করাই তার কাজ। প্রব্‌লেমের গ্রন্থিমোচন ইন্‌টেলেক্‌টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে লজিকের এলেকায় নয়।

তোমার চিঠিতে তুমি আমার লেখা গোরা ঘরে বাইরে প্রভৃতি নভেলের উল্লেখ করেছ। নিজের লেখার সমালোচনা করবার অধিকার নেই, তাই বিস্তারিত করে কিছু বলতে পারব না। আমার এই দুটি নভেলে মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে সে-কথা কবুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে, সেগুলি জায়গা পেয়েছে, না জায়গা জুড়েছে। আহার্য জিনিস অন্তরে নিয়ে হজম করলে দেহের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য ঘটে। কিন্তু ঝুড়িতে করে যদি মাথায় বহন করা যায়, তবে তাতে বাহ্য প্রয়োজন সাধন হতে পারে কিন্তু প্রাণের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় না। গোরা গল্পে তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে

থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক না, সে নিন্দনীয়। আলোচনার সামগ্রীগুলি গোরা ও বিনয়ের একান্ত চরিত্রগত প্রাণগত উপাদান যদি না হয়ে থাকে তবে প্রব্লেমে ও প্রাণে প্রবন্ধে ও গল্পে জোড়াতাড়া জিনিস সাহিত্যে বেশিদিন টিঁকবে না। প্রথমত আলোচ্য তত্ত্ববস্তুর মূল্য দেখতে দেখতে কমে আসে, তার পরে সে যদি গল্পটাকে জীর্ণ করে ফেলে তাহলে সবসুদ্ধ জড়িয়ে সে আবর্জনারূপে সাহিত্যের আঁস্তাকুড়ে জমে ওঠে। ইবসেনের নাটকগুলি তো একদিন কম আদর পায়নি কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসেনি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে? মানুষের প্রাণের কথা চিরকালের আনন্দের জিনিস, বুদ্ধিবিচারের কথা বিশেষ দেশকালে যত নতুন হয়েই দেখা দিক, দেখতে দেখতে তার দিন ফুরোয়। তখনো সাহিত্য যদি তাকে ধরে রাখে তাহলে মৃতের বাহন হয়ে তার দুর্গতি ঘটে। প্রাণ কিছুপরিমাণ অপ্রাণকে বহন করেই থাকে যেমন আমাদের বসন আমাদের ভূষণ, কিন্তু প্রাণের সঙ্গে রফা করে চলবার জন্যে তার ওজন প্রাণকে যেন ছাড়িয়ে না যায়। য়ুরোপে অপ্রাণের বোঝা প্রাণের উপর চেপেছে অতিপরিমাণে; সেটা সইবে না। তার সাহিত্যেও সেই দশা। আপন প্রবল গতিবেগে য়ুরোপ এই প্রভূত বোঝা আজও বইতে পারছে, কিন্তু বোঝার চাপে এই গতির বেগ ক্রমশ কমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। অসংগত অপরিমিত প্রকাণ্ডতা প্রাণের কাছ থেকে এত বেশি মাশুল আদায় করতে থাকে যে একদিন তাকে দেউলে করে দেয়।

সাহিত্যে আধুনিকতা

সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এ-রকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে, যদি তার সজীবতা না থাকে। এবারে আমারই পুরোনো তর্জমা ঘাঁটতে গিয়ে এ-কথা বারবার মনে হয়েছে। তুমি বোধ হয় জানো বাছুর মরে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্তি ক'রে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরি করা হয়, তারি গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে। তর্জমা সেইরকম মরা বাছুরের মূর্তি— তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জন্মায়। সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক না হয়, তবে যাঁর গরজ সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে। পরিচয়ের অন্য কোনো পন্থা নেই। যথাপথে পরিচয়ের যদি বিলম্ব ঘটে তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যে দিন ও রাত্রির মতো পর্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সংকোচনের দশা ঘটে। মিল্টনের পর ড্রাইডেন পোপের আবির্ভাব হয়। আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া-ভাঙবার নাড়া। এইজন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রসসৃষ্টির সার্বজনিক যজ্ঞ। তার মধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে,

ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল—তার মধ্যে ছিল সর্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও জাগ্রত মনকে পথনির্দেশ করলে বিশ্বের দিকে। সহজেই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, কেবল বিজ্ঞান নয় সাহিত্য-সম্পদও আপন উদ্ভবস্থানকে অতিক্রম ক'রে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়; তার দাক্ষিণ্য যদি সীমাবদ্ধ হয়, যদি তাতে আতিথ্যধর্ম না থাকে তবে স্বদেশের লোকের পক্ষে সে যতই উপভোগ্য হোক না কেন সে দরিদ্র। আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে দরিদ্র নয়, তার সম্পত্তি স্বাজাতিক লোহার সিন্ধুকে দলিলবদ্ধ হয়ে নেই।

একদা ফরাসী বিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্মই হোক রাজশক্তিই হোক যা কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায় তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান; সেই বিশ্বকল্যাণ-ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ, সে মুক্তদ্বার সাহিত্য, সকল দেশ সকল কালের মানুষের জন্য সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতির ও পরজাতির মর্মস্থল বিদীর্ণ করে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হতে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্বত্র সর্ববিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষাপরায়ণ। স্বার্থসাধনার বাহন যারা তাদেরই ঈর্ষা, তাদেরই ভেদনীতি অনেকদিন থেকেই য়ুরোপের অন্তরে অন্তরে গুমরে উঠছিল, সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ করে আগ্নেয়স্রাবে

য়ুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেইজন্যে এই যুদ্ধের যে দান তা দানবের দান, তার বিষ কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনলে না।

তার পর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে—প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগলের সংখ্যা বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয় যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠছে তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখিনে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি বলেই জানতুম—অকস্মাৎ দেখতে পাই সমস্ত যাচ্ছে বিপর্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠছে, হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা। এর মূলে আছে ভীরুতা, যে ভীরুতা বিষয়বুদ্ধির। ভয়, পাছে ধনের প্রতিযোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্থভাণ্ডারে এমন ছিদ্র দেখা দেয় যার মধ্য দিয়ে ক্ষতির দুর্গ্রহ আপন প্রবেশপথ প্রশস্ত করতে পারে। এইজন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে দেশের লোক আপন স্বাধীনতা আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিকে প্রস্তুত আছে। এমন কি, স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব হতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্বরতাকে শিরোধার্য করে নিয়েছে। বৈশ্যযুগের এই ভীরুতায় মানুষের আভিজাত্য নষ্ট করে দেয়, তার ইতরতার লক্ষণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

পণ্যহাটের তীর্থযাত্রী অর্থলুব্ধ য়ুরোপ এই যে আপন মনুষ্যত্বের খর্বতা মাথা হেঁট ক'রে স্বীকার করছে, আত্মরক্ষার উপায়রূপে নির্মাণ করছে আপন কারাগার, এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করছে না? ইংরেজি সাহিত্যে একদা আমরা বিদেশীরা যে নিঃসংকোচ আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম আজ কি তা আর আছে? এ-কথা বলা বাহুল্য

প্রত্যেক দেশের সাহিত্য মুখ্যভাবে আপন পাঠকদের জন্য, কিন্তু তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দূর-নিকটের সকল অতিথিকেই আসন জোগাতে পারে। যে সাহিত্যে সেই আসন প্রসারিত সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য, সকল কালেরই মানুষ সেই সাহিত্যের স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করে তোলে, তার প্রতিষ্ঠাভিত্তি সর্বমানবের চিত্তক্ষেত্রে।

আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে। আমি যা বলতে পারি তা আমার ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলছি—অথবা তাও নয়—একজনমাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলছি—আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ-কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই প্রমাণ হবে যে এই সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্বভৌমিকতা, যাতে ক'রে বিদেশ থেকে আমিও একে অকুণ্ঠিতচিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয়নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার ব'লে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন

উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারই বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই-একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা বললে অন্যায় হবে।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্য সত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্ধা মাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য যে প্রেম যে মহত্ত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, কোনো আইনস্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বলতে পারে না বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিস্টাইন। যদি কোনো বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজনীয়কে অপমানিত করতে তার উৎসাহ উগ্র হতে থাকে তাহলে বলতেই হবে এই মনোভাব

চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধ। সাহিত্য সর্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহবেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য মানুষের শিল্পকলা। এইজন্যেই মানুষের সাহিত্য মানুষের শিল্পকলা সর্বমানবের। তাই বারে বারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী-ভাবে নূতন; যে তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদির রসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। যে নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারিনে :

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয় জুড়ন না গেল—

তাকে যেন সত্যই নূতন ব'লে ভ্রম না করি, সে আপন সদ্য জন্মমুহূর্তেই আপনি জরা সঙ্গে নিয়েই এসেছে, তার আয়ুঃস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে।...

১৩৪১

কাব্যে গদ্যরীতি

গানের আলাপের সঙ্গে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকা রীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয়নি। কেননা, আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে-কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ-পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, "যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয় যখন "এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।" যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে এ-কথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো

হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকন-পরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না, তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারই আলোচনা চলছে। বিরাজমাণ কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বরকনে টোপর মাথায় আলপনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ওদিকে আকাশ থেকে আসছে শাহানা রাগিণীতে শানাইয়ের সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই শানাই-বাজনা সেই মন্ত্র-পড়া লেগেই আছে। তবে সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্য মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত শাহানা সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ-অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল কিন্তু

বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে শাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন কি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্ত শ্রুত কড়া সুরও না-মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি বেনারসিটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করিনে। এমন কি বাম দিক থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা-রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনও ঘটে। কিন্তু সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তনস্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন কি, হনুমানের চরিত্রকেও

বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রং-ফলানো চওড়া বলেই লোকে ওইটের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে। ভবভূতি তা করেননি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে উত্তররামচরিত রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ওই দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহলে সাহিত্য-সংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা যায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময় বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে-মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাধা। ভিড়ের ছোঁওয়া

বাঁচিয়ে পোশাকী শাড়ির প্রান্ত তুলে ধরা আধঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না এমন পণ করিনি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ওই পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারিনে। যাঁরা দৈবত্নর্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মন্ত্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

খড়দহ, দেওয়ালি, ১৩৩৯

২

অন্তরে যে ভাবটা অনির্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে এটাকে লিরিক বলে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গীগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে ব'লেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিকে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবলবেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্য বিশেষ প্রসাধন আয়োজন বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব।

কিন্তু একবার সরিয়ে দাও ওই রঙ্গমঞ্চ, জরির আঁচলা দেওয়া বেনারসী শাড়ি তোলা থাক্ পেটিকায়, নাচের বন্ধনে তনুদেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাই বা সংযত করলে, তাহলেই কি রস নষ্ট হল? তাহলেও দেহের সহজ ভঙ্গীতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় যে-বেদনার ইঙ্গিত ঠিকরে ওঠে সে মুক্ত ব'লেই যে নিরর্থক এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসাড় হয়েছে। সে নাচে না বলেই যে তার চলনে মাধুর্যের অভাব ঘটে কিংবা সে গান করে না বলেই যে তার কানে কানে কথার মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকে না এ-কথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা, আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে। অশোকের গাছে সে আলতা-আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল; না হয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ-হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে; সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না—না হয় গদ্য-লিরিকই হল। এ রস শালপাতায় তৈরি গদ্যের পেয়ালাতেই মানায়, ওটাকে তো ত্যাগ করা চলবে না। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে এ-কথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।

প্রশ্ন উঠবে গদ্য তাহলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন্ নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর, তাহলে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন, এ-সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরনার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে। সেই মিশ্রণের উদ্দেশ্য সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া। শিশুদের সেটা পছন্দ না হতে পারে কিন্তু দৃঢ়দন্ত বয়স্কের রুচিতে এটা উপাদেয়।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না এটা শোচনীয়। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তাহলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেব-সাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। (দোহাই তোমার, বাংলাদেশের ময়ূরে-চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা কোরো)।

১৭ মে ১৯৩৫

কাব্য ও ছন্দ

গদ্যকাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্যের বিষয় নেই।

ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে—এ-কথা স্বীকার করতে হবে।

শুধু তাই নয়। যে-সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক। পদ্যের ভাষা-বিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে। গেরুয়া-বেশে সন্ন্যাসী জানান দেয় সে গৃহীর থেকে পৃথক, ভক্তের মন সেই মুহূর্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে—নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।

কিন্তু বলা বাহুল্য সন্ন্যাসধর্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয় সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি করে আকৃষ্ট হয়। সে বলে আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয় যে-কাপড় বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুই দিক থেকে। এক হচ্ছে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর এক হচ্ছে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় বলে গণ্য ছিল। সেই সময়ে

আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য।

এমন সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গী পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারের অনিত্যতার আর-একটা প্রমাণ দিই। একসময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে-কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসংকোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে-মেয়েরা সাহস ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ-ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে।

ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িত-ভাবে কুলস্ত্রীই আছেন যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী বলে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্বতন বিধানকে এই ছন্দে বহুদূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল কেননা তখনকার ইংরেজি-শেখা পাঠকেরা মিল্‌টন-শেকস্‌পীয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না।

অর্থাৎ লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায় পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ীর সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হতে পারে না। কী হতে পারে এবং হতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না—এ-কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্বেই প্রমাণ করেছে। আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য—কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য।

কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা,—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক আর পায়ে হেঁটেই হোক। ছন্দে-লেখা রচনা কাব্য হয়নি তার হাজার প্রমাণ আছে, গদ্যরচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হতে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমসলা বাদ দিয়েও, কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায় আসল কাব্য জিনিসটা একান্তভাবে ছন্দ-অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক পদ্যই হোক রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা-নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার করে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য গদ্য হলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে : কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

১২ নভেম্বর ১৯৩৬

গদ্যকাব্য

কতকগুলি বিষয় আছে যার আবহাওয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কিছুতেই সহজে প্রতিভাত হতে চায় না। ধরাছোঁওয়ার বিষয় নিয়ে তর্কে আঘাত-প্রতিঘাত করা চলে। কিন্তু বিষয়বস্তু যখন অনির্বচনীয়ের কোঠায় এসে পড়ে তখন কী উপায়ে বোঝানো চলে তা স্বস্থ কি না। তাকে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার একটা সহজ ক্ষমতা ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু রুচি এমন একটা জিনিস যাকে বলা যেতে পারে সাধনদুর্লভ, তাকে পাওয়ার বাঁধা-পথ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। সহজ ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বলতে পারি যে এই আমার ভালো লাগে।

সেই রুচির সঙ্গে যোগ দেয় নিজের স্বভাব, চিন্তার অভ্যাস, সমাজের পরিবেষ্টন ও শিক্ষা। এগুলি যদি ভদ্র, ব্যাপক ও সূক্ষ্মবোধশক্তিমান হয় তাহলে সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রুচির শুভসম্মিলন কোথাও সত্য পরিণামে পৌঁছেছে কিনা তাও মেনে নিতে অন্য পক্ষে রুচিচর্চার সত্য আদর্শ থাকা চাই। সুতরাং রুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে যুগে যুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে যে-মানুষ যথোচিত চর্চা করেনি সে বেশ নম্রভাবেই বলে, মতের অধিকার নেই আমার। সাহিত্য ও শিল্পে রসসৃষ্টির সভায় মতবিরোধের কোলাহল দেখে অবশেষে হতাশ হয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। সেখানে সাধনার বালাই নেই ব'লে স্পর্ধা আছে অবারিত, আর সেইজন্যেই রুচিভেদের তর্ক নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে থাকে। তাই বররুচির আক্ষেপ মনে পড়ে, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

স্বয়ং কবির কাছে অধিকারীর ও অনধিকারীর প্রসঙ্গ সহজ। তাঁর লেখা কার ভালো লাগল কার লাগল না শ্রেণীভেদ এই যাচাই নিয়ে। এই কারণেই চিরকাল ধরে যাচনদারের সঙ্গে শিল্পীদের ঝগড়া চলেছে। স্বয়ং কবি কালিদাসকেও এ নিয়ে দুঃখ পেতে হয়েছে সন্দেহ নেই ; শোনা যায় নাকি মেঘদূতে স্থূলহস্তাবলেপের প্রতি ইঙ্গিত আছে। যে-সকল কবিতায় প্রথাগত ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করা হয় সেখানে অন্তত বাইরের দিক থেকে পাঠকদের চলতে ফিরতে বাধে না। কিন্তু কখনো কখনো বিশেষ কোনো রসের অনুসন্ধানে কবি অভ্যাসের পথ অতিক্রম করে থাকে। তখন অন্তত কিছুকালের জন্য পাঠকের আরামের ব্যাঘাত ঘটে ব'লে তারা নূতন রসের আমদানিকে অস্বীকার ক'রে শান্তি জ্ঞাপন করে। চলতে চলতে যে-পর্যন্ত পথ চিহ্নিত হয়ে না যায় সে-পর্যন্ত পথকর্তার বিরুদ্ধে পথিকদের একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সেই অশান্তির সময়টাতে কবি স্পর্ধা প্রকাশ করে, বলে তোমাদের চেয়ে আমার মতই প্রামাণিক। পাঠকরা বলতে থাকে, যে-লোকটা জোগান দেয় তার চেয়ে যে-লোক ভোগ করে তারই দাবির জোর বেশি। কিন্তু ইতিহাসে তার প্রমাণ হয় না। চিরদিনই দেখা গেছে নূতনকে উপেক্ষা করতে করতেই নূতনের অভ্যর্থনার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

কিছুদিন থেকে আমি কোনো কোনো কবিতা গদ্যে লিখতে আরম্ভ করেছি। সাধারণের কাছ থেকে এখনই যে তা সমাদর লাভ করবে এমন প্রত্যাশা করা অসংগত। কিন্তু সদ্য সমাদর না পাওয়াই যে তার নিষ্ফলতার প্রমাণ তাও মানতে পারিনে। এই দ্বন্দ্বের স্থলে আত্মপ্রত্যয়কে সম্মান করতে কবি বাধ্য। আমি অনেকদিন ধরে রসসৃষ্টির সাধনা করেছি, অনেককে হয়তো আনন্দ দিতে পেরেছি, অনেককে হয়তো বা দিতে পারিনি। তবু এই বিষয়ে আমার বহুদিনের সঞ্চিত যে

অভিজ্ঞতা তার দোহাই দিয়ে দুটো-একটা কথা বলব, আপনারা তা সম্পূর্ণ মেনে নেবেন এমন কোনো মাথার দিব্য নেই।

তর্ক এই চলেছে গদ্যের রূপ নিয়ে কাব্য আত্মরক্ষা করতে পারে কি না। এতদিন যে-রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে, এবং সে-দেখার সঙ্গে আনন্দের যে অনুষঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গদ্যকাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরূপেতে তার ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন তর্কের বিষয় এই যে, কাব্যের স্বরূপ ছন্দোবদ্ধ সজ্জার 'পরে একান্ত নির্ভর করে কি না। কেউ মনে করেন করে, আমি মনে করি করে না। অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। এ-বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালা-পুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন ক'রে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধেনি। উপাখ্যানমাত্র—কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন ; কারণ এ তো অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়নি। আমি বলি হয়নি ব'লেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত, তবে হালকা হয়ে যেত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নাম-না-জানা কয়েকজন লেখক ইংরেজিতে গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। এ-কথা মানতেই হবে যে সলোমনের গান ডেভিডের গাথা সত্যিকার কাব্য। এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে, তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হত তবে সর্বনাশই হত।

যজুর্বেদে যে উদাত্ত ছন্দের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাকে আমরা পদ্য বলি না, বলি মন্ত্র। আমরা সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষ্য হল শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে কেবল অর্থবান তা নয়, ধ্বনিমানও বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্যমন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর অনুভব করেছেন কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামে না।

একদা কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি আমার গীতাঞ্জলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করি। সেদিন বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকেরা আমার অনুবাদকে তাঁদের সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করলেন। এমন কি, ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে উপলক্ষ্য ক'রে এমন সব প্রশংসাবাদ করলেন যাকে অত্যুক্তি মনে করে আমি কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। আমি বিদেশী, আমার কাব্যে মিল বা ছন্দের কোনো চিহ্নই ছিল না, তবু যখন তাঁরা তার ভিতর সম্পূর্ণ কাব্যের রস পেলেন, তখন সে-কথা তো স্বীকার না করে পারা গেল না। মনে হয়েছিল ইংরেজি গদ্যে আমার কাব্যের রূপ দেওয়ায় ক্ষতি হয়নি, বরঞ্চ পদ্যে অনুবাদ করলে হয়তো তা ধিক্কৃত হত, অশ্রদ্ধেয় হত।

(মনে পড়ে একবার শ্রীমান সত্যেন্দ্রকে বলেছিলুম, "ছন্দের রাজা তুমি, অ-ছন্দের শক্তিতে কাব্যের স্রোতকে তার বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত করো দেখি।" সত্যেনের মতো বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা বাংলায় খুব কমই আছে। হয়তো অভ্যাস তাঁর পথে বাধা দিয়েছিল, তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। আমি স্বয়ং এই কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলুম লিপিকায়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাইনি। লিপিকা লেখার পর বহুদিন আর গদ্যকাব্য লিখিনি। বোধ করি সাহস হয়নি ব'লেই।)

(কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ।

গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে। সেইজন্যেই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতিমাধুর্য অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনাআপনি উদ্ভব হয়। নটীর নাচে শিক্ষিতপটু অলংকৃত পদক্ষেপ। অপর পক্ষে ভালো চলে এমন কোনো তরুণীর চলনে ওজন-রক্ষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এই সহজ সুন্দর চলার ভঙ্গীতে একটা অশিক্ষিত ছন্দ আছে, যে ছন্দ তার রক্তের মধ্যে, যে ছন্দ তার দেহে। গদ্যকাব্যের চলন হল সেইরকম— অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।)

আজকেই মোহাম্মদী পত্রিকায় দেখছিলুম কে একজন লিখেছেন যে, রবিঠাকুরের গদ্যকবিতার রস তিনি তাঁর সাদা গদ্যেই পেয়েছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লেখক বলেছেন যে 'শেষের কবিতা'য় মূলত কাব্যরসে অভিষিক্ত জিনিস এসে গেছে। তাই যদি হয় তবে কি জেনানা থেকে বার হবার জন্যে কাব্যের জাত গেল? এখানে আমার প্রশ্ন এই, আমরা কি এমন কাব্য পড়িনি যা গদ্যের বক্তব্য বলেছে, যেমন ধরুন ব্রাউনিঙে? আবার ধরুন এমন গদ্যও কি পড়িনি যার মাঝখানে কবিকল্পনার রেশ পাওয়া গেছে? গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানি না। আমার কাছে তারা ভাই আর বোনের মতো, তাই যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্য গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদানপ্রদান হচ্ছে, তখন আমি আপত্তি করিনে।

রুচিভেদ নিয়ে তর্ক করে কিছু লাভ হয় না। এইমাত্রই বলতে পারি আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ

করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই, কিন্তু রূপ আছে এবং এইজন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি। কথা উঠতে পারে গদ্যকাব্য কী। আমি বলব কী ও কেমন জানি না, জানি যে, এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্যরূপেই আসুক তাকে কাব্য ব'লে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।

শান্তিনিকেতন, ২৯ আগস্ট, ১৯৩৯

সাহিত্য-বিচার

…সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহরণ করে সেটা সকল সময় সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হল অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কারের জন্য নির্ভর করতে হয় ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে। তার নিম্ন-আদালতের বিচার সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধিনির্দিষ্ট নয়, তার আপিল-আদালতের রায়ও তথৈবচ। এস্থলে আমাদের প্রধান নির্ভরের বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে শিক্ষিত লোকের রুচির পরিধি তৎকালীন বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তরে তার দশান্তর ঘটে। সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্যপরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাসবৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না—তাঁরা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভান করে থাকেন। কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়, ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাশ্বত নয়। উপস্থিতমতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহির করেন, তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শের অনুসারে সাহিত্যকের দণ্ডপুরস্কারের ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। তার বড়ো আদালত নেই, তার ফাঁসির দণ্ড হলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে বেঁচে থাকতে থাকতে হয়তো ফাঁস যাবে ছিঁড়ে, গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনার এই অধ্রুব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়রও নিষ্কৃতি লাভ করেননি। পণ্যের মূল্যনির্ধারণ-কালে ঝগড়া করে তর্ক করে কিংবা আর পাঁচজনের নজির তুলে তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি

স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এস্থলে ধ্রুব আদর্শের ভান না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায় তাহলে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্পনিপুণ হয় তাহলে মানদণ্ডই সাহিত্যভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্যবিচারমূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার ; এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হতে থাকে বিশেষ কালের বা বিশেষ দলের, বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এ আইন সর্বজনীন এবং সর্বকালের হতে পারে না। সেইজন্যেই পাঠকসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক-একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপলিঙের মরসুম। এমন নয় যে ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসংঘ এই মরসুমের দ্বারা চালিত হতে থাকে, অবশেষে কখন একসময় ঋতু-পরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্য বিচারে এ-রকম ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন আদর্শের ভান করে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা

করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ-লাগা মরসুম হতে পারে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এই রকম বিচারকের অহংকার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয় তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সেই সরষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সে-রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি যেন আমি অন্তত কোথাও কোথাও আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষ্যে এ-সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে যখন আমি ক্ষণিকা লিখেছিলেম, তখন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তাহলে কারো বলতে বাধত না যে ওই সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনা-মহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য কেননা লিরিক কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্যরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার 'চিরকুমারসভা'ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ—কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত।…

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারেনি অনেককাল পর্যন্ত তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালক-পদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে, বাঙালী পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারেনি। মুশকিল এই যে বাঙালী কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না। আমার নিজের কথা যদি বল, সত্যআলোচনাসভায় আমার উক্তি অলংকারের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ-কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এই সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে, সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি সেই চড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান ক'রে পাননি ব'লে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এদেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদিবংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে, তার পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাতবংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। এ-কথা সত্য এই স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়লোকের প্রহসন অভিনয় করিনি। অতএব আমার মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বের ছাপ পড়ে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন বিত্তসচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতির মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এ-রকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে, সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে "তরুণ" শব্দটা এইরকম ফণা তুলে ধরেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এইরকম জাতে-ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়েছে হালে। আমি

যখন মস্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমার অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোকর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেলবন্ধনে জাতিচ্যুতিদোষ ঘটেছে সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে শুনতে পাই এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় একসময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনই যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে-ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগদুঃখ ভোগ করে আসছি সেইজন্য যদি ব'লে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হতে পারে, তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার বিপ্লব ঘটে, কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না, সেই আমাদের সৌভাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করার একটা দল পাকাই তাহলে বলতে হয় যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত, নইলে তাঁদের মনের তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে?

শান্তিনিকেতন, ১৩৪৭

সাহিত্যের মূল্য

সেদিন অনিলের সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যের আদর্শের নিরন্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেম; সেই সঙ্গে বলেছিলেম যে ভাষা সাহিত্যের বাহন, কালে কালে সেই ভাষার রূপান্তর ঘটতে থাকে। সেজন্য তার ব্যঞ্জনার অন্তরঙ্গতার কেবলই তারতম্য ঘটতে থাকে। কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলা আবশ্যক।

আমার মতো গীতিকবিরা তাদের রচনায় বিশেষভাবে রসের অনির্বচনীয়তা নিয়ে কারবার করে থাকে। যুগে যুগে লোকের মুখে এই রসের স্বাদ সমান থাকে না, তার আদরের পরিমাণ ক্রমশই শুষ্কনদীর জলের মতো তলায় গিয়ে ঠেকে। এইজন্য রসের ব্যবসা সর্বদা ফেল হবার মুখেই থেকে যায়। তার গৌরব নিয়ে গর্ব করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এই রসের অবতারণা সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়। তার আর-একটা দিক আছে যেটা রূপের সৃষ্টি। যেটাতে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, কেবলমাত্র অনুমান নয়, আভাস নয়, ধ্বনির ঝংকার নয়। বাল্যকালে একদিন আমার কোনো বইয়ের নাম দিয়েছিলেম 'ছবি ও গান'। ভেবে দেখলে দেখা যাবে এই দুটি নামের দ্বারাই সমস্ত সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা যায়। ছবি জিনিসটা অতিমাত্রায় গূঢ় নয়—তা স্পষ্ট দৃশ্যমান। তার সঙ্গে রস মিশ্রিত থাকলেও তার রেখা ও বর্ণবিন্যাস সেই রসের প্রলেপে ঝাপসা হয়ে যায় না। এইজন্য তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকুতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না। এই গতিশীল জগতে যা কিছু চলছে ফিরছে তারই মধ্যে

বড়ো রাজপথ দিয়ে সে চলাফেরা করে বেড়ায়। সেই কারণে শেক্স্‌পীয়রের লুক্রিস এবং ভিনস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিস-এর কাব্যের স্বাদ আমাদের মুখে আজ রুচিকর না হতে পারে—সে-কথা সাহস করে বলি বা না বলি; কিন্তু লেডী ম্যাকবেথ অথবা কিং লীয়র অথবা অ্যাণ্টনি ও ক্লিয়োপেট্রা এদের সম্বন্ধে এমন কথা যদি কেউ বলে তা হলে বলব তার রসনায় অস্বাস্থ্যকর বিকৃতি ঘটেছে, সে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। শেক্‌স্‌পীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, সেখানে যুগে যুগে লোকের ভিড় জমা হবে। তেমনি বলতে পারি কুমারসম্ভবের হিমালয়-বর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম। তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিমর্যাদা হয়তো আছে তার রূপের সত্যতা একেবারেই নেই। কিন্তু সখিপরিবৃতা শকুন্তলা চিরকালের। তাকে দুষ্মন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিন্তু কোনো যুগের পাঠকই পারেন না। মানুষ উঠেছে জেগে, মানুষের অভ্যর্থনা সকল কালে ও সকল দেশেই সে পাবে। তাই বলছি সাহিত্যের আসরে এই রূপসৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে কিন্তু রইল তার ভাঁড়ুদত্ত। মিডসামার নাইট্‌স্‌ ড্রীম নাট্যের মূল্য কমে যেতে পারে কিন্তু ফলস্টাফের প্রভাব বরাবর থাকবে অবিচলিত।

জীবন মহাশিল্পী। সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য, তবুও বহু শত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে যা উজ্জ্বল। জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। সেইরকম সাহিত্যই ধন্য—ধন্য ডন কুইকসট, ধন্য রবিনসন ক্রুসো। আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে, আঁকা পড়ছে জীবনশিল্পীর রূপ-রচনা।

কোনো-কোনোটা ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত, আবার কোনো-কোনোটা উজ্জ্বল। সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষকালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। কিন্তু জীবন যেমন মূর্তিশিল্পী তেমনি জীবন রসিকও বটে। সে বিশেষ ক'রে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি জীবনের স্বাক্ষর না পায়, যদি সে বিশেষকালের বিশেষত্ব মাত্র প্রকাশ করে বা কেবলমাত্র রচনাকৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তাহলে সাহিত্যে সেই রসের সঞ্চয় বিকৃত হয় বা শুষ্ক হয়ে মারা যায়। যে-রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে-রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না।

"চরণ নখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে" এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই। অপর পক্ষে "তোমার ঐ মাথার চূড়ায় যে রং আছে উজ্জ্বলি সে রং দিয়ে রাঙাও আমার বুকের কাঁচলি", এর মধ্যে জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতন, উদয়ন, ২৫ এপ্রিল ১৯৪১

সাহিত্যে চিত্রবিভাগ

আমরা পূর্বেই বলেছি যে সাহিত্যে চিত্রবিভাগ যদি জীবনশিল্পীর স্বাক্ষরিত হয়, তবে তার রূপের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। জীবনের আপন কল্পনার ছাপ নিয়ে আঁকা হয়েছে যে-সব ছবি, তারই রেখায় রেখায় রঙে রঙে সকল দেশে সকল কালে মানুষের সাহিত্য পাতায় পাতায় ছেয়ে গেছে। তার কোনোটা বা ফিকে হয়ে এসেছে, ভেসে বেড়াচ্ছে ছিন্নপত্র তার আপন কালের স্রোতের সীমানায়। তার বাইরে তাদের দেখতেই পাওয়া যায় না। আর কতকগুলি আছে চিরকালের মতন সকল মানুষের চোখের কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে। আমরা একটি ছবির সঙ্গে পরিচিত আছি, সে রামচন্দ্রের। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্যে নিরপরাধা সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। এতবড়ো মিথ্যা ছবি খুব অল্পই আছে সাহিত্যের চিত্রশালায়। কিন্তু যে লক্ষ্মণ আপন হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে অমিল হলে অধৈর্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিতেন শাস্ত্রের উপদেশ এবং দাদার পন্থার অনুসরণ অথচ চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে কাটাতে না পেরে নিষ্ঠুর আঘাত করতে বাধ্য হয়েছেন আপন শুভবুদ্ধিকে, যার মতন কঠিন আঘাত জগতে আর নেই,—সেই সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ছবি তাঁর দাদার ছবিকে ছাপিয়ে চিরকাল সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ওদিকে দেখো ভীষ্মকে, তাঁর গুণগানের অন্ত নেই অথচ কৌরবসভার চিত্রশালায় তাঁর ছবির ছাপ পড়ল না। তিনি বসে আছেন একজন নিষ্কর্মা ধর্ম-উপদেশ-প্রতীকমাত্র হয়ে। ওদিকে দেখো কর্ণকে, বীরের মতন উদার অথচ অতিসাধারণ মানুষের মতন বার বার ক্ষুদ্রাশয়তায় আত্মবিস্মৃত। এদিকে দেখো বিদুরকে, সে নিখুঁত ধার্মিক। এত নিখুঁত যে, সে কেবল কথাই কয় কিন্তু কেউ তার কথা মানতেই চায় না। অপর পক্ষে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি-

মুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে এমন অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যে যদিচ জেনেছেন অধর্মের এই পরিণাম তাঁর স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুণ শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত চিত্তকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারেননি।) এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি—মনুসংহিতার শ্লোকের উপরে উপদেশের দাগা-বুলোনো নয়। এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিকভ্রান্ত অন্ধ তিনি চিরকালের জন্যে স্থির রইলেন।

(রূপসাহিত্যে তাই যখন দেখি কবি তাঁর নায়কের পরিমাণ বাড়িয়ে বলবার জন্যে বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করেছেন আমরা তখন স্বতই সেটাকে শোধন করে নিই। আমাদের সত্যলোকের ভীম কখনোই তালগাছ উপড়ে লড়াই করেননি। এক গদাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। রূপের রাজ্যে মানুষ ছেলে ভুলিয়েছিল, যে-যুগে মানুষ ছেলেমানুষ ছিল। তার পর থেকে জনশ্রুতি চলে এসেছে বটে কিন্তু কালের হাতে ছাঁকাই পড়ে মনের মধ্যে তার সত্য রূপটুকু রয়ে গেছে। তাই হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন এখনো কানে শুনি কিন্তু আর চোখে দেখতে পাই নে, কেননা আমাদের দৃষ্টির বদল হয়ে গেছে।)

রসের ভোজেও এই কথা খাটে। সেখানে সেই ভোজে যেখানে জীবনের স্বহস্তের পরিবেশন, সেখানে রসের বিকৃতি নেই। শিশু কৃষ্ণ চাঁদ দেখবার জন্য কান্না ধরলে পর যে-সাহিত্যে তার সামনে আয়না ধরে তার নিজের ছবি দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা করেছিল, সেখানে এই রচনা-নৈপুণ্যে ভক্তরা যতই হায় হায় করে উঠুক, শিশুবাৎসল্যের এই রসের কৃত্রিমতা কোনো দেশের অভ্যাসের আসরে যদি বা মূল্য পায়, মহাকালের পণ্যশালায় এর কোনো মূল্য নেই।) এই কাব্যের কৃত্রিমতার কুস্বাদ যদি বদল করতে চাও, তাহলে এই কবিতাটি পড়ো :

দধিমন্থধ্বনি, শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরি মুখ, পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান ॥
কহে শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি, মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রানী দিল পুরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দদুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড, উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখো দেখো রোহিণী, গদ গদ কহে রানী,
যাদুয়া নাচিছে দেখো মোর।
ঘনরাম দাসে কয়, রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর ॥

এ যে আমাদের ঘরের ছেলে, এ চাঁদ তো নয়। এ রস যুগে যুগে আমাদের মনে সঞ্চিত হয়েছে। মা চিরকাল একে লোভ দেখিয়ে নাচিয়েছে, চাঁদ দেখিয়ে ভোলায়নি।

রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা ক'রে তবে নিষ্কৃতি পায়। সেই অত্যুক্তি যখন

বলে, "পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে" তখন মন বলে, এই মিথ্যে কথার চেয়ে সত্য কথা আর হতে পারে না। রসের অত্যুক্তিতে যখন ধ্বনিত হয়, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল", তখন মন বলে, যে-হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমকে অনুভব করি সেই হৃদয়ে যুগযুগান্তরের কোনো সীমাচিহ্ন পাওয়া যায় না। এই অনুভূতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে। রসসৃষ্টির সঙ্গে রূপসৃষ্টির এই প্রভেদ; রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়। আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে।

তাই দেখি সাহিত্যের চিত্রশালায় যেখানে জীবনশিল্পীর নৈপুণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেখানে মৃত্যুর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। সেখানে লোক-খ্যাতির অনিশ্চয়তা চিরকালের জন্যে নির্বাসিত। তাই বলছিলেম, সাহিত্যে যেখানে সত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই। চেয়ে দেখলে দেখা যায় কী প্রকাণ্ড সব মূর্তি, কেউ বা নীচ শকুনির মতো মন্থরার মতো, কেউ বা মহৎ ভীমের মতো দ্রৌপদীর মতো—আশ্চর্য মানুষের অমর কীর্তি জীবনের চিরস্বাক্ষরিত। সাহিত্যের এই অমরাবতীতে যাঁরা সৃষ্টিকর্তার আসন নিয়েছেন তাঁদের কারো বা নাম জানা আছে, কারো বা নেই, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তাঁদের স্পর্শ রয়ে গেছে। তাঁদের দিকে যখন তাকাই তখনই সংশয় জাগে নিজের অধিকারের প্রতি।

আজ জন্মদিনে এই কথাই ভাববার—রসের ভোজে কিংবা রূপের চিত্রশালায় কোন্‌খানে আমার নাম কোন্ অক্ষরে লেখা পড়েছে। লোক-খ্যাতির সমস্ত কোলাহল পেরিয়ে এই কথাটি যদি দৈববাণীর যোগে কানে এসে পৌঁছতে পারত, তাহলেই আমার জন্মদিনের আয়ু নিশ্চিত নির্ণীত হত। আজ তা বহুতর অনুমানের দ্বারা জড়িত বিজড়িত।

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৪৮

সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা

...আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত এ-কথা বার বার শুনেছি এবং বার বার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর-কিছু নই কেবলমাত্র কবি। সেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই। ঐতিহাসিক পণ্ডিত আমার সেই কাব্যস্রষ্টার কেন্দ্র থেকে আমাকে টেনে এনে ফেলে যখন, আমার সেটা অসহ্য হয়। একবার যাওয়া যাক কবি-জীবনের গোড়াকার সূচনায়।

শীতের রাত্রি—ভোরবেলা, পাণ্ডুবর্ণ আলোক অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিতে শুরু করেছে। আমাদের ব্যবহার গরিবের মতো ছিল। শীতবস্ত্রের বাহুল্য একেবারেই ছিল না। গায়ে একখানামাত্র জামা দিয়ে গরম লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতুম। কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যান্য সকলের মতো আমি আরামে অন্তত বেলা ছটা পর্যন্ত গুটিসুটি মেরে থাকতে পারতুম। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান সেও আমারই মতো দরিদ্র। তার প্রধান সম্পদ ছিল পুবদিকের পাঁচিল ঘেঁষে একসার নারকেলগাছ। সেই নারকেলগাছের কম্পমান পাতায় আলো পড়বে, শিশিরবিন্দু ঝলমল করে উঠবে, পাছে আমার এই দৈনিক দেখার ব্যাঘাত হয় এইজন্য আমার ছিল এমন তাড়া। আমি মনে ভাবতুম সকালবেলাকার এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হত তাহলে সর্বজনীন বালক-স্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আমি যে অন্যদের থেকে এই অত্যন্ত

ঔৎসুক্যের বেগে বিচ্ছিন্ন নই, আমি যে সাধারণ এইটে জানতে পারলে আর কোনো ব্যাখ্যার দরকার হত না। কিন্তু কিছু বয়স হলেই দেখতে পেলুম আর-কোনো ছেলের মনে কেবলমাত্র গাছপালার উপরে আলোকের স্পন্দন দেখবার জন্য এমন ব্যগ্রতা একেবারেই নেই। আমার সঙ্গে যারা একত্রে মানুষ হয়েছে তারা এ পাগলামির কোঠায় কোনোখানেই পড়ত না তা আমি দেখলুম। শুধু তাদের কেন, চারদিকে এমন কেউ ছিল না যে অসময়ে শীতের কাপড় ছেড়ে আলোর খেলা একদিনও দেখতে না পেলে নিজেকে বঞ্চিত মনে করত। এর পিছনে কোনো ইতিহাসের কোনো ছাঁচ নেই। যদি থাকত তাহলে সকালবেলায় সেই লক্ষ্মীছাড়া বাগানে ভিড় জমে যেত, একটা প্রতিযোগিতা দেখা দিত কে সর্বাগ্রে এসে সমস্ত দৃশ্যটাকে অন্তরে গ্রহণ করেছে। কবি যে, সে এইখানেই। স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ির তেতলার ঊর্ধ্বে ঘননীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা। সে এক-দিনের কথা আমার আজও মনে আছে কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখেনি এবং পুলকিত হয়ে যায়নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। একদিন স্কুল থেকে এসে আমাদের পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলুম। ধোপার বাড়ি থেকে গাধা এসে চরে খাচ্ছে ঘাস— এই গাধাগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির বানানো গাধা নয়, এ আমাদের সমাজের চিরকালের গাধা, এর ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম হয়নি আদি-কাল থেকে—আর একটি গাভী সস্নেহে তার গা চেটে দিচ্ছে। এই যে প্রাণের দিকে প্রাণের টান আমার চোখে পড়েছিল, আজ পর্যন্ত সে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। কিন্তু এ-কথা আমি নিশ্চিত জানি সেদিনকার সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এক রবীন্দ্রনাথ এই দৃশ্য মুগ্ধচোখে দেখেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস আর কোনো লোককে এই দেখার গভীর তাৎপর্য এমন করে বলে দেয়নি। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনো ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ, সেখানে ব্রিটিশ সবজেক্ট ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র লীলা চলছিল কিন্তু নারকেলগাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনো রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল এবং আপনাকে আপনার আনন্দরূপে নানাভাবে প্রত্যহ প্রকাশ করছিল। আমাদের উপনিষদে আছে, "ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি"—আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায় তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায় কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে। অনেক ঘটনা আছে যা জানার অপেক্ষা করে, সেই জানাটা আকস্মিক। একসময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কথা ও কাহিনীর গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল সুতরাং বলতে পারা যায় কথা ও কাহিনী সেইকালেরই বিশেষ রচনা। কিন্তু এই কথা ও কাহিনীর রূপ ও রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনে আনন্দের আন্দোলন তুলেছিল, ইতিহাস তার কারণ নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাই তার কারণ—তাই তো বলেছে আত্মাই কর্তা। তাকে নেপথ্যে রেখে

ঐতিহাসিক উপকরণের আড়ম্বর করা কোনো কোনো মনের পক্ষে গর্বের বিষয়, এবং সেইখানে সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে সে কিছু পরিমাণে আপনার দিকে অপহরণ করে আনে। কিন্তু এ সমস্তই গৌণ, সৃষ্টিকর্তা জানে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হত তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে কথা ও কাহিনীর হরির লুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তার পূর্বে এবং তার পরে এ-সকল চিত্র ঠিক এমন করে দেখতে পায়নি। বস্তুত তারা আনন্দ পেয়েছে এই কারণে, কবির এই সৃষ্টিকর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে। আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল, তার পূর্বে আর কেউ তা করেনি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তার সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল-রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ-রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব-প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়। এখনকার সমালোচকেরা যে বিস্তীর্ণ ইতিহাসের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করেন তার মধ্যে অন্তত বারো আনা পরিমাণ আমি জানিইনে। বোধ করি সেইজন্যই আমার বিশেষ করে

রাগ হয়। আমার মন বলে দূর হোকগে তোমার ইতিহাস। হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহ প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখদুঃখকে যে আত্মসাৎ ক'রে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে। জীবনের ইতিহাসের সব কথা তো বলা হল না, কিন্তু সে ইতিহাস গৌণ। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা-মানুষের আত্মপ্রকাশের কামনায় এই দীর্ঘ যুগযুগান্তর তারা প্রবৃত্ত হয়েছে। সেইটেকেই বড়ো করে দেখো যে ইতিহাস সৃষ্টিকর্তা-মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে—ইতিহাসের অতীতে সে, মানবের আত্মার কেন্দ্রস্থলে। আমাদের উপনিষদে এ-কথা জেনেছিল এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ করেছি সে আমিই করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব।...

শান্তিনিকেতন, মে ১৯৪১

সত্য ও বাস্তব

মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টন বাছাই করে নেয়নি। সে তার পড়ে-পাওয়া ধন। কিন্তু সঙ্গে আছে মানুষের মন; সে এতে খুশি হয় না। সে চায় মনের মতোকে। মানুষ আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের মতোকে অনেক সাধনায় বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের মতোর ধারাকে দেশে দেশে মানুষ নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদত্ত পাওনার চেয়ে এর মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। সে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি; তাই আপনার সৃষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বরাবর সে অর্জন করে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই যে তার মনের মতো রূপ, এরই মূর্তি নিয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়, আপনাকে চেনে। বড়ো বড়ো মহাকাব্যে মহানাটকে মানুষ আপনার পরিচয় সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে, আপনাকে অতিক্রম করে আপনার তৃপ্তির বিষয় খুঁজেছে। সেই তার শিল্প তার সাহিত্য। দেশে দেশে মানুষ আপনার সত্য প্রকৃতিকে আপনার অসত্য দীনতার হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে। মানুষ আপনার দৈন্যকে আপনার বিকৃতিকে বাস্তব জানলেও সত্য বলে বিশ্বাস করে না। তার সত্য তার নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে স্থাপন করে। রাজ্যসাম্রাজ্যের চেয়েও তার মূল্য বেশি। যদি সে কোনো অবস্থায় কোনো কারণে অবজ্ঞাভরে তার গৌরবকে উপহাস করে, তবে সমস্ত সমাজকে নামিয়ে দেয়। সাহিত্য শিল্পকে যারা কৃত্রিম ব'লে অবজ্ঞা করে, তারা সত্যকে জানে না। বস্তুত প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়া-তাড়া-লাগা আবরণে নানা বিকারে কৃত্রিম; সে চিরকালের পরিপূর্ণতার

আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে, ধ্যানের সম্পদে। যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা, সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। তা সত্যের সাধনার দিকে নানা পন্থায় উৎসুক হয়ে থাকে। তার সাহিত্য তার শিল্প একটা বড়ো পন্থা। তা কখনো কখনো বাস্তবের রাস্তা দিয়ে চললেও পরিণামে সত্যের দিকে লক্ষ্য নির্দেশ করে।

শান্তিনিকেতন, জুন ১৯৪১

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'সাহিত্যের স্বরূপ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে দুইটি প্রবন্ধ নূতন সংযোজিত হইল—সাহিত্যের মাত্রা ও সাহিত্যে আধুনিকতা।

এই গ্রন্থের প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশই নিম্নোল্লিখিত মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রে আবদ্ধ ছিল, কোনো গ্রন্থে ইতিপূর্বে সংকলিত হয় নাই।

সাহিত্যের স্বরূপ	কবিতা,	বৈশাখ	১৩৪৫
সাহিত্যের মাত্রা [১]	পরিচয়,	শ্রাবণ,	১৩৪০
সাহিত্যে আধুনিকতা [২]	পরিচয়,	মাঘ,	১৩৭১
কাব্যে গদ্যরীতি ॥১॥ [৩]	পরিচয়,	বৈশাখ	১৩৪০
কাব্য ও ছন্দ [৪]	কবিতা,	পৌষ	১৩৪৬
গদ্যকাব্য [৫]	প্রবাসী,	মাঘ	১৩৪৬
সাহিত্যবিচার [৬]	কবিতা,	আষাঢ়	১৩৪৮
সাহিত্যের মূল্য	প্রবাসী,	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৮
	কবিতা,	আষাঢ়	১৩৪৮
সাহিত্যে চিত্রবিভাগ	প্রবাসী,	জ্যৈষ্ঠ	১৩৪৮
সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা [৭]	কবিতা,	আশ্বিন	১৩৪৮
সত্য ও বাস্তব [৮]	প্রবাসী,	আষাঢ়	১৩৪৮

১ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত

২ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত; 'ছিন্নপত্র' নামে প্রকাশিত

৩ শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত; 'পুনশ্চ' নামে প্রকাশিত। 'কাব্যে গদ্যরীতি ॥২॥' ও শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। দুইটিই 'ছন্দ' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪ 'গদ্যকাব্য' নামে প্রকাশিত

৫ শান্তিনিকেতনে অভিভাষণের অনুলিপি

৬ শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত

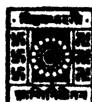
৭ শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে লিখিত

৮ 'সাহিত্য, শিল্প' নামে প্রকাশিত

মুদ্রাকর শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলা সাময়িক সাহিত্য

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বাংলা সাময়িক সাহিত্য

১৮১৮-১৮৬৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বি শ্ব ভা র তী

কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : ৩৩

প্রকাশ চৈত্র ১৩৫১

পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭১ : ১৮৮৬ শক

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত

বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার

ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

১'১

অনুজকল্প

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণবরেষু

আজকাল সভ্য সমাজে সংবাদপত্র নিত্যব্যবহার্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সংবাদপত্র মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। অথচ সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যেও মাত্র গত দুইশত বৎসরের মধ্যে সংবাদপত্রের সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। তাহার পূর্বে ইউরোপের মফস্বলবাসী বড়োলোকেরা ও ব্যবসায়ীরা হাতে-লেখা সংবাদের চিঠি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশাহরা প্রতি প্রদেশে এবং বড়ো বড়ো শহরে চর রাখিতেন; এই চরেরা স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের লিখিয়া পাঠাইত। গোপনীয় রাজকীয় কথা না থাকিলে এই সকল সংবাদের চিঠি রাজদরবারে প্রকাশ্যে পড়া হইত, এবং সভায় উপস্থিত সকল লোক নানা স্থানের সংবাদ পাইত। বাদশাহের অনুকরণে অধীন সেনাপতি, শাসনকর্তা এবং করদ-রাজারাও বাদশাহের দরবারের ঘটনা, তাঁহার উক্তি এবং রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার জন্য সম্রাটের সভায় নিজ নিজ সংবাদ-লেখক—'ওয়াকেয়া-নবিস' রাখিতেন। ফৌজদার, থানাদারের মতো ছোটোখাটো রাজকর্মচারীরাও নিজ উপরিতন কর্মচারী অর্থাৎ সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার সভায় নিজস্ব পত্রলেখক নিযুক্ত করিতেন। এই-সকল লেখক নিজ নিজ প্রভুর নিকট নিয়মিতরূপে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত, তাহাই সাধারণতঃ মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড়ো বড়ো মহাজন এবং ধনী বণিকেরাও নিজ নিজ কারবারের দূরবর্তী শাখাগুলিতে অথবা বড়ো বড়ো শহরে প্রবাসী স্বকীয় প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। সংবাদ জানিবার জন্য মানুষের যে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, এইরূপে মোগলযুগে সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকের মধ্যেই তাহা চরিতার্থ

করিবার উপায় ছিল। ফার্সীতে লিখিত এই-সকল সংবাদলিপির নাম ছিল— 'আখ্‌বার' বা ডবল বহুবচনে 'আখ্‌বারাৎ'।

ইংরেজ আমলে ইংরেজি সংবাদপত্রের অনুকরণে এ দেশের এই প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ শুরু হয়, সংবাদপত্রপ্রকাশ উহার একটি দিক। বাংলা দেশের— তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজি। উহা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হিকির (Hicky) 'বেঙ্গল গেজেট'। ইহার পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' প্রভৃতি আরও কতকগুলি কাগজ বাহির হয়।

সংবাদপত্রশাসন

সে যুগে কোম্পানির গবর্মেণ্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁহারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনাভঙ্গি উগ্র এবং ভাষা ইতর ও অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণে এবং সৈন্যসামন্তের গতিবিধি, জাহাজ-গমনাগমনের সংবাদ প্রভৃতি যাহাতে অবাধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্‌লি সর্বপ্রথম সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার সংকোচ বিধান করেন। তখন নিয়ম হইল, অতঃপর সেক্রেটরির দ্বারা পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে কোনো সংবাদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না; নিয়মভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্বাসিত হইতে হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তখন পর্যন্ত এ দেশের সকল সংবাদপত্রই ইংরেজি ভাষাতে এবং ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত। এই নিয়মের ফলে সংবাদপত্রের সমস্ত লেখাই— এমন-কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশের পূর্বে অনুমোদনের জন্য সরকারের সেক্রেটরির নিকট পেশ

করিতে হইত। সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রশাসন কিরূপ কঠিন ভাবে চলিয়াছিল তাহা শ্রীরামপুর মিশনের জে. সি. মার্শম্যানের একখানি পত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন, "সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে সংবাদপত্রের অনেক স্তম্ভই তারকা-চিহ্নিত হইয়া বাহির হইত; কেননা, যে-সকল অংশে 'সেন্‌সর' তাঁহার সাজ্ঘাতিক কলম চালাইতেন, শেষ মুহূর্তে শূন্য অংশগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।"

দমনকার্য এই ভাবে কয়েক বৎসর চলিবার পর এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে গবর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস 'সেন্‌সর' বা সংবাদপত্র-পরীক্ষকের পদ তুলিয়া দেওয়া সমীচীন বোধ করিলেন।

হিট্‌লী নামে এ দেশীয় একজন সাহেব 'মর্নিং পোস্ট' পত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। তিনিই সর্বপ্রথম সেন্‌সরের আদেশ অমান্য করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সরকারী সংবাদপত্র-পরীক্ষক 'মর্নিং পোস্টে'র একটি সংখ্যার কিয়দংশ ছাপিতে নিষেধ করেন। কিন্তু হিট্‌লী তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম, তাঁহার মাতা এ দেশবাসিনী; এ অবস্থায় সেন্‌সরের আদেশ অমান্য করিলেও তাঁহার কোনো শাস্তি হইতে পারে না, যেহেতু এরূপ অপরাধে কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকদেরই শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

সেন্‌সর বেলী সাহেব সংবাদপত্র-পরীক্ষক-পদের অসারতা অচিরাৎ গবর্নর জেনারেলের গোচর করিলেন। লর্ড হেস্টিংস বিশেষ বিবেচনার পর সেন্‌সরের পদ রহিত করিয়া তৎপরিবর্তে সম্পাদকের নির্দেশের জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। দেশীয় সম্পাদকগণকে শাসন করিবার ক্ষমতা তখন সরকারের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্‌সরের পদ বাহাল রাখা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই।

লর্ড হেস্টিংস কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই বাংলা ভাষায় একাধিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়।

ইং ১৮১৮

১। **দিগ্‌দর্শন**। (মাসিক) এপ্রিল ১৮১৮

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই প্রথম মাসিক পত্র। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইহার সম্পাদক ছিলেন। "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" এই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত।

স্কুলের পাঠ্য হিসাবে 'দিগ্‌দর্শনে'র উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া স্কুলবুক-সোসাইটি ইহার বহু খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সোসাইটিরই অনুরোধে ও ফরমাশে 'দিগ্‌দর্শন' পত্রের ইংরেজি ও ইংরেজি-বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশিত সংখ্যার তালিকা এইরূপ—

বাংলা সংস্করণ	১-২৬ সংখ্যা
ইংরেজি-বাংলা সংস্করণ	১-১৬ সংখ্যা
ইংরেজি সংস্করণ	১-১৬ সংখ্যা

২। **সমাচার দর্পণ**। (সাপ্তাহিক) ২৩ মে ১৮১৮

'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশের মাসখানেক যাইতে না যাইতেই শ্রীরামপুর মিশন 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। এখন পর্যন্ত যত দূর জানা যায়, 'সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র।

৪ জুলাই ১৮১৮ হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণে'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত—

দর্পণে মুখসৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

এ দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় জে. সি. মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে তারিখে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের লোকের মধ্যে ইংরেজি শিখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে ১১ জুলাই ১৮২৯ তারিখ হইতে 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

এ পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' কেবল প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল। অতিরিক্ত 'দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১১ জানুয়ারি ১৮৩২, বুধবার। সংবাদপত্রের ডাকমাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায় ৮ নবেম্বর ১৮৩৪ তারিখ হইতে 'সমাচার দর্পণ' সাপ্তাহিক আকারে পুনরায় প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক মার্শম্যানের উপর 'গবর্মেণ্ট গেজেট' নামে অন্য একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন-ভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্মবাহুল্যের ফলে শীঘ্রই 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত করিতে হইল। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

বাঙালিদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পুনর্জীবিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কলিকাতার অপর এক জন বাঙালি সম্পাদক

—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' অল্প দিন মাত্র চলিয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেও ইহা জীবিত ছিল।

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিবার সংকল্প করিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়।

'সমাচার দর্পণ' একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল। ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহাতে মুদ্রিত সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। **বাঙ্গাল গেজেটি**। (সাপ্তাহিক) জুন (?) ১৮১৮

শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহরাগ্রামনিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বন্ধু হরচন্দ্র রায়ের সহযোগে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ১৪৫নং চোরবাগান স্ট্রীটে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, এবং 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাই বাঙ্গালি-পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন্‌খানি আগে প্রকাশিত হয়, আপাততঃ তাহা জোর করিয়া বলা যাইতেছে না।

১৬ মে ১৮১৮ তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টার' পত্রিকায় বাঙালি-প্রবর্তিত একখানি বাংলা সংবাদপত্রের কথা এই ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়—

BENGALEE NEWSPAPER

From the Oriental Star, May 16—Amongst the improvements which are taking place in Calcutta, we observe with satisfaction that the publication of a Bengalee Newspaper has been commenced. The diffusion of general knowledge and information amongst the natives must lead to beneficial effects; and the

publication we allude to, under proper regulations, may become of infinite use, by affording the more ready means of communication between the natives and the European residents. *The Asiatic Journal and Monthly Register* (London) for January 1819, p. 59.

১৬ মে ১৮১৮ তারিখে 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে' উল্লিখিত সংবাদপত্রখানি যে 'বাঙ্গাল গেজেটি', তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় পরবর্তী ২৩ মে (শনিবার) তারিখে। কিন্তু এই সংবাদটিকে আমি 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না।

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেট' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিকে গঙ্গাকিশোরের সহকর্মী হরচন্দ্র রায়, ১২ মে তারিখযুক্ত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন; বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে" ("intends to publish") এবং ১৬ মে তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সংবাদে দেখা যাইতেছে, "The publication of a Bengalee Newspaper has been commenced." তাহা হইলে ১২ হইতে ১৬ মে তারিখের কোনো এক দিনে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সুতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। 'বাঙ্গাল গেজেটি' "বাহির হইবে"— এই বিজ্ঞাপন ১৪ মে বাহির হইবার পরদিনই ১৫ মে তারিখে কাগজ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই 'ওরিয়েণ্টাল স্টারে'র সাহেব সম্পাদক সেই পত্রিকা দৃষ্টে সেই দিনই তাহার উপর মন্তব্য লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত হইয়াছে— এই জাতীয় তৎপরতা সে যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। সে যুগের ছাপাখানা ও সংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোনো গলতি থাকা সম্ভব। আমার বিশ্বাস, এই

সংবাদের অর্থ—'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে;. "the publication···has been commenced" কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

অপর পক্ষে, শ্রীরামপুর মিশনারীরা বলেন, 'সমাচার দর্পণ' 'বাঙ্গাল গেজেটি'র দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হয়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মতে—

...within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Samachar Durpun, the first Native Weekly Journal printed in India, he [Gunga kishor] published another, which we hear has since failed.

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কীয় আলোচনা-প্রসঙ্গে ১১ জুন ১৮৩১ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক যে মন্তব্য করেন, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট।...আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে।...ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।

এই-সকল কারণে যত দিন পর্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, তত দিন পর্যন্ত কোন্‌খানি প্রথম বাংলা সংবাদপত্র— এ বিষয়ে চরম কথা বলা বোধ হয় উচিত হইবে না।

'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোনো সংখ্যা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় উহার বিষয়-বিন্যাস ও রচনাপদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে জানিবার উপায় নাই। একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, উহাতে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারি-নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা থাকিত এবং উহার সডাক মাসিক মূল্য ছিল দুই টাকা। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নাল' পত্র

পাঠে জানা যায়, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রে সহমরণ বিষয়ে ওই বৎসরে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

ইং ১৮১৯

৪। **গস্‌পেল মাগাজীন**। (মাসিক) ডিসেম্বর ১৮১৯

'গস্‌পেল মাগাজীন' এই সময়ের দ্বিতীয় মাসিকপত্র এবং খ্রীষ্টীয়-তত্ত্ব বিষয়ে সর্বপ্রথম সাময়িকপত্র। এখানি মাসে মাসে ইংরেজি বাংলায় বাহির হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। Baptist Auxiliary Missionary Society ইহার প্রকাশক।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে 'গস্‌পেল মাগাজীন'-এর একটি বাংলা সংস্করণও বাহির হয়।

ইং ১৮২১

৫। **ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ**। সেপ্টেম্বর ১৮২১

"কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত" একখানি পত্র ১৪ জুলাই ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় এই পত্রখানিকে মিশনরীদের তরফ হইতে হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা আক্রমণ জ্ঞান করিয়া প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রশ্নগুলির উত্তর 'সমাচার দর্পণে' পাঠান। 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ তারিখে মন্তব্য করেন যে, যদি পত্রখানির "অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল

ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই।" তখন রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্ম্মার নামে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে '*Brahmunical Magazine.* The Missionary and the Brahmun No. 1 ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ সং ১ 1821' নামে একখানি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজি অনুবাদ থাকিত। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬। **সম্বাদ কৌমুদী**। (সাপ্তাহিক) ৪ ডিসেম্বর ১৮২১

'বাঙ্গাল গেজেটি' উঠিয়া যাওয়ায় হিন্দুরা একখানি বাংলা সমাচারপত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সে অভাব দূর করেন কলুটোলানিবাসী তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৪ ডিসেম্বর ১৮২১। প্রথম সংখ্যায় লিখিত হয়—"লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র-প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য।··· দেশবাসীর অভাব-অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে আলোচিত হইবে।" 'সম্বাদ কৌমুদী'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি থাকিত—

> দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
> রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতি মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া প্রকাশিত হইত। রামমোহন রায় ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে প্রবন্ধদানে সাহায্য করিতেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই কয় সংখ্যা পরিচালন করেন। অতঃপর

তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্ত 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদক হন; আড়াই মাস পরে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করিলে গোবিন্দচন্দ্র কোঙার সম্পাদক হন। অল্প দিনের জন্য ইহার প্রচার বন্ধ ছিল, কিন্তু পর বৎসর (১৮২৩) এপ্রিল মাসে আহিরীটোলানিবাসী আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'সম্বাদ কৌমুদী' পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পর এই পত্র প্রায় দশ বৎসর জীবিত ছিল। এই সময়ের মধ্যে কিছু দিন হলধর বসু ও রাধাপ্রসাদ রায় 'সম্বাদ কৌমুদী' পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া হইতে 'সম্বাদ কৌমুদী' সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত।

হিন্দুদের কতকগুলি প্রচলিত প্রথা— বিশেষত সহমরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় 'সম্বাদ কৌমুদী' জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিল।

ইং ১৮২২

৭। **পশ্বাবলী**। (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮২২

কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি কর্তৃক 'পশ্বাবলী' নামে একখানি বাংলা মাসিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার এক-এক সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর বিবরণ, এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই-সেই জন্তুর কাঠ-খোদাই চিত্র থাকিত। 'পশ্বাবলী'র প্রথম সংখ্যার তারিখ— ফেব্রুয়ারি ১৮২২। 'পশ্বাবলী' পত্রের প্রথম পর্যায় পাদরি লসন সংকলন করেন এবং ডবলিউ. এইচ. পীয়র্স, বাংলায় অনুবাদ করেন। কাঠখোদাই চিত্রগুলি লসনের। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে (?) লসনের মৃত্যু হওয়ায় 'পশ্বাবলী'র প্রথম পর্যায় ছয় সংখ্যার বেশি অগ্রসর হয় নাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ের 'পশ্বাবলী' পরিচালন করেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র। তিনি সর্বসমেত ১৬ সংখ্যা 'পশ্বাবলী' ইংরেজি-বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৮। **সমাচার চন্দ্রিকা**। (সাপ্তাহিক) ৫ মার্চ ১৮২২

'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়কে আন্দোলন করিতে দেখিয়া রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁহাদের পক্ষ হইতে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবার আয়োজন করিলেন। এই সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'। ইহার সম্পাদক হইলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন— এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়— ৫ মার্চ ১৮২২। ইহার শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত—

> সদা সমাচারজুষাং ফলাপিকা, পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা।
> বিজ্ঞস্তুতে সর্ব্বমনোনুরঞ্জিকা প্রিয়া ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা।

১৭৫১ শকের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮২৯) হইতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সপ্তাহে দুই বার করিয়া বাহির হইতে থাকে। রক্ষণশীল হিন্দু-সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রাধান্য বিশেষরূপে বাড়িয়াছিল; গ্রাহক-সংখ্যাও অন্যান্য বাংলা সাময়িকপত্রগুলির তুলনায় বেশি ছিল।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিন 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পত্রিকার স্বত্ব ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে বিক্রয় করেন। ৭ মে ১৮৫২ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে ভগবতীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশের উল্লেখ আছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় অতি অল্প দিনের জন্য পুরাতন 'সমাচার চন্দ্রিকা'ও প্রকাশিত হইয়াছিল— সমসাময়িক সংবাদপত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

'সমাচার চন্দ্রিকা'ও সে যুগের একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ছিল।

৯। **খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি।** (মাসিক) মে ১৮২২

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামপুর হইতে 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা বাংলায় দ্বিতীয় মাসিকপত্র।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন

ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতে— বিশেষত সিল্ক বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জর্নালে' অনেক লেখা বাহির হইতে লাগিল, যাহা সরকারের নিকট আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হেষ্টিংসের নিয়মের বিরোধী বলিয়া মনে হইল। সরকার রুষ্ট হইয়া সংবাদপত্র শাসনের জন্য বিধি প্রবর্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বড়োলাটের মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যেরা ইংরেজি সংবাদপত্র সম্বন্ধে প্রতিকূল মত নিজ নিজ মিনিটে প্রকাশ করিলেন। উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলী তাঁহার ১০ অক্টোবর ১৮২২ তারিখের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত করেন। তিনি লিখিতেছেন—

বর্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি বাংলায় ['সম্বাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'] এবং দুইখানি ফার্সীতে।

চারিখানিই সাপ্তাহিক।…ফার্সী কাগজগুলির নাম—'জাম-ই জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'।…দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের।[১] ধর্ম-সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকর।…

১ 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' ফার্সী ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। কলিকাতার ধর্মতলা হইতে মুদ্রিত হইয়া ১২ এপ্রিল ১৮২২ (শুক্রবার) তারিখে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।

ফার্সী ও বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপত্রেই অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। 'সতীদাহ' লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই সকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে। (বঙ্গানুবাদ)

এই মিনিটে বেলী স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবে লেখেন—

The liberty of the Press, however essential to the nature of a free State, is not in my judgment, consistent with the character of our institutions in this country, or with the extraordinary nature of their interests.[১]

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর সকৌন্সিল লর্ড হেস্টিংস সংবাদপত্রগুলিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট নূতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর বৎসরের ৯ জানুয়ারি তারিখে লর্ড হেস্টিংস বিলাতযাত্রা করেন। অ্যাডাম অস্থায়ী ভাবে গবর্নরজেনারেল হইলেন। তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ৪ মার্চ ১৮২৩ তারিখে এক কড়া প্রেস-আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে সুপ্রীম কোর্টে রেজেস্ট্রীকৃত হইয়া এই আইন জারি হইল।

এই আইন অনুসারে কোনো সাময়িকপত্র বাহির করিবার পূর্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ ছিল। কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গবর্মেণ্টের চীফ সেক্রেটরির নিকট পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অনুমতি পাওয়া যাইত, কিন্তু সেজন্য কোনো ফি দিতে বা খরচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব হইতেই প্রত্যেক সম্পাদককে দেওয়া

১ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে (পৃ, ৫৫৩-৬০) ও 'বাংলা সাময়িক-পত্র'গ্রন্থে (পৃ, ১০৫-১৬) বেলীর সমগ্র মিনিটটি মুদ্রিত হইয়াছে।

থাকিত। তাহা সত্ত্বেও আইনবিরুদ্ধ কোনো বিষয়ের আলোচনা করিলে কাগজের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হইত এবং বেআইনীভাবে কাগজ চালাইলে চারি শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

এই নূতন আইনের প্রথম ফলস্বরূপ রামমোহন রায় সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' বন্ধ হইয়া গেল। পত্রের শেষ সংখ্যায় (৪ এপ্রিল ১৮২৩) রামমোহন জানাইলেন যে, নূতন আইনের অপমানজনক শর্তে রাজি হইয়া তিনি কাগজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

ইং ১৮২৩

১০। **সম্বাদ তিমিরনাশক**। (সাপ্তাহিক) অক্টোবর ১৮২৩

১২৩০ সালের কার্তিক মাসে 'সম্বাদ তিমিরনাশক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১২৩৭ সাল হইতে ইহা অর্ধ-সাপ্তাহিক অর্থাৎ সপ্তাহে দুই বার বাহির হইতে থাকে।

'সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলকে সর্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত, এবং যখন তখন উদারপন্থীদের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিত না। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই 'সম্বাদ তিমিরনাশকে'র প্রচার রহিত হয় বলিয়া জানা যায়।

ইং ১৮২৯

১১। **বঙ্গদূত**। (সাপ্তাহিক) ৯ মে ১৮২৯

৯ মে ১৮২৯, শনিবার 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদূতে'র শিরোভাগে এই কবিতাটি শোভা পাইত—

> সংগোপনেল্পবিবৃতিং প্রবদন্তি দূতাঃ সর্ব্বে ন তত্র সুজনা হিতমভ্যুপেতাঃ।
> কিন্ত্বাখিলার্থকলনাম্বহুদেশভূতপ্রজ্ঞাময়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ॥

অন্তঅন্তদূতগণ, সামান্ত যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম্ম অন্বেষণে ॥
অতএব সাধারণ, সর্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত ॥

'বঙ্গদূতে'র সম্পাদক ছিলেন নীলরত্ন হালদার। অবকাশের অভাবে কিছু দিন পরে তিনি অবসর লইতে বাধ্য হইলে, ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, ভোলানাথ সেনের মৃত্যু হইলে, মহেশচন্দ্র রায় অল্প দিন কাগজখানি পরিচালন করিয়াছিলেন।

১২। **সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ**। (মাসিক?) জুলাই ১৮২৯

১২৩৬ সালের শ্রাবণ মাসে এই "পুস্তক"-এর "১ম খণ্ড" এবং পৌষ মাসে "২ সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল এক টাকা। কালাচাঁদ রায় ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; "যাহার এই পুস্তক লইতে ইচ্ছা হইবেক তিনি বহুবাজারের গিরিধর বাবুর বাটীতে শ্রীকালাচাঁদ রায়ের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন।"

দেশ-বিদেশের বৃত্তান্ত ও ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করাই প্রধানত 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণে'র উদ্দেশ্য ছিল। ইহা তিমিরনাশক যন্ত্রে মুদ্রিত হইত; 'সম্বাদ তিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলের সমর্থনকারী ছিল। 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'ও যে প্রচলিত আচার-ব্যবহারাদি সংরক্ষণের জন্যই প্রচারিত হইতেছিল, তাহা ইহার প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত "অনুষ্ঠানপত্রে" প্রকাশ—"...গ্রন্থের শেষ খণ্ডে ব্যবহার দর্পণ সঙ্কেত করিয়া এই দেশীয় লোকেরা অন্যদেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদাচার এবং সদ্ব্যবহার যাহাতে হয়

এমত উপায় লিখা যাইবেক যখন বিষয়ানুরোধে কোন বিষয় যাহাতে সাহেব লোকের দিগের আমোদজনক হইতে পারে এমন অনুভব হইলে ইংরাজী ভাষায় তাহা লিখিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করা যাইবেক।"

'সর্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণে'র প্রথম খণ্ডে "এতদ্দেশে গোরা-লোকের বসতি" ও "পারস্য ভাষা পরিবর্তনে আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইবার বিষয়" আলোচিত হইয়াছে।

ইং ১৮৩০

১৩। **শাস্ত্রপ্রকাশঃ**। (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৩১

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করেন। ইহাতে কেবল শাস্ত্রীয় আলোচনাই স্থান পাইত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ জজ-পণ্ডিত-রূপে পূর্ণিয়া গমন করিলে পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়।

ইং ১৮৩১

১৪। **সংবাদ প্রভাকর**। (সাপ্তাহিক) ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১

'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্তু প্রথমে ইহা সাপ্তাহিক-রূপে প্রকাশিত হয়; ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৬ মাঘ ১২৩৭। 'সংবাদ প্রভাকরে'র কণ্ঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত; শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত—

॥ সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥

॥০০০॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামংভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা
ক্ষুধাকাতরাঃ ॥০০০॥

॥০০০॥ অম্ভোজ্বমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ
স্বান্তুদ্বিরেফা রসং ॥০০০॥

'সংবাদ প্রভাকর'-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ছিলেন পাথুরিয়া-ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র ও নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র-মোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক এবং তাঁহার কবিতার গুণগ্রাহী। তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েক মাস পরে ১২৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুর-বাড়িতে 'সংবাদ প্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।" দেড় বৎসর চলিবার পর ২৫ মে ১৮৩২ তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাস-তিনেক পূর্বে পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন।

চারি বৎসর পরে, ১০ আগস্ট ১৮৩৬ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃ প্রকাশিত হয়, তবে এবার সাপ্তাহিক রূপে নহে—বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) রূপে। এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

১২৬০ সালের বৈশাখ হইতে 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই মাস-পয়লার কাগজগুলিতে "সর্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্বশেষে— মাসের সমুদয়

ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম প্রকটিত” হইত। ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্যটন করিয়া প্রাচীন কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এগুলি তিনি প্রধানত ১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মাস-পয়লার কাগজগুলিতে মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি অগ্রসর না হইলে বোধ হয় এত দিন কবিদিগের এই-সকল রচনার কোনো অস্তিত্বই থাকিত না।

২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোকগমন করিলে তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’র সম্পাদক হন।

‘সংবাদ প্রভাকর’ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত। রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রমুখ সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পণ্ডিত ইহার লেখক ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুলি ‘সংবাদ প্রভাকরে’ই প্রকাশিত হয়।

১৫। **সম্বাদ সুধাকর**। (সাপ্তাহিক) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১

“কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব” প্রেমচাঁদ রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ‘সম্বাদ সুধাকর’ মতে অনেকটা মধ্যপন্থী ছিল। এই পত্রিকার জন্য কানাইলাল ঠাকুর একটি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার স্থিতিকাল চারি বৎসর।

১৬। **সমাচার সভারাজেন্দ্র**। (সাপ্তাহিক) ৭ মার্চ ১৮৩১

ইহাই মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। ২৫ ফাল্গুন ১২৩৭

তারিখে কলিঙ্গার শেখ আলীমুল্লা বাংলা ও ফার্সী ভাষায় ইহা প্রকাশ করেন। 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' প্রাচীনপন্থী ছিল।

১৭। **জ্ঞানান্বেষণ।** (সাপ্তাহিক) ১৮ জুন ১৮৩১

ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮ জুন ১৮৩১। 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজি-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম সম্পাদক— দক্ষিণানন্দন (পরে "দক্ষিণারঞ্জন") মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণানন্দনের পর 'জ্ঞানান্বেষণ' পরিচালন করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। তাঁহারা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাগজখানিকে ইংরেজি-বাংলায় প্রকাশ করেন।

নামে সম্পাদক না হইলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই গোড়া হইতে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিতেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি…। সদ্বংশ্য যুবহিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় [বীটন-বালিকা-বিদ্যালয়] স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ রাখেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বন্ধুগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, …সে কবিতা এই—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি।

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন ॥
লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার ॥"

রামগোপাল ঘোষ 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিল। তারকচন্দ্র বসু, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্রও 'জ্ঞানান্বেষণে'র সহিত যুক্ত ছিলেন।

প্রায় দশ বৎসর চলিবার পর, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের প্রচার রহিত হয়।

১৮। **অনুবাদিকা**। (সাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৩১

রাধামোহন সেনের পুত্র ভোলানাথ সেন এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রধানত *Reformer* পত্রের প্রবন্ধাদির বঙ্গানুবাদ থাকিত। 'রিফর্মার' ও 'অনুবাদিকা' উভয় পত্রেরই স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

১৯। **সম্বাদ রত্নাকর**। (সাপ্তাহিক) ২২ আগস্ট ১৮৩১

প্রচলিত ধর্ম ও আচারের সমর্থনই এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। রামচন্দ্র পাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইহার প্রচার রহিত হয়।

২০। **সম্বাদ সারসংগ্রহ**। (সাপ্তাহিক) ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১

ইহাই বাঙালি সম্পাদিত সর্বপ্রথম ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্র। ইহাতে প্রধানত অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রের সারসংকলন থাকিত।

২১। **জ্ঞানোদয়**। (মাসিক) ডিসেম্বর ১৮৩১

রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। 'জ্ঞানোদয়' ছেলেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানত নীতিকথা, ইতিহাস ও ভূগোল -বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। 'জ্ঞানোদয়' ২০ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৩২

২২। **বিজ্ঞানসেবধি**। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৩২

ইহার প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্র এইরূপ: "বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি— লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও ফল এবং সন্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুত এইচ. এইচ. উইল্‌সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুক্ত বাবু অমলচন্দ্র গাঙ্গলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা ভাষান্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল ১ সংখ্যা···ইং ১৮৩২ শাল"।

আমি ইহার প্রথম দ্বাদশ সংখ্যা দেখিয়াছি; ৯ম ও ১০ম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

২৩। **দলবৃত্তান্ত**। (সাপ্তাহিক?) ইং ১৮৩২

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এই সাময়িকপত্রখানি প্রকাশিত হয়। সামাজিক দলাদলির সংবাদই ইহাতে স্থান পাইত।

২৪। **সংবাদ রত্নাবলী**। (সাপ্তাহিক) ২৪ জুলাই ১৮৩২

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে [২৪ জুলাই

১৮৩২] 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।"

'সংবাদ রত্নাবলী' "এক বৎসর আট মাস তিন দিবস" পর্যন্ত জীবিত ছিল। ১৫ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়।

২৫। **জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ**। (মাসিক ?) ইং ১৮৩২

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার পরিচালক ছিলেন।

ইং ১৮৩৩

২৬। **বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ**। (পাক্ষিক···) সেপ্টেম্বর ১৮৩৩

'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজি-বাংলা) পাক্ষিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে। ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান এ দেশে প্রচার করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শ্রেণীর তিন জন শিক্ষক— ডবলিউ. এম. উলেস্টন, গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত ও নবকুমার চক্রবর্তী 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' সম্পাদন করিতেন। এই পত্রের ইংরেজি নাম— *The Hindoo Manual of Literature.*

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ' মাসিকপত্রে পরিণত হয়। এই সময় হইতে ইহাতে ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্য উপাদেয় সংস্কৃত ও বাংলা রচনার অনুবাদও দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২৭। **চার আনা পত্রিকা**। (মাসিক ?) ইং ১৮৩৩

পাদরি লঙের মতে ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজি-বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৩৫

২৮। **সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।** (মাসিক···) ১০ জুন ১৮৩৫

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রথমে মাসিকপত্ররূপে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার। হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। সেকালের প্রথামত 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র ললাটে উদ্দেশ্যবাচক একটি শ্লোক থাকিত। প্রথম সংখ্যায় যে শ্লোকটি প্রকাশিত হয়, তাহা এইরূপ—

অজ্ঞানরূপং তিমিরং বিনশ্য জ্ঞানপ্রকাশং প্রতিমাসমেব।
বিস্তীর্য্য লোকে হরচন্দ্রকেতুঃ সম্পূর্ণচন্দ্রো দয় এষ ভাতি।

পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে কিন্তু স্বতন্ত্র একটি শ্লোক মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

দশ পঞ্চ কলা পূর্ণে পূর্ণিমায়াম্বিধৌ পুনঃ।
অধুনা হরচন্দ্রেণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ঃ কৃতঃ।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা মন্থলী জার্নালে' প্রকাশ—

The Sungbad Purno Chundrodoy.—The Monthly-Magazine of this name, has since the 19th April. been changed to a weekly Literary and Political Journal. (P. 201)

তিন বৎসরের উপর হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১২৪৫ সালের পৌষ (১৮৩৯, জানুয়ারি?) মাস হইতে কলিকাতা আমড়াতলার আঢ্য-পরিবারের উদয়চন্দ্র আঢ্য ইহার সম্পাদক হন। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশ—

"১২৪৫ সাল, পৌষ।—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তৎসম্পাদন কার্য্যে শ্রীউদয়চন্দ্র আঢ্যের নাম প্রকাশ হয়।"

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে উদয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য 'সংবাদ

পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব, এই সময় হইতেই নিম্নের শ্লোকটি পত্রিকার কণ্ঠে মুদ্রিত হইত—

দৃষ্ট্বা হৃষ্ট্যা শশাঙ্কং দিনরুচিরহিতং সাঙ্কগ্রাসং নিরঙ্কং ধাত্রা সংবাদ
সোমং গুণময়মসৃজৎ পঙ্কজঘ্নং তমোঘ্নং।
স্বাঢ্যে সাঢ্যে সলেখে সমধুহৃদয়িতেঽদ্বৈতচন্দ্রে সুশৈলে
ভব্যোভব্যোভবাব্ধৌ হরিপদহৃদি সংপূর্ণচন্দ্রোদয়োঽসৌ॥

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' দৈনিকের কলেবর ধারণ করে ; ১৯ নবেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সংবাদ ভাস্করে' প্রকাশ—

"আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় * * * দৈনিক হই * * * সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্দ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে…।"

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অদ্বৈতচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন করেন। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র পঞ্চম সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ আঢ্য ; ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর আরও ১১ মাস চলিয়া 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' বন্ধ হইয়া যায়।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সে যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র ছিল।

২৯। **ভক্তিসূচক**। (সাপ্তাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৩৫

ইহাতে প্রধানত বিষ্ণুভক্তির আলোচনা প্রকাশিত হইত।

সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচন

১৮২৩ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রাযন্ত্র শৃঙ্খলিত ছিল। মুদ্রাযন্ত্র বিধির ফলে গবর্মেণ্টের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা থাকিলেও কার্যত সংবাদপত্রগুলি

অনেক দিন যাবৎ— বিশেষ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮-মার্চ ১৮৩৫) স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। সংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের কোনো আশঙ্কার কারণ নাই— এই বিবেচনায় সার্ চার্লস্ মেটকাফ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ তারিখে মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল মোচন করেন। এই সময় হইতে পরবর্তী বাইশ বৎসর সাময়িকপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সর্বপ্রকারে বন্ধনমুক্ত করিয়া মেটকাফ শুধু এই আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সংবাদ অথবা সংবাদের সমালোচনাপূর্ণ কোনো সাময়িকপত্র প্রকাশ করিতে হইলে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সর্বাগ্রে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে যে, তাঁহারা প্রস্তাবিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

ইং ১৮৩৭

৩০। **সম্বাদ সুধাসিন্ধু**। (সাপ্তাহিক) ১৩ এপ্রিল ১৮৩৭

প্রকাশকাল— ২ বৈশাখ ১২৪৪। সম্পাদক— বটতলানিবাসী কালীশঙ্কর দত্ত। আয়ু— বৎসরেক কাল।

৩১। **সম্বাদ গুণাকর**; (অর্ধ-সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৩৭

প্রকাশকাল— ডিসেম্বরের শেষাশেষি ১৮৩৭। সম্পাদক— শ্যামপুকুর-নিবাসী গিরিশচন্দ্র বসু।

ইং ১৮৩৮

৩২। **সংবাদ দিবাকর**। (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৩৮

প্রকাশকাল— পৌষ ১২৪৫। সম্পাদক— গঙ্গানারায়ণ বসু।

৩৩। **সংবাদ সৌদামিনী**। (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৩৮

১২৪৫ সালের পৌষ মাসে, কলুটোলানিবাসী কালাচাঁদ দত্তের সম্পাদকত্বে এই দ্বিভাষিক (ইংরেজি-বাংলা) পত্রখানি প্রকাশিত হয়। আয়ু— তিন বৎসর।

৩৪। **সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৩৮

প্রকাশকাল— ১২৪৪ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক— পার্বতীচরণ দাস। ইহার বিজ্ঞাপন, সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভ সমস্তটাই কবিতায় প্রকাশিত হইত নমুনা—

আমারদের জে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পংক্তির প্রতি মূল্য চাবি আনা গো॥
চারি ঘোড়ার গাড়ি চোড়ে গত দিনে বেকালে গো।
গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো॥
কলিকালে যত সব ভাল মানুসের ছেলে গো।
লেখা পড়া শিখে কেহ ধর্ম কর্ম মানে না গো॥

ইং ১৮৩৯

৩৫। **সম্বাদ ভাস্কর**। (সাপ্তাহিক...) মার্চ ১৮৩৯

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (চৈত্র ১২৪৫) এই সাপ্তাহিকপত্র শ্রীনাথ রায়ের সম্পাদকত্বে সিমলা হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদকরূপে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্চায)। 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশিত হইলে 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন—

"পুর্বে আমারদিগেব যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সম্বাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে...।"

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "সিমলের রাধাকৃষ্ণ মিত্রের [সাতুবাবুর ভগ্নীপতির] চতুর্থ পুত্র জীবনকৃষ্ণের আনুকূল্যে শ্রীনাথ রায় ইহা প্রকাশ করেন।" এই উক্তি একেবারে অমূলক নাও হইতে পারে; কিন্তু এ কথা সত্য যে, গোড়া হইতেই আন্দুলনিবাসী মথুরানাথ মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ মল্লিক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্কর তাঁহার সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "...শ্রীনাথবাবু [বহু] কাল আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, আমারদিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন।"

'সম্বাদ ভাস্করে'র শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত—

গৌরীশঙ্করবক্ত পদ্মহৃদয়ে শ্রীনাথপদ্মাতুবো মগ্নোঽয়ং সমুদেতি
ভাস্করবরঃ সম্বাদপদ্মোদয়ৈঃ।
হৃৎপদ্মপ্রকটায় সন্ততমহো সম্বাদপদ্মার্থিনাং লোকানাং খলু
বেদপদ্মপ্রকটৈঃ শ্রীপদ্মযোনির্যথা॥

এই শ্লোকটির পরিবর্তে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ রচিত নিম্নের শ্লোকটি 'সম্বাদ ভাস্করে'র কণ্ঠে শোভা পাইত—

ভ্রাতর্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্থ নায়ং ক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং
ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরাদ্গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বত-
মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

কিছু দিন পরে এই দ্বিতীয় শ্লোকটির সহিত আরও একটি শ্লোক সংযুক্ত হয়। শ্লোকটি এইরূপ—

নানালোককরক্রিয়ঃ সমুদিতে নব্যায়তে শাশ্বতঃ শশ্বৎস্বাত্ম-
গুণাম্বুজোজ্জ্বলকরো দোষান্ধকারোজ্ঝিতঃ।
নানাদেশবিলাস এষ বিমলসম্যক্সুরুবর্ণোপরো গৌরীশঙ্করপূর্ব্ব-
পর্ব্বতমুখাদ্বোজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর এই অতিরিক্ত শ্লোকটি আর ছাপা হইত না।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গৌরীশঙ্করের সহযোগী শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ১৪ নবেম্বর ১৮৪০ তারিখে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন—

We understand that the death of Sreenauth Roy will not, in the least, diminish the usefulness and efficiency of the *Bhaskar*,.. Sreenauth Roy was not the principal editor of the paper. His contributions to it formed but a small part of the editorials. The individual to whom praise is due for the able manner in which that paper has hitherto been conducted, is still in the land of the living. He is the quondam Bengally editor of the *Gyannaneshum*. His writings, as far as we have been able to judge, are always characterized by good sense and vigorous style. Being freed from the trammels of Hindoo superstition, he gladly embraces every opportunity of exposing the folly of his bigotted countrymen, and shewing the great utility of cultivating European knowledge ...

গৌরীশঙ্করই যে 'সম্বাদ ভাস্করে'র প্রধান সম্পাদক ছিলেন তাহার আরও একটি প্রমাণ দিতেছি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' পাইয়াছি, এই সংখ্যায় গৌরীশঙ্কর তাঁহার "প্রতিপালক মিত্র" শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুতে লেখেন—

"এজন্য এই ভাস্কর পত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে প্রথম প্রকাশ করি, * * * * লিখিব এবং আবশ্যক মতে টাকা * * * লইব, যাহা লভ্য হইবে শ্রী * * * শ্রীনাথ রায় আমারদি * * * * মাত্র সম্পাদক হইয়া * * * করিতে লাগিলেন, এবং * * * কিঞ্চিৎ কাল পরেই রসরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কটক হইতে আসিয়া পূর্ব্বালাপিত শ্রীনাথ রায়ের সঙ্গে আমারদিগের বাসায় আসিয়া রহিলেন, তাহাতেই রসরাজ পত্র কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশ করেন, এবং দুই ব্যক্তিই আমারদিগের বাসায় রহিলেন···।"

'সম্বাদ ভাস্কর' প্রথমাবস্থায় সাপ্তাহিক পত্র ছিল। ইহা "শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটীতে প্রতি মঙ্গলবারে ভাস্কর যন্ত্রে প্রকাশিত হয়।" ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ হইতে 'সম্বাদ ভাস্কর' অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এই সময় হইতে ইহা "কলিকাতার শোভাবাজার বালাখানার

বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গল এবং শুক্রবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।” ১২ এপ্রিল ১৮৪৯ তারিখ হইতে ইহা সপ্তাহে তিন বার— মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে বাহির হইতে আরম্ভ করে।

‘ভদ্রার্জ্জুন’-প্রণেতা তারাচরণ শিকদার ‘সম্বাদ ভাস্করে’র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন “যিনি আমারদিগের যন্ত্রালয়ে বঙ্গভাষায় ইংরাজির অনুবাদ করিতেন”। তারাচাঁদ, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ‘বিদ্যারত্ন’ নামে একখানি অল্পায়ু পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন। অতঃপর তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য ‘সম্বাদ ভাস্কর’ প্রকাশ করিতে থাকেন।

‘সম্বাদ ভাস্কর’ বহু দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে যুগের একখানি উৎকৃষ্ট সমাচারপত্র।

৩৬। **সম্বাদ রসরাজ** ॥ (সাপ্তাহিক···) ২৯ নবেম্বর ১৮৩৯

১৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ তারিখে এই সাপ্তাহিক-পত্রখানি প্রকাশিত হয়। কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন ; কিন্তু ইহার প্রকৃত পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। কালীকান্তের পর কিছু দিন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের, এবং গঙ্গাধরের মৃত্যুর (১৩ মে ১৮৫৩) পর ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে কাগজখানি প্রকাশিত হইত। ‘সম্বাদ রসরাজে’র গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই কারণে শীঘ্রই ইহা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকপত্রে পরিণত হয়। গালি-গালাজ ও অশ্লীল রচনা প্রকাশ করিয়া ‘সম্বাদ রসরাজ’ অনেকেরই বিরাগ-ভাজন হইয়াছিল ; এমন-কি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের একাধিক বার কারাবাসও ঘটে। কিন্তু ইহাতেও গৌরীশঙ্করের চৈতন্য হয় নাই। শেষে—

“...[১২৬৩] ২৮ অগ্রহায়ণের রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় সর্ব্বমান্য

দলপতি মহামত্তি মহোদয়দিগের পরিবার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ করাতে ভুবনমান্ত কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মুণ্ডুপাতার্থে দণ্ডধর হইলেন, ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে রসরাজের নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই… ভয়ে রসরাজ অবনত হইয়া রাজাবাহাদুরের কমলকরে আত্মসমর্পণ করতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে আপদের শান্তিঃ হইয়াছে…।"

৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ (২২ মাঘ) তারিখে 'সম্বাদ রসরাজ' "রসরাজ বিদায়" লিখিয়া অন্তর্হিত হয়।

গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর (৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯) পর তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'সম্বাদ রসরাজ' পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। নবপর্যায় পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত—

সতাং স্বান্তে শ্রান্তং শমসুখমসীমম্ প্রকটয়ন্ বিদগ্ধানাং সক্তঃ কুসুমশরলীলাং প্রচলয়ন্।
গুণানাবিষ্কুর্বন্ গুণিষু খলগর্ব্বানপহরন্ রসোদন্তোদ্গারী জগতি রসরাজো বিজয়তে॥

'সম্বাদ রসরাজ' পূর্বস্বভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অযথা গালাগালি ও নিন্দার ফলে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে "ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্ম্মদাসের এক মাস মিয়াদ হইয়াছে।" ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'সম্বাদ রসরাজ' নব কলেবরে উদিত হয়; "আহ্লাদের বিষয় এই ইহাতে এক্ষণে আর কোন অশ্লীল বিষয় লিখিত হইবে না। সম্পাদক ইহাকে সাহিত্য পত্র করিবেন কল্পনা করিয়াছেন।"

৩৭। সংবাদ অরুণোদয়। (দৈনিক) ডিসেম্বর ১৮৩৯

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র হইতে এই দৈনিক পত্রখানি জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়; ইহা কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

ইং ১৮৪০

৩৮। **মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী**। (সাপ্তাহিক) ১০ মে ১৮৪০

মফস্বল হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম সংবাদপত্র। 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' কাশিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী। এক বৎসর পরে "মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোপে উক্ত রাজা বাহাদুর বর্ত্তমানেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।"

৩৯। **সংবাদ সুজনরঞ্জন**। (সাপ্তাহিক) মে ১৮৪০

প্রকাশকাল— মে ১৮৪০। সম্পাদক— হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়।

৪০। **আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ**। (মাসিক) জুন ১৮৪০

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৭ তারিখে এই মাসিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহা "চানকগ্রাম নিবাসি শ্রীশ্রীনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীতঃ।" তিন খণ্ড প্রকাশের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে (আষাঢ় ১২৫৯) 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' পুনঃপ্রকাশিত হয়। এবারও অল্প দিন পরে— ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেই 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণে'র প্রচার রহিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পর্যায়ের চারি খণ্ড 'আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ' একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪১। **গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্**। (সাপ্তাহিক) ১ জুলাই ১৮৪০

এই রাজকীয় বার্তাবহ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইত। গবর্মেণ্টের আইন-কানুনের বঙ্গানুবাদই ইহাতে স্থান পাইত। 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি পর্যন্ত 'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্'-এর সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য সম্পাদকতা করেন বলিয়া জানা যায়।

৪২। **জ্ঞানদীপিকা**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪০

প্রকাশকাল— ১২৪৭ সাল। সম্পাদক— ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ইং ১৮৪১

৪৩। **সংবাদ ভারতবন্ধু**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪১

প্রকাশকাল—১২৪৮ সাল। সম্পাদক—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৪। **সংবাদ নিশাকর**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪১

প্রকাশকাল—১২৪৮। সম্পাদক—নীলকমল দাস।

ইং ১৮৪২

৪৫। **বেঙ্গাল স্পেক্টেটর**। (মাসিক···) এপ্রিল ১৮৪২

প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' নামে এক ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রথমে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশ-কাল-- এপ্রিল ১৮৪২।

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়—

"অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমাদিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যেপ্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা

জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পূর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্বস্বহিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বন পূর্ব্বক আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎপত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম, ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয়।"

পাঁচ মাস মাসিকরূপে চলিয়া 'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাক্ষিক পত্রে, এবং পর-বৎসর মার্চ মাস হইতে পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ নবেম্বর তারিখের (২য় খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা) পত্রই ইহার শেষ সংখ্যা।

'বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর' এযুগের এ কখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

৪৬। বিদ্যাদর্শন। (মাসিক) জুন ১৮৪২

১৭৬৪ শকের আষাঢ় মাসে স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশ করেন। 'বিদ্যাদর্শন' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়—

"এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদিলিখনে একং প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।...

উত্তমং কবিতা যিনি লিখিয়া প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমারদিগের বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।"

'বিদ্যাদর্শন' পত্র ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একখানি সুপরিচালিত পত্রিকা ছিল।

৪৭। **সংবাদ ভৃঙ্গদূত**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪২

প্রকাশকাল—১২৪৯ সাল। সম্পাদক—নীলকমল দাস।

ইহা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া পর বৎসর বিলুপ্ত হয়।

ইং ১৮৪৩

৪৮। **মঙ্গলোপাখ্যান পত্র**। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৪৩।

"*The Evangelist* মঙ্গলোপাখ্যান পত্র" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টতত্ত্বই ইহাতে আলোচিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—জে. রবিনসন। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

৪৯। **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**। (মাসিক…) ১৬ আগস্ট ১৮৪৩

"কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে" তত্ত্ববোধিনী সভা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল "ব্রহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে রূপেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন।" ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ তারিখে এই সভার মুখপত্রস্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কি প্রকার

হইবেক? অতএব তাহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমাদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।"

প্রথম বারো বৎসরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করেন—অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন—

"তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদ-পত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।"

অক্ষয়কুমার দত্তের পর যাঁহারা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক" নির্বাচিত হন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকালের তালিকা—

১. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর: ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৯-১৮৬১; এপ্রিল

১৯০৯-এপ্রিল ১৯১০; এপ্রিল ১৯১৫-জানুয়ারি ১৯২৩ (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে)। ২. অযোধ্যানাথ পাকড়াশী: ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫-এপ্রিল ১৮৬৭; এপ্রিল ১৮৬৯-আগস্ট ১৮৭৩। ৩. হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন: এপ্রিল ১৮৬৭-এপ্রিল ১৮৬৯; এপ্রিল ১৮৭৭-সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। ৪. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: সেপ্টেম্বর ১৮৮৪-এপ্রিল ১৯০৮। ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: এপ্রিল ১৯১০-এপ্রিল ১৯১৫। ৬. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর: এপ্রিল ১৯১৫-জানুয়ারি ১৯২৩ (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে); জানুয়ারি ১৯২৩-....

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দীর্ঘকাল চলিয়া অল্পদিন হইল বন্ধ হইয়াছে।

ইং ১৮৪৪

৫০। **কায়স্থ কৌস্তুভ**। ১৭ জুলাই ১৮৪৪

এই সাময়িকপত্রে কায়স্থ-উৎপত্তির বিবরণ, কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বচন প্রভৃতি আছে। ইহার ২য় সংখ্যা ১১ মার্চ ১৮৪৫ ও তৃতীয় সংখ্যা ৫ মে ১৮৪৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ মিত্র কর্তৃক এগুলি সংগৃহীত।

৫১। **সর্ব্বরসরঞ্জিনী**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৪

৫২। **সংবাদ রাজরাণী**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৪

প্রকাশকাল— ১২৫১ সাল; সম্পাদক— গঙ্গানারায়ণ বসু।

৫৩। **পক্ষির বিবরণ**। ইং ১৮৪৪

'পশ্বাবলী'-সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র পক্ষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি সংখ্যা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতা স্কুলবুক-সোসাইটির সাহায্যে ১৮৪৪

খ্রীষ্টাব্দে "পক্ষির বিবরণ। Ornithology No. 1" বাহির করেন। ইহার আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

ইং ১৮৪৬

৫৪। **নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।** (পাক্ষিক…) ১২ জানুয়ারি ১৮৪৬

১২৫২ সালের "মকর সংক্রমণ দিবস" হইতে 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষতা করাই এই পত্রিকা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। নন্দকুমার কবিরত্ন ইহার সম্পাদক ছিলেন। 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'র কণ্ঠে নিম্নোক্ত শ্লোকটি মুদ্রিত থাকিত—

একো বিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ।

—•—

সদ্বিচারজুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌষেয়বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনো মে।

দশ বৎসর পাক্ষিকরূপে চলিয়া 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা' মাসিকপত্রে পরিণত হয়।

৫৫। **জগদুদ্দীপক ভাস্কর।** (সাপ্তাহিক) ১১ জুন ১৮৪৬

ইহা মুসলমান-পরিচালিত দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র। বাংলা ছাড়া আরও চারিটি ভাষায় ইংরেজি (*Indian Sun*), হিন্দী, ফার্সী, ('দফত বেওয়াকেয়াত') এবং উর্দু বা হিন্দুস্থানীতে 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' প্রকাশিত

হইত। মৌলবী নাসীরউদ্দীন এই পত্রিকাখানির প্রকাশক। তিন মাস যাইতে না যাইতেই 'জগদ্দ্দীপক ভাস্কর' পত্রের প্রচার রহিত হয়।

৫৬। **পাষণ্ডপীড়ন**। (সাপ্তাহিক) ২০ জুন ১৮৪৬

৭ আষাঢ় ১২৫৩ তারিখে প্রভাকর যন্ত্র হইতে সীতানাথ ঘোষের সম্পাদকত্বে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ রসরাজ' পত্রের সহিত কবিতা-যুদ্ধ করিবার জন্যই 'পাষণ্ডপীড়নে'র আবির্ভাব। এই-সকল কবিতা অশ্লীলতা ও কুৎসাপূর্ণ। ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে 'পাষণ্ডপীড়নে'র প্রচার রহিত হয়।

৫৭। **সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা**। (মাসিক) আগস্ট ১৮৪৬

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় সত্যসঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এই সভার মুখপত্রস্বরূপ 'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। শ্যামাচরণ বসু ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৪ নবেম্বর ১৮৪৭ তারিখে সম্পাদকের মৃত্যু হইলে পত্রিকাখানিও বন্ধ হইয়া যায়।

৫৮। **সমাচার জ্ঞানদর্পণ**। (সাপ্তাহিক) ১৭ অক্টোবর ১৮৪৬

ভাস্কর যন্ত্রালয় হইতে উমাকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদকত্বে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১২৫৬ সালের আশ্বিন (১৮৪৯ সেপ্টেম্বর) মাসে 'সমাচার জ্ঞানদর্পণে'র প্রচার রহিত হয়।

৫৯। **জগদ্বন্ধু**। (মাসিক) ইং ১৮৪৬

সীতানাথ ঘোষ, ব্রজলাল কারফরমা ও উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি হিন্দু কলেজের কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ১২৫৩ সালে 'জগদ্বন্ধু' নামে একখানি মাসিকপত্রের জন্ম হয়। সীতানাথ ঘোষ এই পত্রের সম্পাদক

ছিলেন। ১২৫৫ সালে পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়। ১ বৈশাখ ১২৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ—

"...বর্ত্তমান বর্ষে [১২৫৫] জগবন্ধু পত্রিকার বিনাশ হওয়াতে আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি, যেহেতু তাহাতে অতি উত্তমং প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইত।"

ইং ১৮৪৭

৬০। **উপদেশক।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৪৭

'মঙ্গলোপাখ্যান' রহিত হইবার পর ঐ প্রকার একখানি পত্রের অনুভূত হওয়ায় 'উপদেশক' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক—পাদরি জে. ওয়েঙ্গার। ইহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

মার্ডক লিখিয়াছেন, ওয়েঙ্গার স্বদেশ হইতে ফিরিয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'উপদেশক' পুনরায় প্রকাশ করেন; ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রচার রহিত হয়।

৬১। **দুর্জ্জন দমন মহানবমী।** (মাসিক...) ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭

"দুর্জ্জনদিগের দমন নিমিত্ত" ২৮ মাঘ ১২৫৩ তারিখে এই পত্রিকার আবির্ভাব। মথুরামোহন দাস গুহ ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভূষণ-স্বরূপ এই শ্লোকটি থাকিত—

ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদ পশূনাং কণ্ঠ গলিত রুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং শ্রীদুর্জ্জন দমন মহানবমী॥

পঞ্চম সংখ্যা (৭ জুন) হইতে ইহা মাসে দুই বার প্রকাশিত হইতে থাকে। একাদশ সংখ্যায় (৯ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায়, মথুরামোহন দাস গুহ পদত্যাগ করায় সহকারী সম্পাদক

ঠাকুরদাস বসুই 'দুর্জ্জন দমন মহানবমী'র সম্পাদক ও একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। এই পত্রিকা পাঠে সুরুচির একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা গালিগালাজ ও অশ্লীলতা -দোষে পূর্ণ।

৬২। **সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন**। (সাপ্তাহিক) ১৫ এপ্রিল ১৮৪৭

ইহা একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজি-বাংলা) সাপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩ বৈশাখ, ১২৫৪। চৈতন্যচরণ অধিকারী ইহার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী পৌষ মাসে 'সংবাদ জ্ঞানাঞ্জনে'র অস্তিত্ব লোপ পায়।

৬৩। **হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়**। (মাসিক) মে ১৮৪৭

প্রকাশকাল— বৈশাখ ১২৫৪। সম্পাদক— বিষ্ণুসভা-সম্পাদক হরিনারায়ণ গোস্বামী। স্থিতিকাল— এক বর্ষ।

৬৪। **সংবাদ কাব্যরত্নাকর**। (সাপ্তাহিক) ১৬ জুন ১৮৪৭

১২৫৪ সালের ৩রা আষাঢ় জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ রসরাজ' বা 'পাষণ্ডপীড়নে'র ন্যায় ইহাতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই প্রধানতঃ স্থান পাইত। ইহার অভিভাবক ছিলেন— ভারত ভট্টাচার্য। প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য ও ভারত ভট্টাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি।

৬৫। **হিন্দুবন্ধু**। (মাসিক) আগস্ট ১৮৪৭

১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 'হিন্দুবন্ধু'তে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে আলোচনাই বেশির ভাগ স্থান পাইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন—উমাচরণ ভদ্র।

৬৬। **রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ**। (সাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৪৭

১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে রংপুরে 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। রংপুরের কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর ব্যয়ে গুরুচরণ রায় ইহা পরিচালন করিতেন। গুরুচরণবাবুর মৃত্যুর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র সম্পাদক হন (আগস্ট ১৮৫১)।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন করিলে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে'র প্রচার রহিত হয়।

৬৭। **সংবাদ সাধুরঞ্জন**। (সাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৪৭

'পাষণ্ডপীড়ন' বন্ধ হইবার পর ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত—

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ। সমস্ত সল্লোক মনোহসুরঞ্জনঃ।
সদাসদালোচন লোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
॥ * ॥ প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
॥ * ॥ সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥

'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ স্থান পাইত। কিছু দিন পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে প্রকাশ করেন। সংবাদ সাধুরঞ্জন' ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত বাহির হইয়াছিল।

৬৮। **জ্ঞানসঞ্চারিণী**। (পাক্ষিক) নবেম্বর ১৮৪৭

১২৫৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। গঙ্গানারায়ণ বসু ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। "জ্ঞানসঞ্চারিণী

পত্রিকা দ্বারা যে সকল মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক জ্ঞানসঞ্চারিণী পাঠশালা নামক এক অবৈতনিক বিদ্যালয় যাহা ছয় মাস অতীত হইল, কলিকাতার সিমুল্যা কাসারিটোলার নং ৪৮ ভবনে সংস্থাপন হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই পাঠশালার মাসিক আয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক।" (৮ম সংখ্যা, ১৫ মার্চ ১৮৪৮)।

৬৯। **সংবাদ সুজনবন্ধু**। (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৭

১২৫৪ সালের পৌষ মাসে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা ১২৫৬ সালে কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া পুনরায় ঐ বৎসর মাঘ মাসে রাধাচরণ চৌধুরী কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হয়।

৭০। **সংবাদ দিগ্বিজয়**। (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৭

প্রকাশকাল— পৌষ ১২৫৪। সম্পাদক— দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

৭১। **সংবাদ মনোরঞ্জন**। (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৭

প্রকাশকাল— পৌষ ১২৫৪। সম্পাদক— গোপালচন্দ্র দে।

৭২। **আক্কেলগুড়ুম**। (সাপ্তাহিক ?) ডিসেম্বর ১৮৪৭

প্রকাশকাল— পৌষ ১২৫৪। সম্পাদক— ব্রজনাথ বন্ধু। ইহা ইংরেজি-বাংলায় প্রকাশিত হইত।

ইং ১৮৪৮

৭৩। **সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর**। (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৮৪৮

১ বৈশাখ ১২৫৬ তারিখের সংবাদ 'প্রভাকরে' প্রকাশ—

"[১২৫৫] বৈশাখ মাস।...জ্ঞানরত্নাকর পত্র প্রকাশ হয়।" বিশ্বম্ভর কর ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

৭৪। **সংবাদ রত্নবর্ষণ**। (পাক্ষিক) জুন ১৮৪৮

ভবানীপুর হইতে মাধবচন্দ্র ঘোষের সম্পাদকত্বে এই পাক্ষিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

৭৫। **সংবাদ মুক্তাবলী**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৮

১২৫৫ সালের প্রথম ভাগে ইহা শিবপুর হইতে প্রকাশিত হয়। কালীকান্ত ভট্টাচার্য ইহার পরিচালক ও আন্দুলরাজ রাজনারায়ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৭৬। **সংবাদ অরুণোদয়**। (সাপ্তাহিক) ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮

প্রকাশকাল— ৩ আশ্বিন ১২৫৫। সম্পাদক— শ্যামপুকুরনিবাসী পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭৭। **সংবাদ কৌস্তভ**। (সাপ্তাহিক) অক্টোবর ১৮৪৮

প্রকাশকাল— কার্তিক ১২৫৫। সম্পাদক— মহেশচন্দ্র ঘোষ।

৭৮। **জ্ঞানচন্দ্রোদয়**। (মাসিক?) ইং ১৮৪৮

১২৫৫ সালে রাধানাথ বসু কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়।

৭৯। **সংবাদ দিনমণি**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৮

১২৫৫ সালে শম্ভুচন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করেন।

ইং ১৮৪৯

৮০। **সংবাদ রসসাগর**। (সাপ্তাহিক…) মার্চ ১৮৪৯

ইহা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ২৫ জুন তারিখে 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্র ইহার ১৫শ সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার

করেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে 'সংবাদ রসসাগর' বারত্রয়িক হয়।

ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর (১৫ জুলাই ১৮৫০) পর কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ রসসাগর' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে ইহা প্রকাশ করিতেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল কাগজখানির নাম রাখেন—'সংবাদ সাগর'। তিনি কৃতিত্বের সহিত ১২৫৯ সাল পর্যন্ত 'সংবাদ সাগর' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

৮১। **বারাণসী চন্দ্রোদয়**। (সাপ্তাহিক) ২ মে ১৮৪৯

একজন প্রবাসী বাঙালির দ্বারা সর্বপ্রথম কাশীতে বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা 'বারাণসী চন্দ্রোদয়', লিথোয় মুদ্রিত একখানি সাপ্তাহিক পত্র। কাশীবাসকালে ভূতপূর্ব 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ'-সম্পাদক উমাকান্ত ভট্টাচার্য এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' এক বৎসর জীবিত ছিল।

৮২। **সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা**। (মাসিক) জুন ১৮৪৯

সম্পাদক— শ্যামবাজারনিবাসী গোবিন্দচন্দ্র দে।

৮৩। **সংবাদ রসমুদ্গার**। (সাপ্তাহিক) জুলাই ১৮৪৯

প্রকাশকাল— আষাঢ় ১২৫৬। সম্পাদক— গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সম্বাদ রসরাজে'র সহিত মসিযুদ্ধ করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। পরবর্তী ডিসেম্বর মাস হইতে ইহাকে "অর্ধসাপ্তাহিক" করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু এই প্রস্তাব বোধ হয় কার্যকর হয় নাই। ইহা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই।

৮৪। **কৌস্তুভ কিরণ**। (মাসিক) আগস্ট ১৮৪৯

প্রকাশকাল— ভাদ্র ১২৫৬। সম্পাদক— ব্রজমোহন চক্রবর্তী।

৮৫। **মহাজনদর্পণ**। (দৈনিক) সেপ্টেম্বর ১৮৪৯

প্রকাশকাল— ভাদ্র ১২৫৬। সম্পাদক— জয়কালী বসু।

বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্র বোধ হয় ইহাই প্রথম।

৮৬। **ভৈরবদণ্ড**। (সাপ্তাহিক) নবেম্বর ১৮৪৯

১২৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, বারাণসীতে লিথোয় মুদ্রিত হইয়া উমাকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদকত্বে ইহা প্রকাশিত হয়। অল্পদিন পরেই ইহা লুপ্ত হয়।

৮৭। **সংবাদ সজ্জনরঞ্জন**। (সাপ্তাহিক···) ডিসেম্বর ১৮৪৯

১২৫৬ সালের পৌষ মাসে গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। পর বৎসর (১২৫৭ সাল) ইহা অর্ধসাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রচার রহিত হয়; মধ্যেও একবার কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' পত্র অর্ধ-সাপ্তাহিকরূপে পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্রের শিরোনামের নিম্নে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত—

লোকানাং কিল তাপহেতুরধুনা ক্ষেত্রজ্ঞতো ভাস্করো
গুপ্তেঽস্তেঽপি প্রভাকরেশ্বর হতো রামাহ্বতেনামুনা।
কিংবা কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেঽখিলে
চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া কলঙ্কিততয়া সদ্বর্ত্মদর্শে কথং॥
সোমঃ সোঽপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাসপ্রকাশস্তু সঃ
অন্যেষাং কিমু বার্ত্তয়া জনমনোবিগ্লাপয়ন্ত্যা ভৃশং।
সদ্বর্ত্ম ব্যবহারদর্শনবিধৌ সোঽপ্যেষ এবাধুনা
আস্তাং সজ্জনরঞ্জনো মণিবরো গোবিন্দ-গুপ্তাঙ্কিতং॥

৮৮। **সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী**। (সাপ্তাহিক…) ডিসেম্বর ১৮৪৯

প্রকাশকাল— পৌষ ১২৫৬। সম্পাদক— বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৫৭ সালে ইহা অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। স্থিতিকাল— কয়েক বর্ষ।

৮৯। **বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়**। (সাপ্তাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৯

প্রকাশকাল— পৌষ ১২৫৬। সম্পাদক— রামতারণ ভট্টাচার্য।

৯০। **সংবাদ রসরত্নাকর**। (পাক্ষিক) ডিসেম্বর ১৮৪৯

প্রকাশকাল— পৌষ ১২৫৬। সম্পাদক— যদুনাথ পাল।

ইং ১৮৫০

৯১। **ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র**। এপ্রিল ১৮৫০

৭ জুন ১৮৪৫ তারিখে কলিকাতায় ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। সোসাইটির মুখপত্রস্বরূপ বাংলায় একখানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় —এই সংবাদ ২৫ এপ্রিল ১৮৫০ তারিখের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় আছে। পত্রিকাখানির নাম এখনও জানিতে পারি নাই।

৯২। **সত্যপ্রদীপ**। (সাপ্তাহিক) ৪ মে ১৮৫০

ইহা "শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীমেরিডিথ টোন্সেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত" হইত। "এতদ্দেশীয় লোকেরদের সংজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্রায়।" ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ২৩ বৈশাখ ১২৫৭। 'সত্যপ্রদীপ' এক বৎসর চলিয়াছিল; ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখে। 'সত্যপ্রদীপে'র প্রচার বন্ধ করিয়া শ্রীরামপুর হইতে 'সমাচার দর্পণ'

পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'সত্যপ্রদীপ' একখানি সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্র ছিল।

৯৩। **দূরবীক্ষণিকা**। (মাসিক) জুন ১৮৫০

১২৫৭ সালের আষাঢ় মাসে খিদিরপুর হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই ১৮৫০ তারিখে 'সত্যপ্রদীপ' লেখেন—"দূরবীক্ষণিকা পত্র। খিদিরপুর নিবাসি শ্রীযুত দ্বারকানাথ মজুমদার মহাশয় উক্ত নামাঙ্কিত এক পত্রিকা আমারদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্র এদেশীয় বিদ্যানুরাগি কতিপয় মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে···।"

৯৪। **ধর্ম্মমর্ম্মপ্রকাশিকা**। (মাসিক) জুন ১৮৫০

এই মাসিকপত্রখানি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। ইহা কোন্নগর ধর্মসভার মুখপত্র ছিল। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইহা কোন্নগরনিবাসী গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে পুনঃপ্রকাশিত হয়। পরবর্তী ৫ জুন তারিখের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সারে' ইহার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

৯৫। **সত্যার্ণব**। (মাসিক) জুলাই ১৮৫০

পাদরি লং এই মাসিকপত্রখানি সম্পাদন করিতেন। প্রধানতঃ ধর্মতত্ত্বই ইহাতে স্থান পাইত। তৃতীয় বর্ষ (সেপ্টেম্বর ১৮৫২) হইতে 'সত্যার্ণব' দুই মাস অন্তর প্রকাশিত হইত। ইহার ১ম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি করিয়া চিত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে পরবর্তী সকল সংখ্যায় দুই বা ততোধিক চিত্র থাকিত। 'সত্যার্ণব' পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

৯৬। সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা। (মাসিক) আগস্ট ১৮৫০

১২৫৬ সালের ফাল্গুন মাসে কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় সর্বশুভকরী সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার মুখপত্ররূপে ১২৫৭ সালের ভাদ্র মাসে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়—

"...সভাসংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, বহুকালাবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক।... আমরা এই যে দুঃসাধ্য মহৎ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবার মানস করিয়াছি পত্রিকা প্রচার তৎসমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় সর্ব্বশুভকরী নাম দ্বারাই ইহার নামকরণ করিলাম।"

এই পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার কলেবর একটি করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধে পূর্ণ হইত। রচনায় লেখকের নাম থাকিত না। প্রথম সংখ্যায় "বাল্য-বিবাহের দোষ" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা বলিয়া তদীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৭৭২ শক) "স্ত্রীশিক্ষা" নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ইহা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রচনা বলিয়া শম্ভুচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশের পর সর্বশুভকরী সভায় গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। "সভার বীজস্বরূপ বাবু তারকনাথ দত্তের সহিত সভ্যগণ অকৌশল করিলেন।" অতঃপর পত্রিকাখানি আর নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; ইহার ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৫১

খ্রীষ্টাব্দেই পত্রিকাখানি প্রচার রহিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার উহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক খণ্ড 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' আছে; উহা "১ম খণ্ড। ৩য় সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৬২। ইং আগষ্ট ১৮৫৫।"

৯৭। **সংবাদ সুধাংশু**। (সাপ্তাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৫০

পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি সম্পাদন করিতেন। ইহাতে প্রধানতঃ খ্রীষ্টতত্ত্বই আলোচিত হইত। "আমারদের বাসনা এই যে সর্ব্ব বিষয়ে জগদীশ্বরের মহিমা বিস্তার এবং স্বদেশীয় লোকের মঙ্গল বর্দ্ধন হয় সুতরাং এই নব পত্রিকাকে পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তারের এবং স্বদেশের মঙ্গল বর্দ্ধনের উপযোগিনী করাই আমারদের অভিপ্রেত।"

এই সাপ্তাহিক পত্র এগারো মাস চলিবার পর ২ আগস্ট ১৮৫১ তারিখে বন্ধ হইয়া যায়।

৯৮। **সংবাদ বর্দ্ধমান**। (সাপ্তাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৫০

১২৫৭ সালের আশ্বিন মাসে বর্ধমান হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। ইহা বর্ধমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রচারিত হইত। কয়েক বৎসর চলিবার পর 'সংবাদ বর্দ্ধমান' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল।

ইং ১৮৫১

৯৯। **জ্ঞানদর্শন**। (পাক্ষিক) ১৪ মে ১৮৫১

১ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পাথুরিয়াঘাটা হইতে এই পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার মাত্র এক সংখ্যা বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

১০০। **কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা**। (পাক্ষিক…) ১ জুন ১৮৫১

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে লিথোয় মুদ্রিত হইয়া কাশী হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালি— কাশীদাস মিত্র। সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ :

"[বারাণসী] চন্দ্রোদয়…আপনার অল্পায়ু বিকল্পে কায়াকল্পদ্বারা নূতন কলেবর ধারণপূর্ব্বক নবীন নাম যথা 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে আখ্যাত হইয়া নব অনুরাগে বিখ্যাত হইয়াছেন…।

এই বারাণসীধামে তিন সহস্রাধিক বঙ্গদেশীয় মনুষ্যের বসবাস হইয়াছে,…এই জনমণ্ডলি সমাজমধ্যে সাধারণের সৎকারজনক কোন সংবাদপত্র বঙ্গভাষায় প্রচার না থাকাতে মহা আক্ষেপের বিষয়…।"

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে 'কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পাক্ষিক হইতে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। কিছুদিন পরে ইহার প্রচার রহিত হয়, কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১০১। **সংবাদ জ্ঞানোদয়**। (সাপ্তাহিক) ৭ জুন ১৮৫১

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। অল্প দিন পরেই ইহার প্রচার রহিত হইলেও ১২৫৯ সালের ভাদ্র মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এবারও অল্প দিন পরই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৫ তারিখে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'সংবাদ জ্ঞানোদয়' আবার প্রকাশিত হয়।

১০২। **মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ**। (মাসিক) জুলাই ১৮৫১

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মেদিনীপুরের কলেক্টর এইচ. ভি. বেলীর আনুকুল্যে ও কতিপয় দেশীয় লোকের পরিচালনে মেদিনীপুর হইতে সর্বপ্রথম

বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানির নাম—'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' (*Midnapur and Hijili Guardian*); ইহা দ্বিভাষিক (ইংরেজি-বাংলা) মাসিকপত্রিকা ছিল; ইহাতে স্থানীয় লোকের রুচিকর সংবাদাদিও থাকিত। পত্রিকাখানি এক বৎসর চলিয়াছিল।

১০৩। **বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ**। (মাসিক) অক্টোবর ১৮৫১

১২৫৮ সালের কার্তিক মাসে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে এই সচিত্র মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন— স্বনামধন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়" এই পত্রের কলেবর পূর্ণ হইত। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'ই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সত্য বটে, 'পশ্বাবলী'র প্রত্যেক সংখ্যায় এক-একটি জন্তুর কাঠখোদাই চিত্র, এবং 'সত্যার্ণব' পত্রের প্রথম বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি ও দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় দুইখানি করিয়া চিত্র থাকিত, কিন্তু সচিত্র পত্রিকা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'পশ্বাবলী' ও 'সত্যার্ণব' সে পর্যায়ে পড়ে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র অতীব যোগ্যতার সহিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র প্রথম ছয় পর্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কাগজখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রকাশিত পুস্তক-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য ছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র দ্বিতীয় সম্পাদক। তিনি ইহার ৭ম পর্ব—১৭৮৩ শক, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সম্পাদন করেন। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্নের সহকারী ছিলেন।

ইং ১৮৫২

১০৪। **জ্ঞানারুণোদয়।** (মাসিক) ৩১ জানুয়ারি ১৮৫২

১৯ মাঘ ১২৫৮ তারিখে কালিদাস মৈত্র ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে শ্রীরামপুরের চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। "শ্রীরামপুরের মধ্যে এতদ্দেশীয় মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকাশ্য পত্র প্রকাশের সূত্র এই প্রথম হইল।"

দশম সংখ্যা (অক্টোবর ১৮৫২) পর্যন্ত কালিদাস মৈত্র 'জ্ঞানারুণোদয়ে'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক বৎসর চলিয়া ইহার প্রচার রহিত হয়। ১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ তারিখে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১০৫। **সংবাদ বিভাকর।** (অর্ধ-সাপ্তাহিক) ১৫ জুন ১৮৫২

৩ আষাঢ় ১২৫৯ তারিখে এই অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন মনোমোহন বসু, কবি ও নাট্যকার হিসাবে ইনি পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পরবৎসর বৈশাখ মাসে 'সংবাদ বিভাকরে'র প্রচার রহিত হয়।

১০৬। **সংবাদ শশধর।** (সাপ্তাহিক) ৬ জুলাই ১৮৫২

পূর্বেই বলিয়াছি, ১২৫৮ সালের মাঘ মাসে শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক মাস পরেই এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ১২৫৯ সালের ২৪ আষাঢ় হইতে 'সংবাদ শশধর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশ করেন। কালিদাস মৈত্র এই সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করিতেন। ১২৫৯ সালেই ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়।

১০৭। **বিশ্ববিলোচন**। (সাপ্তাহিক ?) ইং ১৮৫২

১২৫৯ সালে প্রকাশিত হইয়া ঐ বৎসরেই পত্রিকাখানি বিলুপ্ত হয়।

ইং ১৮৫৩

১০৮। **ধর্ম্মরাজ**। (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

ইহার সম্পাদক ছিলেন তারকনাথ দত্ত। "ধর্ম্মরাজ নিয়ত হিন্দুধর্ম্ম বিরোধি খৃষ্টীয়ানগণের প্রবোধক ধর্ম্মঘটিত প্রস্তাব সকল প্রকটন এবং সাহিত্যাদি বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন।" 'ধর্ম্মরাজে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :

> বিরাজতে সভ্যসমাজরাজঃ, সদর্থরাজী নিধিরাজরাজঃ।
> তমঃ প্রভাবক্ষতি ধর্ম্মরাজঃ, শুভপ্রবৃত্তিপ্রদ ধর্ম্মরাজঃ ॥

১০৯। **বিদ্যাদর্পণ**। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৫৩

প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৬০। সম্পাদক—প্রিয়মাধব বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১০। ?—(মাসিক) মে ১৮৫৩

'বিদ্যাদর্পণ' প্রকাশের এক মাস পরে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার নাম এখনও জানিতে পারি নাই।

১১১। **সুলভ পত্রিকা**। (মাসিক) জুলাই ১৮৫৩

১২৬০ সালের শ্রাবণ মাসে 'রাজরসামৃত'-প্রণেতা দ্বারকানাথ রায়ের সম্পাদকত্বে ইহা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী চৈত্র মাসে পত্রিকার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হয়। ইহার পর প্রকাশকের সহিত সম্পাদকের বিচ্ছেদ ঘটে। ইহার ফলে দ্বারকানাথ ১২৬১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পত্রিকার ২য় খণ্ড জি. পি.

রায় এণ্ড কোম্পানির সাহায্যে ইণ্ডিয়ান ফেয়ার যন্ত্রালয় হইতে পূর্ববৎ প্রকাশ করেন।

ও দিকে পূর্বপ্রকাশক— কলিকাতা নিউ প্রেস লালবিহারী দের সম্পাদকত্বে 'সুলভ পত্রিকা' প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১১২। **ছোট জাগুলিয়া হিতৈষি মাসিক পত্রিকা।** অক্টোবর ১৮৫৩

১২৬০ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হইয়া অল্পদিন পরে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল।

১১৩। **পাষণ্ড দলন।** (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক) নবেম্বর ১৮৫৩

প্রকাশকাল— অগ্রহায়ণ ১২৬০।

১১৪। **চিকিৎসা রত্নাকর।** (মাসিক) ইং ১৮৫৩

সম্পাদক— হলধর সেন।

ইং ১৮৫৪

১১৫। **রসার্ণব।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৫৪

প্রকাশকাল— মাঘ ১২৬০। সম্পাদক— রাধামাধব মিত্র।

১১৬। **সংবাদ দিনকর।** (সাপ্তাহিক) ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪

প্রকাশকাল— ১৭ ফাল্গুন ১২৬০। সম্পাদক— কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১৭। **সমাচার সুধাবর্ষণ।** (দৈনিক) জুন ১৮৫৪

শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদকত্বে এই দ্বিভাষিক (বাংলা ও হিন্দী) পত্রখানি প্রকাশিত হইত।

'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রও বটে, এ সংবাদ হিন্দীভাষাভাষীদের জানা না থাকিতে পারে।

১১৮। **মাসিক পত্রিকা।** (মাসিক) আগস্ট ১৮৫৪

ইহার সম্পাদক ছিলেন— প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, উভয়েই সে যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি। "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।"

'মাসিক পত্রিকা' চারি বৎসর চলিয়াছিল। ইহার প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) হইতে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১১৯। **প্রকৃত মুদগর।** (মাসিক) নবেম্বর ১৮৫৪

'মাসিক পত্রিকা'র বিপক্ষতা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব।

ইং ১৮৫৫

১২০। **সিদ্ধান্ত দর্পণ।** (মাসিক) মার্চ ১৮৫৫

পরিচালক— যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১২১। **বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।** (মাসিক) ২০ এপ্রিল ১৮৫৫

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল। সম্পাদক— কালীপ্রসন্ন সিংহ। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ৮ বৈশাখ ১২৬২; ইহাতে সভ্যতার বিষয়, ও চাঞ্চল্য নামে দুইটি প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে— বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, চাঞ্চল্য, ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা। ১২৬৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-

সংখ্যায় বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রিকাখানি- বৎসরাধিক কাল জীবিত ছিল।

১২২। **জ্ঞানবোধিনী**। (সাপ্তাহিক) মে ১৮৫৫

প্রকাশকাল— জ্যৈষ্ঠ ১২৬২।

১২৩। **বঙ্গ বার্ত্তাবহ**। (পাক্ষিক) মে ১৮৫৫

প্রকাশকাল— জ্যৈষ্ঠ ১২৬২। সম্পাদক— হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১২৪। **সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র**। (মাসিক) জুলাই ১৮৫৫

ইহা "নীতি ধর্ম্ম ইতিহাস উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সংস্কৃত পুরাণোপপুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদি তথা অন্যান্য ভাষার বহুতর পুস্তক হইতে অনুবাদিত" মাসিকপত্র। প্রকাশকাল— আষাঢ় ১২৬২। সম্পাদক— অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য। পত্রিকার মলাটের উপর এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :

ইতিহাসপুবাণানি কাব্যাখ্যানকথাস্তথা।
হ্লাদয়ন্তি হৃদম্ভোজমম্ভোজং ভাস্করো যথা॥

'সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' সর্বসমেত ৩৪ সংখ্যা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ১২৬২ ও ১২৬৩ সালে প্রকাশিত হইলেও, তৃতীয় বর্ষের পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল ১২৬৬-৬৭ সালে।

১২৫। **বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা**। (মাসিক···) সেপ্টেম্বর ১৮৫৫

প্রকাশকাল— আশ্বিন ১২৬২। সম্পাদক—নবীনচন্দ্র আঢ্য। ইহাতে "নীতিবিদ্যা শিক্ষা, বাণিজ্য, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সার বিবরণ" স্থান পাইত। 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা'র প্রথম চারি খণ্ড মাসিক আকারে বাহির হইয়াছিল। পঞ্চম খণ্ড, পাক্ষিক আকারে এবং সর্বশেষে দৈনিক আকারে বাহির হইতে থাকে। দৈনিক পত্রের শীর্ষদেশে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :

আম্রাতৃতল্যাখ্যপুরা রমারমা নবীনচন্দ্রাঢ্যসদাঢ্যদাঢ্যতা।
পত্রী সুপত্রীবহুতাসতাং সতাং সা বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকাশিকা॥

ইং ১৮৫৬

১২৬। **মর্ম্ম ধুরন্ধর।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৫৬

প্রকাশকাল— মাঘ ১২৬২।

১২৭। **বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা।** এপ্রিল ১৮৫৬

১২৮। **সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা।** (মাসিক) মে ১৮৫৬

এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন নবকৃষ্ণ বসু ও শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৯। **এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ।** (সাপ্তাহিক) ৪ জুলাই ১৮৫৬

শিক্ষাবিভাগের দক্ষিণ বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর হজসন প্র্যাট সাহেবের প্রতিপোষকতায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। রেঃ ও'ব্রায়ান স্মিথ ইহার প্রথম সম্পাদক। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিভাগীয় সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ "The object is to supply the people in the interior of the country with a Newspaper cheap in price and healthy in tone." কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে'র সহকারী সম্পাদকের— প্রকৃতপক্ষে সম্পাদকেরই কার্য করিয়াছিলেন। ও'ব্রায়ান স্মিথ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পরবর্তী মার্চ মাসে তাঁহার স্থলে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার নিযুক্ত হন। কিন্তু

তিনি সম্পাদকীয় আসনে বসিবার পূর্বে কানাইলাল পাইন ও ব্রহ্মমোহন মল্লিক অল্পদিন পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন।

প্যারীচরণ সরকারের হস্তে 'এডুকেশন গেজেটে'র যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। প্রায় আড়াই বৎসর পত্রিকা পরিচালনের পর এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ঈস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনের নিকট একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ হতাহত লোকের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন, তাহা জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয় নাই। গবর্মেণ্টও রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সাময়িকপত্রের বিবরণ অবলম্বন করিয়া এবং নিজে অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। সরকারী অর্থে প্রতিপালিত পত্রিকায় এরূপ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় গবর্মেণ্ট প্যারীচরণের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে প্যারীচরণ ৩১ জুলাই পদত্যাগ করেন।

প্যারীচরণ সরকারের স্থলে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ভূদেববাবুর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেটে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ—৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮। গবর্মেণ্ট ভূদেববাবুকে পত্রিকাখানির সর্বস্বত্ব দান করেন।

১৩০। **সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা**। (মাসিক) জুলাই ১৮৫৬

"প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা ও শিল্পসাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১৩১। **অরুণোদয়**। (পাক্ষিক) আগস্ট ১৮৫৬

এই সচিত্র পাক্ষিক পত্রখানি শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইত। রেঃ লালবিহারী দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :

অপরং অস্মৎসমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতে যূয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয়ঞ্চ যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সম্মন্যধ্বে তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাধারণ পত্রং। ১ ॥ ১৯।

'অরুণোদয়' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

১৩২। **অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা।** (মাসিক) অক্টোবর ১৮৫৬

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শ্রীশ্রীভাগবতী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার মুখপত্রস্বরূপ ১২৬৩ সালের কার্তিক মাসে শ্রীদ্বারকানাথ হোড় ও মধুসূদন সরকারের সম্পাদকত্বে 'অদ্বয়তত্ত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা' প্রচারিত হয়। পঞ্চম সংখ্যা হইতে রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ ইহার সম্পাদক হন। পত্রিকাখানি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না।

১৩৩। **মজিলপুর পত্রিকা।** (মাসিক ?) ডিসেম্বর ১৮৫৬

২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ—"কলিকাতার দক্ষিণ মজিলপুর গ্রামে মজিলপুর পত্রিকা নামে এক পত্রিকা প্রকাশ

১৩৪। **উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা।** ডিসেম্বর ১৮৫৬

ইহার সম্পাদক ছিলেন উত্তরপাড়ানিবাসী বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত :

সৎপক্ষপক্ষপাতেয়ং পাক্ষিকী নাম পত্রিকা।
রাজতে রাজহংসীব মানসাম্ভোজলাসিনী॥

ইং ১৮৫৭

১৩৫। **হিন্দুরত্নকমলাকর।** (সাপ্তাহিক) ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭

'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের পরিচালক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক। তিনি 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রের প্রকাশ রহিত করিয়া 'হিন্দুরত্নকমলাকর' প্রকাশ করেন। ৯ মার্চ ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশ: "গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য…১৪ ফাল্গুন [১২৬৩] দিবসে 'রসরাজ' পরিবর্ত্তে 'হিন্দুরত্নকমলাকর' নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন,…।" "হিন্দুধর্ম্মপক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ" এই সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়।

১৩৬। **বিজ্ঞানমিহিরোদয়।** (মাসিক…) এপ্রিল ১৮৫৭

২ বৈশাখ ১২৬৪ তারিখে শ্রীরামপুর হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রের কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পাইত—

> পুষ্ণন্নেষ প্রতিক্ষণং খলু হরিশ্চন্দ্রং নিজৈরশ্মিভির্ভিন্দন্ সান্দ্রতমাংসি
>
> দুষ্কৃতধিয়ামর্থান্ সমুদ্দীপয়ন্।
>
> শ্রীনারায়ণপূর্ব্বশৈলশিখরাদুদ্যন্ কজাংস্তোষয়ন্ স্বদ্বিজ্ঞানবিলোচনোহি
>
> মিহিরঃ শ্রীমান্নভঃক্রামতি॥

'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' দ্বিতীয় বর্ষ (১ বৈশাখ ১২৬৫) হইতে পাক্ষিক আকার ধারণ করে।

১৩৭। **সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা।** (মাসিক) এপ্রিল ১৮৫৭

প্রকাশকাল— বৈশাখ ১৭৭৯ শক। সম্পাদক— কানাইলাল পাইন।

১৩৮। **লোক লোচন চন্দ্রিকা।** (মাসিক) জুন ১৮৫৭

প্রকাশকাল— আষাঢ় ১২৬৪। সম্পাদক— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন

দীর্ঘকাল পরে সিপাহী-বিদ্রোহকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনরায় লোপ পাইয়াছিল। ১৩ জুন ১৮৫৭ তারিখে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আইন জারি করেন: "রাজানুমতিবিরহে কোন মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করিলে অথবা রাজাভিমত বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে বা পুস্তক বিশেষে অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫০০০ টাকা দণ্ড ও দুই বৎসরের অনধিক কারাবাস করিতে হইবেক।" এই আইনের ফলে অন্তত দুইখানি পত্রিকার অপমৃত্যু হয়— রঙ্গপুরের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ -সম্পাদিত *Hindu Intelligencer*.

ইং ১৮৫৮

১৩৯। **সুবোধিনী**। (পাক্ষিক) ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮

১ মাঘ ১২৬৪ তারিখে রামচন্দ্র দিচ্ছিতের সম্পাদকতায় চুঁচুড়া হইতে ইহা প্রকাশিত হয়।

১৪০। **রচনা-রত্নাবলি**। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৫৮

প্রকাশকাল— মাঘ ১২৬৪। সম্পাদক— প্রাণনাথ দত্ত ও আরও কয়েক জন যুবক।

১৪১। **বিচারক**। (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৫৮

ইহার প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন— "বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে।" 'বিচারক' "অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত।" পাঁচ-ছয় সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক ছিলেন।

১৪২। **কলিকাতা বার্ত্তাবহ**। (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক) ১৮ জানুয়ারি ১৮৫৮

১২৬৪ সালের ৬ মাঘ ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতি সোম ও শুক্রবার বাহির হইত। "কিং চান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি মর্ম্মে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ -রচিত একটি কবিতা পত্রিকার শিরোভাগে শোভা পাইত।

১৪৩। **হিতৈষিণী পত্রিকা**। (মাসিক) মে ১৮৫৮

কলিকাতা হাড়কাটা লেনস্থ হিতৈষিণী সভার মুখপত্র। প্রকাশকাল— বৈশাখ ১২৬৫। ব্রাহ্মধর্ম ও নীতিবিষয়ক আলোচনাই ইহাতে স্থান পাইত।

১৪৪। **চমৎকারমোহন**। (ত্রিসাপ্তাহিক) আগস্ট ১৮৫৮

এই সংবাদপত্রখানি ইংরেজি ও বাংলায় প্রতি সপ্তাহে তিন বার— সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে প্রকাশিত হইত। প্রকাশকাল— শ্রাবণ ১২৬৫। সম্পাদক— 'প্রিয়ম্বদ' উপন্যাস-প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত।

১৪৫। **কলিকাতা পত্রিকা**। (মাসিক) অক্টোবর ১৮৫৮

প্রকাশকাল— কার্তিক ১৯১৫ সংবৎ। সম্পাদক— মথুরানাথ দত্ত।

১৪৬। **সোমপ্রকাশ**। (সাপ্তাহিক) ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮

১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ তারিখে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ইহার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত—

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের। রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা প্রকৃতপক্ষে 'সোমপ্রকাশে'ই প্রথম শুরু হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় "পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করতেন।"

মাতলা রেল খোলা হইলে 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাটী হইতে প্রকাশিত হইত।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি হইতে কর্মবাহুল্যের জন্য দ্বারকানাথ কিছু দিনের জন্য সম্পাদকীয় আসন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশী গমন করিলে তাঁহার ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদন করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরবর্তী ২৭ জুলাই হইতে পুনরায় সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকিউলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হইলে "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া" যায়। পরে ১৯ এপ্রিল ১৮৮০ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা" 'সোমপ্রকাশ' "নব কলেবর ধারণ করিয়া··· কলিকাতা মৃজাপুর দপ্তরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত" হয়।

২২ আগস্ট ১৮৮৬ তারিখে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যু হয়।

ইং ১৮৫৯

১৪৭। **পূর্ণিমা।** (মাসিক) ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

ইহা প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— "সন ১২৬৫ সাল। ৬ ফাল্গুন মাঘী পূর্ণিমা"। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী

'পূর্ণিমা'র সম্পাদক ছিলেন। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

১৪৮। **হিতবিলাসিনী পত্রিকা।** (মাসিক ?) এপ্রিল ১৮৫৯

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি সিমুলিয়া হরি ঘোষের স্ট্রীটে 'হিতবিলাসিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা হইতে 'হিতবিলাসিনী পত্রিকা' বাহির হইত।

১৪৯। **ভারতবর্ষীয় সভা। মাসিক বিজ্ঞাপনী।** মে (?) ১৮৫৯

এই মাসিকপত্রখানি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র ছিল।

১৫০। **সৌদামিনী।** (অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক) ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯

ইহা প্রতি মঙ্গল ও শনিবার প্রকাশিত হইত। শ্যামাচরণ সান্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার ইহার সম্পাদক ছিলেন। "সৌদামিনী পত্রিকা সংস্থাপিতা করণের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে রাজনীতি, সমাচার, আত্মতত্ত্ব, নীতিমালা বিশেষতঃ কবিতাই বিস্তর প্রকাশিত হইবেক।"

১৫১। **সংবাদ দ্বিজরাজ।** (সাপ্তাহিক) ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯

'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন— গোঁসাইদাস গুপ্ত। এই সাপ্তাহিক পত্রখানির কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত—

> নাস্তং যাত্যরুণোদয়ে নচ রুচিং ধত্তে খরাম্ভাস্করান্নোল্লাসং কুমুদাকরস্য কুরুতে কলঙ্কানেবাঙ্কিতাঃ।
>
> সম্প্রত্যুম্মদয়ন্ মনাংসি মহতাং ভাবান্ সমুদ্ভাবয়ন্নুদ্গাচ্ছন্ দ্বিজরাজ এষ নিতরামব্যাজমুদ্ভ্রাজতে।

'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রের অভাব পূরণার্থ ই 'সংবাদ দ্বিজরাজ' পত্রের আবির্ভাব। "সংবাদ প্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে প্রকার সাধুরঞ্জন পত্র ছিল এই দ্বিজরাজ পত্রও সেই প্রকার হইবেক।"

ইং ১৮৬০

১৫২। মঙ্গল উষা। (মাসিক ?) ইং ১৮৬০

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন—"১২৬৬ সালের···শেষভাগে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়, কবি তাহার 'মঙ্গল উষা' নাম ও প্রচার-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া লেখক হয়েন।"

১৫৩। সত্যপ্রদীপ। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬০

শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র। প্রকাশক— খ্রীষ্টান্ ভার্নাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 'সত্যপ্রদীপ' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

১৫৪। রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ। (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৮৬০

এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশিত হইলে, ১৮ মে ১৮৬০ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন—

> জিলা রঙ্গপুর কাকিনীয়া ভূগোলক বাটীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরীর সাহায্যে ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাস অবধি দিক্প্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

'রঙ্গপুর দিক্প্রকাশে'র প্রথম সম্পাদক— মধুসূদন ভট্টাচার্য।

১৫৫। জ্ঞানচন্দ্রিকা। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৬০

সম্পাদক— বলাইচাঁদ সেন।

১৫৬। কবিতাকুসুমাবলী। (মাসিক) মে ১৮৬০

১৭৮২ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ঢাকা বাঙ্গলাযন্ত্র হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। "বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ

কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য"। 'কবিতাকুসুমাবলী'র কণ্ঠদেশে এই শ্লোকটি থাকিত—

সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্তমধুব্রতান্।
নানারসসমাকীর্ণা কবিতাকুসুমাবলী ॥

'কবিতাকুসুমাবলী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল— "২০ ভাদ্র বুধবার ১৭৮৩ শক।"

১৫৭। **মনোরঞ্জিকা।** (মাসিক) জুন ১৮৬০

ঢাকা হইতে প্রকাশিত ইহা দ্বিতীয় সাময়িক পত্র। ২ জুলাই ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন—

মনোরঞ্জিকা।—বর্ত্তমান আষাঢ় [১২৬৭] মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবকসম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।...

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইহার একজন সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১৫৮। **মনোহর।** (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৬০

সম্পাদক— উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৫৯। **নবব্যবহার সংহিতা।** (মাসিক...) আগস্ট ১৮৬০

ঢাকা সদর আমীন আদালতের উকিল রামচন্দ্র ভৌমিক "নানাবিধ আইন ও সরকুলর অর্ডর" সম্বলিত এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশ করেন।

১৬০। **রাজপুর পত্রিকা।** (মাসিক ?) সেপ্টেম্বর ১৮৬০

১৬১। **বিজ্ঞান কৌমুদী।** (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬০

জগমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন। "বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাই এতৎপত্র প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

১৬২। **ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী**। (মাসিক) ইং ১৮৬০

ইহা ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন— কৈলাসচন্দ্র সরকার।

১৬৩। **সংস্কার সংশোধিনী**। (মাসিক) ইং ১৮৬০

বিক্রমপুরান্তর্গত কুকুটীয়াস্থ জ্ঞানমিহির বিকাশিনী সভা হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন— কুকুটীয়া মধ্য-বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার।

ইং ১৮৬১

১৬৪। **ঢাকাপ্রকাশ**। (সাপ্তাহিক) ৭ মার্চ ১৮৬১

ইহাই ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ২৫ ফাল্গুন ১২৬৭। প্রথমাবধি ৪র্থ বৎসর ২২ সংখ্যা পর্যন্ত 'ঢাকাপ্রকাশে' কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নাম "প্রকাশক"-রূপে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন ; তাঁহার অনেক রচনা এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ও অনেক দিন 'ঢাকা-প্রকাশ' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৬৫। **বঙ্গ হিতার্থিনী**। (সাপ্তাহিক ?) মে ১৮৬১

সম্পাদক— শিবকৃষ্ণ দত্ত।

১৬৬। **ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র**। (পাক্ষিক) মে ১৮৬১

ইহাতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় স্থান পাইত। রত্নাবলীর মর্মানুবাদক তারকচন্দ্র চূড়ামণি ইহা সম্পাদন করিতেন।

১৬৭। **পরিদর্শক**। (দৈনিক) জুলাই ১৮৬১

এই দৈনিক পত্রখানি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদকত্বে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১৪ নবেম্বর ১৮৬২ তারিখ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার কলেবরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রধানত গ্রাহকগণের অনাদর-জন্য কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

১৬৮। **সুধাকর**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৬১

এই সমাচারপত্রখানি খুব সম্ভব ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক— মথুরানাথ তর্কভূষণ।

১৬৯। **যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল**। (সাপ্তাহিক ?) ইং ১৮৬১

'রসরাজে'র সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' নামে একখানি সাময়িকপত্র— খুব সম্ভব সাপ্তাহিক— ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়।

১৭০। **শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা**। ইং ১৮৬১

ইহা কলুটোলার শ্রীচৈতন্যসভার মুখপত্র। "উপদেশক" বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত বাবাজি এই পত্রিকার শেষাংশে লিখিতেছেন—"সর্ব্ববেদান্ত সম্মত চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যা করণাশয়ে প্রথমত সংক্ষেপ সূচনা করিলাম···।"

১৭১-৭২। **গদ্যপ্রসূন**। **গদ্যমাসিক**। ইং ১৮৬১ (?)

কেদারনাথ মজুমদার পূর্ববঙ্গের এই দুইখানি সাময়িকপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এ দুইখানি মাসিকপত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

ই ১৮৬২

১৭৩। **শিল্প কল্প লতিকা**। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬২

ইহা ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি মাসিক পত্রিকা। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। "শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ দের সাহায্যে" অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয়—"ইহাতে আমাদিগের অশন, আচ্ছাদন, নিকেতন ও ভ্রমণানুকূল দ্রব্যের উৎপাদনে আবশ্যক যন্ত্র ও কৌশল ; এবং সুখ ও চমৎকারিতা সাধন বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করণের প্রথা, এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য প্রকরণ, ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া, এবং দেশীয় কারখানায় যে রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া লেখা যাইবে।"

'শিল্প কল্প লতিকা'র প্রথম চারি সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি। ১২৬৯ সালে ইহার কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

১৭৪। **বিশ্বমনোরঞ্জন**। (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৬২

১২৬৮ সালের মাঘ মাস হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে ধনসিন্ধু যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন··· নবকিশোর সেন।

১৭৫। **মঙ্গলোদয়**। (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৮৬২

'মঙ্গলোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১২৬৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত। কলিকাতা বহুবাজারের ভূম্যধিকারী ব্রজগোপাল ও নন্দগোপাল মতিলাল ইহার

প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি স্থান পাইত—

বার্ত্তয়াভিনবয়া প্রমোদয়ন্ দর্শয়ন্ নব নব মহোৎসবং।
অঞ্জসা প্রকটিতার্থসঞ্চয়ঃ সন্নৃণাং ভবতু মঙ্গলোদয়ঃ।

১৭৬। **শুভকরী পত্রিকা।** (মাসিক) ১২ মে ১৮৬২

১৭৮১ শকাব্দের ১৯ চৈত্র বালীগ্রামে শুভকরী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা বা সুমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর উদ্দেশ্য নহে—যতদূর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন; ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান; ও দরিদ্র বালকদিগের অধ্যয়নার্থ আনুকূল্য বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরীর মুখ্য অভিপ্রায়।" ইহার দুই বৎসর পরে এই সভাকর্তৃক 'শুভকরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ৩০ বৈশাখ ১২৬৯ তারিখে প্রকাশিত হয়।

'শুভকরী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন— উত্তরপাড়া গবর্মেণ্ট পাঠশালার প্রধান শিক্ষক রামসদয় ভট্টাচার্য। প্রতি সংখ্যা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইত। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয়—"শুভকরী নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং উহার মূল্য স্বরূপ যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইবে, সভার উদ্দেশ্য সাধনেই তাহা ব্যয়িত হউক।···পত্রিকা প্রচার করণের পূর্ব্বে আমরা এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমাদিগের পত্রিকাখানি সংবাদপত্র হইবে না; উহা কেবল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পূর্ণ থাকিবে। তদনুসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর··· আগামী মাস হইতে প্রধান২ কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠ অধিকার করিয়া লইবে।"

তিন বৎসর চলিবার পর 'শুভকরী পত্রিকা' বন্ধ হইয়া যায়।

১৭৭। **চিত্তরঞ্জিকা**। (মাসিক) ১৪ মে ১৮৬২

'চিত্তরঞ্জিকা' ঢাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯। ঢাকা কলেজের তৎকালীন ছাত্র সারদাকান্ত সেন ইহার প্রকাশক। অনেকে বলেন, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। সম্ভবতঃ 'কবিতাকুসুমাবলী' বন্ধ হইয়া গেলে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ—"নূতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।··· বিবিধ ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও প্রকাশিত হইবে।··· গদ্য রচনায় এবং অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না।"

১৭৮। **অমাবস্যা**। (মাসিক) জুন ১৮৬২

প্রকাশকাল— আষাঢ় ১২৬৯।

১৭৯। **বঙ্গোজ্জ্বল**। (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৬২

১৮০। **ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা**। (সাপ্তাহিক) জুন ১৮৬২

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক— রামচন্দ্র ভৌমিক। আয়ু— এক বৎসর।

১৮১। **অবকাশরঞ্জিকা**। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬২

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে 'অবকাশরঞ্জিকা' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত। "নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশরঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেশ্য।"

ইং ১৮৬৩

১৮২। **অমৃতপ্রবাহিণী।** (পাক্ষিক) জানুয়ারি ১৮৬৩

এই পাক্ষিক পত্রখানি যশোহর হইতে প্রকাশিত হইত। ইহাতে "বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয়" লিখিত হইত। 'অমৃতপ্রবাহিণী'র সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ বসন্তকুমার ঘোষ।

১৮৩। **সংবাদ ভারতবন্ধু।** (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৬৩

প্রকাশকাল— মাঘ ১২৬৯। ইহা বিশ্বমনোরঞ্জন যন্ত্রে মুর্শিদাবাদে মুদ্রিত হইত। পত্রিকাখানি প্রধানতঃ আদালত সংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ থাকিত।

১৮৪। **আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা।** (সাপ্তাহিক) জানুয়ারি ১৮৬৩

হাবড়ার সিবিল সার্জন ডাঃ রবার্ট বার্ডের সাহায্যে এ পত্রিকা প্রচারিত হইত। সম্পাদক— বংশবাটী নিবাসী দ্বারকানাথ দাস।

১৮৫। **রহস্য-সন্দর্ভ।** (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র ১৯১৯ সংবতের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। "পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশ্যে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত"। ইহার ৬ষ্ঠ পর্ব ৬ষ্ঠ সংখ্যা (৬৬ খণ্ড) পর্যন্ত অতীব কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া রাজেন্দ্রলাল "অবকাশাভাবপ্রযুক্ত" অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রাণনাথ দত্ত 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তিনি ১২৭৮ সালে দুই সংখ্যা (৬৭-৬৮ খণ্ড) এবং ১২৭৯ সালে দশ সংখ্যা (৬৯-৭৮ খণ্ড) প্রকাশ করিয়া সপ্তম পর্ব্ব শেষ করেন। ১২৮০

সালের বৈশাখ মাসে 'রহস্য-সন্দর্ভ' "নবপর্ব্বাবলী" বাহির হয়; ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল।

১৮৬। গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা। (মাসিক…) এপ্রিল ১৮৬৩

১২৭০ সালের বৈশাখ মাসে কুমারখালি বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার অপ্রকাশিত ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—"গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া…গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার কার্য্য আরম্ভ করিলাম।" পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত, শ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত—

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা॥

১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে পাক্ষিক পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

নানা কারণে এই পত্রিকাখানি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র ঊনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। জলধর সেন, প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পরিচালনে ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' পুনরায় প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে।

১৮৭। অবোধ-বন্ধু। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৬৩

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই মাসিকপত্রখানি চোরবাগান স্কুল বুক যন্ত্র হইতে প্রকাশ করেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহার প্রচার বন্ধ থাকে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাস হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পুনঃপ্রকাশিত হয়। কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী এই পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার অনেক রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষের ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে বিহারিলাল এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। তাঁহার সম্পাদনকালে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অনেক রচনা 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ "পৌল ভর্জ্জীনী"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'অবোধ-বন্ধু' তৃতীয় ভাগ (বৈশাখ-চৈত্র ১২৭৬) পর্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত—

> করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
> পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥

১৮৮। সাহিত্য সংক্রান্তি। (মাসিক) ১৩ মে ১৮৬৩

'পূর্ণিমা' বন্ধ হইয়া যাইবার পর বিহারিলাল চক্রবর্তী ও তদীয় বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ উভয়ে মিলিয়া 'সাহিত্য সংক্রান্তি' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা প্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। 'সাহিত্য সংক্রান্তি'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭০।

১৮৯। ভারত পরিদর্শন। (সাপ্তাহিক) ১৫ জুন ১৮৬৩

২ আষাঢ় ১২৭০ তারিখে শান্তিপুর হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ তর্কভূষণ। পরবর্তী ৯

নবেম্বর তারিখ হইতে 'ভারত পরিদর্শন' কালীপ্রসন্ন সিংহের চিৎপুরস্থ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা প্রায় এক বৎসর জীবিত ছিল।

১৯০। **ঢাকাদর্পণ**। (সাপ্তাহিক) জুলাই ১৮৬৩

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র অকালমৃত্যু ঘটিলে, ইহার অভাব পূরণ করিবার জন্য 'ঢাকাদর্পণ' প্রকাশিত হয়। হরিশ্চন্দ্র মিত্র এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

১৯১। **বামাবোধিনী পত্রিকা**। (মাসিক) আগস্ট ১৮৬৩

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে কলিকাতার বামাবোধিনী সভার কার্যালয় হইতে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।" 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করিতেন— মজিলপুরের উমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁহার মৃত্যুর (৪ আষাঢ় ১৩১৪) পরও পত্রিকাখানি ১৩২৯ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল।

১৯২। **উদ্যোগবিধায়িনী**। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৩

এই পত্রিকাখানি পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভার মুখপত্র ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের ডায়েরিতে প্রকাশ—"পাবনা হইতে তৎকালের কালেক্টারের মহরার বরদাকান্ত গুপ্তের লেখনীতে ও পাবনাবাসী তীর্থনাথ সাহা প্রভৃতির উদ্যোগে 'উদ্যোগবিধায়িনী'··· প্রচার হইয়াছিল।"

১৯৩। **সচিত্র ভারত সংবাদ।** (পাক্ষিক) ৩০ নবেম্বর ১৮৬৩

প্রকাশকাল— ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭০।

"এই পত্র প্রতি মাসের ১৫ই ও ৩০শে তারিখে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে দেশহিতৈষি ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও জীবনচরিত্র এবং সচিত্র গল্প সকল ও পুরাবৃত্ত এবং পাক্ষিক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদাবলী এবং অপরাপর ঘটনার সারমর্ম্ম (যাহা পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে) তদ্বিষয় সকল সুললিত চলিত বঙ্গভাষায় লিখিত হইবেক,…।"

ইং ১৮৬৪

১৯৪। **রচনাবলী।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৪

ইহা রঙ্গপুর কাকিনিয়া হইতে ১২৭০ সালের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯৫। **কাব্যপ্রকাশ।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৪

১২৭০ সালের মাঘ মাসে ঢাকা হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। ইহাতে কাব্য, নাটক-প্রহসন, আখ্যায়িকাদি স্থান পাইত। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি থাকিত—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

১৯৬। **পাবনাদর্পণ।** (মাসিক) মার্চ ১৮৬৪

১২৭০ সালের ফাল্গুন মাসে পাবনা হইতে এই মাসিকপত্র প্রচারিত হয়। সম্পাদক—রামসুন্দর রায় ও কাশীনাথ মিশ্র। "ইহাতে কাব্য নীতি ও বিবিধ সংবাদ লিখিত" হইত।

১৯৭। **শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার**। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৬৪

১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে 'শিক্ষা দর্পণ ও সংবাদসার' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। "এই পত্র হুগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা সেই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়।" প্রত্যেক সংখ্যায় "সংবাদসার" নাম দিয়া দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত।

১২৭৪ সালের পৌষ সংখ্যা হইতে 'শিক্ষা দর্পণ' ও 'বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা' সম্মিলিত হইয়া পত্রিকার নামকরণ হয় 'শিক্ষা দর্পণ। ও মাসিক পত্রিকা।'

৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮ তারিখ হইতে ভূদেববাবু 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা 'শিক্ষা দর্পণে'র প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবত এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রচার রহিত করেন।

১৯৮। **ধর্ম্মপ্রচারিণী**। (মাসিক) মে ১৮৬৪

"যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়" এই উদ্দেশ্যে ১২৭১ সালের গোড়ার দিকে বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারিণী নামে একটি সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভার মুখপত্রস্বরূপ ১২৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'ধর্ম্মপ্রচারিণী' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ গুহ।

১৯৯। **হিন্দু ইণ্টারপ্রীটার**। (পাক্ষিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৪

Hindoo Interpreter দ্বিভাষিক (ইংরেজি-বাংলা) পত্র ছিল। ইহা পাক্ষিক ("Bi-monthly") এবং "More a politico ethical magazine" ছিল বলিয়া জানা যায়।

২০০। **ধর্ম্মতত্ত্ব**। (মাসিক···) অক্টোবর ১৮৬৪

১৭৮৬ শকের কার্তিক মাস হইতে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’র আদর্শে ‘ধর্ম্মতত্ত্ব’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। “ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, সামাজিক উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি, নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা, সাধুদিগের জীবন, বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক হইতে সত্যধর্ম্ম প্রতিপাদক ভাব ; এই সমুদায় ঐ পত্রিকার লেখ্য বিষয়।” মাসিক ‘ধর্ম্মতত্ত্ব’ দ্বিভাষিক পত্র ছিল ; ইহাতে বাংলা অংশ ছাড়া কয়েক পৃষ্ঠা ইংরাজিও থাকিত। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নাই। ইহা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না।

১৭৯০ শকে ‘ধর্ম্মতত্ত্ব’ নূতন আকারে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। তৃতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা (১ মাঘ, ১৭৯১ শক) পত্রিকার গোড়ায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

> “ধর্ম্মতত্ত্ব। ‘পাক্ষিক’ ধর্ম্মতত্ত্ব অদ্য দয়াময়ের প্রসাদে এক বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল।...”

এই সংখ্যায় পত্রিকার শিরোভূষণস্বরূপ নিম্নের শ্লোকটি মুদ্রিত হইয়াছে—

> সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
> চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
> বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
> স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

এই শ্লোকটি অদ্যাবধি পাক্ষিক ‘ধর্ম্মতত্ত্বে’র কণ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে।

২০১। **পরিদর্শন**। (মাসিক) ডিসেম্বর ১৮৬৪

১৫ জুন ১৮৬৩ তারিখে যদুনাথ তর্কভূষণের সম্পাদকত্বে ‘ভারত পরিদর্শন’ নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ইহার প্রচার রহিত হয় এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের

শেষাশেষি মাসিক আকারে 'পরিদর্শন' নামে চিৎপুর পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়।

২০২। **ভারতরঞ্জন**। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৬৪

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আজিমগঞ্জ হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' প্রকাশিত হয়— এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা 'ভারতরঞ্জন' নামে প্রকাশিত হয়। নবকিশোর সেন ইহারও স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

ইং ১৮৬৫

২০৩। **সত্যান্বেষণ**। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৫

বৌবাজার ব্রহ্মোপাসনালয় হইতে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশিত হইত। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ— "নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ বা অনুশীলন থাকিলে ইহা সাধারণের প্রীতিকর হইবে না, আশঙ্কায় আমরা এই পত্র ধর্ম্ম্য প্রস্তাবের সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপূরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি,…।"

২০৪। **বিজ্ঞাপনী**। (সাপ্তাহিক) মার্চ ১৮৬৫

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বালিয়াটী-নিবাসী গিরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী ঢাকায় 'ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। পর বৎসর মার্চ মাসে এই যন্ত্রালয় হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও ঢাকা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনে 'বিজ্ঞাপনী' একখানি উচ্চ শ্রেণীর সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর

'বিজ্ঞাপনী' জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর সম্পাদকত্বে ময়মনসিংহ হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে।

২০৫। **হিন্দু হিতৈষিণী**। (সাপ্তাহিক) এপ্রিল ১৮৬৫

১২৭২ সালের বৈশাখ মাসে ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্রস্বরূপ 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র। 'হিন্দু হিতৈষিণী' ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

২০৬। **রাজনীতি সংগ্রহ**। (সাপ্তাহিক) ১৭ এপ্রিল ১৮৬৫

১২৭২ সালের ৬ই বৈশাখ কলিকাতা ভবানীপুর হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি রামগোপাল বসু মল্লিকের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সাধারণের উপকারজনক বহু বিষয় স্থান পাইত। 'রাজনীতি সংগ্রহ' দুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

২০৭। **বিদ্যোন্নতিসাধিনী**। (মাসিক) জুন ১৮৬৫

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে "বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভা" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠাতা সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার চৌধুরী ও হরচন্দ্র চৌধুরী। সভার মুখপত্রস্বরূপ 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৭২ সালের আষাঢ় মাস হইতে প্রকাশিত হয়। "ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম, ও দেশোন্নতি সাধনই··· এই পত্রিকার উদ্দেশ্য" ছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র চৌধুরী। 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' এক বৎসর চলিয়াছিল।

২০৮। **সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী**। (ত্রৈমাসিক) জুলাই ১৮৬৫

জোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ১২৭২ সালের শ্রাবণ মাসে এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

২০৯। **হিন্দুরঞ্জিকা।** (মাসিক···) ডিসেম্বর ১৮৬৫

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য যেমন কয়েকখানি সাময়িক পত্রের উদ্ভব হইয়াছিল তেমনই আবার ব্রাহ্মধর্মস্রোত রোধ করিবার জন্য কয়েকটি হিন্দু সভা-সমিতিরও সৃষ্টি হইয়াছিল। এই-সকল প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রস্বরূপ এক-একখানি পত্রিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোয়ালিয়া ধর্মসভা হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুরঞ্জিকা' অন্যতম। ইহা প্রথমে মাসিক আকারে, খুব সম্ভব, ১২৭২ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীনাথ সিংহ রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন।

১২৭৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৮) মাস হইতে সাপ্তাহিক রূপে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র নবপর্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সময় ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। "হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের সংবাদপত্রোপযোগী বিবিধ বিষয়" এই সাপ্তাহিক পত্রে স্থান পাইত। নবপর্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত—

> ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
> ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

ইং ১৮৬৬

২১০। **চিকিৎসক।** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৬

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা শ্রেণীর ছাত্রগণ চিকিৎসা-বিষয়ক এই মাসিকপত্র প্রকাশ করেন।

২১১। **সর্ব্বার্থ সংগ্রহ।** (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬

ইহা "বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান ও নীতি ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক মাসিক পত্র।"

২১২। **নব-প্রবন্ধ**। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৬

সম্পাদক— তিনকড়ি ঘোষাল। ইহা একখানি "সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশক মাসিক পত্র।" 'নব-প্রবন্ধে'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত—

সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

'নব-প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাসে শেষ হয়।

২১৩। **বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা**। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৬

১২৭৩ সালের আশ্বিন মাসে বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। পর বৎসর পৌষ মাসে ইহা ভূদেব মুখোপাধ্যায়-পরিচালিত 'শিক্ষা দর্পণ' পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'শিক্ষাদর্পণ ও মাসিক পত্রিকা' নাম ধারণ করে।

২১৪। **মুর্শীদাবাদ সংবাদসার**। (পাক্ষিক) ডিসেম্বর ১৮৬৬

এই পাক্ষিক পত্র বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত হইত।

ইং ১৮৬৭

২১৫। **তত্ত্ববিকাশিনী**। (মাসিক) ১ জানুয়ারি ১৮৬৭

ইহা "ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা"। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মের পোষকতা করণ।

২১৬। **পল্লী-বিজ্ঞান**। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৭

ঢাকার অন্তঃপাতী জৈনসার বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ১২৭৩ সালের মাঘ মাসে এই মাসিকপত্রখানি প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছেন—"যে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যা ও শিক্ষার

অভাব সে দেশ বিদ্বান্ নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে সভ্যতা নাই, সে দেশ সভ্য নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই, সে দেশ সুস্থ নয়। অতএব আমরা উল্লিখিত অভাবটী মোচনের মানসে কতিপয় বন্ধুর পরামর্শানুসারে এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতেছি।"

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র ১১শ সংখ্যা হইতে জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক আনন্দকিশোর সেন সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১২শ সংখ্যা হইতে পত্রিকার শিরোভূষণ-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি প্রকাশিত হইত—

গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
তোষিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ॥
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত॥

১২৭৫ সালে 'পল্লী-বিজ্ঞান' উঠিয়া যায় বলিয়া জানা যায়।

২১৭। **প্রত্নকম্রনন্দিনী**। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৭

প্রতি পূর্ণিমায় এই ধর্ম্মমূলক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। সম্পাদক —সত্যব্রত সামশ্রমী। সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ (এবং কোনো কোনো সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত হইত। বৈদিক ধর্মের আলোচনা বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকিত।

২১৮। **অবকাশ-বন্ধু**। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৭

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। প্রকাশকাল— আশ্বিন ১২৭৪। সম্পাদক— আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

২১৯। **নব পত্রিকা**। (মাসিক) নবেম্বর ১৮৬৭

প্রকাশকাল— অগ্রহায়ণ ১২৭৪। সম্পাদক— হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।

উল্লেখপঞ্জী

নাম	পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা
সংবাদ অরুণোদয়	৩৭, ৭৬
সংবাদ কাব্যরত্নাকর	৬৪
সংবাদ কৌস্তুভ	৭৭
সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর	৭৩
সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন	৬২
সংবাদ জ্ঞানোদয়	১০১
সংবাদ দিগ্বিজয়	৭০
সংবাদ দিনকর	১১৬
সংবাদ দিনমণি	৭৯
সংবাদ দিবাকর	৩২
সংবাদ দ্বিজরাজ	১৫১
সংবাদ নিশাকর	৪৪
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	২৮
সংবাদ প্রভাকর	১৪
সংবাদ বর্দ্ধমান	৯৮
সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	৮৮
সংবাদ বিভাকর	১০৫
সংবাদ ভারতবন্ধু	৪৩, ১৮৩
সংবাদ ভৃঙ্গদূত	৪৭
সংবাদ মনোরঞ্জন	৭১
সংবাদ মুক্তাবলী	৭৫
সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী	৩৪
সংবাদ রত্নবর্ষণ	৭৪
সংবাদ রত্নাবলী	২৪
সংবাদ রসমুদ্গার	৮৩
সংবাদ রসরত্নাকর	৯০
সংবাদ রসসাগর	৮০
সংবাদ রাজরাণী	৫২
সংবাদ শশধর	১০৬
সংবাদ সজ্জনরঞ্জন	৮৭
সংবাদ সাধুরঞ্জন	৬৭
সংবাদ সুজনবন্ধু	৬৯
সংবাদ সুজনরঞ্জন	৩৯
সংবাদ সুধাংশু	৯৭
সংবাদ সৌদামিনী	৩৩
সংস্কার সংশোধিনী	১৬৩
সচিত্র ভারত সংবাদ	১৯৩
সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী	২০৮
সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা	১২৮
সত্যধর্ম্মপ্রকাশিকা	৮২
সত্যপ্রদীপ	৯২, ১৫৩
সত্যব্রত সামশ্রমী	২১৭
সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা	৫৭
সত্যান্বেষণ	২০৩
সত্যার্ণব	৯৫
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৯
সমাচার চন্দ্রিকা	৮
সমাচার জ্ঞানদর্পণ	৫৮
সমাচার দর্পণ	২
সমাচার সভারাজেন্দ্র	১৬
সমাচার সুধাবর্ষণ	১১৭
সম্বাদ কৌমুদী	৬
সম্বাদ গুণাকর	৩১
সম্বাদ তিমিরনাশক	১০

সংস্কৃত সাহিত্যের কথা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

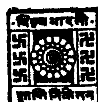
বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

সংস্কৃত সাহিত্যের কথা

শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রকাশ মাঘ ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

সূচীপত্র

সংস্কৃত ভাষা

কাল্‌চার বলতে যা বোঝায় তার বাংলা হোলো সংস্কৃতি। কাজেই সংস্কৃত ভাষা মানে কাল্‌চারড্‌ ল্যাংগোয়েজ্‌ অর্থাৎ শিক্ষিতদের ভাষা। এ-ভাষার আর এক নাম দেবভাষা। সেদিক দিয়ে তার অর্থ হয় যে-ভাষা দেবতার উদ্দেশ্যে যাগ যজ্ঞে বলা হয়। অথবা দেব মানে বিদ্বান, তাদের যে-ভাষা সে ভাষা দেবভাষা। কাজেই সেকালে যিনি এই ভাষা জানতেন না, তিনি সভ্যসমাজে কোনো রকম সম্মানই পেতেন না। তারপর এই ভাষা এদেশের ভদ্রভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এখনো পর্যন্ত এই ভাষার পঠনপাঠন সমানভাবে চলে আসছে।

আগেকার যুগে বই শুনে শুনে মুখস্থ করে রাখার নিয়ম ছিল এইজন্যে শাস্ত্রের নাম ছিল শ্রুতি, স্মৃতি। যিনি যত বই মুখস্থ রাখতে পারতেন তিনি তত পণ্ডিত বলে গণ্য হতেন আর মুখে মুখেই এই ভাষা ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। খ্রীস্টপূর্ব চারপাঁচ হাজার বছর আগেও এদেশে লেখার চলন ছিল কিন্তু সে লেখা আর্যদের নয়। তাতে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি লেখা সম্ভবপর ছিল না বলে মনে হয়। মহেঞ্জদাড়ো হরপ্পা খুঁড়ে যেসব মোহর পাওয়া গেছে তার ওপরকার লেখা এখনো পড়তে পারা যায়নি। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে অত আগেও এদেশে লেখার চলন ছিল তবুও সংস্কৃত শাস্ত্রগুলি মুখে মুখে চলত। সংস্কৃত ভাষা লেখা হয় অনেক পরে।

বইয়ের খোঁজ

সংস্কৃত লেখার চলন হবার পরেই বিদ্বানেরা নিজের নিজের মুখস্থ বই লিখে রাখেন। সংস্কৃতের নিজস্ব কোনো অক্ষর ছিল না। পণ্ডিতরা নিজের নিজের দেশের প্রচলিত অক্ষরে বই লিখতেন। সেইজন্যে যে-কোনো দেশের প্রাচীন বই দেখলেই দেখা যায় সেগুলি সে দেশের অক্ষরে লেখা।

কাশী হোলো সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। কাশীর কাছেই দেবনগর বলে একটা নগর ছিল সেখানকার অক্ষরই কাশীপ্রান্তের লোকেরা লিখে থাকেন। জর্মন পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর ঐ দেবনাগরী অক্ষরই সংস্কৃত অক্ষররূপে চালিয়ে যান, এখন সমস্ত ভারত আর তার বাইরেও ঐ অক্ষরই সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি দেবনাগরীর নাম সংস্কৃত অক্ষর হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপার এখন থেকে প্রায় একশো বছরের মধ্যে ঘটেছে।

সেকালে যানবাহনের এত সুবিধে ছিল না, আর ডাকেরও এত ব্যাপকতা ছিল না। কাজেই বিরাট ভারতবর্ষে কোথায় কোন্ পণ্ডিত কোন্ বই লিখছেন তার খবর বড়ো একটা মিলত না। অথচ সবদেশেই বই লেখা চলছিল। ইংরেজ আমলে নানাদেশের সঙ্গে খবরাখবরের সুবিধে ঘটায় ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই প্রথমে সংস্কৃত বইয়ের খোঁজ আরম্ভ করেন।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে এল্‌ফিন্‌স্টোন্ সাহেব খোঁজ করে সংস্কৃত বইয়ের যা সংখ্যা পেয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেন যে গ্রীক্ আর ল্যাটিন ভাষার সমস্ত বইয়ের মিলিত সংখ্যার চেয়ে সংস্কৃত বইয়ের সংখ্যা বেশি। কিন্তু তখন সংস্কৃত বইয়ের খোঁজ খুব কমই পাওয়া যায়।

এর আগে ১৮৩০ খ্রীঃ— ফ্রেড্‌রিশ সাহেব প্রভৃতি মাত্র সাড়ে তিনশো সংস্কৃত বইয়ের খোঁজ পান। ১৮৫২ খ্রীঃ বেবর সাহেব স্বকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় ৫০০ বইয়ের উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি ১৬০০ বইয়ের কথা লিখে যান। এই রকমে খোঁজের ফলে এল্‌ফিন্‌স্টোনের কথিত সংখ্যা বেড়ে চলেছিল।

১৮৯১ খ্রীঃ— থিয়োডোর অ্যাউফ্রেক্ট ক্যাটালোগস্ ক্যাটালোগোরাম্ নামে একখানি বড়োরকম সংস্কৃত বইয়ের তালিকা তৈরি করেন। তাতে ঐসময় পর্যন্ত যত বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায় তার নাম আছে। তার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৩২০০০ হাজারে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ নেপালে রক্ষিত অনেক অজ্ঞাত সংস্কৃত পুস্তকের সন্ধান পান। সেই সব মিলিয়ে সবসুদ্ধ সংস্কৃত বই হোলো চল্লিশ হাজারের ওপর।

এখনো আবার নতুন নতুন বই আবিষ্কৃত হচ্ছে। আর নানা জায়গায় সন্ধানও মিলছে।

সাংকৃত্যায়ন রাহুল সম্প্রতি আবার খোঁজ দিলেন যে তিব্বতে বহুতর সংস্কৃত বই রয়েছে যা এদেশে অজ্ঞাত। কাজেই মোটামুটি ধরলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সংস্কৃত বইয়ের নামধাম আমাদের হাতের কাছেই আছে।

১৮১৯ খ্রীঃ— সংস্কৃত বইয়ের প্রথম খোঁজ আরম্ভ হয়। জর্মন পণ্ডিত শ্লিগল প্রভৃতি অনেকেই উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু তখন ক-খানাই বা বই জানা গিয়েছিল।

এখনো মঠ মন্দির স্তূপের মধ্যে থেকে নতুন নতুন বই পাওয়া যাচ্ছে, এই-রকম নতুন বই ভবিষ্যতে যে কত পাওয়া যাবে তা কে বলতে পারে।

কিসের ওপর লেখা

নানা জিনিসের ওপর এইসব সংস্কৃত বই লিখিত হোত, বেশির ভাগই তালপাতার ওপর লেখা। পাঞ্জাব আর কাশ্মীর বাদে ভারতের অন্যত্র তাল-পাতাই লেখার কাজে ব্যবহৃত হোত।

উত্তর ভারতে তালপাতার ওপর কালি দিয়ে, আর দক্ষিণ ভারতে লোহার কলম দিয়ে তালপাতার ওপর অক্ষর কুঁদে তার ওপর ভুষো বুলিয়ে লেখা হোত (এখনো হয়)।

কালি দিয়ে লেখাকে লেপন, আর কুঁদে লেখাকে লেখন বলা যেতে পারে। লেপন থেকে লিপি, আর লেখন থেকে লেখা শব্দ চলিত হয়েছে।

সবচেয়ে প্রাচীন তালপাতার বই যা পাওয়া গিয়েছে তা দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দের বই। মকার্ট সাহেব কাশগর থেকে যেসব পুরোনো হাতের লেখা বই সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে একখানা চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে লেখা। প্রজ্ঞাপারমিতা রহস্য ও উষ্ণীষবিজয়ধারণী নামে ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দে এদেশে লেখা দুখানা বই জাপানে সুরক্ষিত আছে।

তালপাতা বাদে ভূর্জপাতাতে লেখার কাজ চলত। মধ্য যুগে ভূর্জপাতায় লেখা বই বেশ করে ফুঁড়ে বাঁধিয়ে রাখা হোত তারও নিদর্শন পাওয়া যায়। হিমালয়ের পাদদেশে ভূর্জপত্রই বেশি ব্যবহৃত হোত। ভূর্জপাতায় লেখা সবচেয়ে পুরোনো বই যা পাওয়া গেছে তা তৃতীয় খ্রীস্টাব্দে লেখা ধম্মপদ নামে পালি ভাষার একখানা বই।

সংযুক্তাগমসূত্র নামে একখানা বৌদ্ধ সংস্কৃত বই পাওয়া গিয়েছে সেখানা চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে লেখা অনেকে মনে করেন।

এদেশে কাগজে লেখা বই সবচেয়ে প্রাচীন যা পাওয়া গিয়েছে তা নাকি ১৩শ খ্রীস্টাব্দের। মধ্য এশিয়াতে খুঁড়ে যে সব বই পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে যেগুলি কাগজে লেখা সেগুলি চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের হওয়া উচিত এইকথা অনেকে বলেন। একথা মনে রাখা দরকার যে কাগজ চীনারা প্রথম আবিষ্কার করে, সেও আবার হাজার দুহাজার বছর আগে।

এসব ছাড়া সুতোর কাপড়ে রেশমী কাপড়ে, কাঠের পাটায়, চামড়ার ওপরে, সংস্কৃতে লেখা অনেক বই পাওয়া যায়। এইসব বই বিভিন্ন দেশের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। তারপর ছোটো বড়ো দানপত্র প্রশস্তি প্রভৃতি পাথর ইট আর সোনা রূপো তামা প্রভৃতি ধাতুর পাতের ওপর লেখা পাওয়া যায়।

বইয়ের শ্রেণীবিভাগ

বিখ্যাত পণ্ডিত উইণ্টারনিজ্ লিখছেন—"সাহিত্য শব্দের যা কিছু ব্যাপক অর্থ হোতে পারে তা সমস্তই সংস্কৃতে বর্তমান রয়েছে।" ধর্ম সম্বন্ধীয় বা ঐহিক বিষয়ের (সেক্যুলার) মহাকাব্য, গীতিকবিতা (লিরিক) নাটক, নীতি, বর্ণনাত্মক, অলংকার বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সংস্কৃতসাহিত্য ভরপুর। আপাতত আলোচনার সুবিধের জন্য নিম্নলিখিতভাবে সংস্কৃত সাহিত্যকে ভাগ করা গেল—

১। বৈদিক সাহিত্য

২। বেদাঙ্গ

৩। পুরাণ ইতিহাস

৪। ধর্ম অর্থ কাম শাস্ত্র

৫। দর্শন

৬। জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র

৭। আয়ুর্বেদ ও উপবেদ

৮। কাব্য নাটক কথা প্রভৃতি

৯। অলংকার

১০। সংকীর্ণকাব্য, টীকা টীপ্পনী

১১। নিবন্ধ

১২। তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র

১৩। বিবিধলৌকিক বিষয়

১৪। শিলালিপি ও তাম্রলিপি

এই শ্রেণীবিভাগ কতকটা কাল অনুক্রমে লেখা। আশ্চর্যের বিষয় কোন্ অজ্ঞাতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সংস্কৃতসাহিত্য ধারাবাহিকক্রমে রচিত হচ্ছে আর লোকেও আলোচনা করছে। কখনো এই ধারার বিচ্ছেদ ঘটেনি।

রিকেটে সাহেব গর্ব করে বলেছেন যে ইংরেজি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে তার ধারাবাহিকতা কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু সংস্কৃতের হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিকতার কাছে ইংরিজি সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ক-দিনের।

বৈদিক সাহিত্য

(১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত)

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ— এই চারবেদের কথা সবাই শুনেছে। সেই চার বেদ হচ্ছে— ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব।

ঋক্‌বেদ আর অথর্ববেদ বিভিন্ন দিক দিয়ে নানাবিষয়ে ভরা। এইজন্তে এর মহত্বও বেশি। সামবেদ আর যজুর্বেদের বেশি সম্বন্ধ যজ্ঞের সঙ্গে।

বেদ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে একটি কথা বলা আবশ্যক। বেদপন্থীরা বলেন বেদ কারো রচিত নয়। এমন কি ঈশ্বরও রচনা করেননি। বেদ আপনি হয়েছে। একথা অবশ্য বিশ্বাসের কথা। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একথা অস্বীকার্য, আমরা যখন ইতিহাসের পথ ধরে চলেছি তখন সব শাস্ত্রকেই তৈরি বলে মেনে নিয়ে চলেছি।

ঋগ্‌বেদের মন্ত্রগুলি কবে রচিত হয় তা নিয়ে নানা মুনির নানামত। বেশির ভাগ মনীষীই স্বীকার করেন যে খ্রীস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগেই মন্ত্র রচনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঋগ্‌বেদের সমস্ত মন্ত্র এক ছাঁদের নয়। কোথাও এর ভাষায় প্রাচীনতা কোথাও বা ভাষার নবীনতা পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন সামবেদের আর অথর্ববেদের অনেক মন্ত্র ঋগ্‌বেদের চেয়ে প্রাচীন। অথর্ববেদে লোকপ্রচলিত এমন অনেক টোটকা ওষুধের কথা আছে যা নাকি জর্মনি আর পোলাণ্ডের প্রচলিত প্রাচীন যুগের টোটকার সঙ্গে মিলে যায়।

বেদের ভাষ্য যা আজকাল প্রচলিত তা বেশিদিনকার নয়। সায়নের ভাষ্য ১৪শ খ্রীস্টাব্দে লেখা। বাঙালি পণ্ডিত নগুড়াচার্যের ভাষ্য ১০ম খ্রীঃ লিখিত। স্কন্দস্বামীর ভাষ্যও কিছু প্রাচীন। এইসব বেদের ব্যাখ্যা পরম্পরা রূপে চলে আসায় কোনো কোনো স্থলে বেদমন্ত্রের অর্থ যথাযথ খোলেনি। তবু ম্যাক্সমূলরের ভাষায় বলতেই হয়—

সায়ন ভাষ্যই বেদবিভার্থীর পক্ষে একমাত্র অন্ধের যষ্টি। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় এইসব প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনায় আরো বোধের পথ সুগম হয়েছে— একথা অস্বীকার করবার জো নেই, তাঁদের ব্যাখ্যায় কিন্তু পরস্পর যথেষ্ট বেমিল আছে। পরে আবার জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থ পাওয়া যাবার পর বেদ বুঝবার আরো সুবিধে হয়েছে। এ ছাড়া অ্যাসেরিয়া মিশর ব্যাবিলোনিয়ার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত নানা উপকরণে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাওয়া গেছে। বৈদিক সাহিত্য তিনভাগে বিভক্ত— সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ও উপনিষদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব এই চারখানি সংহিতা। এগুলিতে গদ্যে ও পদ্যে রচিত মন্ত্র আছে। যজুর্বেদ আবার কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ ভেদে দুই রকম।

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে লেখা। কচিৎ কোথাও কোথাও পদ্য আছে। কর্মকাণ্ডের ওপরেই ব্রাহ্মণ লিখিত। কখন্ কিভাবে যজ্ঞে আগুন জ্বালতে হবে, কুশ কিভাবে কোথায় রাখতে হবে, কোন্ যজ্ঞে কী আহুতি কিভাবে দিতে হবে এইসব কথাই কোথাও কারণ দেখিয়ে কোথাও বা অমনি লেখা আছে তাছাড়া ব্রাহ্মণে সেই সময়ের প্রচলিত আর লোক পরম্পরায় আগত অনেক গল্পও আছে। এইসব গল্পই পরবর্তী যুগের পুরাণ ইতিহাসের আদি পুরুষ। ব্রাহ্মণ-গুলিতে সংহিতাগুলির প্রামাণ্য মেনে নেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যায় ব্রাহ্মণের আগেই সংহিতাগুলি পূর্ণতা পেয়েছিল। এটা অবশ্য মনে করা উচিত যে সংহিতা আর ব্রাহ্মণের মাঝামাঝি আরো কিছু রচিত হয়ে থাকবে। কেননা মূল সংহিতার অনেক অংশ আর ব্রাহ্মণগ্রন্থেরও অনেকগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেইসব গ্রন্থে কী ছিল তা আর জানবার উপায় নেই। যদিচ ব্রাহ্মণগুলির প্রধান লক্ষ্য কর্মকাণ্ডের ওপর তবু এগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন, আয়ুর্বেদ প্রভৃতির অস্পষ্ট আলোচনা আছে। এই ব্রাহ্মণগ্রন্থের পর বেদের দার্শনিক ভাগ, যাতে আত্মা ঈশ্বর জীব জগৎ প্রভৃতির আলোচনা আছে।

এই দর্শনভাগের নাম আরণ্যক বা উপনিষদ্। ভারতের প্রায় সমস্ত দর্শনই এই উপনিষদ্ আশ্রয় করে উদ্ভূত। জৈন আর বৌদ্ধরা উপনিষকে স্বীকার

করেন না কিন্তু তাঁদের মতও উপনিষদে আলোচিত হয়ে খণ্ডিত হয়েছে দেখা যায়।

প্রধান ব্রাহ্মণগুলি এই— ঋগ্‌বেদের— ঐতরেয় আর শাংখ্যায়ন। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের— তৈত্তিরীয়। শুক্লযজুর্বেদের— শতপথ। সামবেদের— তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ, তলবকার বা জৈমিনীয়। অথর্ববেদের—গোপথ।

ব্রাহ্মণের শেষভাগ আরণ্যক, আরণ্যকের শেষ উপনিষদ। অরণ্য অর্থাৎ তপোবনে আলোচনা হয়েছে বলে, অথবা যজ্ঞের সময় আগুন জ্বালানোর জন্যে অরণি (আগুন জ্বালবার কাঠ) ঘষতে ঘষতে আলোচনা হয় বলে এগুলির নাম আরণ্যক, আর উপনিষদ্ মানে একত্র বসে যার আলোচনা হয় (এই কথা অনেক পণ্ডিতেই বলেন)। খ্রীস্টপূর্ব একহাজার বছর আগেই এসব সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে বলে সকলে স্থির করেছেন।

বেদ আগে চারভাগে ভাগকরা ছিল না। ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বর্তমান আকারে চার ভাগ করে যান। সেজন্য তাঁর নাম হয় বেদব্যাস অর্থাৎ বেদকে যিনি ভাগ করেছেন।

বেদাঙ্গ

(খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ বছর থেকে খ্রীস্টপর ৪০০ পর্যন্ত)

বেদ বিভাগ হয়ে যাওয়ার পর এল বেদাঙ্গযুগ। এই যুগে ঋষিদের দৃষ্টি পড়ল নানা দিকে। তার ফলে বেদাঙ্গের উৎপত্তি। বেদের অঙ্গ বেদাঙ্গ। বেদ বুঝতে গেলে এগুলির নিতান্ত দরকার। বেদাঙ্গ হোলো ছয়টি—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ আর জ্যোতিষ।

বেদপন্থীরা বেদকে স্বত উদ্ভূত বা ঈশ্বর প্রকাশিত বলেন, কিন্তু বেদাঙ্গগুলি মুনিঋষিদের রচিত কাজেই কতকগুলির রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। মুনি বা ঋষি মানে জ্ঞানী, পণ্ডিত। সেকালে সব মুখস্থ করে রাখতে হোত, বইপত্র

ছিল না। ছোটো ছোটো কথাই মুখস্থ করার পক্ষে সুবিধে। সেইজন্যে ছোটো ছোটো বাক্যে শাস্ত্রের তাৎপর্য রচিত হোত। এগুলিকে সূত্র বলে। সূত্র সবই প্রায় গদ্যে রচিত কচিৎ পদ্যেও দেখা যায়। পরে কিন্তু বড়ো বড়ো লেখাকেও সূত্র বলা হয়েছে বিশেষত জৈন বৌদ্ধ শাস্ত্রে।

এখন বেদাঙ্গগুলির মধ্যে প্রথম, শিক্ষা। তাতে আছে কোন্ অক্ষর কী ভাবে কী রকম সুরে কী রকম উচ্চারণে পাঠ প্রভৃতি করতে হয়।

অনেকগুলি শিক্ষাগ্রন্থ ছিল তার কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে কিছু পাওয়াও যায়। কতকগুলি শিক্ষা ছাপাও হয়েছে। এর মধ্যে পাণিনির শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করেছে। শিক্ষার বদলে শীক্ষা এরকম বানানও পুঁথিতে আছে।

তিনরকম সুরে বেদ পাঠ হয়, একটা উঁচু সুর, তাকে বলে উদাত্ত। আর একটা নিচু সুর তার নাম অনুদাত্ত। আর একটা মাঝারি সুর তার নাম স্বরিত।

শিক্ষার পর হোলো জ্যোতিষ। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে দিন গোনা হোত। অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ কর্তব্য। এজন্য দিন ঠিক করতে জ্যোতিষের নিতান্ত আবশ্যক। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রণেতা লগধ নামক আচার্য। ঋগ্‌বেদাঙ্গ-যজুর্বেদাঙ্গভেদে এর দুভাগ হোলেও পরস্পরে কোনো তফাত নেই। এতে ৩৬॥টি শ্লোক আছে। এখানি খুব উপযোগী বই।

পরবর্তী কালে হিন্দু জ্যোতিষ বিশেষ বিপুলতা লাভ করে। এই জ্যোতিষকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, সংহিতা, গণিত আর জাতক।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকের মত মগ (magie) থেকে সংহিতা, আর গ্রীক্‌দের কাছ থেকে জাতক নেওয়া হয়েছে। এই তিনভাগেই সংস্কৃত ভাষায় বিশাল জ্যোতিষশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। গণিতে হিন্দুগণ নিজস্ব জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। আবার কতকগুলি বিষয় এঁরা গ্রীক্‌পণ্ডিতদের কাছ থেকেও নিয়েছেন।

আর্যভট্ট, লল্ল, বরাহ-মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মুঞ্জাল আর ভাস্করাচার্য গণিত-জ্যোতিষে বিশেষ সমৃদ্ধি সাধন করেন। এখন পর্যন্ত জ্যোতিষে নানা গ্রন্থ লেখা চলছে। মহামহোপাধ্যায়দ্বয় চন্দ্রশেখর সামন্ত ও সুধাকর দ্বিবেদীর নাম বর্তমান যুগে জ্যোতিষীগণের বিশেষ স্মরণীয়।

আগে বলা হয়েছে বেদের সংহিতা ভাগে ব্রাহ্মণে আর উপনিষদেও প্রচুর পরিমাণে পদ্য আছে। কাজেই পদ্যের ধরন ধারন জানা দরকার। পদ্যকেই সাধারণত ছন্দ বলে। এই ছন্দ বোঝবার জন্যে যে সব ছন্দশাস্ত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রাচীন হোলো পিঙ্গলাচার্যকৃত ছন্দঃশাস্ত্র। কোন্ জাতের কবিতায় কত অক্ষর কত পংক্তি থাকবে, পংক্তির মধ্যে কত অক্ষরের পর থেমে আবার পড়তে হবে এইসব বিষয় এতে লেখা। এসব না জানলে পদ্য পড়া ঠিকমতো হয় না। তাই ছন্দঃশাস্ত্রও অবশ্য পাঠ্য। পিঙ্গলআচার্য কবে কোথায় থাকতেন তা জানা যায়নি। প্রাকৃতভাষাতেও একখানা পিঙ্গলছন্দ আছে। তাতে প্রাকৃত ছন্দের কথা আছে, অনেকের মত এখানি ১৪শ খ্রীস্টাব্দের আগেকার নয়।

ছন্দবিষয়ে পরে অনেক বই তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী আর কেদারভট্টের বৃত্তরত্নাকর খুব প্রচলিত বই। আধুনিক যুগে দুখভঞ্জন কবির বাগ্‌বল্লভ ছন্দ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো বই।

বৈদিক শব্দ সংগ্রহকে নিঘণ্টু বলে। প্রাচীনতম অভিধানের নিদর্শন এই নিঘণ্টু। যাস্ক আচার্য নিঘণ্টু কর্তা। এক এক বস্তুর যত নাম আছে তা একত্র করে করে এতে সাজানো। যাস্কই এই নিঘণ্টুর ওপর ভাষ্য লেখেন, তার নাম নিরুক্ত। এ দুটি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে লেখা অনেকে বলেন।

নিরুক্তে বৈদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি আছে। কোন্ শব্দ কেন বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তারও বিচার আছে। আজকালকার শব্দতাত্ত্বিকরা নিরুক্তের মতে অনেক শব্দের মানে মানেন না, তবু তাঁরা একথা একবাক্যে স্বীকার করেন যে বেদ বুঝতে গেলে নিরুক্তপাঠ অপরিহার্য।

নিরুক্তের একখানি টীকা আছে, যা ১২শ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি লেখা।

নিঘণ্টুই হোলো পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধান একথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

সংস্কৃতে এইরকম অভিধানজাতীয় বই পরবর্তী কালে অনেক রচিত হয়েছে। এর মধ্যে অমরকোষ খ্যাতিতে অগ্রগণ্য। এক এক বস্তুর নাম এগুলিতে পৃথক পৃথক ভাগে সাজানো। আবার এক অক্ষরের পরে ক— যেমন বক, দু অক্ষরের পরে ক— যেমন বালক, তিন অক্ষরের পরে ক— যেমন ক্রমেলক, এ রকম ভাবেও কথা সাজিয়ে অভিধান রচিত হয়েছে; বিশ্বকোষ আর মেদিনীকোষ তার মধ্যে বিখ্যাত। আর আয়ুর্বেদের গাছগাছড়ার নাম আর তাদের গুণের অভিধান হচ্ছে আয়ুর্বৈদিক নিঘণ্টু। তাতে বর্গীকরণ অর্থাৎ শ্রেণীভাগ এমন সুন্দর যা আধুনিক বিজ্ঞান মতেও মেলে।

কল্পসূত্র তিন রকমের— শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। আশ্বলায়ন প্রণীত শ্রৌতসূত্র বেদাঙ্গে প্রধানভাবে নিবিষ্ট। শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যজ্ঞের বিধান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রৌতসূত্রকে অবলম্বন করে অনেকগুলি বই লেখা হয়েছে ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দ থেকে দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণাদির নিত্যনৈমিত্তিক কাজের কথা আর বিধান আছে। এই ধর্মসূত্রকে অবলম্বন করে— ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহুবিধ পুস্তক রচিত হয়েছে। আপস্তম্ব গৌতম প্রভৃতির লেখা ধর্মসূত্র মান্য। পরবর্তীযুগের স্মৃতি সংহিতা, স্মৃতির টীকা প্রভৃতি নিয়ে এই বিভাগের বহু প্রচার ঘটেছে। স্মৃতিগুলির অবলম্বন প্রধানভাবে ধর্মসূত্র, আর অংশত শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। এর মধ্যে কতক হচ্ছে প্রাচীন কতক হচ্ছে নবীন।

গৃহ্যসূত্রে দ্বিজগণের উপনয়নাদি সংস্কার প্রভৃতির বিধান আছে। সে যুগের সামাজিক আদর্শ অবস্থা বুঝতে হোলে গৃহ্যসূত্র পাঠ অবশ্য কর্তব্য উইণ্টার্নিজের মতো নৃতত্ত্ববিদগণেরও গৃহ্যসূত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রাচীন গ্রীক্ রোমানদের বিধিব্যবস্থা জানবার জন্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের

নানাস্থান থেকে বিক্ষিপ্ত বিষয় একত্র করতে হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিধিব্যবস্থা এক গৃহ্যসূত্র থেকেই জানা যায়।

শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্র ছাড়া আর-একরকম সূত্র আছে যাকে বলে শূল্বসূত্র। এগুলি শ্রৌতসূত্রের সঙ্গে যুক্ত। এতে যজ্ঞবেদির মাপ, আকার ও নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণ দাবি রাখেন এই শূল্বসূত্রে যে রেখা গণিতের অর্থাৎ জিওমেট্রীর বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করা হয়েছে তা পৃথিবীর প্রাচীনতম।

এইবার আসছে ব্যাকরণের কথা। ব্যাকরণ হচ্ছে শব্দগঠন, ও ভাষা নিয়ন্ত্রণের শাস্ত্র। খুব প্রাচীনকালে প্রাতিশাখ্য নামে প্রত্যেক বেদের ভিন্ন ভিন্ন বই ছিল। তাতে কোন্ বেদে কোন্ শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে, স্বর সঞ্চার, সন্ধি প্রভৃতি অনেক কথাই বলা আছে। প্রাতিশাখ্যকে ব্যাকরণের আদিরূপ বলা যেতে পারে। পরে রীতিমতো সাজিয়ে ব্যাকরণ তৈরি হয়। বর্তমানে ব্যাকরণের সবচেয়ে প্রাচীনতম আচার্য পাণিনি। চতুর্থ খ্রীস্টপূর্ব শতাব্দীতে ইনি গান্ধার (কাবুল) প্রদেশে শালাতুর গ্রামে জন্মান। এঁর মার নাম ছিল দাক্ষী। এঁর লেখা অষ্টাধ্যায়ীসূত্র সর্বত্র বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপের পণ্ডিতগণও বলেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে এমন পরিপূর্ণ একখানি ব্যাকরণ আজ পর্যন্ত কেউ লেখেননি। অষ্টাধ্যায়ীতে ৩৮৬৩টি সূত্র আছে। তার ওপর কাত্যায়ন শোধন আর সংযোজন করে বার্তিক লেখেন। সূত্র আর বার্তিক মিলালে সংখ্যা হয় প্রায় ৫১০০র ওপর। এই সূত্র বার্তিকের ওপর পতঞ্জলি প্রায় খ্রীস্ট-পূর্ব ১৫০ অব্দে বিখ্যাত মহাভাষ্য লেখেন। এই মহাভাষ্যকে ফণিভাষ্যও বলে। কেননা পতঞ্জলিকে তখনকার লোকে শেষনাগের অবতার বলে মনে করত। আপিশলি, শাকল্য, গার্গ্য প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ পাণিনির আগেকার। এঁদের নাম পাণিনির সূত্রে আছে। এঁদের কোনো বই এখনো পাওয়া যায়নি।

পাণিনিব্যাকরণের ওপর পঞ্চাশ ষাটখানির বেশি টীকাটীপ্পনি আছে। পরবর্তী যুগে পাণিনিব্যাকরণের আধারে অনেকে ব্যাকরণ লেখেন কারণ

পাণিনি বড়ো কঠিন, সেজন্যে ব্যাকরণকে সরল ও সহজবোধ্য করবার দরকার হয়। পাণিনির ওপর এখনো পর্যন্ত ব্যাখ্যা রচিত হচ্ছে।

পাণিনি ছাড়া অন্য প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ হচ্ছে— কলাপ (২য় খ্রীঃ) চন্দ্র (৬ষ্ঠ খ্রীঃ) জিনেন্দ্র (৮ম খ্রীঃ) সংক্ষিপ্তসার (৯ম খ্রীঃ) সারস্বত (১১শ খ্রীঃ) সুপদ্ম, হেমচন্দ্র (১২শ খ্রীঃ) মুগ্ধবোধ (১৩শ খ্রীঃ), ভট্টোজী দীক্ষিতের প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদী নামে পাণিনির ব্যাখ্যা ভারতে বর্তমানকালে সবচেয়ে লোকপ্রিয় আর বেশি প্রচলিত।

পুরাণ ইতিহাস

(খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৪০০ পর্যন্ত)

পূর্বোক্ত কালকে সূত্রযুগ বলা যেতে পারে কেননা তখন সব শিক্ষণীয় বিষয় সূত্রাকারেই রচিত হোত। এর পর একরকম ছন্দ খুব লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে এই ছন্দের নাম অনুষ্টুভ্। সাধারণে শ্লোক নামে প্রসিদ্ধ। এক এক লাইনে আটটি করে অক্ষর। চার লাইনের ছন্দ। এই রকম—

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্,
দ্বিচতুঃপাদয়োর্ হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ

পুরাণ ইতিহাসের বারো আনা ভাগই এই ছন্দে লেখা।

পুরাণে সৃষ্টির কথা বড়ো বড়ো রাজবংশের কথা, ধর্ম কর্ম ব্রত নিয়মের কথা আছে। বৈদিকযুগে কোনো প্রাচীন গল্প বলবার সময় "ইতি হ আস" অর্থাৎ এইরকম ছিল— বলে গল্প আরম্ভ করা হোত। তার থেকে প্রাচীন কোনো গল্প বা কাহিনীর নাম ইতিহাস হয়েছে। উপনিষদ্ আর ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেক প্রাচীন ইতিহাস বা গল্প রয়েছে। এখন এইজাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন রামায়ণ আর মহাভারত। রামায়ণ বাল্মীকি আর মহাভারত বেদব্যাস রচনা

করেন। আজকাল আমরা যে রামায়ণ মহাভারত হাতে পাই তা এক সময়ের লেখা নয়। সেই প্রাচীন লেখার সঙ্গে অনেক অপ্রাচীন লেখার যোগ হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এইরকম যোগ হোতে হোতে রামায়ণ মহাভারতের রূপান্তর ঘটেছে। রামায়ণ কাব্যাংশে আর মহাভারত সাহিত্যাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কাব্য বলতে এখানে কেবল রসকে আর সাহিত্য বলতে বিজ্ঞান নীতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত যোগকে লক্ষ্য করা গেল। খ্রীস্টপূর্ব পাঁচশো বছর আগেই রামায়ণ মহাভারত বর্তমানরূপে পরিণত হয়েছিল।

মহাভারতের তিনরকম সংস্করণ দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর ভারতীয় আর মালাবারী। মালাবারের মহাভারত খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত— একথা পণ্ডিতদের স্বীকৃত। উত্তর দক্ষিণের মহাভারতের অনেক অংশ পরে যোগকরা, রামায়ণেরও ঐ দশা। পূর্ব ভারতে মধ্যভারতে আর পশ্চিম ভারতে তার প্রকারান্তর ঘটেছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত— রামায়ণের আদিকাণ্ড আর উত্তরকাণ্ড অনেক পরে লিখে যোগ করা।

রামায়ণ মহাভারতের পরে আসে পুরাণের কথা। ভারতবর্ষে পুরাণ যে কত আছে তার ঠিক নেই। সাধারণত অষ্টাদশ মহাপুরাণ আর অষ্টাদশ উপপুরাণেরই প্রাধান্য। এই মহাপুরাণ আর উপপুরাণ নিয়েও ঢের বাদ বিবাদ আছে—মোটকথা পুরাণ নামক বা তজ্জাতীয় পুস্তক একশোর ওপরে।

পুরাণ রচনা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে তা বলা কঠিন। কেননা রচনা আর বিষয় সন্নিবেশ দেখলে মনে হয় সব পুরাণ একসময়ের রচনা নয়।

পার্জিটর সাহেব পুরাণ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন তাঁর মতে কোনো কোনো পুরাণ খ্রীস্টপূর্ব অব্দে রচিত। জ্যাকসনের মতে—খ্রীস্টপূর্ব দুশো বছর আগে পুরাণ নামে যে সব বইপত্র ছিল সেগুলি নানা সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে নানারূপ ধরেছে।

আজকালকার পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে পুরাণে এমন অনেক কথা আছে যা ঐতিহাসিক আর কতক আর্য-পূর্ব জাতির।

পুরাণ সম্বন্ধে এখনো ভালো করে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা হয়নি তবু যতটা এদেশী আর বিদেশী পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই মত যে পুরাণের মধ্যে প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপাদান যথেষ্ট রয়েছে। আর এটা প্রায় স্থির যে ৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অনেক পুরাণ পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু পরে তাতে অনেক বিষয় লিখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—মায় কুইন্ ভিক্টোরিয়ার ইঙ্গিত পর্যন্ত।

পুরাণে ভারতীয় দর্শন, ধর্মমত, আচার, বিচার সাধনার কথাতে ভরা। কাজেই সেদিক দিয়ে এর মূল্য কম নয়। জৈনরা অনেক পুরাণ লিখেছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ আর শ্রীমদ্ভাগবত সবচেয়ে প্রধান। ভাগবতের ওপর বহুতর টীকাটীপ্পনি নিবন্ধ লেখা হয়েছে। সমস্ত পুরাণই ব্যাসের নামে রচিত। ব্যাস বলতে অবশ্য অনেককে বোঝাতে পারে। তার মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই সর্বশ্রেষ্ঠ।

পুরাণ সম্বন্ধে একটা বিষয় ভাববার আছে। স্ত্রীলোক শূদ্র আর আচার-হীন ব্রাহ্মণের বেদে অধিকার নেই। তাই তাদের শাস্ত্র কথা জানাবার জন্যে পুরাণের পথ খোলা হয়েছে। পুরাণের বক্তারাও সূতজাতীয়। আজকাল গণশিক্ষা বলতে যে অর্থ আমরা বুঝি, সেই গণশিক্ষা এই পুরাণের দ্বারাই তখনো চলত এখনো চলে আসছে।

পুরাণের গল্পে অতিলৌকিক, অসম্ভব সব কথা আছে। অশিক্ষিত মানুষ সবদেশেই অলৌকিক কথায় আকৃষ্ট হয়। লোক আকর্ষণের জন্যই ঐসব কথা। সেগুলিকে নিছক সত্যি বলে মানতে কুমারিল ভট্ট নিষেধ করে বলেছেন গল্পগুলির তাৎপর্য গ্রহণ করবে, ঘটনাকে নয়।

এই পুরাণ শেষে এত জনপ্রিয় হয়ে পড়ল তাতে বেদচর্চা ঢেকে দিল

বিশেষত পুরাণপাঠকদের একটা মোটা আয়ও বাঁধা ধরা হয়ে গেল। বর্তমান কালেও পুরাণের ওপর ভারতবাসী হিন্দুর টানই বেশি। শেষে এই পুরাণ সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমান স্মৃতি নিবন্ধগুলিতে গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, ও সংহিতার বচন আর পুরাণের বচনের মধ্যে সংখ্যার তুলনা করলেই তা ধরা পড়ে।

যাই হোক সমস্ত পুরাণগুলির বিষয়বস্তু দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অষ্টাদশ মহাপুরাণ— ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ স্কন্ধ, বামন, কূর্ম মৎস্য গরুড় ব্রহ্মাণ্ড। এই মহাপুরাণ ছাড়া অনেকগুলি উপপুরাণ আছে।

ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র

ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল বৈদিক কল্পসূত্র। এই ধর্মশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র নামে খ্যাত। এগুলি পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রচিত। এগুলিও সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। মনুসংহিতাই সর্বপ্রধান, তারপর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার স্থান। কুড়িখানা সংহিতা নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্র। এগুলিকে প্রাচীনস্মৃতি বলে। নব্যস্মৃতির কথা নিবন্ধ অধ্যায়ে বলা যাবে।

বৃহস্পতি শুক্রাচার্য প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের কর্তা। রাজ্য বাণিজ্য প্রভৃতি পরিচালনা করতে হোলে অর্থশাস্ত্রের দরকার। চাণক্য বা কৌটিল্য লিখিত অর্থশাস্ত্রই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ছোটো ছোটো অর্থশাস্ত্র অনেক লেখা হয় তার অনেকগুলি লুপ্ত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়লে দেখা যায় সেকালে রাজকর্মচারী নিয়োগ, নানা বস্তুর ওপর কর নির্ধারণ প্রভৃতি বিশেষ বিধিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল।

কামশাস্ত্রের যা প্রাচীন বই মেলে তা বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্র। এর টীকা বৌদ্ধপণ্ডিত যশোধর কৃত। এতে গার্হস্থ্য সুখভোগ পারিবারিক নিয়মকানুন আলোচিত। বাৎস্যায়ন তাঁর বইয়ে অনেক প্রাচীন কামশাস্ত্রকারদের নাম

করেছেন। তাঁদের বই এখন পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে অনেক বই রচনা করা হয়েছিল। সেগুলি তত ভালো হয়নি। সেগুলির মধ্যে কক্কোক কৃত রতিরহস্য প্রামাণিক ও আদৃত। মল্লিনাথ প্রভৃতি টীকাকারেরা রতিরহস্য থেকে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন।

দর্শনশাস্ত্র

(২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮০০ পর্যন্ত)

উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে পরবর্তীকালে দর্শনশাস্ত্রে রূপান্তরিত। বেদপন্থার প্রতিদ্বন্দ্বী জৈন আর বৌদ্ধ দর্শন। তবু তার ওপর উপনিষদের প্রভাব বেশ লক্ষিত হয়। কারো কারো মতে দার্শনিক অধ্যাত্মবাদের মূল আর্যেতর জাতির। যাই হোক বর্তমানে প্রচলিত দর্শনগুলির মূল যে উপনিষদ তা অস্বীকার করবার যো নেই।

দর্শনকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সাংখ্য, মীমাংসা ও ন্যায়। নিরীশ্বর আর সেশ্বর ভেদে সাংখ্য, পূর্ব আর উত্তর ভেদে মীমাংসা, ন্যায় আর বৈশেষিক ভেদে ন্যায়কে ধরে দর্শন ছয় রকমের। এই ষড়্‌দর্শনই ভারতের গৌরব স্থল। পরে দর্শনগুলির নানা শাখা সৃষ্ট হয়েছে।

সবচেয়ে প্রাচীন দর্শন হল সাংখ্য। কপিলমুনি এর রচয়িতা। ইনি ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু স্বীকার করেননি বলে এঁর মত নিরীশ্বর। জৈন আর বৌদ্ধ মতের ওপর সাংখ্যের প্রভাব আছে একথা অনেকে বলেন।

মূল সাংখ্য সূত্রগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে গেলে তার পর বর্তমান সাংখ্য সূত্র রচিত হয়। এর ভাষ্য করেছেন, অনিরুদ্ধ আর বিজ্ঞানভিক্ষু। কিন্তু সাংখ্য মতের সবচেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ হল, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা। এখানি ৭০টি পদ্যে সম্ভবত ৫০০ খ্রীস্টাব্দে লেখা। সাংখ্যকারিকার ওপর মাঠর গৌড়পাদ, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি অনেকের ব্যাখ্যা আছে।

পতঞ্জলিমুনি যোগদর্শন লেখেন। এ মতও অনেকটা সাংখ্যের মত, এতে

ঈশ্বরকে মানা হয়েছে বলে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। যোগদর্শন পাতঞ্জলদর্শন নামেই খ্যাত। কারো মতে ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি এই দর্শন করেছেন, কারো মতে তা নয়।

পূর্ব মীমাংসা দর্শন শুধু মীমাংসা দর্শন নামে খ্যাত। ব্যাসের শিষ্য জৈমিনি এই দর্শনের কর্তা। সবচেয়ে প্রাচীন যা ভাষ্য তা এই দর্শনের— শবরস্বামীর লেখা। মীমাংসা দর্শনে বেদের প্রামাণ্য, আর যাগযজ্ঞের দ্বারাই ইষ্টলাভ হয় এই সব প্রতিপাদন করা হয়েছে। সমস্ত দর্শনের চেয়ে এই দর্শন আকারে বড়ো।

শবরস্বামীর সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট ভারতবর্ষ থেকে অবৈদিক বৌদ্ধ মত নির্মূল করে বৈদিকমত স্থাপনের চেষ্টা করেন। মীমাংসা দর্শনের প্রধান দুটো শাখা, একটা কুমারিলভট্টের আর একটা প্রভাকরভট্টের।

উত্তর মীমাংসা হচ্ছে বেদান্ত দর্শন। সমস্ত দর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর সম্মানিত। বেদব্যাস এর কর্তা। এই দর্শনের সূত্রগুলিকে ব্রহ্মসূত্র বলে। এর প্রাচীনভাষ্য হচ্ছে শংকরাচার্যের। এঁর আগেকার যা ভাষ্য তা পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত ডায়োসনের মত যে, শংকর হচ্ছেন পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের মধ্যে একজন, সে তিন জন— প্লেটো, শংকর ও ক্যাণ্ট। শংকর মতের ওপর অসংখ্য বই লেখা হয়েছে আর এখনো হচ্ছে।

শংকরের পর ভাস্কর রামানুজ মধ্ব, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, বলদেব প্রভৃতি নিজ নিজ মতের অনুযায়ী বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখেছেন। আবার এই সব বিভিন্ন মতের ভাষ্যের ওপর অজস্র ছোটো ছোটো বই লেখা হয়েছে।

এখন ন্যায় শাস্ত্রের কথা আসছে। ন্যায় আর বৈশেষিক যেন দুই ভাই, অনেকটা একরকম। অক্ষপাদ গৌতম লিখেছেন ন্যায়সূত্র, কণাদ উলূক্য লিখেছেন বৈশেষিকসূত্র। বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের আর প্রশস্তপাদ লেখেন বৈশেষিকসূত্রের ওপর ভাষ্য। এই দুই দর্শন পড়লে খুব বুদ্ধি খোলে সেইজন্য সাধারণে এই দর্শন অত্যন্ত আদর পায়।

অনেক পরে মিথিলার গঙ্গেশপণ্ডিত ন্যায় বৈশেষিককে মিলিয়ে একটা

দার্শনিক মত চালান তাকে বলে নব্য ন্যায়। এই নব্য ন্যায় বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালংকার প্রভৃতি নদিয়ার পণ্ডিতদের হাতে পড়ে নতুন রূপ ধারণ করে। আর এর উন্নতি এত হয় যে এখনো পর্যন্ত এই ধারণা— যদি নব্য ন্যায় পড়া না থাকে তবে সে হাজার সংস্কৃত জানলেও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে গণ্য নয়। মনে রাখতে হবে এই নব্য ন্যায় সৃষ্টিতে বাঙালির হাত বারো আনা। এ সম্বন্ধে যে কত বই আছে তার সংখ্যা নেই। এই নব্য ন্যায়ের ভাষাপরিচ্ছেদ আর তার টীকা সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এমন একখানি বই যে এখানি না পড়লে সংস্কৃত সাহিত্যের যে কোনো বিষয়ের বই ভালো বোঝা যায় না। এই প্রসিদ্ধ সটীক বইখানি বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন লিখে গেছেন। ১৪শ খ্রীস্টাব্দে মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে ১৬টি দর্শনের মত তুলেছেন। তার মধ্যে অবশ্য প্রধান অপ্রধান মত আছে।

অবৈদিক দর্শনকে নাস্তিক মত বলা হয়। এই মতের লোকেরা বেদ মানেন না। চার্বাক প্রভৃতি আচার্যরা আবার কিছুই মানতেন না— যতকাল বেঁচে থাকবে তত কাল যেমন করে হোক সুখে থাকবার চেষ্টা করবে এই তাঁদের মত। চার্বাকদর্শনের বইপত্র আর পাওয়া যায় না। অবৈদিকমতের যে দুটি প্রবল মত বর্তমান তা হল— জৈন আর বৌদ্ধ। এই জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে, আর বৌদ্ধরা হীনযান মহাযান ভেদে দুই রকম। কিন্তু এর মধ্যেও ছোটোখাটো অসংখ্য ভেদ আছে।

জৈনরা প্রাকৃতভাষায় আর সংস্কৃতভাষায় অনেক বই লিখেছেন। আবার বৌদ্ধরা পালিভাষা আর সংস্কৃত ভাষায় বই লিখেছেন। বিশেষ এই যে হীন-যানদের বই পালিতে আর মহাযানদের বই সংস্কৃতে লেখা। হীনযান অবশ্য মহাযান থেকে প্রাচীন। জৈনদের ভালো ভালো বই দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে লেখা। দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দে আচার্য হেমচন্দ্র এঁদের প্রধান গুরু ছিলেন। তাঁর মতো প্রতিভাশালী লোক সেযুগে আর ছিল না।

২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ মতের সংস্কৃত বই লেখা হয়

বিখ্যাত নাগার্জুন আচার্য দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান মত প্রবর্তন করেন। এই মত দেখতে দেখতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। শক আর সিথিয়ন রাজারা এই মত গ্রহণ করায় ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বৌদ্ধমত দেশ বিদেশে চলে যায়। জৈন মত অবশ্য সে রকম যায়নি। সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের কতক পালি গ্রন্থের অনুবাদ কতক আবার স্বতন্ত্র। সংস্কৃতের মধ্যেও কতক খারাপসংস্কৃতে লেখা কতক ভালো সংস্কৃতে লেখা।

সংস্কৃত বৌদ্ধ বই অনেক লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তিব্বতী আর চীনে পণ্ডিতরা বহু বইয়ের যথাযথ অনুবাদ করে রেখেছিলেন। বর্তমান কালের অনুসন্ধানের ফলে সেই সব অনুবাদ আর কিছু কিছু মূল বইয়েরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলির সংখ্যাও কম নয়। চীন তিব্বতের মঠে এখনো নানা বিষয়ের অজ্ঞাত সংস্কৃত বই বর্তমান।

এখন আবার যে সব ভালো বই লোপ পেয়েছে অথচ তার চীনে তিব্বতি অনুবাদ আছে, সেই অনুবাদ থেকে সেগুলিকে আবার সংস্কৃতে পরিণত করে ছাপাবার চেষ্টা চলছে।

আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য উপবেদ

চার বেদের চার উপবেদ। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, আর শিল্পবেদ। কেউ কেউ শিল্পবেদের বদলে তন্ত্রশাস্ত্রকে বসান।

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদ। অথর্ববেদে গাছগাছড়ার প্রচুর বর্ণনা আছে। এই আয়ুর্বেদের আটটি ভাগ বা অঙ্গ। অর্থাৎ আয়ুর্বেদ অষ্টাঙ্গ। সেগুলি এই—

শল্য—Major surgery

শালাক্য—Minor surgery

কায় চিকিৎসা

ভূতবিদ্যা—Demonology

কৌমারভৃত্য—শিশু চিকিৎসা

অগদ তন্ত্র—Toxicology

রসায়ন তন্ত্র—Elixirs

বাজীকরণ—Aphrodisiacs

খ্রীস্টপূর্বাব্দেই এই সব অঙ্গের ওপর বড়ো বড়ো বই লেখা হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি বইয়ের কেবল নামই পাওয়া যায়। মূল বই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরে চরক আর সুশ্রুত প্রাচীন বইয়ের সার সংকলন করে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুখানা বই আজ পর্যন্ত সমস্ত জগতের পণ্ডিতদের দ্রষ্টব্য পুঁথির মধ্যে গণ্য।

চরকের কথা বৌদ্ধ চীনে বইয়েতে আছে। চরক মহারাজ-কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন (খ্রী ১ম শঃ)। সুশ্রুত এঁর পরেকারই লোক, সেণ্টাল এশিয়াতে কাশগড়ে পাওয়া পুঁথিপত্রে চরক সুশ্রুতের নাম পাওয়া গিয়েছে। ভেলসংহিতা নামে আরো একখানা বই পাওয়া গিয়েছে। চরক সুশ্রুতের পরেই বাগ্‌ভট পণ্ডিতের অষ্টাঙ্গহৃদয়। এই তিনখানা বৃহত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধ। পরে অসংখ্য বই আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে আর হচ্ছে

তিব্বতে প্রাচীন আয়ুর্বেদের অনুবাদ করা অনেক বই আছে যার মূল গ্রন্থ লুপ্ত।

এর পর গান্ধর্ববেদ অর্থাৎ সংগীতশাস্ত্র আর শিল্পবেদ অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্ম শাস্ত্রের যেসব বই পাওয়া যায় তা খুব বেশি দিনকার নয়। তবে বীণা প্রভৃতির নাম লাট্যায়ন শ্রৌত সূত্রে আছে। শিল্পের বই ক্রমে ক্রমে দুএকখানা করে আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। ধনুর্বেদ সম্বন্ধে বেশি কিছু পাওয়া যায়নি। পুরাণ আর তন্ত্রের মধ্যে শিল্প শাস্ত্রের অনেক কথা আছে।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে শিল্পবিষয়ে যে চৌষট্টি রকম কলাবিদ্যার উল্লেখ আছে তা দেখলে মনে হয় শিল্পবিষয়ে সেকালে সমাজ সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু অনেকেরই মত যে এইসব শিল্প আর্যেতরজাতির কাছ থেকে নেওয়া।

কাব্য ও নাটক প্রভৃতি

খ্রীস্ট প্রথম শতক পর্যন্ত যেসব কবিতা পাওয়া যায় সেগুলি ধর্ম বা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে লেখা। কিন্তু মনে হয় রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেও সেকালে অনেক কবিতা লেখা হত। সেগুলি লুপ্ত। অনেকের মতে নল দময়ন্তীর উপাখ্যান নাকি প্রাচীনতম।

সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম হচ্ছে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত আর সৌন্দরনন্দ। মধ্যএশিয়াতে একটা মঠের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে অনেক বইপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে অশ্বঘোষের এক খানা নাটকের কতক অংশ মিলেছে। এতে মনে হয় অশ্বঘোষ আরো অনেক বই লিখেছিলেন। অশ্বঘোষের লেখা অতি চমৎকার। উক্ত সময়ের কাছাকাছি কেবল রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কবিতা লেখা আরম্ভ হয়। কিন্তু একথা আনুমানিকও হতে পারে কেননা তার আগেকার কোনো বই পাওয়া যায়নি। আর যায়নি বলেই যে ছিল না একথা মানতে অনেকে নারাজ।

কালিদাস কাব্যনাটক লেখকদের মধ্যে সকলের সেরা। অশ্বঘোষ কালিদাসের চেয়ে প্রাচীন। পরে মাঘ ভারবি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিরা কাব্য লিখে এই দিকটা সমৃদ্ধ করে তোলেন।

শত শত কবিদের প্রবন্ধ কাব্য উদ্ভটকবিতায় রসসাহিত্য অসামান্য হয়ে ওঠে। কান আর মনের ওপর পদ্যের প্রভাব তাড়াতাড়ি পড়ে বলে কাব্যগুলি প্রায় সবই পদ্যে লেখা।

গদ্যকাব্যও সঙ্গে সঙ্গে লেখা চলছিল। সেই গদ্য এমনভাবে সাজানো যে তার তুলনা অন্য ভাষায় আছে কিনা জানি না। সুবন্ধুর বাসবদত্তা বাণভট্টের কাদম্বরী, দণ্ডীর দশকুমার চরিত প্রভৃতি গদ্যকাব্যের মধ্যে কাদম্বরীই অত্যুৎকৃষ্ট।

পদ্যে আর গদ্যে মিলিয়ে লেখাকে বলে চম্পূ। নল চম্পূ, রামায়ণ চম্পূ ভারত চম্পূ প্রভৃতি খানকয়েক উৎকৃষ্ট চম্পূকাব্য আছে। আবার গল্পবলার উদ্দেশ্যে গদ্য-পদ্য মিশিয়ে ছোটো ছোটো আর একরকম লেখা আছে পঞ্চতন্ত্র, তন্ত্রাখ্যায়িকা,

হিতোপদেশ প্রভৃতি এই জাতীয়। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি পৃথিবীর গল্পসাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, আর নানা ভাষায় এর অনুবাদ হয়ে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জৈন সংস্কৃতেও ছোটো ছোটো গল্পের অনেক বই আছে।

প্রায় দুহাজার বছর আগে গুণাঢ্য নামে একজন পণ্ডিত বৃহৎকথা নামক একখানা প্রকাণ্ড গল্পের বই প্রাকৃত ভাষায় লেখেন। সোমদেবভট্ট আর ক্ষেমেন্দ্র নামক কাশ্মীরী পণ্ডিত তার সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। মূল প্রাকৃতখানা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যথাক্রমে দুখানার নাম কথাসরিৎসাগর আর বৃহৎকথামঞ্জরী। বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ নামে আরো একখানা বই পাওয়া গিয়েছে। এই বৃহৎ কথা থেকে পঞ্চতন্ত্রকার ও সংস্কৃত অন্যান্য কবিরা অনেক গল্প নিয়েছেন। বৃহৎকথারও অনেক গল্পের মূল আবার পালিজাতক।

সংস্কৃত নাটকে তার নিজস্ব ভঙ্গি আছে। ইউরোপের পণ্ডিতরা মানাতে চেষ্টা করেছিলেন গ্রীকদের কাছ থেকে সংস্কৃত নাটক ধার করা, একথা সম্পূর্ণ ভুল। এখনকার বিলিতী পণ্ডিতরা মানছেন যে ভারতীয় নাটক কারো কাছে ঋণী নয়। সংস্কৃতভাষার সবচেয়ে প্রাচীন নাটক যা পাওয়া গেছে তা অশ্বঘোষের শারীপুত্র প্রকরণ। দুঃখের বিষয় বইখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। তারপর ভাসের স্থান। ভাসের নাটক খ্রীস্টপূর্বাব্দে রচিত ও সরল। কতকগুলি বেশ ভালো। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত নাটকের মধ্যে লোকচরিত্রে সমাজচরিত্রে সবচেয়ে সেরা। এখানি কিন্তু ভাসের একটি অসম্পূর্ণ নাটকের পূরণ। ছোটো সংস্কৃত নাটক কত যে আছে তার সংখ্যা নেই। সকলের মধ্যে কালিদাসের শকুন্তলা, ভাসের প্রতিমা, ভবভূতির উত্তররামচরিত, ভট্টনারায়ণের বেণী সংহার, বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস অত্যন্ত বিখ্যাত।

আলোচনাত্মক গ্রন্থ

কাব্য নাটক কিছু জমে উঠলে তখন তার ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। এই রকম আলোচনা করার ঝোঁক নাকি বেদ-উপনিষদে সূক্ষ্মভাবে

আছে কাজেই প্রাচীন। খ্রীস্টপূর্বাব্দে নটসূত্র রচিত হয়। রস সংগীত অভিনয় প্রভৃতি এতে আলোচিত হয়েছিল। প্রথম খ্রীস্টাব্দে ভরত নাট্যশাস্ত্র সংকলিত হয়। তাতে পূর্ব আচার্যদের মতও তোলা হয়েছে।

পরে ভামহ, দণ্ডী রুদ্রট রুয্যক, ধনিক ভোজরাজ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই জাতীয় বইয়ের নাম অলংকারশাস্ত্র। এই শাস্ত্রে সবচেয়ে বাহাদুরি নিয়েছেন কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা, নব্যন্যায় যেমন বাঙালির হাতে গড়া, তেমনি অলংকারশাস্ত্র কাশ্মীরী পণ্ডিতদের হাতে গড়া।

কাশ্মীরী পণ্ডিত আনন্দবর্ধন ধ্বনি বলে একটা জিনিস স্বীকার করলেন, সেটা হচ্ছে কথার যা অর্থ, তার থেকেও আলাদা একটা অর্থ যা বোঝা যায় তা। যেমন 'সূর্যউদয়ে ফুলগুলি হেসে উঠল' এই কথাতে যে হাসির কথা আছে তা অচেতন ফুলের পক্ষে খাটে না কাজেই হেসে উঠল মানে ফুটল। আবার অনেক দিন পরে বন্ধু এলে যেমন অন্য বন্ধুরা আনন্দে হাসতে থাকে তেমনি রাতের পর সূর্য এলেন, বন্ধুকে অনেকক্ষণ পরে দেখে যেন ফুলগুলি আনন্দ করতে লাগল। এই যে অর্থ এটা হল ধ্বনি।

আনন্দবর্ধনের এই মত অনেকে মেনে নিলেন। ধ্বনি সম্প্রদায় সৃষ্ট হল। আচার্য অভিনব গুপ্ত আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকের ওপর আর ভরত নাট্যশাস্ত্রের ওপর বিখ্যাত টীকা লিখে ধ্বনিসম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। এই মতে মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশ, বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণ, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ রসগঙ্গাধর নামে বিখ্যাত গ্রন্থ লিখে গেছেন।

ধ্বনি সম্প্রদায়কে বলে নব্য আলংকারিক, আর ভামহ দণ্ডীর মতঅবলম্বীকে বলে প্রাচীন আলংকারিক। প্রাচীন মত নব্য মতের কাছে হটে গিয়েছে। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা একখানি এ বিষয়ে অপূর্ব গ্রন্থ, কিন্তু সেখানির সবটা পাওয়া যায়নি। অলংকার শাস্ত্রের টীকা টীপ্পনীও যথেষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় অলংকারশাস্ত্রের এই অভ্যুত্থানে কাব্য নাটকের উন্নতিতে বিশেষ বাধা পড়ল। কেননা শক্তিশালী লেখকগণও অলংকারের নির্দিষ্ট পথ ধরে

চলতে লাগলেন। তার ফলে সবই হয়ে গেল একঘেঁয়ে আর নূতনতাহীন। এইসব কাব্য সমালোচনা যে সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল ঠিক সেই সময়ই কবিতারও অধঃপতন আরম্ভ হতে লাগল।

এই অলংকার শাস্ত্রেরই একটি শাখা রসশাস্ত্র। স্ত্রীপুরুষের মনোবৃত্তি চাল চলন নিয়ে এর গঠন।

শিংগভূপালের রসার্ণবসুধাকর, ভানুদত্তের রসমঞ্জরী নামকরা বই। এই রসশাস্ত্র সবচেয়ে গৌরব লাভ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হাতে পড়ে।

রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি রসশাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন পুস্তক। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি ও প্রীতি সন্দর্ভে রসের আলোচনা দার্শনিক দৃষ্টিতে করে গেছেন। শ্রীজীব হলেন রূপগোস্বামীর ভাইপো। অদ্বৈত সিদ্ধিকার বিখ্যাত আচার্য মধুসূদন সরস্বতীও ভক্তিরসায়নে রস সম্বন্ধে দার্শনিক ভাবে আলোচনা করেছেন।

ছোটো ছোটো কাব্য আর দর্শন প্রভৃতির টীকাটীপ্পনী

(৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৪শ পর্যন্ত)

কাব্যের অবনতির সময়েও ভালো কবিতা লেখা চলছিল। তার অধিকাংশতেই কৃত্রিমতা আর সভারঞ্জকতাতে ভরা। এই সময় চরিত্রমূলক ও ঐতিহাসিক বই কিছু লেখা হয়। জৈন আচার্যদের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি বিশেষ সমাদৃত। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী বিখ্যাত গ্রন্থ।

ধর্মশাস্ত্রের ওপর টীকা লেখা এই যুগের প্রধান কাজ। কোনো কোনো টীকা আবার নিজেই যেন আলাদা বই। কল্লুকভট্ট, মেধাতিথি, আর গোবিন্দ রাজ মনুসংহিতার টীকাকার। আগের দুজন বাঙালি। অপরার্ক কর্ক, নারায়ণ বরদরাজ, অসহায়, রঙ্গনাথ, সায়ন প্রভৃতি নানা পণ্ডিত, ধর্মশাস্ত্রের টীকাকার।

এই সব টীকা দেখলে এঁদের পাণ্ডিত্য আর বহুদর্শিতা অস্বীকার করবার

যো নেই। এই যুগের বিস্ময়ের বিষয় দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যের টীকাগুলি। একে তো দর্শনের ভাষ্য সহজ নয় তাতে এইসব টীকা না হলে অনেক স্থলে তা দুর্বোধ থেকে যেত। টীকাগুলি ভাষ্যের মত সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়েছেন। ভাষ্যকারদের মতোই টীকাকাররা অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা এঁদের হাতে তৈরি একথা বললে বেশি কিছু বলা হয় না।

এই সব টীকাকারদের মধ্যে ষড়দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, আর কাব্যের টীকাকার মল্লিনাথ সংস্কৃতভাষায় শ্রেষ্ঠ আর অমর হয়ে রয়েছেন।

শেষে কিন্তু টীকাকারদের দুর্মতি ঘটল। তাঁরা নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে মূলের চেয়ে টীকা অত্যন্ত দুর্বোধ হয়ে দাঁড়াল। তখন আবার টীকার টীকা তস্য টীকার দরকার হল। মূল গেল চেপে। পরে টীকাকাররা আর এই দোষের হাত এড়াতে পারলেন না।

তাই ভোজরাজ এঁদের ঠাট্টা করে বলেছেন এঁরা বইয়ের আসল অর্থকে ব্যাখ্যার চোটে ঘুলিয়ে দেন— "বস্তুবিপ্লবকৃতষ্টীকাকৃত: প্রায়শঃ"।

নিবন্ধ

ব্যাকরণ অলংকার জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে সংগ্রহ বা রচনা হল নিবন্ধ। গদ্য আর পদ্য দুইয়েই নিবন্ধ রচিত আছে। কেউ কেউ একে প্রকরণও বলে থাকেন। ধারা নগরের রাজা ভোজ ছিলেন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী আর হিন্দুদের সংস্কৃতি রক্ষার শেষরাজা। ইনি নানা বিষয়ে বই লিখে গেছেন। তাঁর পরে যখন তুর্কিদের আক্রমণে দেশে বিপ্লব ঘটে সে সময় মূল গ্রন্থ রচনা হ্রাস হয়ে যায়। কিন্তু বড়ো বড়ো নিবন্ধ রচনা হয়, বিশেষত স্মৃতি সম্বন্ধে। ঐ সব নিবন্ধে নানা শাস্ত্র থেকে বিধি ব্যবস্থা সংগ্রহ করে তার আলোচনা করা হয়েছে। বিদেশীর সংঘর্ষে সমাজ তখন বিপন্নপ্রায় কাজেই তার রক্ষার

জন্য শাস্ত্রবিধির দরকার হয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকে এই সব নিবন্ধকার দেখা দিলেন, কনৌজের—লক্ষ্মীধর, কর্ণাটের—মাধবাচার্য, বাংলার—শূলপাণি ভবদেব, জীমূতবাহন, রঘুনন্দন, মিথিলার— চণ্ডেশ্বর আর ছোটো বাচস্পতিমিশ্র, উড়িষ্যার— বিদ্যাকর, নরসিংহ, বুন্দেলখণ্ডের— মিত্রমিশ্র, কুমায়ুনের— অনন্তমিশ্র ভট্ট, ত্রৈলঙ্গের— দেবানভট্ট, কাশ্মীরের— কমলাকর, স্মৃতি নিবন্ধে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন, আজপর্যন্ত তাঁদের মত সেই সেই দেশে চলছে।

ব্যাকরণ দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রেও ছোটো নিবন্ধ ঢের তৈরি হয়েছে আর এখনো হচ্ছে।

তন্ত্র আর ভক্তি শাস্ত্র

বহু পণ্ডিতের মত তন্ত্র খ্রীস্টীয় সাত শতকে ভারতে এসেছে কিন্তু তন্ত্রগুলি ঘেঁটে দেখলে মনে হয় তা নয়, তন্ত্রশাস্ত্র প্রাক্‌আর্য সুতরাং অতি প্রাচীন। স্যার উড্রফ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করে গেছেন। অথর্ব বেদে, (ঋগ্‌বেদেও) তান্ত্রিক ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। মনে হয় আর্যরা এদেশের লোকের কাছ থেকে তা শিখে থাকবেন। সে সময়টাতে আর্য, অনার্যের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলতে আরম্ভ হয়েছিল। ৭০০ খ্রীস্টাব্দে নাথ সম্প্রদায় বা যোগী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এঁদের আচার্য মীননাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যে সব গ্রন্থ রচনা করেন তা যোগ আর তন্ত্রে মিশানো। এই মত ভারতের উত্তরপূর্বে খুব ছড়িয়ে পড়ে। তন্ত্র সম্বন্ধে এখনো বিশেষ ভাবে কোনো আলোচনা হয়নি। তন্ত্রের শত শত বই বর্তমান। মহাযানী বৌদ্ধরা তিব্বতীতন্ত্র এনে চালান, এই মত এখনো সর্বত্র জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চলছে। অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু হয়ে গিয়েছেন। এইজন্যে অনেকের অমূলক বিশ্বাস যে বৌদ্ধরাই আদি তান্ত্রিক। বর্তমানে হিন্দুধর্মে বেদের চেয়ে তন্ত্রের প্রভাব বেশি।

অধিকাংশ তন্ত্রেই শৈব আর শাক্ত মতের মহিমা প্রকাশ হয়েছে। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের হাতে শৈবতন্ত্রমত পরিপুষ্টি লাভ করে। শাক্তমত বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ ভাগে বেশি প্রচলিত হয়।

বর্তমানে ভারতের সর্বত্র উপাসনার ক্ষেত্রে তন্ত্রমতেরই আদর দেখা যায়। বইও যেমন অসংখ্য তার আচার্যেরাও অসংখ্য। তার মধ্যে অভিনব গুপ্ত, ভাস্কর রায়, কেশব মিশ্র, জ্ঞানানন্দ, পূর্ণানন্দ কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি আচার্যগণ বিখ্যাত।

বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ তন্ত্র ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে যায়। এঁদের তন্ত্রের বইও কম নয়। এই যুগেই (অর্থাৎ মধ্যযুগে) আর-এক মতবাদ প্রবল হল যাকে বলে ভক্তিবাদ। শিব আর বিষ্ণুকে নিয়ে এর দুটো বড়ো ধারা চলেছে। বৈষ্ণব ধারা ক্রমে এত বড়ো আর ব্যাপক হয়ে উঠল যে শৈব ধারা ম্লান হয়ে গেল। দক্ষিণ ভারতের আচার্যেরাই এই ভক্তিবাদের প্রবর্তক। এই মতই ভারতে আজকাল সবচেয়ে প্রবল।

মজার কথা যে খ্রীস্টান মিশনারীরা দাবি করেন যে ভক্তিবাদ নাকি খ্রীস্টমত থেকে উৎপন্ন, এসম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগও যথেষ্ট করেছেন। ভক্তিবাদের মূল কথা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে উপাসনা করা। এই মত ঋগ্‌বেদের মধ্যেও আছে। ঋগ্‌বেদ খ্রীস্টজন্মের অনেক আগেকার। কাজেই উক্ত মিশ-নারী মত অশ্রদ্ধেয়। অবশ্য এই ভক্তিবাদ দ্রাবিড়দের দ্বারা বিশেষ ভাবে পুনর্গঠিত।

ভক্তিশাস্ত্রের উপযোগী প্রাচীনগ্রন্থ শাণ্ডিল্যসূত্র আর নারদসূত্র। পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলিও এই মতের আশ্রয়। তারপর অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ পুরাণ প্রভৃতি অবলম্বন করে করা। শ্রীমদ্‌ভাগবতই হল এই মতের প্রধান গ্রন্থ। রামানুজ বল্লভ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি আচার্যরা এই মতের জীবনদাতা। এই সব আচার্যদের শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা ভক্তিবাদ বিপুলতা লাভ করেছে।

স্তোত্র সাহিত্য

বহুদেবতার স্তবস্তুতি ভক্তেরা রচনা করেন। সেইসব স্তুতি ক্রমে এত জমে ওঠে যে সেগুলি সংগ্রহ করলে বড়ো বড়ো বই হয়ে দাঁড়ায়। এগুলির মধ্যে এত চমৎকার ভাব তত্ত্বকথা ও কবিত্ব আছে যে দেখলে বিস্মিত হয়ে পড়তে হয়। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন, সবাই এই স্তোত্র সাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এই স্তোত্র সাহিত্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা এপর্যন্ত হয়নি।

শিলালিপি আর তাম্রশাসন

এইবার হচ্ছে পুঁথিপত্রের বাইরেকার কথা। পাহাড়ের গায় ইটের ওপর থামের ওপর তামার পাতে এগুলি লেখা। খ্রীস্টপূর্বাব্দেও এই রকম লেখা পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে পুরানো হল অশোকের শিললেখ। সেগুলি পালি ভাষাতে লেখা।

এইজাতীয় লেখাতে রাজাদের কীর্তিকথা বা দানপত্র প্রভৃতি আছে। ১৫০ খ্রীস্টাব্দে গির্ণার পর্বতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের শিলালেখ চমৎকার ভাষায় লেখা। একে উৎকৃষ্ট গদ্য কাব্যের নমুনা বলে ধরে নিতে পারা যায়। এই শিলালিপি প্রভৃতি অপঠিত থাকলে সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান অঙ্গ অজ্ঞাত থাকে। এই দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করান ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ। এই সব লিপি সংগ্রহ করে অনেক বই ছাপানো হয়েছে আর হচ্ছে।

নানা জায়গা থেকে তাম্রশাসনও পাওয়া যাচ্ছে, তার ভাষাও চমৎকার।

অন্যান্য বিষয়

ঘরবাড়ি-বাগানতৈরি, পশুচিকিৎসা, রান্নাকরা, খেলাধুলা, শিকার, হাত মুখদেখে লক্ষণ বলা, পরে আরবী পার্শী বইয়ের অনুবাদ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষাতে রয়েছে। আরো অনেক বিষয়ে নতুন নতুন বই খোঁজ করে পাওয়া যাচ্ছে আর ছাপাও হচ্ছে।

পাখির দুটো পাখার মতো হল সংস্কৃতের পক্ষে প্রাকৃত আর পালি-ভাষা। এদুটো না জানলে সংস্কৃতের সবটা জানা হয় না। বিশেষত লোকাচার দেশাচার প্রভৃতি অনেক বিষয় বাদ থেকে যায়, কাজেই এখানে তার খুব সংক্ষেপে নামগুলি করা যাচ্ছে। পালি ভাষায় লেখা বৌদ্ধশাস্ত্র তিনি ভাগে ভাগ করা। তার নাম ত্রিপিটক। সুত্তপিটক বিনয়পিটক আর অভিধম্মপিটক। সুত্তপিটকে বুদ্ধের আর তাঁর জনকয়েক শিষ্যের উপদেশ ও আলাপ আলোচনা আছে। বিনয়পিটকে আচার ব্যবহার, ও অভিধম্মপিটকে দর্শন আলোচিত হয়েছে। সুত্তপিটক দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অংগুত্তর নিকায়, ও খুদ্দক নিকায় এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্ভিদা, অপদান, বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটক এই পনের খানা বই খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত। পারাজিকা, পাচিত্তিয়, মহাবগ্গ চুল্লবগ্গ ও পরিবার এই পাঁচখানা বই নিয়ে বিনয় পিটক। ধম্মসংগণি বিভঙ্গ কথাবত্থু, পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, ধাতুকথা যমক, পট্ঠান এই সাতখানা বই নিয়ে অভিধম্ম পিটক। এই ত্রিপিটকের ওপর বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল প্রভৃতি আচার্যেরা অত্থকথা অর্থাৎ ব্যাখ্যা লিখেছেন। এ ছাড়া ত্রিপিটক অবলম্বন করে আরো অনেকে বই লিখেছেন। মিলিন্দ পঞ্হো, বিসুদ্ধি মগ্গ, আর অভিধম্মত্থসংগহ এই তিনখানি মূল ত্রিপিটকের

অন্তর্গত না হলেও অত্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ। পালিতে কাব্য অলংকার ব্যাকরণ ছন্দ বিষয়েরও বই আছে।

পালিতে লেখা বইগুলি হীনযান অর্থাৎ দক্ষিণী বৌদ্ধদের। উত্তরী বৌদ্ধ অর্থাৎ মহাযানীদের বই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। মহাযানীদের বইয়ের সংখ্যা বিপুল। তার মধ্যে দর্শনের বইগুলি চিন্তায় যুক্তিতে বিচারে অতুলনীয়। একথা বললে বেশি বলা হবে না যে এই সব বৌদ্ধ দর্শনগুলি সামনে থাকাতে আর তারই ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দু দর্শনগুলি বিকাশ লাভ করেছে। অশ্বঘোষ মাতৃচেট, আর্যশূর নাগার্জুন আর্যদেব বসুবন্ধু অসংগ শান্তিদেব প্রভৃতি আচার্যগণ মহাযানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। সংস্কৃতে ব্যাকরণ সাহিত্য অলংকার প্রভৃতি নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট বই রচনা করেছেন মহাযানী আচার্যেরা।

শ্বেতাম্বর আর দিগম্বর ভেদে জৈন সম্প্রদায় দুরকম। এঁদের মূলগ্রন্থ সব প্রাকৃত ভাষায় লেখা। দু দলের প্রাকৃত দু রকমের। জৈনদের প্রধান বই হল এগার অঙ্গ আর বার উপাঙ্গ। এগার অঙ্গ— আয়ারংগ সুত্ত; সুয়গড়ংগ, ঠাণংগ, সমবায়ংগ, ভগবতী বা বিবিহপন্নত্তি, নায়াধম্মকহা, উপাসগদসা, অন্তগড দসা, অনুত্তরোববায়িদসা, পঞ্হবাগরণ, বিবাগসুত্ত। বার উপাঙ্গ— উববায়ি, রায়পসেনি, জীবাভিগম, পন্নবনা, সূরপন্নত্তি, জম্বুদীব-পন্নত্তি চন্দপন্নত্তি, নিরয়াবলী, কপ্পাবংডসিয়া, পুপ্ফচুলিয়া, বহ্নিদসা, দসপইন্না।

এই অঙ্গ উপাঙ্গ নিয়ে দুই দলে কিছু কিছু ভেদ আছে। জৈন আচার্যগণ আরো অনেক বই প্রাকৃত ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই লিখে গেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভাবান আচার্য হেমচন্দ্র সূরি। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এঁর লেখা বইগুলি উৎকৃষ্ট ও প্রামাণিক। কুন্দকুন্দাচার্য, উমাস্বাতি, বিমল সূরি, হরিভদ্র সূরি প্রভৃতি এঁদের মধ্যে বিখ্যাত।

ভাষার বৈশিষ্ট্য

সাজসজ্জা মানুষের সংস্কারগত। দেহ-গেহ প্রভৃতিকে মনোরম করবার চেষ্টা মানুষে অক্লান্তভাবে করে আসছে তখন ভাষাই বা বাদ যাবে কেন। এই ভাষার সাজসজ্জা বিধিতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল অলংকার শাস্ত্রের পথ। একদল শব্দের সাজে আর একদল অর্থের সাজে নিরত হলেন। সাহিত্যের ভালোমন্দ অবশ্য নির্ভর করল অর্থের সাজের ওপর।

কিন্তু শব্দ নিয়ে যাঁরা সাজ সজ্জায় লেগেছেন তাঁদের বাহাদুরিও কম নয়। পণ্ডিতরা এই পথকে উৎকৃষ্ট বলে স্বীকার না করলেও এ কথা বলেছেন যে মনকে হালকা করার জন্যে এই সব শব্দেরসাজওয়ালা কাব্য চাই।

এর ফলে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার নমনীয়তা অতি আশ্চর্য। পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় এ রকম আছে কি না জানি না। ভাষাকে যে রকম ইচ্ছে সেই রকম চালানো যায়।

একই বইয়ে আছে রামায়ণ আর মহাভারতের ঘটনা মিলে মিশে। ইচ্ছে হয় রামায়ণ পড়ো না হয় মহাভারত[১]। সোজা করে শ্লোক পড়লে রামকথা আর উলটো করে পড়লে হবে কৃষ্ণকথা[২]। একদিকে নাটকের পরিশিষ্ট অন্যদিকে পর পর সাজানো ব্যাকরণের সূত্র ও উদাহরণ[৩]। একই কাব্য একবার বৈরাগ্য ভাবের আর একবার আদিরসের অর্থে ভরা। এই রকম অজস্র বৈচিত্র্য সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে। তারপর হেঁয়ালি প্রভৃতিও কম নয়। এক অক্ষর বা দু অক্ষর দিয়ে শ্লোক তৈরী, সোজা করে পড়লে সংস্কৃত উলটো করে পড়লে প্রাকৃত, নানারকম ছবি এঁকে তার ওপর শ্লোক সাজানো প্রভৃতি হরেক রকম কৌতুকজনক বিষয় রয়েছে। আগেই বলেছি এগুলি কেবল মনোরঞ্জন ও কৌতুকের জন্য রচিত হত। এ প্রসঙ্গে কাদম্বরীর রাজা শূদ্রকের অবসর বিনোদের ব্যাপারে বাণভট্টের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

১ কবিরাজ পণ্ডিতের রাঘব পাণ্ডবীয় ২. সূর্যসূরির— রামকৃষ্ণবিলোম কাব্য
৩ কৃষ্ণানন্দের— অন্তর্ব্যাকরণ নাট্যপরিশিষ্ট

আর একটা কথা লক্ষ্য করা দরকার, সংস্কৃতকাব্য বা নাটক যা কিছু, তার বর্ণনা ও ক্ষেত্র শহরকে নিয়ে, গ্রাম নিয়ে নয়। কাজেই শহুরে রীতিনীতি আর বড়োমানুষি এতে পরিস্ফুট। স্মৃতিশাস্ত্রগুলি আবার শহর নিয়ে নয়, গ্রাম নিয়ে। কেননা স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে দিনচর্যা শহরে অসম্ভব তা পড়লেই বোঝা যায়। কাজেই কাব্য সাহিত্য আর স্মৃতি এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যে চলেছে দুটো ধারা একটা শহুরে আর একটা গ্রাম্য।

এইবার সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কতগুলি মেনে নেওয়া বিষয় চলে আসছে সেগুলির সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করব কেননা এগুলির প্রভাব সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যুক্ত যেসব উপভাষা আছে তার ওপরেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। এগুলিকে বলা হয় "কবিসময়" অর্থাৎ কবিদের মেনে নেওয়া বিষয়। বাস্তব জগতে তা সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে।

চকোর জ্যোৎস্না পান করে, বর্ষাকালে হাঁসেরা মানস সরোবরে চলে যায়, মেয়েদের পায়ের আঘাতে অশোক ফোটে, তারা মুখে মদ নিয়ে বকুল গাছের ওপর ছিটিয়ে দিলে বকুল ফুল ফোটে। তেমনি মেয়েদের স্পর্শে প্রিয়ংগু, চাহনিতে তিলক, আলিঙ্গনে— কুরুবক, নর্মবাক্যে— মন্দার, মৃদুহাসিতে—চম্পক, ফুঁয়ে— আম, গানে— নমেরু, আর নাচে—কর্ণিকারের ফুল ফোটে। দিনে পদ্মের, রাতে কুমুদের বিকাশ, মেঘের ডাকে ময়ূরের নাচ, অশোকের ফলহীনতা, বসন্তে জাতীপুষ্পের অভাব, চন্দন অগুরু প্রভৃতি যেসব গাছের কাঠেই গন্ধ সেসব গাছের পুষ্পহীনতা কবিরা মেনে নিয়েছেন। তারপর কবিদের রূপ বর্ণনাতেও একটা মোটামুটি নিয়ম বাঁধা আছে। যেমন চোখ হবে খঞ্জন, হরিণচোখ, পদ্ম, মৎস্য, চকোর প্রভৃতির মতো। অর্থাৎ কোথাও হরিণের চোখের মতো চঞ্চল। আবার কোথাও খঞ্জনের দেহের মতো কালো সাদায় মেশানো। এসবস্থলে ভাব অনুসারে অর্থ ধরতে হয়। নাক হবে তিল ফুলের মতো। ঠোঁট হবে আকৃতিতে বিম্ব ফলের মতো, রঙে বন্ধুক পুষ্পের (বাঁধুলী ফুলের) মতো। এই রকম সমস্ত শরীরের বর্ণনায় একটা একটা বিশেষ বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা আছে আর

অন্যান্য বিষয়েও এই রকম উপমা বা তুলনা আছে। এর প্রভাব বর্তমান বাংলাসাহিত্যেও কম নয়।

কোনো স্থলে ভিন্নার্থক শব্দকে একার্থক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে যেমন মীনকেতন মকরকেতন শশাংক হরিণাংক। এসবস্থলে মীন মকর শশ হরিণ এক নয়। তেমনি নীল কৃষ্ণ পাণ্ডর শ্বেত পাণ্ডু প্রভৃতি রং পরস্পর মেশামেশি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কতগুলি বিষয়ে আবার কবিরা স্বাধীন নন যেমন শশাংক স্থলে শশী চলবে কিন্তু মৃগাংকের স্থলে মৃগী চলবে না। এই রকম অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে, যা সাহিত্য পড়তে পড়তেই জানা যায়।

শেষকথা

যেমন বিশাল কোনো স্থানকে দূর থেকে দেখলে তার একটি অখণ্ড ও আবছা দৃশ্য চোখে পড়ে, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যকে এই প্রবন্ধে দূর থেকেই তেমনি দেখা গেল। কেননা সমস্ত খুঁটিয়ে ও নিঃশেষে নাম নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের কথা বলা অসম্ভব। এই বইয়ে 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ ধরা হয়েছে— অর্থাৎ সংস্কৃতভাষার যে যে বিষয়ের **সহিত** সম্বন্ধ আছে তাই সংস্কৃত সাহিত্য (সহিত+ষ্য)।

যে কয়েকটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখা উচিত, সে সম্বন্ধে কিছু বলে আমাদের বক্তব্য শেষ করব।

Dead language কথাটা বিদেশী আমদানি। এর মানে মৃতভাষা। এই বিশেষণটি সংস্কৃতভাষার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। এখন মৃতভাষা বলতে যদি অপ্রচলিত অর্থাৎ যা আটপৌরে কথাবার্তায় চলে না তাকেই বোঝায়, তবে তো বাংলা সাধুভাষাও মৃতভাষা। যাতে বই পত্র আর এখন লেখে না তাই যদি মৃতভাষা হয়, তবে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে বছর বছর নতুন সংস্কৃত বই, সাপ্তাহিক মাসিক বাৎসরিক প্রভৃতি পত্রিকাদি অনেক বেরুচ্ছে, যিনি এ দিকের খবর রাখেন তিনি জানেন। সংস্কৃত শেখার বিদ্যালয় সারাভারতে

সংখ্যায় স্কুলকলেজের চেয়ে কম বোধ হয় না। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী এ ভাষা শ্রদ্ধাসহকারে পড়ে। কাজেই কী হিসাবে সংস্কৃত মৃতভাষা তা ঠিকমতো বোঝা যায় না। সুতরাং সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলার চেয়ে "সুপ্রাচীন" ভাষা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নেপাল থেকে কুমারিকা আর বম্বে থেকে আসাম পর্যন্ত এই ভাষার চর্চা এখনো পুরোদস্তুর মতো বর্তমান। বিভিন্ন ভাষায় ভরা এই ভারতের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেকোনো না কোনো সংস্কৃত জানা "পণ্ডিতজী" পাওয়া যায়ই কাজেই সংস্কৃত বলতে পারলে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসে ঘুরে আসা চলে।

অনেকে এখনো সংস্কৃতে বিশেষভাবে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তার খোঁজ রাখেন ক'জন।

বিদেশীরাজকর্তা ও মিশনারীদের প্রভাবে সংস্কৃতের ওপর হালে-শিক্ষিত সাধারণের একটা অনাদর অবজ্ঞা বয়ে চললেও সংস্কৃতের গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিদেশীয় মনীষীদের সংস্কৃতআলোচনা প্রভৃতি এদিকে দৃষ্টান্তস্বরূপে বর্তমান।

আজকালকার শিক্ষিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংস্কৃত আলোচনার পথ প্রদর্শক ইউরোপীয় পণ্ডিতরা। কিন্তু বিদেশী দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্যের সমালোচনায় এদেশি সাহিত্যের মর্যাদা যে ঠিকমতো সবজায়গায় রক্ষা করা হয়নি সেকথা বলাই বাহুল্য। আধুনিক এদেশি পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের মতই তাঁদের বইয়ে উদ্গীরণ করছেন। তার কারণ বোধ হয় মূলবইগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করার সময় অভাব। তারপর ভারতবর্ষের এক এক প্রান্তের আচার ব্যবহার বিভিন্ন। সমাজ ও ব্যবহারের প্রতিবিম্ব হল সাহিত্য। কাজেই অবন্তীপুরীর গণিকা বসন্তসেনার বিবাহিত হয়ে ভদ্রঘরের বধূরূপে পরি-গণিত হওয়া যে সমস্ত ভারতের আচার নয় তা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং

যে কোনো একখানা বইয়ে বিশেষ কিছু দেখলে সমস্ত ভারতের ঘাড়ে তা চাপানো সমালোচকদের পক্ষে অপকার্য।

শত শত বছরের আগেকার বই নিয়ে সমালোচনার সময় সেই সময়কার আবহাওয়া আর ঠিক ঐ সময়ে অন্য দেশের ও সাহিত্যের অবস্থা পাশাপাশি রেখে বিচার করা আবশ্যক। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার পক্ষে তা ঠিক হয়নি।

দু'তিন হাজার বছর ধরে যে ভাষার ধারা সমানে চলে আসছে যার ধারা কখনো বন্ধ হয়নি তার বিশালতা কতদূর হতে পারে তা সহজে বোঝা যায়।

রাষ্ট্রবিপ্লব, উই প্রভৃতি পোকায় ও অযত্নে হাজার হাজার বই নষ্ট হয়ে গেছে। তক্ষশিলা নালান্দা প্রভৃতির বিরাট পুস্তকালয় আক্রমণকারী বিদ্রোহীরা পুড়িয়ে দেয়, তাতেও অজস্র বই নষ্ট হয়ে গেছে। আবার বিদেশী পরিব্রাজক ও রাজ-রাজড়ারা এমন অনেক বই নিয়ে গেছেন যার অন্য কপি এদেশে নেই। এখনো অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে দুর্লভ পুঁথিপত্র নষ্ট হতে বসেছে। এমনিভাবে ধ্বংসের নানা পথ থেকে যে বইগুলি বেঁচে আছে তার একটা সদ্‌গতি করার চেষ্টা আজকাল চলছে। তার ফলে অনেক অমূল্য বই পাওয়া যাচ্ছে। একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল। শালিহোত্র হচ্ছেন অশ্ববৈদ্য। ঘোড়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর উৎকৃষ্ট গ্রন্থের উল্লেখ শুধু প্রাচীন টীকাকারদের লেখায় পাওয়া যেত আসল বইখানি পাওয়া যায়নি। একদিন একটা লোক দোকানে কতকগুলি পুরানো কাগজপত্র বিক্রি করতে যায় তার মধ্যে একখানা আস্ত পুঁথি দেখে একজন, কোনো অধ্যাপককে দেখতে দেন, সেটা কী। অধ্যাপক দেখলেন সেখানা শালিহোত্রের পুঁথি। তিনি তখনি কিনে এসিয়াটিক সোসাইটিকে দেন তাঁরা ছাপিয়ে বার করেন। তারপর ঐ বইয়ের আর দ্বিতীয় কপি পাওয়া যায়নি। এমনিভাবে অজ্ঞাতে মূর্খদের হাতে পড়ে অনেক বই চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে।

যেসব পণ্ডিতমণ্ডলী নানাদিক থেকে উপেক্ষা অবজ্ঞা দারিদ্র্য প্রভৃতি

আনন্দবদনে মেনে নিয়ে এই ভারতীয় জ্ঞানধারাকে আজ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে আসছেন তাঁদের কথা অনেকেরই অজ্ঞাত। নতুন চিন্তা দ্বারাও যাঁরা সংস্কৃতভাষাকে পুষ্ট করেছেন তাঁদেরও ঐ দশা। এসম্বন্ধে বলা যেতে পারে ম, ম, রাখালদাসের অদ্বৈতবাদখণ্ডন, ম,ম, রামাবতারের শক্তি (সপ্তম) দর্শন, ম,ম, পঞ্চাননের শক্তিভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় হবে আরো কয়েক শতাব্দী পরে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের সম্প্রসার বিশ্লেষণশক্তি আর ভারতীয় পণ্ডিতদের গভীরতা এই দুয়ের মিশ্রণ যদি সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদের মন অধিকার করতে পারে তবে অচিরাৎ এই ভাষার চর্চা আবার নতুন রূপ নিয়ে বিস্ময় জাগাবে সমস্ত জগতের মনীষীদের মনে।

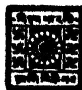


পৃ ১৯ পং, ২৩ দ্বাদশ স্থলে বারোশো,

পৃ ২৫ পং, ১১ অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি স্থলে অদ্বৈতসিদ্ধি হবে।

সাহিত্য-মীমাংসা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১২৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

সাহিত্য-মীমাংসা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৫ শ্রাবণ
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৬৭ আশ্বিন : ১৮৮২ শক

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রাকর শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস। ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড। কলিকাতা ৩৭

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহোদয়ের উদ্দেশে

মুখবন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনা ও নন্দন-তত্ত্বের (aesthetics) দিকে আজ বাঙালী মনীষিগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। বর্তমান গ্রন্থের কয়েকটি প্রস্তাব বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ('দেশ', 'শনিবারের চিঠি') প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিদ্বৎসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় রসতত্ত্ব কিরূপে ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, এবং ভট্টনায়ক প্রমুখ বিশিষ্ট দার্শনিকগণের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আচায অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদে পরিণতিলাভ করিল, তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। রসই যে কাব্যের বা সাহিত্যের আত্মা সে বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহু মনীষীই একমত। আর সকল উপাদানই বাহ্য। অধ্যাত্মতত্ত্বের মতই যদিও রসতত্ত্ব অনির্বচনীয় ও অনুভবমাত্রগম্য, তবুও উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় মনীষা কিরূপ সূক্ষ্ম বিবেকদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বর্তমান প্রবন্ধগুলি ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে পরিকল্পিত একটি বিস্তৃততর আলোচনার অংশবিশেষ। সহৃদয় পাঠকগণের নিকট ইহা সমাদৃত হইলে, পরিকল্পিত গ্রন্থপ্রকাশনে উৎসাহিত হওয়া যায়—ইহাই আন্তরিক নিবেদন।

অপূর্বং যদ্ বস্তু প্রথয়তি বিনা কারণকলাং
জগদ্ গ্রাবপ্রখ্যং নিজরসভরাৎ সারয়তি চ।
ক্রমাৎ প্রখ্যোপাখ্যাপ্রসরসুভগং ভাসয়তি তৎ
সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবি-সহৃদয়াখ্যং বিজয়তে॥

—অভিনবগুপ্ত

অর্থাৎ

কোনও কারণব্যতিরেকেই যাহা অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করিয়া থাকে,
যাহা নিজের নৈসর্গিক আনন্দাতিশয়ের উল্লাসের দ্বারা
এই পাষাণতুল্য জগৎকে সারবান্ করিয়া তুলে,
এবং যাহা ক্রমে কবির প্রাতিভ দর্শন (intuition)
এবং বর্ণন (expression)-রূপে বিকশিত হইয়া
সেই নীরস বিশ্বকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে
কবি ও সহৃদয়ের চিত্তে স্ফুরণশীল সেই সারস্বত-তত্ত্ব বিজয়লাভ করুক।

গ্রন্থপরিচিতি

শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এম্. এ., পি. আর এস. বয়সে নবীন হইলেও শাস্ত্রজ্ঞানে ও বিচারশক্তিতে জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া নিজেকে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শ্রীমানের বহু প্রবন্ধ আজ বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত এবং ইহা আমার উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত করিবে।

সম্প্রতি ইনি বাংলা ভাষায় 'সাহিত্য-মীমাংসা' নামে একটি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে ইহার কথামুখ লিখিতে অনুরোধ করেন। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বিশেষ ধৈর্য ও মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। মনে হইল, একটা প্রয়োজন মিটিবে। আজকাল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রসমূহের আলোচনা হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। ইহা একদিকে যেমন জিজ্ঞাসু অধ্যেতৃবর্গের জ্ঞানবর্ধনের হেতু হইবে, সেইরূপ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধিও করিবে। সে কারণে শ্রীমান্ বিষ্ণুপদের এই গ্রন্থরচনার সার্থকতা আছে। ইহাতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বা অজ্ঞান বা অল্পজ্ঞান প্রযুক্ত সিদ্ধান্তের বিকৃতি ঘটে নাই। যাহা বুদ্ধি বা মনীষার দ্বারা বুঝা যায় নাই, তাহার কল্পনার সাহায্যে বা কোনও য়ুরোপীয় লেখকের সিদ্ধান্তের অনুরোধে বিকৃতি করা আজকাল প্রচলিত সমুদাচার (fashion) হইয়াছে। এই গ্রন্থে কিন্তু এই নবীন সমুদাচারের অনুবর্তন করা যয় নাই। য়ুরোপীয় মনীষীদের মতের সহিত ইহার কষ্টকল্পনা করিয়া সাজাত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয় নাই। যেখানে যেটি সঙ্গত বা সুসদৃশ সেই মতটি উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ অলঙ্কার শাস্ত্রের মুখ্য প্রমেয় বস্তু রসতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসকগণের মতগুলি যথাযথ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই নহে, ইহাদের সারবত্তা ও যুক্তিমত্তাও নূতনভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। প্রতীচ্য মনীষীদের চিন্তার সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য যথাসম্ভব

প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য ভাবধারাবাসিত-চিত্ত পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধা ইহাতে হইবে। সুখের বিষয়, তাঁহারা ভুল বুঝিবেন না।

এই গ্রন্থ অধ্যয়নে কেবল সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণীই যে উপকৃত হইবেন তাহা নহে, যাঁহারা বিশেষবিদ্ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে কৃতপরিশ্রম, ইহা আলোচনা করিলে তাঁহাদেরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান বৈশদ্য লাভ হইবে। এ জাতীয় গ্রন্থের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। পাণ্ডিত্যের অপরিপন্থী অথচ সাধারণের গ্রহণশক্তির যোগ্য করিয়া গ্রন্থ রচনা করা আজ বিশেষভাবে আবশ্যক। বিশ্বভারতীর অধিকারিবর্গ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন অনেকদিন। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই সাফল্য লাভের প্রধান কারণ তাঁহাদের লেখক নির্বাচনের উপর নির্ভর করিতেছে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকনির্বাচন সমীচীন হইয়াছে, ইহা আশা করি আমার মত অনেকেই স্বীকার করিবেন। আমি এই গ্রন্থের পঠন-পাঠনের বহুলপ্রচার কামনা করি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্য-পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইবে, এই আশাও পোষণ করি।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য-মীমাংসা

আমাদের বর্তমান আলোচনার নাম সাহিত্য-মীমাংসা—ইংরেজী Literary Criticism শব্দের ইহা হুবহু প্রতিশব্দ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও অগ্রগতি হয়। যে জাতি বর্বরতার স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই তাহার সাহিত্য বলিতে কিছুই নাই। সাহিত্য সভ্যতার প্রতীক, এবং সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যবিচারের ধারাও ক্রমশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। সাহিত্যের স্রষ্টা ও পাঠক, উভয় সম্প্রদায়ের মনেই স্বভাবত এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, সাহিত্য কি? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? কবিমনের উপাদান কি? সাহিত্যের সহিত অন্যান্য শিল্প ও কলা, যেমন চিত্র, ভাস্কর্য, সংগীত, যাহাদের ভিতর দিয়া সভ্য মানব নিজেদের অন্তর্লোকের আনন্দ ও আদর্শ বাহিরের লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া থাকে, তাহাদের ভেদ কি? এইরূপ শত শত জটিল প্রশ্নের সমাধানই সাহিত্য-মীমাংসা-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের সভ্যতা বহু প্রাচীন। ইউরোপের বর্তমান সভ্য সমাজ যখন অরণ্যের গহন অন্ধকারে পশুশিকারে ব্যস্ত ছিল, আত্মরক্ষা ও শরীরধারণই ছিল যখন তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যা, তখন আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষে সভ্যতার প্লাবন বহিয়াছিল। বিজ্ঞানে চিকিৎসাবিদ্যায় ভাস্কর্যে চিত্রে দর্শনে সাহিত্যে শত ধারায় ভারতীয় সভ্যতা ভারতীয় আদর্শ আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল। আজ সে প্লাবন আর নাই, সে সকল ধারা শুষ্ক। কিন্তু তখনকার সাহিত্য ও সাহিত্য-মীমাংসার প্রণালী বহু অপঠিত ও অনাদৃত পুঁথির মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমরা তাহাদের কোনও পরিচয়ই রাখি না। ইউরোপের সাহিত্যের উজ্জ্বলতায় আমরা মুগ্ধ, আমরা একান্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রীক্ মনীষী আরিস্ততল্-এর সাহিত্য-বিশ্লেষণ শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক।

কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতের নমস্য আচার্যগণ সাহিত্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের অলৌকিক প্রজ্ঞাবলে শিল্প ও কলার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ধারণের যে সকল মানদণ্ড নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের বর্তমান শিল্প ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কোনও অনুসন্ধিৎসাই নাই।

অনেকে বলিবেন, সংস্কৃতে সাহিত্য সম্বন্ধে যে বিচারপদ্ধতি তাহা যে বর্তমানের লৌকিক সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে, ইহা ধারণা করা অন্যায়। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে দৃষ্টিতে সাহিত্যের বিচার করতেন, আমাদের বিচার করিবার দৃষ্টি তাহা হইতে বিভিন্ন ও নূতন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্তমান সাহিত্যের ন্যায় জটিলতা ছিল না। তখন Realism এবং Idealism লইয়া কবি ও সমালোচকগণের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয় নাই। আধুনিক ভাষার ন্যায় উপন্যাস-সাহিত্য বলিয়া কোনও বিভাগ সংস্কৃত ভাষায় ছিল না। অভিনয় ও নাট্য তখনকার দিনে মানবজীবনের সহিত এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া উঠে নাই। পৌরাণিক ঘটনাই ছিল কাব্য ও নাট্যের প্রধান অবলম্বন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্য, কালিদাসের কুমারসম্ভব রঘুবংশ, মাঘের শিশুপালবধ, ভারবির কিরাতার্জুনীয়—ইহাদের আদর্শে রচিত কতকগুলি কাব্য, মেঘদূতের ন্যায় কতকগুলি খণ্ডকাব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল উত্তররামচরিত প্রভৃতির অনুকরণে রচিত কতকগুলি পৌরাণিক নাটক, হাল্‌কা, নিতান্ত স্থূল ধরণের কতকগুলি প্রহসন, বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা কয়েকখানি গদ্যকাব্যই ছিল সাহিত্য-সমালোচকের সমালোচনার যথাসর্বস্ব পুঁজি—stock-in-trade। আজকাল আধুনিক সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্র বহুদিকে প্রসারিত হইয়াছে, সাহিত্যের জটিলতা বাড়িয়াছে, কবিত্বশক্তির ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, মানবজীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সুগভীর সম্বন্ধ কবি ও সমালোচকগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আজ আর পৌরাণিক প্রেমকাহিনী, বীরত্বের কথা পাঠক ও দর্শকের হৃদয়

আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহারা নিজেদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের মধ্যে নূতন বর্ণে অঙ্কিত দেখিবার জন্য উৎসুক। অতএব সাহিত্যের আদর্শ প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান যুগে বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং মৃত, প্রস্তরীভূত, নির্জীব সাহিত্যের সমালোচনার মানদণ্ড লইয়া সজীব এবং ক্রমবর্ধমান সাহিত্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিতে বাসলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

অপর পক্ষে, ইউরোপীয় সাহিত্য-মীমাংসার ধারা সাহিত্যসৃষ্টির সহিত সমান বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, দুয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান রচিত হয় নাই। ইউরোপীয় মনীষিগণ কখনও অন্ধভাবে অতীতের পূজা করেন নাই। যুগে যুগে বিখ্যাত সমালোচকগণ সমসাময়িক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে, স্বাধীন চিন্তাশক্তির বশবর্তী হইয়া সাহিত্যের মাপকাঠি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পরববর্তী যুগে, আবার নূতন যুগ-সাহিত্যের প্রবাহে তাঁহাদের সেই তুলাদণ্ড হয়তো ভাসিয়া গিয়াছে। আবার তাৎকালিক সমালোচকগণ নূতন বিচার-পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছেন। এইভাবে সাহিত্যের সহিত সমালোচনারও ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে নবীনতা আছে, নূতন ভাব-ধারার সহিত সংমিশ্রণে তাহা প্রবহমান নদীর মত সজীব। সত্য বটে, ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যও আরিস্তত্‌ল্‌-এর কাব্য-মীমাংসা বিষয়ক চিরন্তন গ্রন্থের (*Poetics*) উপরই মুখ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাহা হইলেও আরিস্তত্‌ল্‌-এর মূল সূত্রগুলির যুগোপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা ইউরোপীয় মনীষিবৃন্দ তাহাকে বর্তমান সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহারা অতীতের সহিত বর্তমানের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। বিচ্ছিন্ন অপরিচিত নির্জীব অতীতের দ্বারা সজীব বর্তমানের যাচাই করিবার প্রয়াস করেন নাই। কিন্তু এই যুক্তির দ্বারা ভারতীয় নিজস্ব সাহিত্য-সমালোচনা-রীতি ও প্রাচীন শাস্ত্রধারার প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা সমর্থন করা যায় না। আমাদেরও আরিস্তত্‌ল্‌ স্থানীয় বহু মনীষী রহিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত

সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক একাধিক গ্রন্থও আজ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এক-একখানি পুস্তক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। ইউরোপীয় সাহিত্যিক ও সমালোচকবৃন্দ যেমনভাবে আরিস্ততল্ হোরেস্ প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া সমসাময়িক সাহিত্যধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য নূতন দৃষ্টিতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কই, সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তো আমরা আমাদের স্বদেশের শাস্ত্রের পঠন-পাঠন করিতেছি না? অথচ বিদেশীয় শাস্ত্রের প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ। বের্গ্সঁ-এর Creative Evolution-এর কথা উঠিলে আমাদের রসনা আর যেন বিশ্রান্ত হইতে চাহে না, অথচ আমাদের প্রত্যেকেই মৃত, আমাদের সৃজনী-শক্তিও নাই, অভিব্যক্তিও নাই। সমস্ত দোষ প্রাচীনদের উপর চাপাইয়া আমরা সকল ভার হইতে যেন অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেই বাঁচি। প্রতীচীর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত চক্রবালের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ইউরোপের প্লেটো আছেন, আরিস্ততল্ আছেন, হোরেস্ আছেন, আমাদের ভরত নাই, ভামহ নাই, দণ্ডী নাই, অভিনবগুপ্ত নাই? আজ প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যের আকাশের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। অতীতের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যে সকল রত্ন অনাদৃত অবহেলিতভাবে লুকাইয়া আছে, আজ আবার তাহাদের নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইতে হইবে, তাহাদের নূতন করিয়া সংস্কার করিতে হইবে। তখন দেখিতে পাইব, আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ সাহিত্যের যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, সাহিত্যের যে উদ্দেশ্য তাঁহারা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন, এক কথায় যে ভাবে তাঁহারা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও নির্দিষ্ট কালের বা দেশের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহা সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্যের গুণাগুণ নিরূপণ করিবার শাশ্বত মানদণ্ডস্বরূপ। তাঁহারা জানিতেন, যুগে যুগে সাহিত্যের গতিপথ বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়, রচনার শৈলী পরিবর্তিত হয়, সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিষয়ে কবি ও সহৃদয় উভয়েরই

ধারণার অভিব্যক্তি ঘটে। সংস্কৃত অলংকার-সাহিত্যের ধারা যাঁহারা নিপুণভাবে সমীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা আচার্য ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতকের শেষভাগে মম্মটাচার্য পর্যন্ত বিস্তৃত এই দীর্ঘ সাহিত্য-মীমাংসক-সম্প্রদায় কেবল পুরাতনেরই চর্চা করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ কথা অনভিজ্ঞ সংস্কৃত-বিদ্বেষীর মুখেই কেবল শোভা পায়। নূতন নূতন অলংকারগ্রন্থে নূতন নূতন প্রশ্নের উত্থাপন হইতেছে। ভরত যাহা জানিতেন না, ভামহ দণ্ডী উদ্ভট প্রভৃতি আচার্য তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার সমাধান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীনের দৃষ্টিতে যেখানে শব্দ অর্থ ও অলংকার ভিন্ন সাহিত্যের অন্য কোনও উপাদান ধরা পড়ে নাই, নবীন সাহিত্য-মীমাংসকগণ সেখানে সাহিত্যের আত্মার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাপৃত। প্রাচীনেরা যখন গুণ ও অলংকারের মধ্যে কোনও ভেদ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, নবীন আলংকারিক সেখানে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজকাল যেমন সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমুল বিবাদ উঠিয়াছে, তাহার সমাধানের কোনও কিনারা পাওয়া যাইতেছে না, আমাদেব প্রাচীন আচার্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই জটিল সমস্যা লইয়া দীর্ঘ বিতণ্ডা চলিয়াছিল, এবং তাঁহারা উহার যে সমাধান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজও আমরা আমাদের মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের নবলব্ধ সমীক্ষা-প্রণালী ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য সত্ত্বেও তাহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেবল, ভারতের অতীত আলংকারিক সম্প্রদায় ও বর্তমানের ইউরোপীয় সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে তফাত এইটুকু মাত্র যে, আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ যেখানে অতি অল্প কথায়, সংযতভাবে সাহিত্যবিষয়ক দুরূহ সমস্যাসমূহের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের শেষ উত্তর দিয়াছেন, আধুনিক সমালোচকগণ সেখানে বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণের অবতারণা করিয়া সমস্যাগুলিকে আরও দুর্বোধ্য করিয়া

তুলিয়াছেন, শুধু নিজেদের পাণ্ডিত্য ও বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় দিবার ছলে। ইহার কারণ আছে। আমাদের শাস্ত্রধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের প্রতিটি উক্তি উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা, হেতুর দ্বারা, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে, হেতুশূন্য অযৌক্তিক কোনও সিদ্ধান্তই প্রতিবাদিগণ গ্রহণ করিবেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। "একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ।" তাঁহাদের আলোচনার এই অত্যধিক যুক্তিমূলকতার কারণ ন্যায়শাস্ত্রের—আমরা যাহাকে Logic বলি—অত্যধিক পঠনপাঠন। আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়শাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্রচর্চার প্রদীপস্বরূপ—"প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্ উপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।" ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী চিন্তা করিবার রীতি, শাস্ত্রবিচার করিবার প্রণালী আমাদের পূর্বাচার্যগণের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারে যেমন ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োগ ছিল, উপযোগিতা ছিল, সাহিত্য-মীমাংসা বিষয়েও তাহার প্রয়োগ ও উপযোগিতা কিছুমাত্র কম নয়। বর্তমানের ন্যায় Logic-এর চর্চা তাঁহাদের নিকট ব্যবহারজীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য, কেবলমাত্র প্রয়োগহীন academic studyতে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহাদের চিন্তাধারার সহিত উহা অঙ্গাঙ্গিভাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ছিল। কিন্তু আমাদের নিকট এই অত্যধিক যুক্তিনির্ভরতা, আন্বীক্ষিকীপ্রিয়তা—logicophilia, অসহ্য। বর্তমানের ইউরোপীয় মনীষিগণও আরিস্ততল্-এর Syllogism অনুযায়ী বিচার করিতে বসেন না।[১] আমাদের কাছে যুক্তি অপেক্ষা ভাবোচ্ছ্বাসই অধিকতর প্রিয়। তাহার মধ্যে অনেক বাষ্প আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই; উন্মাদনা আছে, কিন্তু প্রেরণা নাই। সুতরাং আমরা যে প্রাচীন ভারতীয়

---

১. **"...It seems to me that one of the reasons why our people are alive and flourishing, and have avoided many of the troubles that have fallen to less happy nations, is *because we have never been guided by Logic in anything we have done*."—Baldwin : Prof. L. Susan Stebbing প্রণীত '*Thinking to Some Purpose*' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১১—Pelican Books**

আচার্যগণের যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থসমূহ ত্যাগ করিয়া বর্তমান ইউরোপের সমালোচক-গণের উচ্ছ্বাসময় সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?

আমরা অবাক হইয়া ভাবি, সাহিত্য-মীমাংসার গ্রন্থে এত অনুমান, এত সূক্ষ্ম তর্ক কিসের, এত চুলচেরা বিচারের কিসে প্রয়োজন? এত ঘটত্বাৎ পটত্বাৎ -এর সমাবেশ কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? কিন্তু এই বিস্ময়ের মূলে আছে সাহিত্য-মীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। সাহিত্য-মীমাংসা কেবল পাঠকের বা দর্শকের হৃদয়ের বস্তুশূন্য ভাবোচ্ছ্বাস নহে—যদি তাহাই হইত, তবে তাহা সাহিত্য-মীমাংসা না হইয়া সাহিত্যের মধ্যেই গণিত হইত। এবং বর্তমানের অধিকাংশ তথাকথিত সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থ সাহিত্যেরই স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। বস্তুত সাহিত্য-মীমাংসা একটি স্বতন্ত্র দর্শন-বিশেষ। বন্ধনকাতর স্বাধীন কবিপ্রতিভা যেমন সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল, সেইরূপ যথার্থ সাহিত্য-মীমাংসক যিনি, তাঁহার প্রতিভা অপেক্ষা বিচারবুদ্ধি (reason), কল্পনা অপেক্ষা তত্ত্বদৃষ্টি, বাস্তবজগতের প্রতি অসহিষ্ণুতা অপেক্ষা বস্তুপরতন্ত্রতারই অধিকতর প্রয়োজন। কবিকল্পনা যতই শৃঙ্খলহীন বলিয়া আপাতত প্রতিভাত হউক-না কেন, তাহার মধ্যেও একটি অনুল্লঙ্ঘনীয় নীতি আছে, কার্যকারণ-ভাব আছে। সহৃদয় পাঠকের সৌন্দর্য ও রসবোধ যতই স্ব স্ব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করুক-না কেন, তাহার মধ্যেও একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা নিহিত আছে। যিনি প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচক, তিনি কবির সাহিত্যসৃষ্টি এবং সহৃদয়ের রসোদ্বোধ এই উভয়ের অন্তর্নিহিত সাধারণ কার্যকারণতত্ত্ব ও শৃঙ্খলা—যাহা প্রাকৃতজনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না—তাহারই বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করেন। ইহাকে দর্শন ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায়?[১] এবং ইহা তো সর্ববাদিসম্মত সত্য

১. "True criticism of art is certainly *aesthetic* criticism, but not because it disdains philosophy, like pseudo-aesthetic, but because it acts as philosophy

যে ভাবোচ্ছ্বাস দার্শনিকতার পরিপন্থী। দার্শনিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি স্থির অকম্পনীয় বিচারবুদ্ধি ও সুনিপুণ পদার্থ বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের প্রাচীন ভারতের যাঁহারা সাহিত্য-মীমাংসার বিভিন্ন প্রস্থানের পরমাচার্য—তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে অধিগতবিদ্য ছিলেন। ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আচার্য আনন্দবর্ধন বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনে পারঙ্গম ছিলেন। এই উভয় দর্শনের উপরেই তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টনায়ক একজন শ্রেষ্ঠ মীমাংসক ছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত, যাঁহার ধ্বন্যালোকলোচন এবং অভিনবভারতী সাহিত্য-মীমাংসার রত্নভাণ্ডার-বিশেষ, তিনিও একজন প্রধান দার্শনিক বলিয়াই খ্যাত, কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। এইরূপে যদি আমরা অনুসন্ধান কার, তবে দেখিতে পাইব যে, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মীমাংসক বলিয়া পরিচিত তাঁহারা শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও বটে। শুধু আমাদের প্রাচীন ভারতেই নয়—প্রাচীন ইউরোপ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান ইউরোপের সাহিত্য-মীমাংসার ধারা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব—যিনিই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক। আরিস্ততল্-এর দার্শনিকতার কথা কে না জানেন? বর্তমান ইউরোপের যাঁহারা মূর্ধাভিষিক্ত সাহিত্য-সমালোচক, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রখ্যাতনামা দার্শনিক। ইংলণ্ডের

---

and as conception of art..." —Benedetto Croce : *The Essence of Aesthetic*, p. 101. London, William Heinemann, 1921

পুনশ্চ—"...as we observe with the truly great critics, and above all with De Sanctis, in his "History of Italian Literature" and in his "Critical Essays", where he is as profound a critic of art as of philosophy, morality and politics ; he is profound in the one because profound in the other, and inversely : the strength of his pure aesthetic consideration of art is the strength of his pure moral consideration of morality, of his pure logical consideration of philosophy, and so on,"—ঐ. পৃ. ১০৩।

Coleridge, Bradley, ইটালির Benedetto Croce, রুশিয়ার Tolstoy, ফ্রান্সের Henri Bergson, জার্মানির Kant, Hegel, Herder, Schopenhauer, ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া, বৃহত্তর মানবজীবন ও বিশ্বসৃষ্টির চরম এবং পরম লক্ষ্য ও পারণতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রযত্নবান্ হইয়াছেন। যাঁহারা বৌদ্ধ শূন্যবাদিদের ন্যায় সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) তাঁহাদের মতে সাহিত্যের লক্ষণ, রসাস্বাদের লক্ষণ, কোনও কিছুরই যথার্থ লক্ষণ অসম্ভব। কেন না, তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী ভাষার দ্বারা এই বিশ্বের কোনও বস্তুরই, অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম বস্তুরও, যাহাকে আমরা একান্ত পরিচিত বলিয়া মনে করিতেছি, তাহারও প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। সুতরাং কি করিয়া সাহিত্যের লক্ষণ ভাষায় প্রকাশ করিব, কি করিয়াই বা সাহিত্যপাঠের আনন্দ ও রসানুভূতির স্বরূপ ভাষার ভিতর দিয়া বর্ণনা করিব? অতএব কবি সাহিত্যসৃষ্টি করিতে থাকুন, আমরা আনন্দলাভ করি, ইহাই যথেষ্ট। তাহার কার্যকারণতত্ত্ব জানিয়া কি ফল, যখন জানিলেও ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার কোনও উপায়ই নাই? সুতরাং—'মূকত্বৈব বরম্'। আমরা যখন সাহিত্যে রসাভিব্যক্তি বিষয়ে আলোচনা করিব তখন দেখিতে পাইব যে, বিভিন্ন প্রস্থানের দার্শনিকগণ কি ভাবে স্ব স্ব সিদ্ধান্তানুসারে রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বৈদান্তিক, শৈব প্রত্যাভিজ্ঞাবাদী প্রত্যেকেরই মতবাদ পরস্পর-বিভিন্ন। বের্গসঁ তাহার *Laughter* শীর্ষক চিন্তাপূর্ণ পুস্তকে সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া স্বকীয় দার্শনিক মতবাদ— creative evolution—জীবনতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনবাদকেই মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[১]

১. দ্র° "...An idea is something that grows, buds, blossoms and ripens from the beginning to the end of a speech. It never halts, never repeats itself.

ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচকগণের দার্শনিকতার ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠ সাম্য কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনাবিশেষ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। অপর পক্ষে, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। সাহিত্য জীবনের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান—ইহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। সাহিত্য মানবজীবনেরই প্রতিকৃতি মাত্র, যদিও কবিকল্পনা তাহাকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সহৃদয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। সুতরাং মানবজীবন সম্বন্ধে যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যত গভীর, তাহার উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে যাঁহার অনুভূতি যত সুস্পষ্ট—সাহিত্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অভিমত তত গম্ভীর ও তথ্যপূর্ণ হইবে, ইহা বিচিত্র কি? এবং এ কথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবে যে, মানবজীবনের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে দার্শনিক মনীষিগণের অন্তর্দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ? কিন্তু অধুনাতন সাহিত্য-সমালোচকগণের ক্ষেত্রে এই দার্শনিক তথ্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা স্বতন্ত্র ভাবুকতারই অধিক প্রাধান্য।

It must be changing every moment, for to cease to change would be to cease to live. Then let gesture display a like animation! Let it accept the fundamental law of life, which is the complete negation of repetition! But I find that certain movement of hand or arm, a movement always the same, seems to return at regular intervals. If I notice it and it succeeds in diverting my attention, if I wait for it to occur and it occurs when I expect it, then involuntarily I laugh. Why? Because I now have before me a machine that works automatically. This is no longer life, it is automaton established in life and imitating it. It belongs to the comic"—*Laughter*: pp. 31-32 Macmillan and Co. Ltd. 1935

পুনশ্চ—"A continual change of aspect, the irreversibility of the order of phenomena, the perfect individuality of a perfectly self-contained series. Such, then, are the outward characteristics...—which distinguish the living from the merely mechanical. Let us take the counterpart of each of these: we shall obtain three processes which might be called *repetition*, *inversion*, and *reciprocal interference of series*. Now, it is easy to see that these are also the methods of light comedy, and that no others are possible."—ঐ, পৃ ৮৯।

বর্তমানের সমালোচনার ধারা সাহিত্যের সর্বজনীনতা অপেক্ষা বিশিষ্ট কবি-মানসের ইতিহাস ও অভিব্যক্তি লইয়াই বেশি ব্যস্ত। সাহিত্যের— দেশকাল-নিবিশেষে— যথার্থ কি স্বরূপ হওয়া উচিত, সাহিত্যের সার্বজনীন ও সার্বকালিক উদ্দেশ্য ও লক্ষণ কি, সাহিত্যে সৌন্দর্য ও রসোদ্বোধের উপাদান— এই সকল বিষয় অপেক্ষা সাধারণ সমালোচক ও পাঠক বিশেষ বিশেষ কবির সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিতেই যেন অধিকতর আনন্দ লাভ করে। জগতের প্রধান প্রধান সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ কি, তাহাদের মধ্যে লক্ষণীয় সাম্য কোন্ কোন্ বিষয়ে—ইহা জানিবার জন্য সাধারণত ততখানি উৎসাহ ও ঔৎসুক্য নাই। তাহা অপেক্ষা—শেক্সপীয়র-এর বিশিষ্ট নাট্য-প্রতিভার উন্মেষের ইতিহাস আলোচনায়, তাহার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ বিশ্লেষণেই আমাদের উৎসাহ সমধিক। বাংলা সাহিত্যের—বাংলা ভাষার সহিত প্রকৃত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, কিরূপ লক্ষণ, রচনার কি প্রকার শৈলী, যুগধর্মের অনুযায়ী কিরূপ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন—এদিকে আমাদের তত ঔৎসুক্য নাই, যতখানি মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের কাব্যপ্রতিভার ঐতিহাসিকতা জানিবার জন্য আছে।

মোট কথা, সর্বজনীনতা বা বিশ্বজনীনতার দিক হইতে আমরা আমাদের সমালোচনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছি—আমাদের দৃষ্টি এখন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের উপর নিবদ্ধ। বিশিষ্ট বনস্পতির উচ্চতাই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, অরণ্যের সমগ্র শোভা ও বিশালতা আমাদের দৃষ্টিতে পড়িতেছে না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে আমাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তির এই সংকীর্ণতা, আধুনিক সমালোচনাপদ্ধতির এই ক্রমবর্ধমান ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা অনেকটা দূর হইবে। সাহিত্যের বিশ্বজনীন স্বরূপ ও আদর্শ বিশ্লেষণই ভারতীয় সাহিত্য-মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্য, সংস্কৃত নাটক প্রভৃতিই প্রাচীন

ভারতীয় সাহিত্য-মীমংসার মুখ্য উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের যে সকল নির্দেশ, তাহা যে কোনও সাহিত্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। সংস্কৃত উদাহরণ কেবলমাত্র আকস্মিক। উহার স্থলে জগতের যে কোনও সাহিত্যের কাব্য ও নাট্যগ্রন্থ হইতে উদাহরণ দেখাইলেও কোনও ক্ষতি হইত না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মুল অনুশাসনগুলি যে কেবল ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেই উপযোগী তাহা নহে, যে কোনও সভ্যজাতির নাট্যসাহিত্যের গঠনপ্রণালী (architectonics) বিচার করিতে হইলে তাহাদের উপযোগিতা কিছুমাত্র কম বলিয়া বোধ হইবে না। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহার দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে এই বিশ্বমানবতা সমানভাবে লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতীয় মন ক্ষুদ্র দেশের এবং কালের গণ্ডিকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বহু ঊর্ধ্বে উঠিতে শিখিয়াছিল, যেখান হইতে নিম্নের সমস্ত সীমা ও ব্যবধান মিলাইয়া যাইত এক অসীম সমগ্রতার মধ্যে। আজিকার দিনে ভারতীয় সমালোচনা-সাহিত্যের অনুশীলনের ইহাই সর্বপ্রধান প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক ইউরোপীয় বিচারভঙ্গীর সহিত প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সংমিশ্রণ ঘটাইতে হইবে; ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমষ্টিগত সমগ্রতার উপলব্ধি করিতে হইবে; জাতীয়তা ও যুগধর্মের সহিত সর্বজনীন ও সার্বকালিক সত্য—সাহিত্যের মধ্য দিয়া যাহার বাহ্য প্রকাশ, তাহাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে হইবে। তবেই সাহিত্য-মীমাংসার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—ইহাই বিশ্বাস।

সাহিত্যের লক্ষণ

সাহিত্যের লক্ষণ কি। এ সম্বন্ধে আচার্যগণের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ লক্ষিত হয়। কেবলমাত্র শব্দই কি সাহিত্য অথবা কেবলমাত্র অর্থ, কিংবা শব্দ ও অর্থের পরস্পর সংহতি? এখানে বলা বাহুল্য যে, যখন শব্দ ও অর্থকে স্বতন্ত্রভাবে 'সাহিত্য' বলিয়া গণনা করা হয়, তখন তাহাদের প্রাধান্যই মুখ্যভাবে অভিপ্রেত। কেবলমাত্র শব্দকে যাঁহারা 'সাহিত্য' বলেন, তাঁহারা অর্থ হইতে প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অর্থের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। কেননা, শব্দ ও অর্থকে কখনও বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাহারা অবিচ্ছেদ্য। প্রাচীন বৈয়াকরণ আচার্য ভগবান্ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

> জগতে এমন কোনও বিজ্ঞান সম্ভবপর নয়, যাহার সহিত শব্দ অনুস্যূত হইয়া নাই। সমস্ত জ্ঞানই শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।[১]

এই মতবাদ কতদূর সত্য, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। যখনই আমরা কোনও অর্থ চিন্তা করি, তখনই আমাদের সেই অর্থের বাচক শব্দেরও জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা অনুভবসিদ্ধ। সেইজন্যই মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।'. শব্দই জ্ঞান মাত্রের একমাত্র প্রকাশক। অর্থ জ্ঞান হইল, সে যেরূপেই হউক-না কেন, প্রত্যক্ষই হউক, অনুমানই হউক, অথবা স্মরণই হউক, অথচ বাচক শব্দের জ্ঞান হইল না—এইরূপ কল্পনা অযৌক্তিক।

---

১. "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে।"—বাক্যপদীয়।

বিখ্যাত মনীষী Benedetto Croce অর্থজ্ঞানের সহিত শব্দের এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

"...a thought is not thought for us, unless it be possible to formulate it in words ;...we do not say that the words must necessarily be declaimed in a loud voice... ; but it is certain that when a thought is really thought, when it has attained to the maturity of thought, the words run through our whole organism, soliciting the muscles of our mouth and ringing internally in our ears.. "[১]

এখন বুঝা গেল, শব্দ ও অর্থ কেন পরস্পর সম্বদ্ধ। কিন্তু অবিবিক্ত শব্দ ও অর্থের প্রাধান্যবিবেক কি করিয়া সম্ভবপর ? ইহার উত্তরে বলিব, চমৎকারিতা। চমৎকারিতাই এই প্রাধান্যবিচারের একমাত্র তুলাদণ্ড। শব্দ যেখানে অর্থ হইতে অধিকতর মনোজ্ঞ, সেখানে শব্দই প্রধান। অর্থ যেখানে শব্দঝংকার হইতে অধিকতর চমৎকারী, সেখানে অর্থই প্রধান। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ স্বীকার করা যায় কি না, তাহা লইয়া সমালোচক-গণের মধ্যে বিবাদের অন্ত নাই। অনেকে বলিবেন, কাব্য পাঠ করিবার সময় শব্দের মাধুর্যই প্রধানভাবে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে, অর্থের দিকে প্রথমত আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে না। সংস্কৃতে জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দে'র কথাই ধরা যাউক। পদের সৌকুমার্য, ছন্দের লালিত্য, প্রকাশভঙ্গীর কোমলতাই সাধারণ পাঠকের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলে, শ্রোতা তখনকার মত জয়দেবের কবিতার অর্থ বুঝিবার কথা ভুলিয়াই যায়। সাধারণ, 'গীতগোবিন্দে'র শ্রোতা বা পাঠককে যদি হঠাৎ কেহ প্রশ্ন করিয়া বসেন— মহাশয়, জয়দেবের এই কবিতাটির কি অর্থ বুঝিলেন ? তাহা হইলে উত্তর আসিবে "শব্দঃ শ্রুতোঽর্থো ন জ্ঞাতঃ"—আমি শব্দগুলিই শুনিয়াছি, অর্থের প্রতি লক্ষ্য করি নাই। বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় শব্দের এই চমৎকারিতা মুখ্যভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা অস্বীকার করিবার

১. *The Essence of Aesthetic*, pp. 42-43.

উপায় নাই যে, কাব্যপাঠের সময় শব্দের মনোহারিতার দিকেই পাঠকের এবং শ্রোতার হৃদয় উন্মুখ হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবলমাত্র মধুর শব্দ পর পর গাঁথিয়া গেলেই সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, এ কথা কোনও সাহিত্য-সমালোচকই স্বীকার করিবেন না। জয়দেব শব্দচয়নে—আপাতদৃষ্টিতে—কালিদাসের অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তিনি যত মধুর শব্দ বাছিয়া তাঁহার গীতিমাল্য গ্রথিত করিয়াছেন। তথাপি কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের সহিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়নের তুলনা হয় না। কেন? ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে শব্দ ও অর্থের চমৎকারিতা অন্যূনানতিরিক্ত। শব্দ এখানে অর্থের সহিত তুল্যস্কন্ধ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। একটি অপরকে ছাপাইয়া উঠে নাই। মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরবের মুখ দিয়া দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ"—বিধাতা তুল্যগুণ মহারাজ দুষ্যন্ত ও আশ্রমপালিতা শকুন্তলাকে বধূবররূপে সম্মিলিত করিয়া 'তিনি বিসদৃশ নরনারীর সম্মেলনের ঘটক' চিরকালের এই অকীর্তি হইতে মুক্ত হইলেন। দাম্পত্য-পরিণয়ের ক্ষেত্রে বধূবরের অবস্থাসাম্য গুণসাম্য বৃত্তিসাম্য যেমন সকল দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়, শব্দার্থ-পরিণয়ের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম। স্বর্ণকারদুহিতার সহিত কর্মকারতনয়ের বিবাহ কখনই সুষ্ঠু ও সুখাবহ নহে। সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্য-সংসারে কবিকে প্রজাপতির সহিত তুলনা করিয়াছেন, কোনও কোনও অংশে কাব্যস্রষ্টা কবির আসন বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির আসনের বহু ঊর্ধ্বে।[১] সুতরাং কবিপ্রজাপতি যদি তাঁহার

১. "অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে।"—ধ্বন্যালোক।

কাব্য-সংসারের শান্তি শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করিতে চাহেন, তবে শব্দার্থরূপী বধূবরের মিলনের মধ্যে যাহাতে কোনও বৈষম্য না থাকে, উভয়ের পরিণয় যাহাতে গুণসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি জাগ্রত রাখিতে হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কাশ্মীরীয় আলংকারিক বক্রোক্তিজীবিত-কার আচার্য কুন্তক শব্দ ও অর্থের এই গুণসাম্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সমসর্বগুণৌ সন্তৌ সুহৃদাবিব সঙ্গতৌ।
পরস্পরস্য শোভায়ৈ শব্দার্থৌ ভবতো (যথা)॥

—সর্ববিষয়ে সমান গুণশালী বন্ধুদ্বয় যেমন পরস্পরের শোভাবর্ধক, সেইরূপ কাব্যেও সদৃশ গুণবিশিষ্ট শব্দার্থযুগল পরস্পরের সৌন্দর্যের হেতু। সুতরাং অর্থের লঘুত্ব ও গৌরবের সহিত শব্দের মূর্ছনাও আরোহ হইতে অবরোহ পর্যন্ত ঝংকৃত হইবে। 'তোমার আপন সুর কখন ধ্বনিবে মন্দ্ররবে, কখন মঞ্জুল গুঞ্জরণে'। মহাকবিগণের বীণা সপ্ততন্ত্রী, একতন্ত্রী নহে। অপরিণত কবি শব্দ ও অর্থের এই অন্যূনানতিরিক্ত মনোহারিতা অটুট রাখিতে পারে না। হয় অর্থের গুরুত্ব ও সৌন্দর্যের সহিত শব্দের গাম্ভীর্য ও মনোহারিতা সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না; অথবা শব্দের সৌন্দর্য ও ঝংকার বাচ্য অর্থের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করিয়া উঠে। পরিণত কবির হস্তে শব্দ ও অর্থের এই তুল্যস্বন্ধতা বা সৌহৃদ্য কখনও বিঘটিত হয় না এবং শব্দার্থের এই সৌহৃদ্য বা বিশিষ্ট 'সাহিত্য' হইতেই সাহিত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি।[১]

আরও এক প্রকারে সাহিত্য-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা যাইতে পারে। কবি কিসের জন্য কাব্য রচনা করেন? আদি কবি বাল্মীকি রামচন্দ্রের জীবনপট কি জন্য শব্দে অঙ্কিত করিতে গেলেন? কালিদাসই বা কি জন্য বিরহী যক্ষের ব্যাকুল আবেদন তাঁহার অনবদ্য মন্দাক্রান্তায় গ্রথিত করিবার জন্য ব্যগ্র

১. "সাহিত্যমনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্ব-মনোহারিণ্যবস্থিতিঃ ॥"—বক্রোক্তিজীবিত, ১.১৭

হইয়া উঠিলেন ? সংস্কৃত আলংকারিক আচার্য অভিনবগুপ্ত কাব্যরচনোন্মুখ মহাকবি বাল্মীকির চিত্তকে পরিপূর্ণ উচ্ছলিত কুম্ভের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ক্রৌঞ্চবিরহকাতরা চক্রবাকীর শোক বাল্মীকির কবিহৃদয়কে পূর্ণ, আলোড়িত করিয়াছিল—বর্ষাসমাগমে জলরাশি যেমন পরিপূর্ণ সরোবর-বক্ষ আলোড়িত করিয়া তুলে। ক্রৌঞ্চপত্নীর অন্তর্গূঢ় শোক মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়াছিল এবং মহর্ষি বাল্মীকির উদ্বেলিত চিত্ত হইতে শোক শ্লোকাকারে উচ্ছলিত হইয়া পাঠকের হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—যেমন জলাশয় হইতে পরীবাহনিষ্ক্রান্ত জলধারা পার্শ্ববর্তী পল্বল-রাজিকে পরিপূর্ণ করে। এই প্রকারে যক্ষের বিপ্রলম্ভব্যথা মহাকবি কালিদাসের অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং কবি মেঘদূতের মন্দাক্রান্তায় তাঁহার সেই উচ্ছলিত বিয়োগব্যথা শতধারায় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, পাঠকের চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য। এই ভাবে একের চিত্তবৃত্তি অন্যে সংক্রান্ত হইয়াছে,—নায়কের চিত্তবৃত্তি কবিতে এবং কবি হইতে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে। এক প্রদীপ হইতে বহ্নিশিখা যেমন অন্য প্রদীপে সঞ্চারিত হয়, ঠিক সেইরূপে। "নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ"। এই প্রকারে নায়ক, কবি ও সহৃদয়ের মধ্যে যে চিত্তসাম্য বা ভাবসাহিত্য ঘটে, তাহাই কবিকর্মের সাহিত্য ব্যপদেশের মূলে। যেখানে এই ভাবসাহিত্য ঘটে নাই, সেখানে সাহিত্যের লক্ষণ অটুট থাকিতে পারে না,—যতই না কেন শব্দসম্পদ্ ও অর্থগৌরব সেখানে থাকুক। কেন না, কবিহৃদয় সেখানে স্বতই অপূর্ণ রহিয়াছে, সহৃদয়ের চিত্ত পরিপূর্ণ করিবার মত রসসম্ভার তাহাতে সঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং শব্দার্থ-গরিমা যে কেবল রিক্ত-কুম্ভের নিঃস্বন মাত্র হইবে,—তাহা যে উচ্ছলিত রসধারার গম্ভীর কল্লোল হইবে না, ইহাতে আশ্চর্য কি ? সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-মীমাংসক 'হৃদয়দর্পণ'-কার আচার্য ভট্টনায়ক সেইজন্য যথার্থই বলিয়াছেন, "যাবৎ পূর্ণো ন চৈতেন তাবন্নৈব বমত্যমুম্"। আধুনিক বিখ্যাত সমালোচক

অধ্যাপক Lascelles Abercrombie তাঁহার *Principles of Literary Criticism* গ্রন্থে সাহিত্যের লক্ষণ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলিয়াছেন—

"We have seen that every work of literature originates in an experience. It may be any sort of experience : Something may have happened to the author in actual life, or he may have heard a story of something, or some phantasy may have flashed into his mind. But it must be an experience peculiar in one respect ; it must be of a kind to take hold of him and to demand utterance. There might be nothing extraordinary in an experience that merely urged him to express himself, there must be something extraordinary in any experience that urges him to express himself to perfection, and in a way that will also represent his experience to another mind....

"When Shakespeare heard (or read) the story of *Othello*, he took it as a single experience ; the whole matter and import of the tale was seized by him, in a single act of imaginative attention. The wealth of matter in this experience of his is expressed by the texture of the play ; but the final impression of the completed play brings all this wealth of matter in our minds into a single intensity of experience, a single act of imaginative attention, the excitement of which corresponds (so far as we are able to correspond) with the energy of Shakespeare's inspiration."

এখানেও সেই নায়ক, কবি ও সহৃদয়ের চিত্তের ভাবসাম্যের কথাই বলা হইয়াছে, যাহা হইতে সাহিত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি। কিন্তু যদিও এই ভাব-সাহিত্যের উৎপত্তি বিষয়ে কবির প্রতিভা ও শব্দার্থ-যোজনায় তাঁহার কৃতিত্বই মূল উপাদান, তথাপি পাঠকচিত্তের প্রবণতার উপর ইহার অনেকখানি নির্ভর করে। তাই সাহিত্যের সাফল্যের জন্য পাঠকের সহৃদয়তাও সমানভাবে আবশ্যক। আচার্য অভিনবগুপ্ত এই সহৃদয়তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তেঽত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।"

কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যে সকল পাঠকের মনোবৃত্তি নির্মল আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে এবং যাঁহারা কবিবর্ণিত কাব্যবস্তুর সহিত নিজ

নিজ চিত্তবৃত্তিকে অভিন্ন করিয়া তুলিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সহৃদয়।

কবির মনোমুকুরে কাব্যবস্তুর যে বিম্ব উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, সহৃদয় পাঠকের বিশদ চিত্তাদর্শে যখন তাহারই নিখুঁত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবে, কবির চিত্তবীণায় যে মূল রাগিণী ঝঙ্কৃত হইতেছে, সহৃদয়ের হৃদয়তন্ত্রীও যখন তাহারই স্বরে অনুরণিত হইয়া উঠিবে, তখনই কবিকর্ম সার্থক। সেই জন্যই আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচন-ব্যাখ্যার উপোদ্ঘাতে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বলিয়াছেন—

সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যং বিজয়তে।

কবির ভাষায়—

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্মর ফুটে।

'সাহিত্যে'র এই শেষোক্ত ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইলে কেবলমাত্র শব্দাত্মক কবি-সৃষ্টিই যে সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহা নহে, যদিও লৌকিক ব্যবহারে ভাষানিবদ্ধ গদ্য-পদ্যাত্মক সৃষ্টিকেই মুখ্যত 'সাহিত্য'—এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। 'সাহিত্যে'র পরিসর আরও ব্যাপক। ভাষাই কেবলমাত্র ভাবুকের অন্তর্গূঢ় চিত্তবৃত্তির প্রকার, পরচিত্তের সহিত কবিচিত্তের সংযোগ বা সাহিত্য স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম নহে। চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি ললিতকলাও কবি-মনের প্রকাশের বিভিন্ন ভঙ্গি। কালিদাস বা শেক্সপীয়র যেখানে নিজ নিজ অনুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য শব্দকেই উপাদানরূপে নির্বাচন করিয়াছেন, রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, হ্বাগনার প্রভৃতি কলাবিদ্গণ সেখানে যথাক্রমে বর্ণিকা, মর্মর ও রাগিণীকে স্ব স্ব অনুভূতি প্রকাশের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য

একই—প্রকাশভঙ্গিই কেবলমাত্র বিভিন্ন। সুতরাং রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, হ্বাগনার,—কালিদাস বা শেক্‌সপীয়রের সমগোত্রীয়, তাঁহারাও কবি। সম্রাট শাহ্‌জাহান এই হিসাবে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠীর একজন এবং তাঁহার সৃষ্টি তাজমহল জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে গণিত হইবার যোগ্য। লক্ষ্য করিবার বিষয়, আচার্য কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই কবি ও চিত্রকরকে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন—

"তস্মাদেব চ কাব্য-কাব্যোপকরণ-কবীনাং চিত্র-চিত্রোপকরণ-চিত্রকরৈঃ সাম্যং প্রথমমেব প্রতিপাদিতম্"।

এক্ষণে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তাহাই যদি হয়, তবে মৌনী ভাবুকের অন্তর্গূঢ় চিন্তাধারাও তো সাহিত্যরূপে গণিত হইবার যোগ্য? বাল্মীকি যদি রামায়ণ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ না করিতেন, কালিদাস যদি তাঁহার মেঘদূতের কাহিনী বিরহগাথায় গ্রথিত না করিতেন, মাইকেল এঞ্জেলো যদি তাঁহার চিত্তনিহিত সৌন্দর্যের আদর্শ শ্বেতমর্মরের উপর প্রতিবিম্বিত না করিতেন, তবে কি তাঁহাদের কবিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত? তাঁহাদের সকলের অন্তরের মধ্যে তো অস্ফুট শব্দ ও অব্যক্ত অর্থ—একতা প্রাপ্ত হইয়াছে; কবি-ভাস্করের চিত্তপাষাণফলকেই তো সৌন্দর্য আপনাকে প্রতিফলিত করিয়াছে; এবং ইহাই তো আদর্শ সাহিত্য। সেখানে কবি ও শ্রোতা এক, ভাস্কর ও দর্শক সেখানে অভিন্ন। মৌনী ভাবুকহৃদয় সেখানে নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে—কবি, ভাস্কর ও চিত্রকররূপে সে স্রষ্টা, শ্রোতা ও দর্শকরূপে সে সহৃদয়ের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন। অতএব অলিখিত কাব্য, অচিত্রিত আলেখ্য, অগীত রাগিণী—এ সকলই কি 'সাহিত্য'? সংস্কৃত আলংকারিক সম্প্রদায় ইহার সমাধান অতি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের সাহিত্যগুরু আচার্য ভট্টতৌত তাঁহার অধুনালুপ্ত 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থে বলিয়াছিলেন—

নানৃষিঃ কবিরিত্যুক্তমৃষিশ্চ কিল দর্শনাৎ।
বিশুদ্ধভাবনাজ্ঞানতত্ত্বপ্রথ্যা চ দর্শনম্॥
দর্শনাদ্ বর্ণনাচ্চাপি রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ।
তথাহি দর্শনে স্বচ্ছে নিত্যেঽপ্যাদিকবেমু্নেঃ।
নোদিতা কবিতা লোকে যাবজ্জাতা ন বর্ণনা॥

আদিকবি বাল্মীকির কবিদৃষ্টি যদিও শাশ্বত ও অপ্রতিহত, তথাপি ততদিন জগতে (রামায়ণ) কবিতার উদ্ভব হয় নাই, যতদিন না তিনি তাঁহার মানসোপলব্ধ রামায়ণ-কাহিনী ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিয়াছিলেন।

অতএব মৌনী কবির কবিত্ব তাঁহার নিজদৃষ্টিতে হয়তো অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তিনি নিজেই হয়তো তাঁহার অপ্রকাশিত কাব্যের স্রষ্টা ও রসয়িতা হইতে পারেন ; তখন তিনি 'হৃদয়কবি'।[১] কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে কবিত্ব তখনই সার্থক, যখন কবি তাঁহার স্বোপলব্ধ অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; চিত্রকরের সৃষ্টিশক্তির চরম পরিপূর্ণতা তখনই, যখন তিনি অন্তরের আলেখ্য বাহ্য বর্ণসমাবেশের দ্বারা চিত্রে রূপায়িত করিতে পারিয়াছেন ; ভাস্কর্য তখনই সফল, যখন ভাস্কর তাঁহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যমূর্তি পাষাণবক্ষে প্রতিফলিত করিয়া বিশ্বের দর্শকসমাজের উদ্দেশে উপহার দিতে পারিয়াছেন।[২] শব্দই কবিত্বের বাহ্যপ্রকাশ, তাহার মধ্য দিয়াই কবিত্ব মূর্তি

---

১. 'যো হৃদয় এব কবতে নিহ্নুতে চ স হৃদয়কবিঃ'—রাজশেখরঃ 'কাব্যমীমাংসা', পৃ. ১৯ (GOS. Edition)

২. "Thought, musical fancy, pictorial image, did not indeed exist without expression, they did not exist at all, previous to the formation of this expressive state of the spirit. To believe in their pre-existence is simplicity, if it be simple to have faith in those impotent poets, painters, musicians, who always have their heads full of poetic, pictorial, and musical creations, and only fail to translate them into external form, either because, as they say, they are impatient of expression, or because technique is not sufficiently advanced to afford sufficient means for their expression ..."—Benedetto Croce : *The Essence of Aesthetic*, p. 43.

পরিগ্রহ করে। এই শব্দকে পৃথক করিয়া লইলে কবিত্ব অশরীরী আত্মার ন্যায় অপ্রত্যক্ষ, অগম্য, অনুপলভ্য। এইজন্যই প্রাচীন আলংকারিক আচার্য দণ্ডী বলিয়াছেন,—'শরীরং তাবদিষ্টার্থ-ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।'[১] অনেকের মতে শব্দ শুধু কাব্যের শরীর নহে,—অর্থবোধক শব্দসমষ্টি হইতে ব্যতিরিক্ত কাব্যবস্তুর পৃথক চৈতন্য বা আত্মা বলিয়া আর কিছুই নাই। যেমন, ভূতচৈতন্যবাদী লোকায়তিকগণের মতে মহাভূতসমষ্টি হইতেই প্রাণিচৈতন্যের উদ্ভব, বিজ্ঞানমাত্রসার আত্মবস্তুর অন্য কোনও পৃথক সত্তাই নাই। কাব্যবস্তুর চৈতন্য বা আত্মার পৃথক অস্তিত্ব আছে কি না,—সে প্রশ্নের পরবর্তী আলোচনায় মীমাংসা করা যাইবে। কিন্তু ইহা ঠিক, শরীরকে বাদ দিয়া আত্মার কোনও নিরাকার অস্তিত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগোচর; পালিভাষায় রচিত 'মিলিন্দপঞ্ঞ্‌হো' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মহারাজ মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের মধ্যে একটি সংলাপ লিপিবদ্ধ আছে। ভদন্ত নাগসেন সেখানে মহারাজ মিলিন্দকে প্রশ্ন করিতেছেন, মহারাজ! আপনি যে রথে আরোহণ করিয়া আমার এই আশ্রমে উপনীত হইলেন, সেই রথ কি প্রকার? মহারাজ, ঈষাই কি কেবলমাত্র রথ? অথবা কেবল অক্ষ, অথবা চক্রসমূহ, অথবা রথদণ্ড, কিংবা তাহাদের সমষ্টি? মহারাজ উত্তর করিলেন, ভদন্ত নাগসেন, ইহারা এক-একটি রথ নয়, ইহাদের সমষ্টিরও রথসংজ্ঞা নয়। নাগসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি মহারাজ! ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথদণ্ড এবং ইহাদের সমষ্টি ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু রথ বলিয়া আপনার ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে? মিলিন্দ কহিলেন, তাহাও নহে। নাগসেন তখন ঈষৎ পরিহাসচ্ছলে রাজাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তবে কি আপনি রথে আরোহণ করিয়া আমার আশ্রমে আসেন নাই? মহারাজ মিলিন্দ তখন নির্বাক।

১. "...If we take from a poem its metre, its rhythm, and its words, poetical thought does not, as some opine, remain behind: there remains nothing. Poetry is born as those words, that rhythm, and that metre."—Benedetto Croce: *The Essence of Aesthetic*, p. 43

শব্দাত্মক সাহিত্যের স্বরূপ বিচারের ক্ষেত্রেও তূষ্ণীম্ভাবই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সত্য বটে, কাব্যের শরীররূপী শব্দ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, রীতি, গুণ,—এই সকল উপাদান পৃথকভাবে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইলে, কাব্যবস্তুর উপলব্ধিগোচর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু শব্দ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, রীতি ও গুণ এই কয়টির সমষ্টিই যে কাব্যের নিঃশেষ উপাদান, ইহাতেও সহৃদয়ের চিত্ত সায় দিবে না। শব্দ, রীতি, গুণ প্রভৃতির মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ, অথচ তাহা শব্দ রীতি প্রভৃতির সহিত অভিন্ন নহে। প্রাতিভ চক্ষু (intuition) দ্বারা যাহা বোধগম্য, তাহাকে বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনা করা দুরূহ। কাব্যশরীর বিশ্লেষণ ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা বেদ্য, কিন্তু তাহার আত্মা অনুভবগম্য। তাহাকেও অপহ্নব করা সম্ভবপর নহে। 'যুক্ত্যা পর্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্নমুভবঃ কয়া' ?

সাহিত্য ও রসতত্ত্ব

১. বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব

নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা আচার্য ভরত 'রস'কে সাহিত্যের বীজরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'রস'বীজ হইতে কাব্যের উৎপত্তি। আবার 'রস'ই কাব্যের ফল—কেন না, কাব্যপাঠের পরিসমাপ্তি রসানুভূতিতে, সহৃদয়ের রসচর্বণায়। এই রসের স্বরূপ কি? 'রস' কাহাকে বলে? সংস্কৃতে 'রস্' ধাতুর অর্থ 'আস্বাদন', এই 'রস' ধাতু হইতেই 'রস'-শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং যাহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহাই 'রস্'। মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ—এই সকলই 'রস', কেন না, বাহ্য জিহ্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদিগকে আস্বাদন করা যায়। সেই জন্যই জিহ্বার অপর নাম 'রসনা'—কেন না, উহার দ্বারা উপরোক্ত ছয়টি বিভিন্ন রসের আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে, উহা আস্বাদনের করণ (instrument, organ)। সাহিত্য-রসের ক্ষেত্রেও ব্যুৎপত্তি একই। এখানেও সেই আস্বাদনই অর্থ। শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, বীভৎস প্রভৃতি 'রস' সমস্তই আস্বাদ্য, কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে। সাহিত্যরসের উপযুক্ত রসনেন্দ্রিয় সহৃদয়ের অন্তরিন্দ্রিয়, তাঁহার অনুভূতপ্রবণ চিত্ত। সাহিত্যিক 'রস' মধুর প্রভৃতি রসের ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, উহা আন্তরেন্দ্রিয়বেদ্য। উহা সাহিত্যের অন্তরতম তত্ত্ব, ঔপনিষদিক ব্রহ্মের মত উহার স্বরূপ গুহানিহিত—'নিহিতং গুহা যৎ'। ভাষার দ্বারা উহাকে স্পর্শমাত্র করা যায়; উহার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় কেবল তাঁহারই নিকট, যিনি উহার অপরোক্ষ মানস অনুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

এই তো গেল 'রস'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত (etymological) অর্থ। কিন্তু রসাস্বাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কি? সহৃদয় শ্রোতা, দর্শক বা পাঠক কি করিয়া অভিনয়দর্শনে বা কাব্যপাঠশ্রবণে রসতত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন? সেই

রসানুভবের নিগূঢ় তথ্যই বা কি? কাব্যপাঠ বা অভিনয়দর্শন হইতে যে রসবোধ হইয়া থাকে, তাহা কি শুধু আনন্দেরই জনক, না, দুঃখময় অনুভূতিও উহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? যদি আনন্দই রসানুভূতির ফল হয়, তবে সে আনন্দের স্বরূপ কি? সাধারণ লৌকিক আনন্দ বা হর্ষ হইতে উহার কি কোনও বৈলক্ষণ্য আছে? রসের শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর কি না? যদি সম্ভবপর হয়, তবে সাহিত্যিক রসের সংখ্যা কয়টি? ঐরূপ বিভিন্নতার কারণই বা কি। এ সকল প্রশ্নই অতি দুরূহ। প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাঁহাদের মনঃসমীক্ষণ বা অনুব্যবসায় (introspection) বলে তাঁহাদের স্ব স্ব মানসিক বৃত্তিগুলির নিগূঢ় বিশ্লেষণ করিয়া রসের স্বরূপ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষণপদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন মানবের মনোবৃত্তির সূক্ষ্ম পরিমাপ, তাহার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। দুরূহ রসতত্ত্বের গবেষণার ক্ষুরধার পথে তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল আত্মসমীক্ষণশক্তির তীক্ষ্ণতা। ইহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাচীন রীতির সহিত আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণাপদ্ধতির সংযোগ ঘটাইতে পারিলে রসতত্ত্বের একটা আধুনিক রুচিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হইতে পারে।

রসতত্ত্বের সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা শব্দের 'অভিধা' শক্তির (function of denotation) দ্বারা প্রকাশ্য নহে। 'রস'কে কখনও কোনও উপায়েই স্পষ্ট কথায় প্রকাশিত করা যায় না। হাস্যরসের অভিনয় দেখিতে গিয়া যদি অভিনেতৃবর্গের পরস্পরের মুখে কেবলই শুনা যায়—'ইহা বড় হাসির কথা', 'আমার বড় হাসি পাইতেছে', তখন প্রেক্ষকবর্গের বদনকমল হইতে যে সকল অমৃতময় বাণী নটগোষ্ঠীর উদ্দেশে বর্ষিত হইতে থাকে, তাহা আদৌ হাস্যরসের অনুরূপ নহে। বাইবেলে আছে, বিধাতা আদেশ করিলেন, 'আলোক হউক', অমনই আলোকের দ্বারা বিশ্ব উদ্ভাসিত হইল। কবি তাঁহার

কাব্যে 'রস হউক' বলিয়া আদেশ করিলেই সহৃদয়ের চিত্তে রসবন্যার প্রাদুর্ভাব হয় না। 'গো' শব্দ শ্রবণ করিলেই যেমন একটি প্রতিনিয়ত প্রাণিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ 'শৃঙ্গার' শব্দটি শ্রবণ করিলেই যদি শ্রোতার হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হইত, তবে রস বাচ্য হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা তো অনুভূত হয় না। বস্তুত যেখানে কোনও বিশিষ্ট রসের বাচক শব্দের দ্বারা সেই রসকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থলে আলঙ্কারিকগণ কবি-প্রতিভার ন্যূনতা লক্ষ্য করিয়া উহাকে কাব্যদোষের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়াছেন। সুতরাং 'রস' বাচ্য নহে। তবে ইহা কি? সাহিত্য-মীমাংসকগণ রসকে 'ব্যঙ্গ্য' বলিয়াছেন, "স এষ পরমো ব্যঙ্গ্যঃ"। 'ব্যঞ্জনা'র দ্বারা রসের বোধ হইয়া থাকে, এবং আভাস ও ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করাই ব্যঞ্জনা-শক্তির বৈশিষ্ট্য। কবি যখন 'করুণ'রসের অবতারণা করিতে যান, তখন কেবলমাত্র হা-হুতাশের দ্বারা তাঁহার কাব্য পূর্ণ করেন না। করুণ রসের ব্যঞ্জনার উপযোগী সামগ্রী তাঁহার কাব্যে সমাবেশ করিয়া থাকেন এবং এই সামগ্রীর যথোপযুক্ত সমাবেশের দ্বারাই কবি সহৃদয় শ্রোতার হৃদয়ে অভিলষিত রস অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। রসাভিব্যক্তির এই সামগ্রী কি? ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে এই সামগ্রীর চারিটি বিশিষ্ট বিভাগ বা শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব এবং সঞ্চারিভাব। ইহাদের প্রত্যেকটিই রসানুভূতির অপরিহার্য উপাদান। বিভাব ও অনুভাব রসাভিব্যক্তির বাহ্য উপাদান, উহারা জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের উপলব্ধি সম্ভবপর। স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব, রসচর্বণার আন্তর উপাদান, উহারা সহৃদয়ের মনোজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উহাদের স্বরূপবিচার পরভাবী।

'বিভাব' শব্দের অর্থ 'কারণ'। কিসের 'কারণ'? রসানুভূতির। মানবের চিত্তবৃত্তির সহিত জড়জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাধারণ দৃষ্টিতে মনোজগতের সহিত জড়জগতের কোন সম্বন্ধই যেন নাই। ইহারা যেন

পরস্পর-অসংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু জড় (matter) ও চৈতন্যের (spirit, mind) মধ্যে এই শাশ্বত দ্বন্দ্বের সমন্বয়সাধনই সমস্ত দর্শনের চরম লক্ষ্য। দার্শনিক পণ্ডিতগণের মনীষা এই দুরূহ সমস্যার সমাধানের জন্যই নিয়োজিত হইয়াছে। জড় ও চৈতন্যের পৃথক ও সমান্তরাল (parallel) সত্তা স্বীকার করিয়া লইলেও উহাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সে সম্বন্ধের নাম, কার্যকারণভাব (causality)। চন্দ্রোদয়দর্শনে আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সমুদ্রবক্ষের মত স্ফীত হইয়া উঠে, জনহীন মরু-প্রান্তর আমাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে; অসংখ্যনক্ষত্রমালাবিভূষিত ছায়াপথখণ্ডিত শারদাকাশের সীমাহীন গভীরতা আমাদের চিত্ত বিহ্বল করিয়া তুলে, আমরা বিধাতার বিশ্বসৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হই, বিস্মিত হই। এই সমস্তই মানবপ্রকৃতির উপর জড়জগতের সুদূর-প্রসারী প্রভাবের নিদর্শন। জড়প্রকৃতির এই দুষ্প্রতিরোধ লীলাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রসিদ্ধ সাহিত্যমীমাংসক আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—"অয়ি জড়প্রকৃতি! তুমি তোমার প্রকৃত সত্তাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া জনগণের হৃদয়কে লইয়া নানা ভঙ্গিতে ক্রীড়া কর, তাহাকে অলক্ষ্যে আক্রমণ করিয়া কত বিবিধ বিলাসে নাচাইতে থাক! অথচ বিশ্বের জনসমাজ নিজের সহৃদয়তার অভিমানে তোমাকেই 'জড়', 'অচেতন' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। আমার মনে হয়, ইহাই সমীচীন, কেন না, জনসমাজই প্রত্যুত 'জড়'। সুতরাং তাহাদের যদি 'জড়' এই আখ্যার দ্বারা নির্দেশ করা হইত, তবে তোমার সহিত তাহারা সমান হইয়া উঠিত। উহাতে কেবল তাহাদের স্তুতিই হইত, নিন্দা নয়।"

আবার কাহাকেও দেখিয়া হয়তো আমরা কুপিত হই, কাহাকেও দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে স্নেহের প্রবাহ বহিতে থাকে। অতএব আমাদের বিভিন্ন পরিবর্তনশীল চিত্তবৃত্তি এই সকল জড়জগতেরই কার্য, জড়প্রকৃতি উহার কারণ। এই সকল কারণকলাপই যখন কবি তাঁহার প্রতিভাবলে কাব্যে বর্ণনা করেন,

তখন ইহাদের 'বিভাব' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যাবহারিক জগতে যখন আমরা ব্যাঘ্র প্রভৃতি দেখিয়া ভীত হই, প্রিয়ার সন্দর্শনে প্রেমাকুলহৃদয় হই, তখন ব্যাঘ্র প্রভৃতি কেবলমাত্র আমাদের চিত্তবৃত্তির প্রতি কারণ, অলৌকিক কারণ মাত্র। কিন্তু কাব্যপাঠজনিত সহৃদয়ের চিত্তে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, উহা লৌকিক অনুভূতি। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' পাঠ করিয়া যে 'উৎসাহ' আমাদের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে, যে বীররসের সঞ্চার হয়, উহা লৌকিক 'উৎসাহে'র সহিত সমপর্যায়ের নহে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', অথবা মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রভৃতি প্রহসন-নাট্যের অভিনয়দর্শনে আমাদের চিত্ত হাস্যরসের আবেগে যে বিকশিত হইয়া উঠে, উহার সহিত সার্কাসের বিদূষকের (clown) মুখভঙ্গি ও অঙ্গবিকারজনিত কৌতুকময় অনুভূতির তুলনা হয় না। মোট কথা, কবিকর্মজনিত যে সকল ভাববিবর্তন আমাদের মনোজগতে লক্ষিত হইয়া থাকে উহারা সর্বথা অলৌকিক, উহাদেরই 'রস' এই বহুমানসূচক সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদেশ করা হইয়া থাকে। লৌকিক ভীতি, লৌকিক শোক, লৌকিক হাস্য, লৌকিক প্রীতির সহিত কবিকর্মসমুদ্ভূত ভয়ানক করুণ হাস্য অথবা শৃঙ্গার-রসের একীকরণ কখনই সম্ভবপর নহে। কবিপ্রতিভার ইহাই অলৌকিকত্ব। এই অলৌকিক প্রতিভাশক্তির স্পর্শেই ব্যাবহারিক জগতে লৌকিক ভীতির ব্যাঘ্র প্রভৃতি যে সকল সাধারণ 'কারণ', তাহাই কাব্যজগতের 'বিভাব'রূপে পরিণত হয়। কাব্যজগতের অন্তর্ভূত কার্য কারণ সমস্তই অলৌকিক,—রস অলৌকিক, বিভাব অলৌকিক, সমুদায়ের মূলে আছে অলৌকিক প্রতিভার স্ফুরণ। সুতরাং ব্যাবহারিক জগতের যাহা কারণমাত্র, কবিকর্মের কাল্পনিক বিশ্বে তাহাই 'বিভাব'। উভয়ে সমগোত্রীয় হইলেও অভিন্ন নহে। একটি লৌকিক, অপরটি অলৌকিক। একটি বিধাতৃবিরচিত বিশ্বের দুর্লঙ্ঘ্য কার্যকারণশৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অপরটি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, মম্মটাচার্যের ভাষায় 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত', কবিপ্রজাপতির শৃঙ্খলহীন যদৃচ্ছাই উহার একমাত্র নিয়ামক,

জড়জগতের নিয়ম উহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, উহারা 'নিয়মের রাজত্বে'র বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

এই 'বিভাব' বা সাহিত্যিক কারণকলাপ আবার দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত—একটির নাম 'আলম্বন'বিভাব, অপরটির নাম 'উদ্দীপন'বিভাব। আলম্বন শব্দের অর্থ বিষয়,—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিষয়। আমাদের চিত্তের যত কিছু বৃত্তি বা বিকার (modification), তাহা কোনও না কোনও একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়। যখন ঘটজ্ঞান হইল,—তখন আমাদের চিত্তের যে জ্ঞানাত্মক পরিণাম (consciousness) সংঘটিত হইল, উহার 'আলম্বন' বা বিষয় একটি নির্দিষ্ট ঘট। মোট কথা, আলম্বন বা বিষয়ই আমাদের চিত্তবৃত্তির মুখ্য কারণ। 'ঘট' না থাকিলে উহাকে আলম্বন করিয়া যে ঘটবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল, তাহা আদৌ সম্ভবপর হইত না। সাহিত্যক্ষেত্রেও সহৃদয়ের যে রসাত্মক চিত্তবৃত্তি, তাহারও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। কোনও একটি বিশিষ্ট কারণকে আলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভাববিকার বা emotion জন্মলাভ করে। ঐরূপ বিভাবকেই সাহিত্যমীমাংসকগণ 'আলম্বন-বিভাব' কহিয়া থাকেন। যেমন, 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে দুষ্মন্তের হৃদয়ে যে রতিভাব বা শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে,—উহার আলম্বনবিভাব শকুন্তলা। কেন না, শকুন্তলা-সন্দর্শনেই মহারাজ দুষ্মন্তের কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ, শকুন্তলাও দুষ্মন্তের দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি অনুরাগপরবশা হন। অতএব, আর একদিক হইতে আলোচনা করিলে শকুন্তলার ভাববিকারের 'আলম্বন-বিভাব' মহারাজ দুষ্মন্ত স্বয়ং। এইরূপে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা পরস্পর পরস্পরের রতিভাবের প্রতি আলম্বন। অন্যান্য রসের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। 'বেণীসংহারে' ভীমের যে রৌদ্ররস, উহার আলম্বন-বিভাব দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণের অপমানজনক বীভৎস দৃশ্য। মেঘদূতের নির্বাসিত যক্ষের 'বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে'র আলম্বন-বিভাব বিরহিণী যক্ষপত্নী। অপর পক্ষে, 'উদ্দীপন-বিভাব' ঠিক এইরূপ অর্থে আমাদের চিত্তবৃত্তির

প্রতি কারণ নহে। উদ্দীপন-বিভাব না থাকিলে আমাদের চিত্তবৃত্তি আদৌ জন্মলাভ করিত না—এইরূপ দাবি করা চলে না। যাহা অস্ফুট ছিল তাহাকে স্ফুট করা, যাহা অর্ধপ্রসুপ্ত ছিল তাহাকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করা, যাহা মুকুলিত ছিল তাহাকে ফলিত করা, যাহা ছিল স্তিমিত তাহাকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তোলাই উদ্দীপন-বিভাবের উপযোগিতা। ইংরেজীতে ইহাকে auxiliary cause বা সহকারি-কারণ বলা চলে। যেমন, সাহিত্যে প্রায়শই বসন্তের আবির্ভাব, প্রেমসঙ্গীত, নায়কনায়িকার অভিসারসজ্জার বর্ণনা শৃঙ্গাররসের অঙ্গরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। এ সমস্তই নায়কনায়িকার প্রীতিকে অধিকতর উজ্জীবিত করিয়া তোলে,—নায়িকার চরণের নূপুরনিক্কণ, তাহার বলয়ের শিঞ্জিতধ্বনি প্রতীক্ষমাণ নায়কের হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তোলে। এই সকলই অনুভবসাক্ষিক। বর্ষাসমাগম বিরহের উদ্দীপন-বিভাব। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতের অনবদ্য মন্দাক্রান্তায় ইহার উদ্বোধন চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, যক্ষের বিরহবেদনাকে উদ্দীপিত করিবার জন্য—"আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে হৃদয়সাগরউপকূল।" অতএব প্রত্যেক রসেরই একটি উপযুক্ত পরিবেশ আছে—এই পরিবেশের উদ্দেশ্য প্রতিপাদ্য রসের উৎকর্ষসাধন, এবং পরিবেশেরই আলঙ্কারিক সংজ্ঞা 'উদ্দীপন-বিভাব'।

অতএব, বিভাবের স্বরূপ বুঝা গেল। এক্ষণে 'অনুভাবে'র স্বরূপ আলোচনীয়। 'অনুভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে 'পশ্চাৎ-(অনু)-ভাবিতা (ভাব)'। প্রশ্ন হইতে পারে: এই পাশ্চাত্ত্য বা পরভাবিতা কাহাকে অপেক্ষা করিয়া? উত্তরে আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন—লৌকিক ভাব বা চিত্তবৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়া। ব্যাবহারিক জগতে আমাদের হৃদয়ে যখন কোনও ভাব উদ্গত হয়, যেমন—ক্রোধ ভয় শোক প্রভৃতি, তখন সেই ভাববিকৃতির অব্যবহিত পরেই শারীরিক বিকার (physical modification) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির নেত্র আরক্ত হইয়া উঠে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়, হস্তের আস্ফালন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল শারীরবিকৃতি

ক্রোধরূপ ভাববিকারেরই অনন্তরভাবি অব্যভিচারি কার্য্য।[১] সেইজন্য ইহারা ক্রোধের 'অনুভাব'রূপে কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, মুখবর্ণের পাণ্ডুতা, রোমাঞ্চ, স্বেদশ্রুতি, পলায়নপ্রবৃত্তি প্রভৃতি শারীরবিকার লৌকিক ভয়াত্মক (fear) চিত্তবৃত্তির কার্য,—সুতরাং ইহারা লৌকিক ভীতির অনুভাব। সংস্কৃত রসমীমাংসকগণ অতি নিপুণভাবে বিভিন্ন চিত্তবিকারের সহচারী অনুভাবসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশ'-গ্রন্থে আন্তর ভাববিকারের সহিত বাহ্য শরীরবিকৃতির নিগূঢ় সম্বন্ধ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের অতুলনীয় মনোবিশ্লেষণনৈপুণ্যে ও পর্যালোচনাশক্তির তীক্ষ্ণতায় সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। অতএব বুঝা গেল, সাহিত্যিক বিভাগ লৌকিক কারণের সমগোত্রীয়, সাহিত্যিক অনুভাব লৌকিক চিত্তবৃত্তিজন্য কার্যের সজাতীয়। কিন্তু অনুভাবের ক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অনুভাব প্রকৃতপক্ষে লৌকিক চিত্তবৃত্তির কার্য হইয়াও সাহিত্যিক রসাত্মক চিত্তবৃত্তির কারণ। বিভাব যেমন সাহিত্যরসের কারণ, অনুভাবও তুল্যরূপে সাহিত্যরসের কারণ। ব্যাবহারিক জগতের 'কার্য' কিরূপে কাব্যজগতে 'কারণে'র পদবীতে উন্নীত হইতে পারে, ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহা বিচার্য। এক্ষণে সাহিত্যিক রসের দুইটি অবশিষ্ট উপাদান 'স্থায়িভাব' ও 'সঞ্চারিভাব', ইহাদের স্বরূপ বিচার্য। পূর্বেই বলিয়াছি, 'স্থায়ী ও সঞ্চারিভাব, রসচর্বণার আন্তর উপাদান',—ইহারা সহৃদয়ের মনোজগতের সহিত সম্পৃক্ত।

মানুষ কখনও বাসনাহীন হইয়া এই জগতে জন্মলাভ করে না। কতকগুলি প্রবৃত্তি তাহার সহজাত—congenital। মহর্ষি গৌতম তাঁহার

১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রত্যাখ্যানকুপিতা লুৎফুন্নিসার বর্ণনা লক্ষণীয়: "ললাটদেশে ধমনীসকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল; জ্যোতির্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল।"

ন্যায়সূত্রে বলিয়াছেন, "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ"। যতদিন রক্তমাংসগঠিত দেহপিঞ্জরের মধ্যে আত্মা বদ্ধ হইয়া থাকিবে, ততদিন পূর্বজন্মের বাসনা বা impression বা প্রবৃত্তিসমূহ তাহার সহিত নিত্য সমবেত হইয়াই থাকিবে। পুনর্জন্মবাদ স্বীকার না করিলেও যদি পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় মানবের ক্রমবিবর্তনবাদ স্বীকার করাও যায়, তথাপি দীর্ঘকালের অভিব্যক্তিবশে যে সকল ভাবনা বা বাসনা মানব-মনে দৃঢ়মূলভাবে রোপিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা বৃদ্ধ হইতে শিশুতে, এক যুগ হইতে অন্য যুগে, সঞ্চারিত হইবেই—তাহাদের বিলোপসাধন কোনও ক্রমেই মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাদের কতকগুলি আমাদের চিত্তের উপরিস্তরে ভাসমান। তখন তাহাদের সত্তা জ্ঞানালোকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি হয়তো মানবমনের গভীরতম স্তরে অজ্ঞাতভাবেই আপন সত্তা বজায় রাখিয়া চলে—তাই বলিয়া তাহাদিগকে অপহ্নব করা যায় না। ইহা Freud-প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিকগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। আমাদের প্রাচীন দার্শনিক আচার্যগণ বহুপূর্বেই এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবজাত শিশুর অপরিচিত পরিবেশ দর্শনে রোদনের মূলে আছে পূর্বজন্মসঞ্চিত ভয়াত্মক বাসনা (instinct of fear)। এইভাবে পূর্বজন্মের অনুভবজনিত সংস্কার-(impression)-রূপেই হউক, অথবা মানব-সমাজের দীর্ঘযুগপ্রবাহী ক্রমবিবর্তনের ফলেই হউক, ভয়, শোক, ক্রোধ, অনুরাগ, হাস, বিস্ময়, জুগুপ্সা, উৎসাহ, শঙ্কা, গ্লানি, অসূয়া, উদ্বেগ, নিশ্চয়—মানবের মনোজগৎ এইরূপ শত শত বিচিত্র বাসনার দ্বারা নিরন্তর শবলিত হইয়া আছে। এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে সাহিত্যমীমাংসকগণ দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, একটির নাম 'স্থায়ী', অপরটি 'সঞ্চারী'। আলংকারিকগণের মতে স্থায়িভাবের সংখ্যা আটটি—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়। স্থায়ী শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ permanent। অপরপক্ষে ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবের (transient states of mind) সংখ্যা

ত্রয়স্ত্রিংশৎ।[১] স্থায়ী ও সঞ্চারিভাবের মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে খুব গভীর নহে। রতি, ভয়, শোক প্রভৃতি ভাব যেমন বাসনা বা সংস্কার রূপে মানবমনের সহিত সম্বদ্ধ—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া প্রভৃতি সঞ্চারিভাবও সংস্কাররূপেই আমাদের মনোজগতের উপাদানরূপে পুরুষপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং উভয়েই সমানরূপে সংস্কার। রতি বা ভয় যেমন instinctive বা সংস্কারপ্রসূত, শঙ্কা অসূয়া প্রভৃতিও তুল্যরূপে instinctive। তবে প্রভেদ কিসে? রতি প্রভৃতি আটটি ভাবই বা কেবল স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইবে কেন? এইরূপ পরিগণনার পক্ষে যুক্তি কি? অভিনবগুপ্তাচার্য তাঁহার ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন: এই আটটি (বা নয়টি) মাত্র ভাবই কেবল স্থায়ী। কেননা, প্রাণী জাত হইবামাত্রই এই কয়টি সংবিদ্ বা বাসনার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সকলেই জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, সুখাস্বাদবিষয়ে তৎপর হইয়া উঠে। ইহারই অপর সংজ্ঞা রিরংসা বা রতি। এইরূপে স্বোৎকর্যাভিমানও তাহার সহজাত বৃত্তি, তাহার ফলে পরকে উপহাস করিবার প্রবৃত্তি তাহার আত্মোপার্জিত। আবার, ঈপ্সিতবস্তুর বিয়োগে তাহার চিত্ত স্বতঃই শোকাকুল হইয়া উঠে, এবং ঐ বিয়োগের যাহা হেতু, সেই বস্তুর প্রতি তাহার চিত্ত কোপপরবশ হয়, সুতরাং এই কোপও প্রাগ্‌ভবীয় বাসনার অঙ্কুররূপে তাহার চিত্তে রোপিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, নিজের শক্তিহীনতা দর্শনে সে সহসা ভয়াকুল হয়। সুতরাং এই ভীতিও তাহার পূর্বজন্মসঞ্চিত বাসনারই লেশমাত্র। এইরূপে উৎসাহ, বিস্ময়, নির্বেদ প্রভৃতি অবশিষ্ট চিত্তবৃত্তিসমূহও তাহার সহজাত সংস্কার। এই সকল চিত্তবৃত্তিবিরহিত হইয়া কোনও প্রাণীই

১. যথা—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, স্বপ্ন, বিবোধ, মাৎসর্য, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস এবং বিতর্ক।

জন্মগ্রহণ করে না।—"ন হ্যেতচ্চিত্তবৃত্তিবাসনাশূন্যঃ প্রাণী ভবতি"। হয়তো ব্যক্তিভেদে এই সকল বাসনার কোনও একটির ন্যূনতা বা আধিক্যমাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। কাহারও 'রাত'-বাসনা প্রবল, অন্য সমস্ত সংস্কার তাহার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া থাকে; কাহারও বা কোপ সমধিক দৃঢ়মূল। অপর পক্ষে, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহ সমুচিত বিভাব বা কারণের অভাবে জন্মমধ্যে একবারও উৎপন্ন না হইতে পারে। যেমন, রসায়নসেবী যোগী তাঁহার দীর্ঘজীবনে একবারের জন্যও গ্লানি বা আলস্য বা শ্রম প্রভৃতি অনুভব করেন না। সমুচিত কারণের দ্বারা এই সকল চিত্তবৃত্তি যদিও-বা অভিব্যক্ত হয়, তথাপি সেই কারণ যখন অপগত হয়, তখন তজ্জনিত গ্লানি, শঙ্কা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহও যুগপৎ ক্ষীণ হইয়া যায়, চিত্তের মধ্যে তাহাদের কোনও চিহ্নই আর অবশিষ্ট থাকে না, অনভিব্যক্ত সংস্কাররূপেও নহে। কিন্তু রতি, উৎসাহ, জুগুপ্সা প্রভৃতি আটটি (বা নয়টি) চিত্তবৃত্তি; আলংকারিকগণের মতে যাহাদের সংজ্ঞা স্থায়িভাব, তাহাদের কখনও সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা যায় না। কোনও একটি বিশিষ্ট বিষয়ে 'উৎসাহ' নষ্ট হইলেও, অপর একটি বিষয়ে 'উৎসাহ' আমাদের চিত্তে অনুবৃত্ত হইয়াই থাকে। হংসপাদিকা যখন 'সকৃৎকৃতপ্রণয়' মহারাজ দুষ্মন্তের রতি বা প্রণয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তখন শুদ্ধান্তের অন্য মহিষীগণও যে মহারাজের প্রণয় হইতে যুগপৎ বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এইরূপ আশঙ্কা ভিত্তিহীন। সেইজন্য মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, 'ন হি চৈত্র একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্ত ইত্যন্যাসু বিরক্ত ইতি'। কোনও একটি বিশিষ্ট রমণীর প্রতি চিত্তের অনুরাগের দ্বারা অন্য রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ অনুমান করা যায় না। যদিও সাময়িকভাবে রতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির কোনও একটি সম্পূর্ণ প্রক্ষীণ বা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে বটে, তথাপি অনাভিব্যক্ত সংস্কাররূপে উহারা চিত্তের অন্তস্তলে গুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। অভিনবগুপ্তাচার্য এই স্থলে একটি উদাহরণের দ্বারা স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইবার চেষ্টা

করিয়াছেন : "স্থায়িভাবসমূহ যেন রক্ত-পীত-নীল-হরিতাদিবর্ণের দ্বারা রঞ্জিত কতকগুলি সূত্র। এবং এই সূত্রের দ্বারাই যেন ক্ষণিক উদয়ব্যয়শালী বিচিত্র লীলাগর্ভ স্ফটিক-কাচাভ্রসকলের ন্যায় স্বচ্ছ ব্যভিচারিভাবসমূহ নিরন্তর গ্রথিত রহিয়াছে। রক্তনীলাদিসূত্রস্যূত স্ফটিকখণ্ডসমূহ যেমন সূত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পদ্মরাগ, মরকত, মহানীল প্রভৃতি বিচিত্র রত্নের আকারে প্রতিভাত হয়, দুইটি স্ফটিকখণ্ডের মধ্যবর্তী অবকাশ যেমন সূত্রবর্ণরঞ্জিত স্ফটিকখণ্ডদ্বয়ের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় প্রোদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ব্যাভিচারিভাবসমূহ রতি, ক্রোধ, হাস, শোক প্রভৃতি স্থায়িসূত্রের বৈচিত্র্যে রঞ্জিত হইয়া উঠে, এবং পূর্বাপর ব্যভিচারিভাবদ্বয়ের সেই প্রতিফলিত বৈচিত্র্যই আবার সূত্র-স্থানীয় স্থায়িভাবকে নব নব ভঙ্গিতে শবলিত করিয়া তাহাদের মধ্যে অপরূপ মনোহারিতা ও আস্বাদনীয়তার সঞ্চার করে। অতএব, দৃঢ়মূল স্থায়িভাব-সমূহই ব্যভিচারিভাবসমূহের একমাত্র ভিত্তি। ব্যভিচারিভাবসমূহের চিত্ত-ভূমির সহিত স্বতন্ত্র, স্থায়িনিরপেক্ষ কোনও যোগ বা সম্বন্ধ নাই। স্থায়ীর ব্যাপক সত্তা হইতেই তাহাদের উদ্ভব ; স্থায়ী হইতে প্রতিবিম্বিত বৈচিত্র্যই তাহাদের সহস্র বিচিত্র বিলাসের মূলে। তথাপি এই প্রতিফলিত বিলাস-বৈচিত্র্যের পুনঃপ্রতিফলনই আবার স্থায়ীকে রমণীয়তা দান করে। এইরূপে স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব পরস্পরোপকারী।[1] স্থায়িভাব সমুদ্রের মত ব্যাপক, উদয়ব্যয়হীন ব্যভিচারিভাবসমূহ সমুদ্রবক্ষের আবর্তের মত, বুদ্‌বুদের মত, কল্লোলের মত পরিবর্তনশীল, বৈচিত্র্যশতশালী। স্থায়ী হইতে ব্যভিচারি-ভাবের জন্মলাভ, স্থায়িভাবেই তাহার স্থিতি, স্থায়ীতেই তাহার অস্তময়।[2] ভরতাচার্য এই আটটি ভাবকেই কি জন্য স্থায়ী বলিয়াছেন, তাহার প্রতি তিনি স্বয়ং কোনও যুক্তি দেন নাই। অভিনবগুপ্তাচার্যই সর্বপ্রথম ভরতাচার্যের

১. অভিনবভারতী, প্রথম ভাগ, পৃ. ২৮৪। অভিনবগুপ্তের উপরিবাণত উদাহরণই পরবর্তী আলংকারিকগণের 'স্রক্‌সূত্রন্যায়ে'র মূলে।

২. দশরূপক ৪.৭ ও ধনিককৃত 'অবলোক' দ্রষ্টব্য।

এই আপাতদৃষ্টিতে যাদৃচ্ছিক বিভাগের দর্শন ও মনঃসমীক্ষণসম্মত ভিত্তি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তী কালের আলংকারিকগণ বোধ হয় 'অভিনবভারতী'র উপরি-উদ্ধৃত অংশটুকু লক্ষ্য করেন নাই। কেন না, এক হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসন'-গ্রন্থেই[১] অভিনবগুপ্তের টীকার ঐ অংশটুকু হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদিও তিনি তাঁহার আকরের (source) নাম উল্লেখ করেন নাই। 'রসগঙ্গাধর'-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কেবলমাত্র ভরতাচার্যের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন, কিছুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি-প্রদর্শনের চেষ্টাই করেন নাই।[২] যেহেতু মুনি রতি, হাস, ক্রোধ, শোক, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং নির্বেদ এই নয়টি মাত্র চিত্তবৃত্তিকে স্থায়িভাবরূপে পরিগণনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা মুনিবচনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; এবং স্থায়িভাবসমূহই যেহেতু ভরতাচার্যের মতে রসপদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেইহেতু সাহিত্যিক রসের সংখ্যাও যথাক্রমে নয়টি— শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। অনেকে বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রসান্তর স্বীকার করিয়াছেন বটে। কিন্তু ভরতাচার্যের মতে উহা অসম্ভব। পুত্রের প্রতি মাতাপিতার যে রতি বা স্নেহ, উহা কখনও স্থায়িভাবরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দেবাদিবিষয়ক রতি, যাহা

১. নির্ণয়সাগর সংস্করণ, পৃ. ৮৩-৮৪ দ্রষ্টব্য।

২. এক স্থলে তিনি ভরতাচার্যকৃত বিভাগের সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সমর্থন খুব সন্তোষজনক হইয়া উঠে নাই : "তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদমীষাং ভাবানাং স্থায়িত্বম্। ন চ চিত্তবৃত্তিরূপাণামেষামাশুবিনাশিত্বেন স্থিরত্বং দুর্লভম্। বাসনারূপতয়া স্থিরত্বং তু ব্যভিচারিষু অতিপ্রসক্তম্—ইতি বাচ্যম্। বাসনারূপাণাম্ অমীষাং মুহুর্মুহুরভিব্যক্তেরেব স্থিরপদার্থত্বাৎ। ব্যভিচারিণাং তু নৈব, তদভিব্যক্তের্বিদ্যুদুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাৎ।"—রসগঙ্গাধর, পৃ. ৩৭ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

হইতে ভক্তির উদ্ভব, তাহাও স্থায়িভাব নহে। উহারা ব্যভিচারিভাব মাত্র;[১] এবং ব্যভিচারিভাব কখনও স্থায়িভাবের মত পূর্ণ, স্বতন্ত্র আনন্দময় অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। স্থায়িভাবেরই কেবলমাত্র সেই শক্তি ও মহিমা আছে। সেইজন্যই ভরতাচার্য স্পষ্টই বলিয়াছেন, "স্থায়িভাবান্ রসত্ব-মুপনেষ্যামঃ।[২] মানবের মনোজগতে স্থায়িভাবের আসন সর্বাগ্রে, স্থায়িভাবটি

---

১. রসগঙ্গাধর পৃ. ৫৬, ৯৪। Watson তাঁহার *Behaviorism*-গ্রন্থে যৌনরতি, পুত্রাদিবিষয়ক রতি প্রভৃতি এবংজাতীয় সমস্ত চিত্তবৃত্তিকেই একশ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "Love responses include "those popularly called 'affectionate', 'good natured', 'kindly',...as well as responses we see in adults between the sexes. *They all have a common origin.*"—C. K. Ogden প্রণীত *The A B C of Psychology* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪০ (London : Kegan Paul. Trench Trübner & Co, Ltd.. 1941)।

২. ব্যভিচারিভাবসমূহ যে রস বা emotion রূপে পরিণত হইতে পারে না,—ইহা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারাও চিত্তবৃত্তিগুলিকে স্থায়ী ও ব্যভিচারী—এই দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। অধ্যাপক Ogden, belief ও doubt—প্রাচ্য সাহিত্যমীমাংসকগণের মতে যে দুইটি চিত্তবৃত্তিকে যথাক্রমে 'মতি' ও 'বিতর্ক' এই দুইটি ব্যভিচারিভাবের সহিত তুলনা করা যায়—তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "It remains to discuss two other topics *which less evidently come under the heading of emotional phenomena*, One of these includes belief, doubt, perjudice, and so forth ; the other deliberation, resolve, and the fluctuations of the will... But when we analyse the states of consciousness known by these names we find that the distinctive character of a crisis of belief or doubt is a feeling of the same general kind as joy, for example, or fear, though unique in flavour. Expectation, bare assent, and familiarity are examples of such belief feelings. *They are generally less intense than emotions*, although pathological forms of doubt and ecstatic belief are not infrequent."—*The A B C of Psychology* পৃ. ২০৫-৬ : 'সংশয়' বা 'নিশ্চয়' কখনও কোনও ব্যক্তির মুখ্য চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না। যদি হয়,—তাহার নিজের অস্তিত্ব বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হইবে, যাহার পরিণাম মানসিক অপমৃত্যু—'সংশয়াত্মা

যেন বীণার মূল স্বর, ব্যভিচারিভাবসমূহ তাহারই যেন অনুরণন—Harmonics শাস্ত্রে যাহাকে বলা হয় undertone। ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের (৭. ৮) এক স্থলে বলিয়াছেন, "মানবের মধ্যে নরপতি যেমন শ্রেষ্ঠ, শিষ্য-সংসদে গুরু যেমন বরেণ্য, সেইরূপ ভাবসমাজে স্থায়িভাব সর্বাপেক্ষা মহান্।" সেই স্থায়িভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্যই সাহিত্যের যতকিছু সামগ্রী,—বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, তাহাদের সমাবেশবিষয়ে কবি তৎপর হইয়া থাকেন। আমরা রসচর্বণার উপাদানসমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম।

বিনষ্টি'। Ogden বলিয়াছেন—"...in doubting manias everything can be doubted. The patient may sometimes even doubt whether he exists."—ঐ, পৃ ২০৭। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সংশয় বা নিশ্চয় বা অন্যান্য চিত্তবৃত্তি যাহাদের ব্যভিচারিভাবরূপে পরিগণনা করা হয়, তাহারা চিত্তের মধ্যে কোনও স্থায়ী সংস্কার বা impression রাখিয়া যাইতে পারে না; "It may be that the intensity of the belief-feeling is no criterion of the permanence of the disposition which it leaves behind. Many people who experience the most intense beliefs are also the most changeable and instable in their conviction."—Belief (মতি) doubt (বিতর্ক) প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবগুলি যে মূলত কতকগুলি স্থায়িভাব—যেমন রতি, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হয়, এবং তাহারা পরস্পর যে পরস্পরের মধ্যে নবীনতা ও বৈচিত্র্য আধান করিয়া থাকে, ইহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন: "As a rule,...the belief or doubt feelings are very subtly interwoven with the other emotions. We rarely believe strongly unless some emotion—it may be joy or fear, pride or humility—is reinforcing the belief. And doubt, more evidently, perhaps, is commonly dependent upon a prior clash of interests and a resultant emotion...But if *these intellectual feelings spring from other emotions they also give rise to them*, since they modify so fundamentally the course of our responses."—ঐ পৃ ২০৭। স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যমীমাংসকগণের মতবাদের সহিত আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকগণের এতগুলি বিষয়ে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সংবাদ সত্যই বিস্ময়কর। উদ্ধৃত ইংরেজী সন্দর্ভটির সহিত অভিনবগুপ্তাচার্যের স্থায়ী ও ব্যভিচারিভাবের পার্থক্যপ্রদর্শক যুক্তিসমূহ তুলনীয়।

২. "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"

ভরত : নাট্যশাস্ত্র

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যাতা ছিলেন।[১] আজ শুধু অভিনবগুপ্তাচার্যের 'অভিনবভারতী'ই বর্তমান। 'বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'—এইটি ভরতাচার্যের রসসূত্র। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজনের মত সাহিত্যমীমাংসকগণ কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত—এই চারিজনই ভারতীয় রসসূত্রের প্রধান ভাষ্যকার। আমরা যথাক্রমে তাঁহাদেরই মত আলোচনা করিব। মম্মটাচার্যও তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশে' এই ক্রমই অনুসরণ করিয়াছেন।

ভারতীয় রসসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য পর্যালোচনার পূর্বে আমাদের কয়েকটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমত, উপরি-উদ্ধৃত রসসূত্রে কেবলমাত্র বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাব—যথাক্রমে এই তিনটি পদার্থেরই উল্লেখ আছে, স্থায়িভাবের কোনও উল্লেখ মহর্ষি করেন নাই। দ্বিতীয়ত, 'সংযোগ' শব্দটির অর্থ মহর্ষির কিরূপ অভিপ্রেত ছিল তাহা অতিশয় সন্দিগ্ধ। তৃতীয়ত, 'নিষ্পত্তি'-শব্দের অর্থও স্পষ্ট করিয়া মহর্ষি নির্দেশ করেন নাই। ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যানভেদের এই তিনটিই মুখ্য কারণ। ভট্টলোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত, প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে সন্দিগ্ধ স্থলের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। আমরা প্রথমত ভট্টলোল্লটের মতেরই পর্যালোচনা করিব।

৩. ভট্টলোল্লট : উৎপত্তিবাদ

ভট্টলোল্লট বলেন : 'কাব্য' বা 'নাট্য' হইতে যে 'রস'বোধ হয়, উহা পাঠক বা প্রেক্ষক সমাজের পক্ষে গৌণ। পাঠক অথবা প্রেক্ষক, সাধারণভাবে

১. "ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোল্লটোদ্ভটশঙ্কুকাঃ।
ভট্টাভিনবগুপ্তশ্চ শ্রীমান্ কীর্তিধরোঽপরঃ॥"—সঙ্গীতরত্নাকর

কোনও সহৃদয়ের চিত্তেই মুখ্যভাবে 'রসে'র উৎপত্তি হয় না। তবে রসের মুখ্য বা প্রকৃত আশ্রয় কে? কবি, সহৃদয়, অনুকর্তা নট, অথবা অনুকার্য দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রভৃতি নায়কনায়িকা? ঐতিহাসিক (অথবা কাল্পনিক বা পৌরাণিক যাহাই বলা হউক না কেন) দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র অবলম্বন করিয়া যেখানে নাট্যের অভিনয় হইতেছে, সেখানে দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীগণ, ইংরেজীতে যাহাদের ড্রামাটিস্ পার্সনি *(dramatis personæ)* বলা হইয়া থাকে, তাঁহারা অনুকার্য, এবং যে সকল অভিনেতা তাঁহাদের 'রূপ' গ্রহণ করেন, ঐ সকল চরিত্রসমূহের 'অনুকরণ' করিয়া প্রেক্ষকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করেন, তাঁহারা 'অনুকর্তা'। কেননা, নাট্য লোকবৃত্তেরই অনুকরণ মাত্র। ভরতাচার্য নিজেই বলিয়াছেন: 'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি।' সুতরাং দুষ্মন্ত, শকুন্তলা প্রভৃতি পাত্রপাত্রী নাট্যে 'অনুকার্য,' এবং কুশীলবগণ সেই সকল ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক চরিত্রেরই 'অনুকর্তা'। এক্ষণে, কবি, সহৃদয়, অনুকার্য এবং অনুকর্তা, এই চারিজনের মধ্যে রসের মুখ্য আশ্রয় কে? ভট্টলোল্লট বলেন: 'অনুকার্য'ই প্রকৃতপক্ষে রসের আশ্রয়, তিনিই যথার্থ রস অনুভব করিয়া থাকেন। শকুন্তলা-বিষয়ক যে শৃঙ্গাররস উহা মুখ্যত ঐতিহাসিক (অথবা পৌরাণিক) দুষ্মন্তের পক্ষেই সম্ভবপর। এবং ঐ 'রস' বিভাব অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের পরস্পর 'সংযোগে' সেই ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের হৃদয়ে 'উৎপন্ন' হইয়াছিল। লোল্লটাচার্যের মতে—রসসূত্রের অন্তর্গত 'নিষ্পত্তি' পদটির অর্থ উৎপত্তি অথবা প্রোডাক্শন। 'উৎপত্তি' বলিতে আমরা 'অভূত-প্রাদুর্ভাব' বুঝিয়া থাকি। 'যাহা ছিল না তাহা হওয়া'—ইহার নাম 'অভূত-প্রাদুর্ভাব', ইহারই নাম উৎপত্তি। মৃত্তিকা হইতে ঘটের 'উৎপত্তি' হয়, কেন-না, ঘট পূর্বে ছিল না, ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ। মৃত্তিকা ইহার উৎপাদক কারণ। সেইরূপ 'রস ও একটি অপূর্ব বস্তু। ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের চিত্তে যে রসের প্রাদুর্ভাব উহা 'অভূত-প্রাদুর্ভাব'। পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না, সেই জন্য উহা অপূর্ব। অতএব 'রসনিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ

'রসোৎপত্তি'। সেই জন্য ভট্টলোল্লট সাহিত্য-মীমাংসকগণের মধ্যে 'উৎপত্তি-বাদী' বলিয়া পরিচিত।

ভাল কথা, ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের হৃদয়ে 'রস' যে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু এই 'উৎপত্তি'র প্রতি কারণ কোন্‌টি? "বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের 'সংযোগ'বশত রসের উৎপত্তি হয়"— ইহাই তো ভরতাচার্যের রসসূত্রের আপাতদৃষ্টিতে সরল অর্থ। কিন্তু 'সংযোগ' শব্দটির অর্থ কি? রসোৎপত্তির প্রতি উহাদের পরস্পর উপযোগিতাই বা কতটুকু? উত্তরে লোল্লটাচার্য বলেন: 'সংযোগ'-শব্দের সাধারণ অর্থ 'সম্বন্ধ'। কিন্তু সম্বন্ধ তো নানাপ্রকার হইতে পারে। কার্যকারণভাব হইতে পারে, জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপকভাব হইতে পারে, উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব হইতে পারে, আশ্রয়াশ্রয়িভাব হইতে পারে। আরও কত প্রকার যে হইতে পারে, তাহার কোনও ইয়ত্তা নাই। তবে, রসসূত্রে সম্বন্ধবাচক 'সংযোগ'-শব্দের বিশিষ্ট অর্থ কি? কোন্ বিশেষ সম্বন্ধটি ইহার দ্বারা বোধিত হইতেছে, কাহার সহিতই বা এই সম্বন্ধ? ভট্টলোল্লট বলেন: রসসূত্রে 'সংযোগ'-শব্দটি তিনটি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে। কেননা, বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের সহিত রসাত্মক চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধ তিন প্রকার। বিভাবের সহিত রসের উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব সম্বন্ধ, অনুভাবের সহিত গম্য-গম্যকভাব সম্বন্ধ, এবং ব্যভিচারিভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ পোষ্য-পোষকভাব। একই 'সংযোগ'পদ বিভিন্ন পদের সহিত অন্বয়বশে তিনটি বিভিন্ন সম্বন্ধবিশেষের বোধক।[১] লোল্লটাচার্যের মতে রতি প্রভৃতি আটটি স্থায়িভাবই 'রস'— স্থায়িভাব ও রসাত্মকচিত্তবৃত্তির মধ্যে কোনও স্বরূপগত বৈষম্য নাই। উহারা পরস্পর অভিন্ন। ঐতিহাসিক মহারাজ দুষ্মন্তের হৃদয়ে শকুন্তলা-বিষয়ক রতিভাবের

১. এতদ্বিবৃণ্বতে ভট্টলোলটপ্রভৃতয়ঃ—"স্থায়িনাং বিভাবেন উৎপাদ্যোৎপাদকভাবরূপাদ্, অনুভাবেন গম্যগমকভাবরূপাদ্, ব্যভিচারিণা পোষ্যপোষকভাবরূপাৎ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরুৎপত্তিঃ অভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চেত্যর্থঃ।—গোবিন্দঠক্কুরকৃত কাব্য-প্রদীপ, পৃ. ৬৩ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—যাহাকে সাহিত্য-মীমাংসায় পারিভাষিক 'শৃঙ্গার'-শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। উহার পূর্বে কোনও অস্তিত্ব ছিল না। শকুন্তলাই ঐ রতিরূপ স্থায়িভাবের আলম্বনবিভাব, উহার 'উৎপত্তি'র প্রতি কারণ। অতএব, 'রস' অথবা স্থায়িভাবের সহিত বিভাবের সম্বন্ধ উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব। কিন্তু মহারাজ দুষ্মন্তের হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের 'উৎপত্তি' হইয়াছে, ইহা লোকে বুঝিবে কিসে? পরচিত্ত তো সর্বদাই পরোক্ষ। একজনের আন্তর চিন্তাধারা আর একজনের নিকট অজ্ঞাত—ইহা তো সর্ববাদিসম্মত সত্য। তবুও বাহ্য শারীরচেষ্টাসমূহ দুইটি অপরিচিত মনোজগতের মধ্যে পরিচয়ের সেতু স্থাপনা করে। নতুবা, লৌকিক সমস্ত ব্যবহার অচল হইয়া পড়িত। আমরা ভ্রূভঙ্গ, আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা, ভাষণ প্রভৃতির দ্বারা পরচিত্তের অন্তর্গূঢ় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে পারি। মনোজগৎ পরোক্ষ বটে, কিন্তু আকার ইঙ্গিত প্রভৃতি সমস্তই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ধূম যেমন অদৃশ্য বহ্নির জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ শারীরবিকৃতিসমূহও, যাহাদিগকে সাহিত্য-মীমাংসাশাস্ত্রে পারিভাষিক 'অনুভাব' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করা হইয়া থাকে, পরোক্ষ আন্তর বৃত্তিসমূহের গমক। সুতরাং 'রস' ও 'অনুভাবে'র মধ্যে গম্য-গমকভাবসম্বন্ধ—ধূম ও বহ্নির মত। 'রস' গম্য বা অনুমেয়; আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা প্রভৃতি 'অনুভাব' গমক বা অনুমাপক।[1] এক্ষণে ব্যভিচাবিভাবের রসোদ্বোধের প্রতি উপযোগিতা কতটুকু?

১. **এখানে সাধারণ দর্শক বা সামাজিকের পক্ষ হইতেই 'অনুভাব'সমূহের নায়কগত রসানুভূতির প্রতি 'গম্য-গমকভাব' প্রতিপাদন করা হইয়াছে। টীকাকারগণও লোল্লটাচার্যের মতের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু নায়কগত রসানুভূতির পূর্ণতাও অনেকটা তাঁহার স্বকীয় অনুভাবের উপরই নির্ভর করে। অনুভাবসমূহ শুধু যে সাধারণের নিকটেই নায়কগত রসাত্মক চিত্তবৃত্তির গমক, তাহা নহে,—নায়কের স্বকীয় রসও অনুভাবসমূহের দ্বারাই তাঁহার নিকট উদ্বোধিত হইয়া থাকে। এমন কি, অনেক আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্ (যেমন James, Lange প্রভৃতি) শারীরবিকৃতি বা**

সত্য বটে, 'বিভাব' রস অথবা স্থায়িভাবের উৎপত্তির প্রতি কারণ (efficient cause), এবং 'অনুভাব'সমূহ সেই উৎপন্ন স্থায়িভাবের গমক।

অনুভাবসমূহকে রসানুভূতি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। রস বা emotion কেবলমাত্র জায়মান অনুভাবসমূহের সমষ্টি মাত্র,—কোনও পৃথক পদার্থ নহে। শারীরবিকৃতি হইতে আমাদের রসবোধের কোনও পৃথক সত্তা নাই। আমার 'ক্রোধ' বা 'রৌদ্ররস' আর কিছুই নহে,—উহা কেবল আমার নয়নের রক্তিমা, ভ্রুভঙ্গ, করাস্ফালন, পরুষভাষণ প্রভৃতি শারীরবিকার বা অনুভাবেরই সমষ্টি বা aggregate মাত্র। এই দিক দিয়া বিচার করিলে অনুকার্যগত মুখ্য রসানুভূতির প্রতি অনুভাব-সমূহও বিভাবের মতই উৎপাদক কারণ,—যদিও দর্শকের দৃষ্টিতে উহারা অনুকার্যগত রসের বা স্থায়িভাবের 'অনুমাপক' হইতে পারে বটে।

দ্রষ্টব্য : "James says, 'Bodily changes follow directly the perception of the exciting fact, and our feeling of the same changes as they occur *is* the emotion.'...Certainly, in my opinion, no case can be made out against its main contention, namely, that the experiences, feelings or states of mind which we call *'emotions' are caused by, and are absolutely dependent upon, bodily changes.* If there were no bodily changes, if consequently the field of consciousness were to contain no sensations of endosomatic origin, there could be no emotion.

"Nor do I see any great weight in the criticisms which have been brought against the use of the word *is* in the passage cited above. It has been pointed out that to say "our feeling of the [bodily] changes as they occur (i. e. the sum total of the endosomatic sensations) *is* the emotion", is to assert an identity between the emotion and the sensation, and that although there may be *a causal connexion between the sensation and the state of mind we call emotion*, this is not logically equivalent to identity. But, as against this. I would contend that the connexion between the endosomatic sensations, and the affective component of the total mental state (i. e. the 'emotion') is precisely the same as that between any other sensation and the change in consciousness produced thereby. So far as *mind* is concerned, sensations emanating from my own body are just external, just as much 'given *ab extra*' as those emanating from what I describe as 'objects' outside my body, and should be treated in the same way as the latter. 'If we say that the change in consciousness produced by an ordinary visual sensation *is* 'perception,' I do not see that we have any right to deny that the change in consciousness

কিন্তু, স্থায়িভাবের উৎপত্তিকেই কেবলমাত্র রস বলা যায় না,—উহা যতক্ষণ না অন্যান্য সহকারিগণের দ্বারা উপচিত হয়, ততক্ষণ পূর্ণ আস্বাদময় পরিণতি লাভ করিতে পারে না। 'বিভাব' রসবীজের উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে বটে, এবং অনুভাব উহার সত্তা সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়া দিতে পারে বটে, তথাপি ঐ বীজের মধ্যে যে পূর্ণ ফলপুষ্পবিশোভিত বনস্পতির সম্ভাবনা নিহিত আছে, তাহা তখনই সফলতা লাভ করিতে পারে, যখন 'ব্যভিচারিভাব'রূপ সহকারিকারণের দ্বারা ঐ রসাঙ্কুরের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। শঙ্কা, অসূয়া, বিতর্ক, নির্বেদ, গ্লানি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব শৃঙ্গাররসকে পরিপূর্ণ আস্বাদ্যতা দান করে। শকুন্তলার প্রতি মহারাজ দুষ্যন্তের রতিভাব কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আপন পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কণ্বের তপোবনে রূপমুগ্ধ মহারাজ দুষ্যন্তের হৃদয়ে শকুন্তলার জন্মবিষয়ে 'বিতর্ক', রাজসভায় উপনীতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুর্বাসার শাপপ্রভাবে দুষ্যন্তের আকস্মিক 'মোহভাব', অতঃপর শকুন্তলার অন্তর্ধানের পর ক্রমশ মহারাজের পূর্ববৃত্তান্ত 'স্মরণ', এবং তজ্জনিত আত্মধিক্কার বা 'নির্বেদ'—এইরূপ কত বিচিত্র ব্যভিচারিভাবের সমাবেশের দ্বারা মহারাজ দুষ্যন্তের শকুন্তলাবিষয়ক 'রতি' শবলিত হইয়া উঠিয়াছে, পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, 'বিষমশিলাসঙ্কট-

---

produced by a different kind of sensation (i. e. a visual or other endosomatic sensation) *is* 'emotion'...''—W. Whately Smith : *The Measurement of Emotion*, পৃ. ১৮-১৯. (London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd. 1922)

লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, উদ্ধৃত মন্তব্য 'লৌকিক' রসের সম্বন্ধেই প্রধানভাবে প্রযোজ্য। ভট্টলোল্লটের মতেও যাহা 'মুখ্য রস', অর্থাৎ যাহা অনুকার্য দুষ্যন্তপ্রমুখনায়কনিষ্ঠ স্থায়িভাব, তাহাও 'লৌকিক' রসমাত্র,—সাহিত্যিক 'রস' নহে। সাহিত্যিক রস 'অলৌকিক',—কেন-না, সে স্থলে দেশ, কাল, অবস্থা, অহংতা, মমতা প্রভৃতি আত্মার বা বিজ্ঞানধারার যত কিছু কাল্পনিক ও অবাস্তব পরিচ্ছেদ বা limitation, সে সমস্তই তখনকার মত অবলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু লৌকিক রসানুভূতির ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানসন্ততির এই সকল পরিচ্ছেদই বজায় থাকে। পরে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

স্খলিতবেগ' নদীপ্রবাহের মত গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও মন্দ হইয়া যায় নাই। এখন বুঝা গেল, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের রসোৎপত্তির প্রতি উপযোগিতা কতটুকু। শুদ্ধ বিভাব, শুদ্ধ অনুভাব, অথবা শুদ্ধ সঞ্চারিভাবের দ্বারা প্রকৃত রসবোধ সম্ভবপর নহে। ইহাদের পরস্পর সংহতির দ্বারাই চরম পরিপূর্ণতা ও সুনিশ্চিত বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর।[১]

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে,—নাট্যের অভিনয়দর্শনাবসরে সত্যসত্যই কি প্রেক্ষকসমাজের হৃদয়ে অনুকার্য দুষ্যন্তাদিনায়কগত রসেরই কেবলমাত্র বোধ জন্মে? তাহাদের কি এইরূপ জ্ঞান হয় যে, "ঐতিহাসিক মহারাজ দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতি রতিমান্"? অনুভব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সত্য বটে, ঐতিহাসিক দুষ্যন্তেই শকুন্তলা-বিষয়ক রতিভাব বাস্তব। কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান তো সামাজিকগণের চিত্তে উদ্ভূত হয় না? সামাজিকগণ দুষ্যন্ত-শকুন্তলাদি নায়কনায়িকার অনুকরণশীল নট বা অভিনেতাদিগকেই ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত শকুন্তলা প্রভৃতি রূপে মনে করিয়া থাকেন। নাট্যদর্শনের সময় অভিনয়নিপুণ দুষ্যন্তরূপী নটকে দেখিয়া—'এই ব্যক্তি দুষ্যন্ত নহেন, কিন্তু নট মাত্র'—সামাজিকগণের এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ভেদপ্রতীতি হয় না। 'এই ব্যক্তিই মহারাজ দুষ্যন্ত, ইনিই শকুন্তলার প্রতি রতিমান্'—নটকে দেখিয়া এইরূপ অভেদবোধই বরং সামাজিকগণের পক্ষে অধিকতর সমীচীন। কিন্তু, সত্য সত্যই তো অনুকর্তা নট, এবং অনুকার্য ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত প্রভৃতি পাত্রপাত্রী অভিন্ন নহে, সত্য সত্যই তো নটের চিত্তে শকুন্তলাবিষয়ক শৃঙ্গাররস বাস্তব নহে। এমন কি, নট যতই অভিনয়নিপুণ হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে কোনও 'রস' অনুভব করিয়া থাকে কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। সুতরাং প্রেক্ষকগণের এইরূপ প্রতীতি কিরূপে সমর্থন করা যায়? ভট্টলোল্লট ইহার

১. "এবং চ বিভাবৈরীষদ্ অভিব্যক্তিঃ, অনুভাবৈঃ স্ফুটা, ব্যভিচারিভিঃ স্ফুটতরা—ইতি সমুদায়-জন্যাভিব্যক্তিরেব রসত্বাপাদিকেতি।"—বৈদ্যনাথ-বিরচিত কাব্যপ্রদীপটীকা, পৃ. ৬২।

উত্তরে বলেন : সত্য বটে, অনুকর্তা নট অনুকার্য দুষ্মন্তাদি পাত্রপাত্রী হইতে ভিন্ন, এবং সে কখনও অনুকার্যনিষ্ঠ মুখ্যরসের বাস্তব আশ্রয় হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিকগণের যে নট ও অনুকার্য নায়কের মধ্যে অভেদবোধ হইয়া থাকে, এবং তাঁহারা যে নটকেই বাস্তবিকভাবে মুখ্যরসের আধার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, ইহাও যে একেবারেই যুক্তিবর্জিত ও আকস্মিক, তাহাও নহে। নটকে তাঁহারা অনুকার্য নায়কের সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন, এবং এই অভেদবোধ 'আরোপমূলক'। আমরা সুন্দর শিশুমুখকে চন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করি—মুখে চন্দ্রত্বের 'আরোপ' করিয়া থাকি। ইহার মূলে আছে মুখ ও চন্দ্রের মধ্যে সৌন্দর্য বিষয়ে সাধর্ম্য। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও দুষ্মন্ত ও নটের মধ্যে যে অভেদবোধ, তাহারও মূলে আছে উভয়ের সাধর্ম্য। এই সাধর্ম্যই নটে 'দুষ্মন্ত'-রূপ ধর্মের আরোপের (সুপার্-ইম্পোজিশন) মূলে। কি সেই সাধর্ম্য? উত্তরে ভট্টলোল্লট বলেন : ঐতিহাসিক দুষ্মন্ত ব্যক্তির অনুভাব, বেশভূষা প্রভৃতির সহিত অভিনয়কোবিদ নটের সেই সেই বিষয়ে সাম্য। ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের শকুন্তলাসন্দর্শনে যেমন যেমন শারীরচেষ্টাসমূহ দৃষ্ট হইয়াছিল, মহারাজ দুষ্মন্ত যেমনভাবে রাজোচিত বসনাভরণে সজ্জিত হইয়া থাকিতেন, শকুন্তলা-বিরহে মহারাজ দুষ্মন্তের যেরূপ বিরহদশা দেখা দিয়াছিল, অভিনয়নৈপুণ্যবশে এই সমস্ত অবস্থারই নিছক প্রতিফলনের দ্বারা নটকে দুষ্মন্তাভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এবং ঐতিহাসিক দুষ্মন্তে যে রতিভাব মুখ্যভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাও সহৃদয় সামাজিকগণ কর্তৃক দুষ্মন্তরূপী নটব্যক্তিতে 'আরোপিত' হইয়া থাকে। সেই জন্য ভট্টলোল্লট বলিয়াছেন, "তদ্রূপতানুসন্ধান" বা নট কর্তৃক অনুকার্য নায়কের রূপের 'অনুসন্ধান' বা 'অনুকৃতি'ই নটে ঐতিহাসিক নায়কনিষ্ঠ স্থায়িভাবের আরোপের মূলে। বস্তুত নটে কোনও রসের বাস্তব সত্তা নাই, উহা কেবল উপচরিত মাত্র, অতএব অমুখ্য। এই আরোপের ফলেই "ইনি দুষ্মন্ত, ইনি শকুন্তলা বিষয়ক রতিমান্", সহৃদয়ের চিত্তে এইরূপ

প্রতীতির উদ্ভব হইয়া থাকে। নটকে 'দুষ্যন্ত' বলিয়া এই যে জ্ঞান, ইহা 'অনুমান' নহে, ইহা সাক্ষাৎকার বা পার্‌সেপ্‌শন। কিন্তু ইহা লৌকিক সাক্ষাৎকার নহে, ইহা অলৌকিক (ট্রান্‌সেন্‌ডেন্‌টাল)। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগবশে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকেই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষজ্ঞান (পার্‌সেপ্‌শন, ইমিডিয়েট নলেজ) বলা হয়। এই প্রত্যক্ষের আবার দুইটি বিভাগ—লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ সেইখানেই সম্ভবপর, যেখানে জ্ঞায়মান বিষয়টি (অবজেক্ট অব নলেজ) বস্তুত জ্ঞানকালে বর্তমান এবং যাহার সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। যখন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটজ্ঞান হয়, তখন আমাদের ঘটের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে—কেন না, ঘটটি সত্যসত্যই বর্তমান এবং তাহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সত্যসত্যই স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে শুক্তিকায় রজতবুদ্ধি জন্মে, সেখানে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু উহা অলৌকিক। কেন-না, সত্যসত্যই রজতখণ্ড সেখানে বর্তমান নাই, এবং ফলে উহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং উহা অলৌকিক। এখানে নটে যে দুষ্যন্তবুদ্ধি এবং 'নট যে দুষ্যন্তনিষ্ঠ রতিভাবের আশ্রয়' এই বোধ, এই দুইটিই অলৌকিক প্রত্যক্ষ। কেন-না, ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত ব্যক্তি অথবা তন্নিষ্ঠ মুখ্য রতিভাব—ইহাদের কোনটিরই অভিনয়ক্ষেত্রে বাস্তব সত্তা নাই। সুতরাং উহাদের সহিত আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ স্থাপিত হইতে পারে না। অথচ ঐরূপ সাক্ষাৎকারও সামাজিকগণের অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, অভিনয়স্থলে সামাজিকগণের নটব্যক্তিতে যে 'ইনিই দুষ্যন্ত, ইনিই শকুন্তলা-বিষয়ক রতিমান্'—এইরূপ বোধ জন্মিয়া থাকে, উহা সর্বথা আরোপমূলক সাক্ষাৎকার, উহা অলৌকিক প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভূত। এবং সামাজিকগণের চিত্তে অভিনয়দর্শনজনিত যে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে, যাহাকে সাহিত্য-

মীমাংসায় 'রসাস্বাদ' বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা এই আরোপমূলক অলৌকিক সাক্ষাৎকারেরই অপর নামমাত্র, আর কিছুই নহে। নটে যেমন রসের বাস্তব সত্তা নাই, উহা যেমন সাধর্ম্যদর্শনজনিত আরোপ বা উপচারমাত্র, সেইরূপ সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে যে আনন্দময় রসানুভূতি উহারও কোন বাস্তব সত্তা নাই, উহা শুধু উপরিবর্ণিত নটে উপচরিত রতির অলৌকিক সাক্ষাৎকারেরই নামান্তর মাত্র।—ইহাই আচার্য ভট্টলোল্লটের স্বকীয় সিদ্ধান্ত।[১]

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদিগণ বলিবেন : ভট্টলোল্লট যে বলেন, প্রকৃত 'রস' বাস্তবসম্বন্ধে অনুকার্য দুষ্যন্তাদি নায়কেই আশ্রিত থাকে,—ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্তের যে রতি উহা তো নিতান্তই পৃথক্‌জনোচিত (laymanlike)। তোমার আমার রতির সহিত মহারাজ দুষ্যন্তের রতির তো কোনই পার্থক্য নাই। উহা তো নিতান্তই লৌকিক। ব্যাবহারিক জগতে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা আমরা যেরূপভাবে প্রভাবিত হই, মহারাজ দুষ্যন্তও ঠিক সেরূপভাবেই প্রভাবিত হইয়াছিলেন—ইহাতে কোনও সন্দেহই নাই। লৌকিক রসের অনুভূতির ক্ষেত্রে অহংতা, মমতা, তুমি, আমি, দেশ, কাল প্রভৃতির জ্ঞান যেমন প্রবল থাকে,—মহারাজ দুষ্যন্তের রতিস্থায়িভাবের আস্বাদ বা অনুভূতিও সমানভাবে এই সকল বিশেষণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ছিল, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাহাই যদি হয়,—তবে লৌকিক রসের সহিত মহারাজ দুষ্যন্তের শৃঙ্গারানুভূতির তফাত রহিল কোথায়? সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে মহারাজ দুষ্যন্তের রসানুভূতি নিতান্তই লৌকিক রসানুভূতি। কিন্তু সাহিত্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়দর্শনজনিত যে রসবোধ উহা তো অলৌকিক। উহা তো

---

১. "মুখ্যতয়া দুষ্যন্তাদিগত এব রসো রত্যাদিঃ কমনীয়বিভাবাদ্যভিনয়প্রদর্শনকোবিদে দুষ্যন্তাদ্যনুকর্তরি নটে সমারোপ্য সাক্ষাৎক্রিয়তে ইত্যেকে। মতেঽস্মিন্ সাক্ষাৎকারো দুষ্যন্তোঽয়ং শকুন্তলাদিবিষয়করতিমান্ ইত্যাদিঃ প্রাগ্‌বদ্ ধর্ম্যংশে লৌকিক আরোপ্যাংশে ত্বলৌকিকঃ।" —রসগঙ্গাধর, পৃ. ৩৩।

উপরিবর্ণিত সমস্ত পরিচ্ছেদের অতীত। কাব্যপাঠজনিত আনন্দময় রসচর্বণার ক্ষেত্রে তো 'আমার এই রস' 'আমার এই নায়িকা' 'আমি এই দেশের অধিবাসী' 'আমি এই কালে বর্তমান'— এইরূপ জ্ঞানধারার যতকিছু সংকীর্ণতা সমস্তই মুছিয়া যায়। এই অনুভূতির সহিত লৌকিক রসানুভূতির সমীকরণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সেই জন্যই তো সাহিত্যমীমাংসকগণ সাহিত্যপাঠ অথবা নাট্যাভিনয়দর্শনজনিত রসবোধকে, ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় aesthetic experience, অলৌকিক বলিয়া থাকেন। এই অনুভূতি আর সমস্ত অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার সহিত তুলনা দিবার মত কোনও বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নাই,—ইহা সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী—*sui generis*। আলংকারিকগণ উহাকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলিয়াছেন,—কিন্তু উহা যে ব্রহ্মাস্বাদের সহিত একান্তভাবে অভিন্ন নহে, ইহা তাহারাও স্বীকার করেন। কবির কাব্যরচনা অথবা নাট্যকারের প্রযোজনার উদ্দেশ্য তো এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদ্রেক,—ইহাই তো তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। কাব্য অথবা নাট্যের তাৎপর্য শুধু এই অলৌকিক চিত্তবৃত্তির উন্মেষসাধনেই—আর কিছুই তো তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। 'কাব্যস্যাতৎপরত্বতঃ'। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে 'লৌকিক' ভাব মুখ্য রস নহে, প্রকৃত রস হইতেছে 'অলৌকিক সাহিত্যিক রস'। সুতরাং ঐতিহাসিক নায়ক নায়িকাতে এইরূপ চিত্তবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। এই সাহিত্যিক রসের মুখ্য আশ্রয় সহৃদয় পাঠক অথবা প্রেক্ষক সমাজ—অনুকার্য নায়কনায়িকা নহে। সুতরাং ভট্টলোল্লটের মত ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, ভট্টলোল্লট বলিয়াছেন,—সহৃদয়ের আনন্দানুভূতি,—যাহাকে পারিভাষিকভাবে 'রস' এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করা হয়,—উহা অনুকার্য নায়কনিষ্ঠ মুখ্য রসের অনুকর্তৃ-নটব্যক্তিতে আরোপিত সত্তার অলৌকিক সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—আরোপিত রতির সাক্ষাৎকারের ফলে কি কখনও এই জাতীয় ব্রহ্মাস্বাদসহোদর আনন্দানুভূতি সম্ভবপর? চন্দনানুলেপনে সুখানুভূতি হয়, ইহা অনুভবসাক্ষিক।

কিন্তু একজনের গাত্রে চন্দনানুলেপন দর্শনমাত্র করিয়া কোনও উদাসীন দ্রষ্টা কি কখনও সেই সুখ অনুভব করিতে পারে? ভট্টলোল্লট বলেন, সহৃদয় প্রেক্ষক অথবা পাঠকের হৃদয়ে কোনও স্থায়িভাবের উদ্রেক হয় না—তাঁহারা কেবল উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তো উপরিবর্ণিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।[১] সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, সহৃদয় পাঠক এবং প্রেক্ষকসমাজই কেবলমাত্র অলৌকিক রসের মুখ্য আধার, অনুকার্য নায়ক নহে। অনুকার্য নায়কনায়িকা শুধু সহৃদয়ের সেই অলৌকিক অনুভূতির উন্মেষের প্রতি কবিকল্পিত উপকরণমাত্র, আর কিছুই নহে।

পরিশেষে একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনীয়। আমরা দেখিলাম, সাহিত্যিক রসের অনুভবিতা একমাত্র সহৃদয়—নায়কও নহে, নটও নহে। কিন্তু অভিনেতা কি কখনও এই অলৌকিক রসের আস্বাদ লাভ করিবার অধিকারী হইতে পারে না? সে কি শুধু সহৃদয় প্রেক্ষকের মনোবিনোদনের উপকরণমাত্রই হইয়া থাকিবে? ইহার উত্তরে সাহিত্যবিচারকগণ বলেন: যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে নট সাহিত্যরসের আশ্রয় হইতে পারে না, তথাপি সে যে নিয়মিতভাবেই রসানুভূতির সীমারেখার বাহ্য হইয়া থাকিবে, ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। নটও কখনও কখনও অভিনয়কালে আত্মবিস্মৃত হইয়া দেশকালাবস্থাতীত রসানুভূতির পরিচয় লাভ করিয়া থাকে,—তন্ময়ীভূত হইয়া আপন পরিমিত সত্তা বিস্মৃত হয়। তখন তাহার অশ্রু, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাব সত্য সত্যই রসের গমক হইয়া দাঁড়ায়, কেবলমাত্র পরচেষ্টার প্রযত্নকল্পিত রসসম্পর্কবিহীন অনুকরণমাত্রে পর্যবসিত হয় না। তখন সে সহৃদয় গোষ্ঠীর একজন সভ্য হইয়া পড়ে,—বাহ্যদৃষ্টিতে অনুকর্তা হইয়াও তত্ত্বদৃষ্টিতে সে তখন সহৃদয়স্থানাপন্ন। 'নাট্য-

১. "চন্দনসুখাদৌ বৈপরীত্যদর্শনাৎ"—কাব্যপ্রদীপ, পৃ. ৬৩।—"ন হি চন্দনারোপশ্চমৎকৃতিহেতুঃ, অপিতু বস্তুতশ্চন্দনসম্বন্ধ এব। তথা সুখমপি নরোপ্যমাণং তথা, কিন্তু বস্তুতো বিদ্যমানমেব।"—বৈদ্যনাথ তৎসৎ: ঐ. টীকা।

দর্পণকার' একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে অভিনেতৃনটকর্তৃক রসানুভূতির সম্ভাব্যতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পণ্যস্ত্রীগণও,—অনুরাগের মিথ্যা অভিনয়ই যাহাদের একমাত্র জীবিকা, তাহারাও কোনও কোনও সময়ে প্রকৃত প্রেমের বশীভূত হয়; সংগীতকুশল গায়ক গীতিলহরীর সাহায্যে শ্রোতার হৃদয়ে রসসৃষ্টি করিতে যাইয়া আপনার অজ্ঞাতসারে রাগপরবশ হইয়া উঠে। সেইরূপ অনুকর্তা নটও রামাদিগত বিপ্রলম্ভের অনুকরণাবসরে স্বয়ং তন্ময় হইয়া সেই রস অনুভব করিয়া থাকে।' কাব্য-স্রষ্টা

১. "ন চ নটস্য রসো ন ভবতীত্যেকান্তঃ। পণ্যস্ত্রিয়ো হি ধনলোভেন পররত্যর্থং রত্যাদি বিপক্ষয়ন্ত্যঃ কদাচিৎ স্বয়মপি পরাং রতিমনুভবন্তি। গায়কাশ্চ পরং রঞ্জয়ন্তঃ কদাচিৎ স্বয়মপি রজ্যন্তে। এবং নটোঽপি রামাদিগতং বিপ্রলম্ভাদ্যনুকুর্বাণঃ কদাচিৎ স্বয়মপি তন্ময়ীভাবমুপযাত্যেবেতি তদ্‌গতা অপি রোমাঞ্চাদয়স্তত্র রসং গময়েয়ুরেব।"—নাট্যদর্পণ পৃ. ১৬০। আধুনিক কোনও কোনও পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে নটের রসাস্বাদ ও তন্ময়ীভবন সম্ভবপর হইলেও দর্শকের রসাস্বাদের পক্ষে উহা বিঘ্নস্বরূপ। নট রসবোধ করে করুক, কিন্তু অভিনয়কালে তাহার নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া অনুকার্য নায়কের চিত্তবৃত্তি, অনুভাব প্রভৃতির যথাযথ অনুকরণ করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত,—তবেই তাহার অভিনয়নৈপুণ্য সার্থক। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতভাবে অনুকার্যনায়কের সহিত নিজে অভিন্ন হইয়া যাওয়া,—প্রেক্ষকের হৃদয়ে রসসৃষ্টির দিক্ দিয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

দ্রষ্টব্য: It has often been supposed—it has often been said, that an actor should think himself into his part, and in order to act most convincingly should forget for the time being that he is not the man he impersonates. That, however, is no more than a popular delusion. It has been effectively dispelled by the great French actor Coquelin, in his book on the art of acting. In that book Coquelin tells the following anecdote.

Another great actor, Edwin Booth, was once taking the chief part in the play *Le Roi s'amuse*...The part was one in which Booth was conscious of having won great success. One evening he satisfied himself that he was acting even better than usual. The power of the situation, the pathos of his lines worked on him so strongly that he completely indentified himself with the character he was representing. Real tears flowed from his eyes, his voice broke with emotion, real sobs choked him. Altogether, it seemed to him that he never acted so well. The performance over, he saw his daughter hastening

কবির রসানুভূতিও তাঁহার সহৃদয়তারই ফল। তাঁহাতে কবি ও সহৃদয়ের পরস্পর সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি হিসাবে তিনি তাঁহার কাব্যজগতের একমাত্র নিয়ন্তা প্রজাপতি, কাব্যের ও নাট্যের পাত্রপাত্রীগণের স্রষ্টিকর্তা। আবার সহৃদয় হিসাবে তিনি স্বকীয় প্রতিভাসৃষ্ট চরিত্রসমূহের সুখ দুঃখ, তাহাদের বিচিত্র অনুভূতির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন। তাঁহারই চিত্তমুকুরে নাটকীয় বিভিন্ন রসের প্রাথমিক প্রতিবিম্ব উদ্‌গৃহীত হয়, সুতরাং তিনিই মূর্ধাভিষিক্ত সহৃদয়।[১] তিনি একাধারে স্রষ্টা ও রসয়িতা। কবির কবিত্ব ও সহৃদয়ত্ব, দুইটি বিভিন্ন তত্ত্ব, কবিপ্রতিভার দুইটি বিভিন্ন দিক—যদিও সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে এই উভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহরণীয়।[২] অতএব রসানুভূতির দিক দিয়া বিচার করিলে কবির সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি 'সহৃদয়'। কাব্যসৃষ্টির মূলে যেমন রসানুভূতিপ্রবণ সহৃদয় কবিচিত্ত, পর্যবসানেও সেইরূপ পাঠক ও প্রেক্ষকের আদর্শের মত নির্মল, কাব্যবর্ণিত বস্তুর

---

towards him. She, his most sincere and truest worthy critic, had been watching the stage from a box, and she was now anxious to inquire what was the matter and how it happened that that night he had acted so badly.

Coquelin does not tell this little story for its own sake. His object is to point a moral. In his own words, the moral is that in order to call forth feeling in others we ourselves must not experience it. He does not say that we must never have known it, but only that we must not be undergoing it while we are in the act of trying to arouse it in others. "In all circumstances, the actor," he says, "must retain complete self-control."—Montgomery Belgion : *Reading for Profit*, pp. 28-29.

১. "কবিহি সামাজিকতুল্য এব। অত এবোক্তং—'শৃঙ্গারী চেৎ কবি'-রিত্যানন্দবর্ধনাচার্যেণ"—অভিনবভারতী : প্রথম ভাগ, পৃ. ২৯৫। অপিচ—"কবেরনুভবশ্চেৎ সহৃদয়ত্বেনৈব নতু কবিত্বেন।" —নাগোজী ভট্ট : রসগঙ্গাধরটীকা, পৃ. ৪।

২. সহৃদয়শিরোমণি আনন্দবর্ধনাচার্য একটি শ্লোকে প্রতিভার এই দ্বৈতস্বরূপ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।"—ধ্বন্যালোকঃ তৃতীয় উদ্দ্যোত।

প্রতিবিম্বগ্রহণক্ষম সহৃদয়চিত্ত। এই উভয়ের মধ্যে আছে—নায়কস্থানীয় সহৃদয় অভিনেতার রসোজ্জীবিত অভিনয়। আচার্য ভট্টতৌত সত্যই বলিয়াছেন: "নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ।"

৪. ভট্টশঙ্কুক: অনুমিতিবাদ

ভট্টলোল্লটের রসসূত্রের ব্যাখ্যা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আচার্য শঙ্কুকের মত পরীক্ষা করিব। ভট্টশঙ্কুকের রসবিষয়ক সিদ্ধান্ত সাহিত্য-মীমাংসা শাস্ত্রে 'অনুমিতিবাদ' বলিয়া পরিচিত। আচার্য শঙ্কুক স্বীকার করেন যে, 'রসানুভূতি' কেবলমাত্র সহৃদয় সামাজিকের পক্ষেই সম্ভব।[১] সাহিত্যিক 'রস' কখনও অনুকার্য নায়কের চিত্তে উদয় লাভ করিতে পারে না। ভট্টলোল্লটের মত তিনি রসানুভূতিকে অনুকার্য নায়কের চিত্তবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুতরাং এই দিক দিয়া ভট্টশঙ্কুকের মতবাদ আমাদের অনুভবের সহিত মিলিয়া যায়। তিনি সাহিত্যিক ও লৌকিক রসাস্বাদের মধ্যে যে মূলীভূত পার্থক্য আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা তাহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আচার্য শঙ্কুকের মতে—"সহৃদয় কর্তৃক স্থায়িভাবের অনুমানই 'রসানুভূতি'।" স্থায়ীর সহিত বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের পরস্পর অনুমাপ্য-অনুমাপকভাব সম্বন্ধ। স্থায়িভাব 'অনুমাপ্য' (inferable), বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাব—এই তিনটিই অনুমাপক। ভরতাচার্যের রসসূত্রে 'নিষ্পত্তি' পদের অর্থ 'অনুমিতি' (inference)। ধূম যেমন পরোক্ষ বহ্নির অনুমাপক, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবও পরোক্ষ অন্তর্গূঢ় স্থায়ী চিত্তবৃত্তির অনুমাপক। কিন্তু এই যে স্থায়িভাবের অনুমিতি, ইহার আশ্রয় কে? অভিনয়দর্শনের সময় সহৃদয় কোথায় স্থায়িভাবের অনুমান করিয়া থাকে?—অনুকার্য দুষ্মন্ত, রামচন্দ্র প্রভৃতি পাত্রপাত্রীই কি ইহার আশ্রয়, অথবা অনুকর্তা নটেই স্থায়িভাব

১. 'চর্বণা চ সামাজিকানাম্—ইতি তেষেব রস ইতি ব্যবহারঃ'—প্রদীপ, পৃ. ৬৫।

অনুমিত হইয়া থাকে?'[১] শঙ্কুক বলেন, সহৃদয় প্রেক্ষক অভিনয়দর্শনের অবসরে অনুকর্তা নটব্যক্তিতেই স্থায়িভাবের অনুমান করিয়া থাকে—অনুকার্য নায়ক-নায়িকাতে নহে। সহৃদয় কর্তৃক অনুমীয়মান স্থায়িভাবের নটই কেবলমাত্র 'পক্ষ'। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে; নট কি প্রকৃতপক্ষে স্থায়িভাবের আশ্রয় হইতে পারে? নট যখন মহারাজ দুষ্মন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনুকরণ করিয়া থাকে, তখন সত্যসত্যই কি তাহাতে শকুন্তলাবিষয়ক রতিরূপ স্থায়িভাবের উদয় হয়? যদি না হয়, তবে কি করিয়া অবিদ্যমান স্থায়িভাবের অনুমান সম্ভবপর? যে পর্বতে বহ্নি নাই সেখানে বহ্নির অনুমান কিরূপে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? আচার্য শঙ্কুক এই প্রশ্নের অতি সুন্দর সমাধান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন: সত্য বটে, প্রকৃতপক্ষে নটব্যক্তিতে কোনও স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা নাই। কিন্তু প্রেক্ষকগণ অভিনয়কালে নটকে নট বলিয়া চিনিতে পারেন না; নটকে দুষ্মন্ত বলিয়াও তাঁহারা সম্যক্ অবধারণ করে না, নট যে দুষ্মন্ত নহে—এইরূপ নিষেধাত্মক জ্ঞানও তাঁহাদের হয় না; আবার, 'এই ব্যক্তি ঠিক দুষ্মন্তের মত' নটবিষয়ক এইরূপ সাদৃশ্য বুদ্ধিও প্রেক্ষকগণের চিত্তে উদিত হয় না; 'এই ব্যক্তি কি দুষ্মন্ত অথবা দুষ্মন্ত নহেন' এইরূপ সংশয়াত্মক বিরুদ্ধোভয়কোটিক জ্ঞানের কোনও চিহ্নও প্রেক্ষকচিত্তে লক্ষিত হয় না; আবার, নটে যে

---

১. এই স্থলে ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সহিত পরিচয় থাকিলে সুবিধা হইবে। প্রত্যেক অনুমানের তিনটি বিশিষ্ট অঙ্গ থাকা প্রয়োজন। তাহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা যথাক্রমে 'পক্ষ', 'সাধ্য' ও 'সাধন'। আমরা যখন ধূমের দ্বারা পর্বতে বহ্নির অনুমান করি, তখন পর্বত 'পক্ষ' অথবা 'আশ্রয়', যেহেতু পর্বতরূপ আশ্রয়েই বহ্নির অনুমান হইতেছে; বহ্নি 'সাধ্য' অথবা 'অনুমেয়', এবং ধূম 'সাধন' 'লিঙ্গ' অথবা 'হেতু'। পাশ্চাত্য লজিকে ইহারা যথাক্রমে 'minor term' (S), 'major term' (P) এবং 'middle term' (M) রূপে পরিচিত। সেইরূপ, নটে যখন বিভাবাদির দ্বারা স্থায়িভাবের অনুমান করা হয় তখন নট 'পক্ষ' অথবা 'আশ্রয়', স্থায়িভাবটি 'সাধ্য' বা 'অনুমেয়' এবং 'বিভাব' প্রভৃতি 'সাধন' বা 'হেতু' বা 'লিঙ্গ'।

সাময়িক দুষ্মন্তবুদ্ধি তাহাকে মিথ্যাজ্ঞানও বলা চলে না—কেন-না, মিথ্যাজ্ঞান পরবর্তী সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। যেমন, শুক্তিকা-খণ্ডে যে রজতজ্ঞান উহা মিথ্যাজ্ঞান, উহা ভ্রম—যেহেতু উত্তরকালীন 'ইহা শুক্তিকাখণ্ডমাত্র, ইহা রজতখণ্ড নহে'—এই নিশ্চয়াত্মক সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা ঐ পূর্বজ্ঞানটি বাধিত (contradicted) হইয়া থাকে। কিন্তু অভিনয়কালীন নটে যে দুষ্যন্তবোধ উহা কি কখনও পরববর্তী 'এই ব্যক্তি নটমাত্র, দুষ্মন্ত নহে' এইরূপ বিরুদ্ধ বিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে? অনুভব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অভিনয়ের অবসানে প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে আসিলেও অভিনেতাতে যে দুষ্মন্তাদিনায়কবুদ্ধি তাহা কখনও তিরোহিত হয় না, বাধিত হয় না। সুতরাং নটে দুষ্মন্তাদিনায়কবুদ্ধিকে শুক্তিকায় রজতবুদ্ধির মত মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে সামাজিক-গণের অভিনয়কালীন নটবিষয়ক জ্ঞানকে কোন্ শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়? আমরা দেখিলাম,—ইহা অবধারণাত্মক সম্যক্‌জ্ঞান নহে; ঔপম্যমূলক সাদৃশ্যজ্ঞান নহে; বিকল্পাত্মক সংশয়জ্ঞানের সহিত ইহার সমীকরণও অসম্ভব; উত্তরকালবাধিত মিথ্যাজ্ঞানের সহিতও ইহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্যক্, মিথ্যা, সংশয়, সাদৃশ্য—এই চারি প্রকার লৌকিক বিজ্ঞানের কোনটির মধ্যেই সামাজিকগণের অভিনেতৃনটবিষয়ক বিজ্ঞানের অন্তর্ভাব সম্ভব নহে। ইহা লৌকিকজ্ঞানবিলক্ষণ, ইহা অলৌকিক। চিত্রিত তুরগে দর্শকের যেমন তুরগবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।[১] চিত্রিত তুরগে যখন তুরগবুদ্ধি হয়, তখন উহাকে যেমন 'ইহা

১. প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ও সমালোচক অধ্যাপক I. A. Richards তাঁহার *Principles of Literary Criticism* গ্রন্থে চিত্রিত ও কাব্যবর্ণিত বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাম্য লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং বাস্তবের সহিত উভয়ের যে একটি বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান আছে, তাহাও তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। দ্রষ্টব্য: "Any familiar activity, when set in different conditions so that the impulses which make it up have to

তুরগই' 'ইহাকে তুরগ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু বস্তুত ইহা তুরগ নহে, ইহা কতকগুলি বর্ণের অভিনব সমাবেশমাত্র', 'ইহা কি তুরগ অথবা চিত্রমাত্র ?' 'ইহা ঠিক তুরগের মত'—এইরূপে যথাক্রমে সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য এই চতুর্বিধ জ্ঞানের কোনটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় না, উহা যেমন সর্বথা অভিনব এক প্রকার প্রতীতি, সেইরূপ সহৃদয় প্রেক্ষকগণের অভিনেতৃনটবিষয়ক প্রতিপত্তিও উপরিবর্ণিত চিত্রতুরগপ্রতীতির ন্যায় সর্বথা অভিনব বিজ্ঞান। সুতরাং সামাজিকগণের নটে যে দুষ্যন্তবুদ্ধি উহা সম্যক্, মিথ্যা, সংশয়, সাদৃশ্য প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, উহা চিত্রে তুরগবুদ্ধির সহিত উপমেয়। চিত্রতুরগন্যায়েই সামাজিকগণের হৃদয়ে অনুকর্তৃ নটব্যক্তিতে অনুকার্যনায়কবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে,—এইরূপ বোধকে কোনও প্রকারে অপহ্নব করিতে পারা যায় না। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা যে জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা লৌকিক বিচারের দৃষ্টিতে কি করিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যাইবে ?[১]

adjust themselves to fresh streams of impulses due to the new conditions, is likely to take on increased richness and fulness in consciousness...This general fact is of great importance for the arts, particularly for poetry, painting and sculpture, the representative or mimetic arts. For in these a totally new setting for what may be familiar elements is essentially involved. Instead of seeing a tree we see something in a picture which may have similar effects upon us but is *not* a tree. The true impulses which are aroused have to adjust themselves to their new setting of other impulses due to our awareness that it is a *picture* which we are looking at. Thus an opportunity arises for those impulses to define themselves in a way in which they ordinarily do not."

—পৃ. ১০৯ ১১০। আমার মনে হয়, ভারতীয় সমালোচকগণের 'চিত্রতুরগন্যায়বাদ' প্রেক্ষকের চিত্তবৃত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহা অপেক্ষা আরও অধিকদূর অগ্রসর।

১. "ন চাত্র নর্তক এব সুখীতি প্রতিপত্তিঃ। নাপ্যয়মেব রাম ইতি, ন চাপ্যয়ং ন সুখীতি, নাপি রামঃ স্যাদ্ বা ন বায়মিতি, ন চাপি তৎসদৃশ ইতি। কিন্তু সম্যঙ্-মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণা চিত্রতুরগাদিন্যায়েন যঃ সুখী রামঃ, অসৌ অয়ম্-ইতি প্রতীতিরস্তীতি। তদাহ—

ভাল কথা,—বুঝা গেল, সহৃদয়চিত্তে চিত্রতুরগন্যায়ে নটে অনুকার্যনায়ক-প্রতীতি জন্মে। সামাজিকগণ কর্তৃক গৃহীত নটই যে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের 'পক্ষ' বা আশ্রয়, ইহা কিরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়? ভট্টশঙ্কুক বলেন: উপরিবর্ণিত নটরূপ পক্ষেই সামাজিকগণ কর্তৃক 'রতি' প্রভৃতি স্থায়িভাব অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যই তো আর নটে রতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির বাস্তব সত্তা নাই। নট তো কেবল অনুকার্যনায়কের অনুভাবসমূহের অনুকরণমাত্র করিয়া থাকে। ওই সকল অভিনীয়মান অনুভাব তো সর্বথা কৃত্রিম, উহাদের সহিত তো আর আন্তর স্থায়ি চিত্তবৃত্তির কোনও জন্যজনকভাব সম্বন্ধ নাই? ওই সকল অনুভাব অনুকরণ করিতেছে বলিয়া নট যে স্থায়িভাবগুলিও অনুভব করিতেছে ঐরূপ তো কোনও নিয়ম নাই?[১] তবে কি করিয়া স্থায়িভাবের অনুমান সম্ভব? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কুক বলেন:

"প্রতিভাতি ন সন্দেহো ন তত্ত্বং ন বিপর্যয়:।
ধীরসাবয়মিত্যস্তি নাসাবেবায়মিত্যপি।
বিরুদ্ধবুদ্ধ্যসম্ভেদাদবিবেচিতসম্প্লব:।
যুক্ত্যা পর্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্ননুভব: কয়া।"—ইতি।"

—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৫।

১. "It is a commonplace that we can show all the signs of fear without actually experiencing fear, the emotion. We may note the signs ourselves and say: "How curious! I seem to be afraid, but I am not."—C. K. Ogden: *The A B C of Psychology*, পৃ. ১৯৯। তুলনীয়—

"Is it not monstrous that this player here,
But in a fiction, in a dream of passion,
Could force his soul so to his conceit
That from her working all his visage wan'd;
Tears in his eyes, distraction in's aspect,
A broken voice, and his whole function suiting
With forms to his conceit? And all for nothing!
For Hecuba?
What's Hecuba to him or he to Hecuba,
That he should weep for her?" —*Hamlet*. Act. II. Sc. *ii*.

নটের অনুভাবসমূহ যে কৃত্রিম ইহা সত্য ; কিন্তু সামাজিকগণের দৃষ্টিতে উহা অকৃত্রিম বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সামাজিকগণ এইরূপ বুঝিতে পারেন না যে, ওই সকল অনুভাবের সহিত আন্তর স্থায়িভাবসমূহের কোনও সম্পর্কই নাই—উহা কেবল নিছক অনুকৃতি মাত্র। সামাজিকগণের এই বিভ্রমের মূলে আছে অভিনেতৃনটের অভিনয়নৈপুণ্য। নাট্যাচার্যের উপদেশ,[১] দীর্ঘকালের শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে কুশীলবগণ অতি সুষ্ঠুভাবে, রোমাঞ্চ, স্বেদ, স্তম্ভ, গদ্গদিকা প্রভৃতি অনুভাবসমূহের আবির্ভাবন করিতে সমর্থ হয়। আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাবসমূহও নাটকের কাব্যাংশ হইতে সহৃদয় কর্তৃক সহজেই গৃহীত হইয়া থাকে ; আবার ব্যভিচারিসমূহও যদিও স্থায়িভাবের মতই পরোক্ষ, তথাপি সেই ব্যভিচারিভাবের অনুগুণ শারীরবিকৃতিসমূহ নট আপন শিক্ষানৈপুণ্যবলে অতি সহজেই প্রকটিত করিয়া থাকে। এইরূপে বিভাবের বাচিক অভিনয়দর্শন, অনুভাবের সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং সঞ্চারিভাবের পরোক্ষ জ্ঞানেব দ্বারা[২] সামাজিকগণ নটরূপ আশ্রয়ে অনুগুণ স্থায়িভাবের অনুমান করিয়া থাকে। যদিও স্থায়িভাবসমূহ পরোক্ষ—তথাপি বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা তৎসম্পৃক্ত স্থায়িভাবের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে অনুমিতি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

কিন্তু জিজ্ঞাসা হইতে পারে—দুষ্মন্তরূপী নটে বিভাবাদির দ্বারা শকুন্তলাদি-বিষয়ক রতিস্থায়িভাবের অনুমানই বা হইবে কেন ? নটে দুষ্মন্তের প্রত্যক্ষই হউক না কেন ? ইহার উত্তরে কি বলিব ? এই প্রশ্নের সমাধান নির্দেশ করিবার পূর্বে ইহার অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক, প্রত্যক্ষ ও

১. শেক্‌স্‌পীয়রের 'Ham'et' নাটকের কুশীলবদলের প্রতি হ্যামলেটের দীর্ঘ বক্তৃতা এই স্থলে আলোচনীয়—"Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on thy tongue..." ইত্যাদি।—Act. III. Sc. ii,

২. 'তথা চৈতন্মতেঽনুমানাদ্ ব্যভিচারিণামবগম ইতি ভাবঃ'—বৈদ্যনাথ তৎসৎ : কাব্য-প্রদীপটীকা, পৃ. ৬৫।

অনুমানের পরস্পর বলাবল সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশত প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। কিন্তু অনুমিতি পরোক্ষ জ্ঞান—সাধারণত ইহাতে অনুমেয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে না। কিন্তু এমনও তো হইতে পরে যে, একই বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাত্মক পরোক্ষ জ্ঞানের সামগ্রী বা কারণ বর্তমান রহিয়াছে, তখন কোন্ জ্ঞানটি হইবে? ধরা যাউক, দর্শকের সম্মুখেই একটি ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে—এই স্থানে বহ্নির সহিত দর্শকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় বহ্নিবিষয়ক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের কারণ রহিয়াছে; আবার বহ্নির সহিত অবিনাভাবী (concomitant) ধূম-দর্শনজনিত বহ্নিবিষয়ক অনুমিতিজ্ঞানের সামগ্রীও যুগপৎ বর্তমান। এ স্থলে বহ্নির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে, অথবা ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান হইবে? যুগপৎ দুইটি জ্ঞান তো সম্ভব নহে। কোন্ জ্ঞানটি প্রবল? দার্শনিকগণ বলেন—এইরূপ স্থলে বহ্নির প্রত্যক্ষই হইবে। কেন না, যে স্থলে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির বিষয় অভিন্ন, সে স্থলে বাধক কোনও সামগ্রী বর্তমান না থাকিলে, প্রত্যক্ষ সামগ্রীই বলবতী, অনুমিতির কারণসমূহ সেইরূপ স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রীর দ্বারা বাধিত হইবে; সুতরাং উভয়ের বিষয় (object) যেখানে অভিন্ন, সেখানে প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমান বাধিত হইবে। যেখানে হস্তীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেখানে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃংহিতের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে যান না।[১] উপরিনির্দিষ্ট উদাহরণস্থলে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয় অভিন্ন—বহ্নিই সেখানে উভয়বিধ জ্ঞানেরই বিষয়; সুতরাং বহ্নির প্রত্যক্ষই হইবে, অনুমান নহে। কিন্তু যে স্থলে উভয়বিধ জ্ঞানের বিষয় পরস্পর ভিন্ন, সে স্থলে অনুমান সামগ্রীরই প্রাবল্য দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন ধরা যাউক—দূরবর্তী অদৃশ্যপর্বতস্থ বহ্নির ধূমরূপ 'লিঙ্গে'র দ্বারা অনুমান হইতেছে। তখন অনুমাতা যিনি, তাঁহার ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান

১. 'নহি প্রত্যক্ষেণ করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তমনুমিমতে পরীক্ষকাঃ'—বাচস্পতি মিশ্র।

(Knowledge of Universal Concomitance) এবং বহ্নিব্যাপ্য ধূমের পর্বতরূপ পক্ষে অবস্থানরূপজ্ঞান (যাহাকে ন্যায়ের পরিভাষা অনুসারে 'পরামর্শজ্ঞান' বলা হইয়া থাকে—এই পরামর্শজ্ঞানই অনুমিতির অব্যবহিত কারণ)। এই উভয়ই তাহার আত্মার সহিত সমবেত হইয়া আছে। আবার দূরস্থিত পর্বতের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় পর্বতবিষয়ক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সামগ্রীও রহিয়াছে। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য: পরমার্শজ্ঞানের সাহায্যে পর্বতস্থ বহ্নির অনুমান হইবে, না, চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট দূরস্থ পর্বতের প্রত্যক্ষ হইবে? নৈয়ায়িকগণের মতে এই স্থলে বহ্নিবিষয়ক আনুমানাত্মক জ্ঞানই জন্মিবে। কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয় এই স্থলে পরস্পর বিভিন্ন। একটির বিষয় ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট পর্বত, অপরটির বিষয় পরোক্ষ বহ্নি, এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের যেখানে বিষয়ভেদ বর্তমান, সেখানে অনুমান সামগ্রীই অধিতকর প্রবল-ইহাই দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। নৈয়ায়িকগণের উপরিবর্ণিত সিদ্ধান্ত দুইটি মনে রাখিলে আমরা পূর্বনির্দিষ্ট প্রশ্নটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। যখন সহৃদয় সামাজিক দুষ্যন্তরূপী নটের অভিনয়দর্শনে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন, তখন তিনি দুষ্যন্তরূপী নটকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আবার তাহার কৃত্রিম অনুভাব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সে সকল অনুভাব নটের আন্তরস্থায়িভাবের পরোক্ষ অনুমানাত্মক জ্ঞানের প্রতি 'লিঙ্গ' বা 'হেতু'। এক্ষণে সামাজিকগণের চিত্তে কি প্রকার জ্ঞান জন্মিবে? "আমি মহারাজ দুষ্যন্তকে প্রত্যক্ষ করিতেছি", এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানই কি উৎপন্ন হইবে, অথবা অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা "আমি দুষ্যন্তরূপ 'পক্ষে' রতিরূপ স্থায়িভাবের অনুমান করিতেছি", এইরূপ অনুমিতি জন্মিবে? শঙ্কুকের অনুবর্তী আলঙ্কারিক আচার্যগণ বলেন যে, এই স্থলে নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রতিবিষয়ক অনুমানই উৎপন্ন হইবে। কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয় এখানে বিভিন্ন—একটির বিষয় [illegible]ষ্যন্তরূপী নট, অপরটির বিষয় মহারাজ-দুষ্যন্তনিষ্ঠ-রতিভাব। সুতরাং [illegible]নের অবসরে প্রেক্ষকগণের চিত্তে "আমি মহারাজ দুষ্যন্তকে প্রত্যক্ষ

করিতেছি" এইরূপ শুদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে না। কিন্তু, "এই যে মহারাজ দুষ্মন্ত, ইনি শকুন্তলা-বিষয়ক রতিমান, যেহতু ইঁহার ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব পরিলক্ষিত হইতেছে"—এই প্রকারে দুষ্মন্তে শকুন্তলা-বিষয়ক রতির অনুমানাত্মক জ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং সামাজিকগণের যে আনন্দানুভূতি, তাহা এই বিভাবাদি লিঙ্গের দ্বারা দুষ্মন্তরূপী নটনিষ্ঠ রতিস্থায়িভাবের অনুমিতিমাত্র।[1] সামাজিকের অন্তরে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের কোনও অব্যবহিত সম্বন্ধই নাই। স্থায়িভাবের অনুমানেই তাহার আনন্দ, তাহার রসবোধ। শুধু ওই অনুমানজনিত আনন্দানুভূতিরই পারিভাষিক-সংজ্ঞামাত্র।

প্রতিবাদিগণ এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিবেন : অনুকর্তা নটে তো রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা নাই। তবে কিরূপে বিভাবাদির দ্বারা স্থায়িভাবের অনুমিতি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? শঙ্কুক ইহার উত্তরে বলেন : নটরূপ পক্ষে স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা আছে কি না-আছে—সামাজিকের অনুমিতির দিক দিয়া ঐরূপ সমালোচনার কোন মূল্যই নাই। স্বীকার করিয়া লইলাম—নট প্রকৃতপক্ষে রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবের আশ্রয় নহে, সামাজিক কর্তৃক স্থায়িভাবের অনুমিতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐরূপ অনুমিতি যে জন্মিয়া থাকে এবং উহার ফলে সামাজিকগণের হৃদয়ে যে অলৌকিক আনন্দানুভূতি উপলব্ধ হয়, ইহা তো আর অপলাপ করিতে পারা যায় না। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সহৃদয়ের রসোদ্বোধ। ওই উদ্দেশ্য যদি ভ্রান্ত অনুমিতির দ্বারাও সম্ভবপর হয়, তবে কবিকর্ম সার্থক, ইহা তো স্বীকার করিতেই হইবে। নটে রতির অনুমান ভ্রান্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার দ্বারা 'অর্থক্রিয়া' বা প্রয়োজন-সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাতই ঘটে না। উহা ভ্রম হইলেও সংবাদি-ভ্রম, বিসংবাদি-ভ্রম নহে। ভ্রমের দ্বারাও কোনও

১ 'দুষ্মন্তাদিগতো রত্যাদির্নটে পক্ষে দুষ্মন্তত্বেন গৃহীতে বিভাবাদিভিঃ কৃত্রিমৈরপি অকৃত্রিমতয়া গৃহীতৈর্ভিন্নে বিষয়ে অনুমিতিসামগ্র্যা বলবত্ত্বাৎ অনুমীয়মানো রসঃ—ইত্যপরে'—রসগঙ্গাধর, পৃ. ৩৪।

কোনও স্থলে ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইয়া থাকে, ইহা তো ব্যাবহারিক জগতে প্রায়ই উপলব্ধ হইয়া থাকে। দূরস্থ প্রদীপ-প্রভা ও মণিপ্রভা দর্শন করিয়া উভয়েরই প্রতি মণিভ্রমে ধাবমান ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি প্রদীপদর্শনে নিরাশ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি মণি লাভ করে।[১] দুইজনেই সমানভাবে ভ্রান্ত বটে,—কিন্তু একজনের ভ্রম বস্তুসংস্পর্শশূন্য, অপর জন ভ্রান্ত হইলেও ওই ভ্রান্তির সহিত ঈপ্সিত বস্তুব সম্বন্ধ বিদ্যমান। সেইজন্য প্রদীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি-আরোপকারীর মণিলাভ ঘটিল না, অপর পক্ষে মণিপ্রভায় মণি-অভিমান ভ্রান্তিমূলক হইলেও ঈপ্সিত মণির সহিত প্রভার সম্বন্ধ ঘটায় প্রমাজ্ঞানেব (valid knowledge) মতই উহা ঈপ্সিত-মণিলাভের হেতু হইল। পূর্বটি বিসংবাদি-ভ্রম, দ্বিতীয়টি সংবাদি-ভ্রম। এই সংবাদি-ভ্রম—বিচার-দৃষ্টিতে অপ্রামাণিক হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে প্রমাণমূলক, কেন না বিসংবাদি-ভ্রমের ন্যায় উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে, অবিসংবাদি সত্যজ্ঞানের মতই অর্থ-ক্রিয়াকারী। সেইজন্য বৌদ্ধাচায ধর্মকীতি বলিয়াছেন—"ভ্রান্তরপি সম্বন্ধতঃ প্রমা"।

সাহিত্যে স্থায়িভাবের অনুমানের ক্ষেত্রেও সেই একই যুক্তি। স্থায়িভাবের অনুমান হয়তো ভ্রান্ত হইতে পারে,—কিন্তু ইহার দ্বারা 'অর্থক্রিয়া'—সহৃদয়ের চিত্তে রসোদ্বোধ, তাহা কখনই ব্যাহত হয় না। সুতরাং ঐরূপ অনুমান অসত্য হইলেও প্রয়োজনসিদ্ধির দিক দিয়া স্থায়িভাবের অনুমিতিপ্রমার মতই সত্য ও বাস্তব। কোনও জ্ঞান সত্য কি অসত্য এইরূপ বিচারের অবকাশ তখনই উপস্থিত হয়, যখন বাহ্যবস্তুর সহিত আন্তর বিজ্ঞানের পরস্পর সংবাদের (correspondence) প্রশ্ন উঠে। নতুবা, বাহ্যবস্তুরনিরপেক্ষভাবে স্ববিশ্রান্ত-ভাবে বিচার করিলে জ্ঞানমাত্রই প্রমাত্মক (valid),—সমস্ত জ্ঞানই স্বরূপত সত্য ও স্বতঃপ্রমাণ। শুক্তিকায় শুক্তিকাবুদ্ধি যেমন প্রমাত্মক, শুক্তিকায়

[১] "মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাঽভিধাবতোঃ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি॥"—ধর্মকীর্তি

রজতবুদ্ধিও ঠিক সেইরূপই সত্য ও স্বতঃপ্রকাশ। কিন্তু বাহ্যবস্তুর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিলেই পূর্বটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেন না, প্রামাজ্ঞানটির সহিত বাহ্যবস্তুর সংবাদ (correspondence) বিদ্যমান আছে, কিন্তু শুক্তিকায় রজতজ্ঞানটি বাহ্যবস্তুবিসংবাদি। ব্যাবহারিক লৌকিক জীবনে আমাদের বাহ্যবস্তু লইয়াই নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হয়—শুদ্ধমাত্র জ্ঞান লইয়া আমাদের জীবন ধারণ দুষ্কর। মরুমরীচিকাবুদ্ধি বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্ববিশ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তৃষ্ণার্ত পথিক যদি ওই জ্ঞানকে সত্য ভাবিয়া সেই মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধাবিত হয়, তবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ব্যাবহারিক জগতে জ্ঞানের সত্যাসত্যত্ববিচার দুষ্পরিহর; কেন না, জ্ঞানজন্য প্রবৃত্তি ও বাহ্যবস্তুকে লইয়াই লোকযাত্রা। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সত্যাসত্যত্ববিচারের উপযোগিতা কতটুকু? এখানে জ্ঞানের সহিত বাহ্যবস্তুর সংবাদ (correspondence) আছে কি না, নটে রতিরূপ স্থায়িভাবের অনুমান বস্তুত নটনিষ্ঠ স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত কি না—তাহা লইয়া বিচার করিয়া কি লাভ? ঐরূপ সত্যাসত্যত্ববিচারের দ্বারা রসবোধের কতটুকু উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইবে? সামাজিক কর্তৃক যে স্থায়িভাবের অনুমান—উহা তো স্ববিশ্রান্ত, প্রতীতিমাত্রসার। উহার সত্যত্ব মিথ্যাত্ব বিচার করিয়া তো আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের কর্মপ্রণালীর সাফল্য বা ব্যর্থতা কিছুই সাধিত হইবে না। কেন না, উহা ব্যবহারজগতের গণ্ডীর বাহিরে; সাহিত্যচর্চা তো ব্যবহারজগতের নীরস, রূঢ়, নির্মম বস্তুপরতন্ত্রতা হইতে বস্তুসংস্পর্শহীন কাল্পনিক বিশ্বের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য আনন্দময় মুক্তি! সেখানে কোনও ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ নাই—অতএব জ্ঞানের সত্যাসত্যত্ব বিচারের মূল ভিত্তিরই সেখানে একান্ত অভাব। সাহিত্যজন্য যে সকল অনুভূতি, উহারা সত্য-মিথ্যার বাহিরে, উহারা সত্যমিথ্যাবহির্ভূত তৃতীয় এক অলৌকিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বাহ্য বাস্তবজগতে উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কি না, এইরূপ বিচার

বাতুলতা মাত্র।[১] বস্তুত, সামাজিকগণের রতির অনুমান যদি ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বাস্তবই হইত, সত্য সত্যই যদি নটে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব বর্তমান থাকিত, তবে সাহিত্যিক অনুভূতির সহিত ব্যাবহারিক অনুমিতির কোনও পার্থক্যই আর থাকিত না। উহা নিতান্তই লৌকিক হইয়া পড়িত। সাহিত্যিক অনুমিতির অলৌকিকত্ব ও চমৎকারিতা এইখানেই যে, ইহার মধ্যে বাস্তবতার সম্পর্ক নাই, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে উহা অবাস্তব ও মিথ্যা।[২]

বিরুদ্ধ সমালোচকগণ এই স্থলে প্রশ্ন করিয়া বসিবেন: স্বীকার করিয়া লইলাম, সামাজিকগণ কর্তৃক নটে রতি-প্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুমান ঘটিয়া থাকে, এবং ওই অনুমিতি সত্যমিথ্যার বহির্ভূত। কিন্তু সামাজিকগণ যে ওইরূপ অনুমিতি হইতে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর? রামের আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা 'সে সুখী' অনুমান করিয়া শ্যামের কোন্ সুখ? সহৃদয় দর্শক দুষ্যন্তরূপী-নটে রতির অনুমানমাত্র করিয়া কিরূপে অলৌকিক আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইবে? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কুক বলেন: ব্যাবহারিক জগতের যে সকল অনুমান উহা তো শুষ্ক তর্ক, উহা তো 'সাধন' বা হেতু হইতে 'সাধ্য' বা অনুমেয়ের জ্ঞানমাত্র। ব্যাবহারিক জগতে আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা রামের আন্তর সুখের অনুমান এবং ধূম হইতে বহ্নির

---

১. 'তেনাত্র গমাগমকয়োঃ সচেতসাং সত্যাসত্যত্ববিচারো নিরুপযোগ এব। কাব্যবিষয়ে চ বাচ্য-ব্যঙ্গ্যপ্রতীতীনাং সত্যাসত্যত্ববিচারো নিরুপযোগ এব—ইতি প্রমাণান্তরপরীক্ষা উপহাসায়ৈব সম্পদ্যত-ইতি।'—মহিমভট্টকৃত 'ব্যক্তিবিবেক', পৃ, ২৫ (কাশী সংস্করণ)। তুলনীয়: "The question of the *reality* of experience does not arise in this region: we are satisfied with the experience itself, simply as such."—Lascelles Abercrombie: *Principles of Literary Crititism*, পৃ. ১৩৬।

২. 'অতঃ প্রতীতিসারত্বাৎ কাব্যস্য অনুমেয়গতং বাস্তবাবাস্তবত্বমপ্রযোজকম্। উভয়থা চমৎকার-লক্ষণার্থক্রিয়াসিদ্ধেঃ। প্রত্যুত অবাস্তবত্বে যথা সিধ্যতি, ন তথা বাস্তবত্বে,—ইতি কাব্যানুমিতে-রেবানুমানান্তরবিলক্ষণতা—ইতি অনুমানবাদিনোঽয়মভিপ্রায়ঃ'—রুয্যকপ্রণীত 'ব্যক্তিবিবেকব্যাখ্যান', পৃ. ৭৪।

অনুমান, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই। ধূম যেমন বহ্নির অনুমানের প্রতি হেতু সেইরূপ রামের বাহুচেষ্টা, ইঙ্গিত প্রভৃতি তাহার অন্তর্গূঢ় পরোক্ষ সুখের অনুমানের প্রতি 'হেতু', নিতান্তই লৌকিক 'হেতু'মাত্র। কিন্তু সাহিত্যিক অনুমানের যে সকল 'হেতু', বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি, উহারা সর্বথা অলৌকিক। উহাদের সহিত তো লৌকিক অনুমানের হেতুর কোনও তুলনাই চলে না। সেই জন্যই লৌকিক জগতে পরকীয় সুখের অনুমান করিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতে পারি না বটে, ধূম হইতে বহ্নির, মেঘোন্নতি দর্শনে ভাবী বারিপাতের, কৃত্তিকার উদয়-দর্শনে রোহিণী নক্ষত্রের আবির্ভাব অনুমান করিয়া কোনও সৌন্দর্যবোধ না হইতে পারে বটে, কিন্তু নাট্যাভিনয়দর্শনে অলৌকিক বিভাবাদির দ্বারা নটগত স্থায়িভাবের অনুমান করিয়া 'বস্তুসৌন্দর্যবলে' আমরা লোকাতীত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, ইহা তো অনুভবসিদ্ধ, ইহা কি করিয়া অপহ্নব করিব? দুইটির উপায় ভিন্ন, সুতরাং ফলও যে বিভিন্ন হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?'[১]

৫ ভট্টনায়ক : ভুক্তিবাদ

আমরা ভট্টলোল্লটের এবং ভট্টশঙ্ককের রসবিষয়ক সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আচার্য ভট্টনায়কের রসসূত্রের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার রসবিষয়ক সিদ্ধান্ত আলঙ্কারিক-সমাজে "ভুক্তিবাদ" বলিয়া পরিচিত।[২]

১. "তদুক্তম্—'নানুমিতো হেত্বাদ্যৈঃ স্বদতেঽনুমিতো যথা বিভাবাদ্যৈঃ।'—ইতি।"—ব্যক্তিবিবেক, পৃ. ৭৪।

২. "ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারেণ বিবৃণুতে"—কাব্যপ্রদীপ, পৃ. ৬৬।

পরবর্তী টীকাকারগণের মতে ভট্টনায়ক সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ অবলম্বন করিয়া ভরতের রসসূত্রের তাৎপর্য নিরূপণ করিয়াছেন। সত্যই সাংখ্যদর্শনের অনেক পারিভাষিক সংজ্ঞা ও সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত বহু পদার্থও ভট্টনায়কের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই বোধ হয় টীকাকারগণের ঐরূপ মন্তব্যের মূলে।

আমরা দেখিলাম, ভট্টলোল্লট এবং ভট্টশঙ্কুক—রসসূত্রের এই দুইজন পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাতা, তাঁহাদের কাহারও মতবাদেই সহৃদয়ের আনন্দময় অনুভূতির সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। ভট্টলোল্লটের মতে মুখ্য রসের আধার অনুকার্য দুষ্মন্ত প্রভৃতি নায়ক, এবং সহৃদয় অনুকর্তা নটে ওই স্থায়িভাবের আরোপ করিয়া উহার অলৌকিক সাক্ষাৎকারের বলে আনন্দ অনুভব করে। ইহা যে সামাজিকগণের সম্পূর্ণ অনুভববিরুদ্ধ, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পরের সুখ দেখিয়া তটস্থ ব্যক্তির কোন আনন্দই জন্মলাভ করিতে পারে না। আচায শঙ্কুক যদিও অভিনেতা নটের স্বরূপ বর্ণনায় অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন বটে, তবুও নটনিষ্ঠ স্থায়িভাবের অনুমানেই সামাজিকগণের অলৌকিক আনন্দানুভূতি আত্মলাভ করে—তাঁহার এইরূপ কল্পনাও সন্তোষজনক নহে। তাঁহাব মতেও সামাজিক কেবল তটস্থ, নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। তাহার সহিত স্থায়িভাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। সে শুধু উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। পরের সুখ অনুমান করিয়াই তাহার আনন্দ। এই সিদ্ধান্তটিও রসানুভূতির প্রকৃতস্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হয় নাই। আবার রসের অনুভূতি যে নিতান্তই ব্যক্তিগত (personal), সহৃদয় দর্শকের একান্তভাবে আত্মগত, ইহাও বলা যায় না। সহৃদয় কি এইরূপ অনুভব করে যে, এই যে অনুভূতি, ইহা কেবল আমারই, আর কাহারও নহে? অনুভবের এই পরিমিতত্ব (limitedness), এইরূপ দ্বৈপায়ন চিত্তবৃত্তি বা insularity—কি সাহিত্যরসের ক্ষেত্রে সম্ভব? তাহা হইলে, লৌকিক চিত্তবৃত্তির সহিত সাহিত্যপাঠ বা নাট্যদর্শনজনিত অনুভূতির তফাত রহিল কোথায়? ব্যাবহারিক জগতের যে সকল অনুভূতি, সে সকলের মূলেই তো 'অহংতা' (egoism) চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, উহা তো একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক বা egocentric। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যদি সহৃদয় আত্মার এই অবিদ্যা-রচিত সংকীর্ণতা,—'নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর' লঙ্ঘন করিতে না পারে, তবে কবিকল্পিত বিশ্বের সহিত জড়জগতের ভেদ রহিল কোথায়? একটি

কেন লৌকিক এবং অপরটি কি জন্যই বা অলৌকিক বলিয়া পরিগণিত হইবে? সুতরাং ভট্টনায়ক বলেন যে, রস উৎপন্ন হয় না, অনুমিত হয় না; উহা আত্মগতও নয়, আবার পরগতও নয়।[১] যদি বল—রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের আস্বাদই রসানুভূতি এবং ঐ সকল স্থায়িভাবের আধার শ্রোতা বা প্রেক্ষক স্বয়ং, তবে শৃঙ্গাররসের অনুভবে যেমন সুখবোধ জন্মে, সেইরূপ, করুণরসের অনুভূতিস্থলেও অনুরূপভাবে দুঃখ অনুভূত হয় না কেন? আমরা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমাভিনয় দর্শন করিয়া শৃঙ্গাররসের অনুভূতিবশে সুখে মগ্ন হই, কিন্তু ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্বের বিপ্রয়োগদর্শন করিয়া করুণরসানুভূতির ফলে দুঃখদগ্ধ হই না কেন? যদি শোক নিতান্ত আমারই হইত, তবে ক্রৌঞ্চপত্নীর মত আমিও দুঃখসন্তপ্ত হইতাম, অভিনয়দর্শনের সমস্ত আনন্দ মুছিয়া যাইত। আবার দর্শকের এইরূপ প্রতীতিও জন্মে না যে, শকুন্তলা আমারই কান্তা, সীতা আমারই পত্নী। যদিও বা সাধারণ নায়িকার স্থলে দর্শকের এইরূপ মমতাবোধ জন্মিতেও পারে বটে, তথাপি যেখানে পৌরাণিক দেবদেবী নাটকের নায়কনায়িকার স্থলাভিষিক্ত, সেখানে প্রেক্ষকের এইরূপ মমতাবোধ অসম্ভব, ত্রিভুবনপূজনীয়া দেবী পার্বতী কখনও সামাজিকগত রতিভাবের 'আলম্বন-বিভাব' হইতে পারেন না। যে সকল পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান সভ্য-সমাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অসম্ভব, যেমন রামায়ণকথায় হনূমান কর্তৃক সমুদ্রলঙ্ঘন, সেই সকল ব্যাপার যখন নাট্যে অভিনীত হয়, কিংবা কবি কর্তৃক তাঁহার কাব্যে বর্ণিত হয়, তখন প্রেক্ষক বা পাঠকের রসপ্রতীতির তো কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না? কিন্তু যদি সামাজিকগণের চিত্তে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা ও মমতাবোধ জাগ্রত থাকিত, যদি সে সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি অলৌকিক চেষ্টাসমূহকে একান্তভাবে আত্মসম্বন্ধভাবে অনুভব করিত, তবে তাহার ঐরূপ অবিসংবাদিত রসপ্রতীতি কখনই সম্ভবপর হইত না। সহৃদয় দর্শক কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'র অভিনয় দর্শন করিয়া যে শৃঙ্গাররসের

[১] "ভট্টনায়কস্ত্বাহ—'রসো ন প্রতীয়তে, নোৎপদ্যতে'..."—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ পৃ. ২৭৮

আস্বাদন করিয়া থাকে উহা যে ঐতিহাসিক মহারাজ দুষ্মন্ত ও আশ্রমকন্যা শকুন্তলার পরস্পর রতিভাবের স্মরণেরই ফল, এইরূপ কল্পনাও যুক্তির দিক দিয়া দুর্বল। কেননা, সেই সকল অতীত বৃত্তান্তেরই স্মরণ সম্ভবপর,—যাহারা পূর্বে অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানকালের দর্শক ও শ্রোতা কেহই তো মহারাজ দুষ্মন্ত অথবা তাপসকন্যা শকুন্তলাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের পরস্পর অনুরাগও তাঁহাদের উপলব্ধিগোচর হয় নাই, সুতরাং দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পরস্পর অনুরাগ বা রতির স্মরণই যে প্রেক্ষকের রসানুভূতির প্রতি কারণ, ইহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? যদি বল, কবিনিবদ্ধ বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরস্পর প্রীতি সম্বন্ধে সামাজিকগণের চিত্তে যে শাব্দবোধ (verbal knowledge) জন্মে, উহাই তাহাদের অলৌকিক আনন্দানুভূতির হেতু, তবে জিজ্ঞাস্য, সাধারণ লৌকিক জীবনে লৌকিক নায়কনায়িকার পরস্পর অনুরাগবর্ণনা শ্রবণ করিয়া শ্রোতার চিত্তে ঐরূপ রসবোধ সম্ভব হয় না কেন? প্রত্যুত, ব্যাবহারিক জীবনে নায়ক-মিথুনের অনুরাগবর্ণনা শ্রবণে শ্রোতার চিত্তে তো লজ্জা, জুগুপ্সা প্রভৃতি ভাবেরই উদয় হয়, সে অনুভূতির মধ্যে তো আনন্দের লেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না? ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ কিংবা আচার্য শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ—ইহার কোনটিতেই তো উপরিনির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক মীমাংসা লক্ষিত হয় না? লৌকিক ব্যবহারজীবনের ভাষা হইতে কাব্যের ভাষার পার্থক্য কোথায়? লৌকিক পদার্থসমূহের সহিত কাব্যবর্ণিত ও নাট্যাভিনীত বিভাব প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য কি, এবং লৌকিক অনুভূতির সহিত কবিকর্মসমুদ্ভূত রসানুভূতির এইরূপ লক্ষণীয় বিভিন্নতার প্রতি হেতু কি? আচার্য ভট্টনায়ক তাঁহার 'ভুক্তিবাদে' এই সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বস্তুত তাঁহার মতবাদ অবলম্বন করিয়াই আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'অভিব্যক্তিবাদে'র ভিত্তি প্রবর্তন করেন,—এ কথা অভিনবগুপ্ত স্বয়ং স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কবিকর্মজনিত রসানুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টনায়ক সাহিত্যের তিনটি বিশিষ্ট ব্যাপার বা function কল্পনা করিয়াছেন, 'অভিধা', 'ভাবনা', এবং 'ভোগীকৃতি'। সামাজিকের রসোদ্বোধের প্রতি এই ব্যাপারত্রয়ের প্রত্যেকটিই অপরিহার্যভাবে অপেক্ষিত। আমরা যথাক্রমে এই তিনটি ব্যাপারের স্বরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

'অভিধা' বা denotation—ইহা শব্দের ব্যাপার। এই ব্যাপারের বলেই কোন একটি বিশিষ্ট শব্দ একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। কবিকর্ম প্রথমত কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং বাক্যসমূহ পৃথক পৃথক শব্দেরই সমষ্টি মাত্র। সুতরাং ওই সকল বিভিন্ন শব্দসংঘাত যখন আপন আপন 'অভিধা'-শক্তির সাহায্যে স্ব স্ব অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয়, এবং সামাজিকগণ যখন ওই সকল অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহাদের অভীপ্সিত অর্থের প্রতীতি সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবি তাঁহার কাব্যরচনার দ্বারা সহৃদয়ের চিত্তে যে অভীষ্ট অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে চাহেন, উহা কেবল শব্দের অভিধাশক্তির সাহায্যেই সম্ভবপর হয়। কিন্তু বাচ্যার্থবোধ তো কেবলমাত্র সহৃদয়ের কাব্যপাঠ অথবা নাট্যাভিনয়দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমরা এ কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি যে, সামাজিকের রসপ্রতীতিই সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য। শুধু বাচ্যার্থবোধের দ্বারা তো অলৌকিক অনুভূতি উদয়লাভ করিতে পারে না! ভট্টনায়ক সেই জন্য কবিকর্মের একটি বিলক্ষণ ব্যাপার কল্পনা করিয়াছেন। ইহার নাম ভাবনা বা সাধারণীকৃতি—ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় universalisation। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাহিত্যিক রসোদ্বোধের চারিটি পৃথক উপাদান স্বীকার করিতে হইবে—বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব—উহারা অভিধেয় অর্থেরই শ্রেণীবিভাগমাত্র। কেন না, শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারা যে সকল অর্থ প্রতীত হয়, তাহারা এই চারিটি উপাদানের যে কোনও একটি শ্রেণীর

অন্তর্ভুক্ত হইবেই। সুতরাং ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, কাব্যবর্ণিত অর্থসমূহ বিভাব অনুভাব প্রভৃতি চারিটি উপাদানের আকারেই সামাজিকের চিত্তে প্রতিভাত হইবে। কিন্তু লৌকিক কার্য কারণ এবং চিত্তবৃত্তি হইতে সাহিত্যিক বিভাবাদির বৈশিষ্ট্য কোথায়? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, লোকদৃষ্ট অথবা লোকবর্ণিত অর্থসমূহ দ্রষ্টা অথবা শ্রোতার নিকট হয় একান্ত স্বকীয়ভাবে নতুবা একান্ত পরকীয়রূপে প্রতিভাত হয়। লৌকিকজীবনে আমরা কোনও একটি জিনিসকে, সে বাহ্যজগতেরই হউক, অথবা মনোজগতেরই হউক, হয় একান্ত আমার বলিয়াই গ্রহণ করি, নতুবা উহার সহিত আমার যেন কোনও সম্বন্ধই নাই, উহা নিতান্তই পরকীয়, আমি কেবল উহার উদাসীন সাক্ষী মাত্র, এইরূপ ভাব দেখাইয়া থাকি। ব্যাবহারিক জগতে আমরা কোনও ক্রমেই এই ঐকান্তিক মমতা ও ঐকান্তিক তাটস্থ্য বা ঔদাসীন্য—এই সীমাদ্বয়কে অতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু কবিবর্ণিত বিভাবাদির সহিত সহৃদয় সামাজিকচিত্তের সম্বন্ধ কি ব্যাবহারিক জীবনের এই মমতা ও ঔদাসীন্যরূপ পরিধিদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ভট্টনায়ক বলেন: তাহা নহে। সাহিত্যিক রসপ্রতীতির স্থলে কবিবর্ণিত অর্থসমূহ সামাজিকগণের চিত্তে একান্ত আত্মগত অথবা একান্ত তটস্থ কোনরূপেই প্রতিভাত হয় না। বিভাব প্রভৃতি কাব্যবর্ণিত পদার্থসমূহ স্ব-পর-বিকল্পের অতীতরূপে সর্বসাধারণভাবে সহৃদয়ের চিত্তে উপস্থিত হয়। সহৃদয় দর্শকের দৃষ্টিতে শকুন্তলা শকুন্তলারূপে, নিজের প্রেয়সীরূপে প্রতিভাত হন না। কবিকল্পিত শকুন্তলা পাঠকের অথবা প্রেক্ষকের নিকট শুধু একটি symbol মাত্র, আর কিছুই নহে। শকুন্তলা কেবলমাত্র কান্তারূপে সাধারণ সহৃদয়ের চিত্তভূমিতে অবতীর্ণা হন। কবিকল্পিত সীতাদেবী তাঁহার সমস্ত ঐতিহাসিকতা বিসর্জন দিয়া সহৃদয়ের রসানুভূতির বিভাবরূপে আবির্ভূতা হন। তিনি তখন রাজর্ষি জনকের পুত্রী নন, মহারাজ দশরথের কুলপ্রদীপ রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভার্যা নন। তিনি তখন দেশকালবিনির্মুক্ত নায়িকার আদর্শ প্রতীক, একটি

universal idea মাত্র। নায়কের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। সুতরাং ঐতিহাসিক সর্বলোকবন্দনীয়া সীতাদেবী যদিও তাঁহার স্বকীয় বিশিষ্টতা লইয়া জনকতনয়ারূপে, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূরূপে সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির আলম্বন হইতে পারেন না বটে, তথাপি আদর্শনায়িকার শাশ্বত প্রতীকরূপে, কান্তারূপে তিনি সমস্ত সহৃদয় সমাজেরই আলম্বনবিভাব হইতে পারেন, কোনও বাধাই আর থাকিতে পারে না। 'তা এব চ পরিত্যক্তবিশেষা রসহেতবঃ'। এই স্থলে অনেকে প্রশ্ন করিয়া বসিবেন: সব ক্ষেত্রেই যদি কবিবর্ণিত নায়কনায়িকা আপনাদের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সর্বজনীনরূপে সহৃদয়ের নিকট প্রতীত হইয়া থাকে, যদি সীতা এবং শকুন্তলা নিজ নিজ অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র কান্তারূপে প্রেয়সীরূপে দর্শকচিত্তে আবির্ভূতা হন, তবে নায়িকা যে স্থলে নায়কের সোদরা ভগিনী, সে স্থলে দর্শকের চিত্তে ঐরূপ কান্তাবুদ্ধির, প্রেয়সীবুদ্ধির উদয় হয় না কেন? কেনই বা সেই স্থলে তাদৃশ নায়িকাবিষয়ক শৃঙ্গারানুভূতি দর্শকের চিত্তে উপলব্ধ হয় না? রসগঙ্গাধর-প্রণেতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ভট্টনায়কের বর্ণিত এই সাধারণীকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন: কবিবর্ণিত নায়কনায়িকা সহৃদয়ের রসানুভূতির প্রতি 'বিভাব'রূপে কল্পিত হইতে পারে তখনই, যখন ঐরূপ বিভাব হইবার পক্ষে কোনও প্রতিবন্ধক বর্তমান থাকিবে না। 'ভগিনী'তে কান্তাবুদ্ধি জন্মে না, সে সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির 'আলম্বন-বিভাব' হইতে পারে না, কেন না, লৌকিক দৃষ্টিতে ভগিনীর প্রতি প্রণয়মূলক আসক্তি গর্হণীয়। সুতরাং এই লৌকিক সংস্কার অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে জাগরূক থাকে, এবং সেই বাধ-জ্ঞানই সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।[১] করুণ,

১. এইগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি দৈশিক ও সামাজিক নিষেধমাত্র—Psychologyতে যাহাদের বলা হয় social inhibitions। যে দেশে বা সমাজে ভগিনীর সহিত প্রণয়সম্বন্ধ রীতিবিগর্হিত নহে, তদ্দেশীয় দর্শকের পক্ষে অভিনয়স্থলে ভগিনীও কান্তারূপে তাহার শৃঙ্গারানুভূতির আলম্বনবিভাব

বীর প্রভৃতি রসান্তরের স্থলেও অনুরূপ বাধ-জ্ঞানের অভাব থাকিলেই নায়ক-নায়িকা সামাজিকের রসানুভূতির 'বিভাব' হইতে পারে। অন্যথা নহে। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ দেখিয়া কোনও সহৃদয় দর্শকের চিত্তে করুণরসের উদ্রেক হয় না, কারণ পূর্ব হইতেই তাহার চিত্ত দুর্যোধনের প্রতি বিরূপ হইয়া আছে। এইরূপ পাপিষ্ঠ কিরূপে আমাদের শোকভাজন হইতে পারে; ঈদৃশ দুষ্কর্মকারীর জন্য শোক করা নীতিবিরুদ্ধ—এইরূপ একটি সংস্কার সামাজিকের চিত্তে দৃঢ়মূলভাবে রোপিত থাকে, সেইজন্য দুর্যোধন কখনও প্রকৃত সহৃদয়ের করুণরসানুভূতির আলম্বন হইতে পারেই না। সেইরূপ, নায়কে কাপুরুষত্ব-জ্ঞান বীররসের প্রতিবন্ধক। 'শৃঙ্গারের বিভাব অগম্যা হইবে না', 'করুণের বিভাব অশোচ্য হইবে না', 'বীররসের বিভাব কাপুরুষ হইবে না' এইভাবে প্রত্যেক রসের বিভাবের পক্ষে কতকগুলি নেতিমূলক জ্ঞান (negative judgments) অবশ্যই থাকিতে হইবে। কিন্তু এইস্থলে জিজ্ঞাস্য: ভগিনীর স্থলে কান্তাবুদ্ধি যেমন 'ইনি অগম্যা' এইরূপ সংস্কারপ্রসূত বাধজ্ঞানের ফলে জন্মলাভ করিতে পাবে না, শকুন্তলার স্থলেই বা কি জন্য ঐরূপ বাধজ্ঞান কান্তাবুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় না? শকুন্তলার প্রতি, সীতার প্রতি প্রীতিও তো তুল্যভাবে নীতিবিরুদ্ধ? অনেকে বলিবেন সহৃদয় আপনাকে দুষ্যন্ত প্রভৃতি নায়কের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে, সুতরাং শকুন্তলার প্রতি, কিংবা সীতাদেবীর প্রতি তাহার প্রণয়মূলক আসক্তি বা রতি লৌকিক নিষেধবুদ্ধির দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। কিন্তু এই স্থলে জিজ্ঞাস্য: আমি

হইতে পারে, কোনও বাধাই নাই। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়সমাজে মাতুলসুতার পরিণয় প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত, সুতরাং পিতৃষসার পুত্র ও মাতুলের পুত্রীকে নায়কনায়িকারূপে কল্পনা করিয়া যেখানে নাটক রচিত হইয়াছে, সেখানে দ্রাবিড়দেশীয় সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির পক্ষে কোনও বিঘ্নই যে ঘটিবে না—তাহা বলাই বাহুল্য। "স্বমাতুলসুতাং প্রাপ্য দাক্ষিণাত্যস্তু নৃত্যতি"। লৌকিক আচার ব্যবহার ও নীতিবোধ যে আমাদের সাহিত্যিক রসানুভূতির উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ইহার দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হয়।

একজন নিঃস্ব প্রাকৃতজন হইয়া নিজেকে কিরূপে সার্বভৌম নরপতি দুষ্মন্তের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিব? আমি একজন আধুনিক কালের নগণ্য মনুষ্য কিরূপে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র হইয়া উঠিব? এইরূপ শত শত বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া দুইটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিরূপে অভেদ সাধিত হইবে? ইহার উত্তরে ভট্টনায়ক বলেন: সত্য বটে প্রেক্ষক আপনাকে নায়কনায়িকার সহিত অভিন্নভাবে কল্পনা করিতে পারে না, কেন না, দেশ, কাল, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি শত শত বৈষম্য ঐরূপ অভেদবোধের প্রতিবন্ধক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাব্যপাঠ অথবা নাট্যদর্শন হইতে সামাজিকগণের রসবোধের কোনও বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। সীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি নায়িকা যেমন তাহাদের সাধারণীকৃত কান্তারূপ পরিগ্রহ করিয়া সামাজিকগণের লোচনের সমক্ষে বিভাবরূপে প্রতিভাত হন, সেইরূপ 'আমি যে দুষ্মন্ত নহি' কিংবা 'রামচন্দ্র নহি' এইরূপ ভেদবুদ্ধিও তখনকার মত স্থগিত বা প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। 'আমি দুষ্মন্ত'—বিধিমুখে (positive) এইরূপ অভেদবুদ্ধি না জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু 'আমি দুষ্মন্ত নহি'—এইরূপ অসম্ভাবনাও অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে উদিত হইতে পারে না, এবং এই ভেদবুদ্ধির অভাবই নেতিমূলক হইলেও অভেদবুদ্ধির মতই রসবোধের সহায়তা করে। আমরা Coleridge-এর ভাষায় এইজাতীয় জ্ঞানকে "suspension of disbelief" বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি।[১] কিন্তু এইরূপ সংশয় এবং অসম্ভাবনা কাব্যপাঠ অথবা অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় শ্রোতা অথবা দর্শকের চিত্তে উৎপত্তিলাভ করে না কি জন্য? কিরূপে উহা তখনকার মত অবলুপ্ত হইয়া যায়, আচ্ছাদিত হইয়া থাকে? লৌকিক শব্দসমূহ শ্রবণ করিয়া অথবা লৌকিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া ওইজাতীয় ভেদবুদ্ধির স্থগন কি জন্য সম্ভবপর হয়

---

১. **"The true stage-illusion in this and in all other things consists not in the mind's judging it to be a forest, but in its remission of the judgement that it is not forest"—Coleridge : Lecture on *The Progress of Drama*.**

না? কাব্যপাঠ এবং অভিনয়দর্শনের ক্ষেত্রেই বা কেমন করিয়া রসপ্রতীতি-বিঘাতক অসম্ভাবনাপ্রসূত ভেদবুদ্ধি তিরস্কৃত হইয়া থাকে? আচার্য ভট্টনায়ক এই প্রশ্নের অতি সুন্দর মীমাংসা নির্দেশ করিয়াছেন, এবং পরবর্তী অভিনব-গুপ্তাচার্য প্রমুখ মনীষিবৃন্দ সাহিত্যিক রসানুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টনায়কের এই সমাধানকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টনায়ক বলেন: কাব্য ও নাট্যের সহিত ব্যাবহারিক শব্দসংঘাত ও লৌকিক প্রত্যক্ষের একটি প্রধান বৈলক্ষণ্য আছে, যাহার ফলে কাব্যবর্ণিত ও নাট্যাভিনীত অর্থসমূহই কেবলমাত্র শ্রোতা ও দর্শকের সমক্ষে সাধারণীভূত হইয়া প্রকাশ পায়, যাহার ফলে সামাজিকের সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ দূর হইয়া আত্মার সহিত নাটকীয় চরিত্রসমূহের ভেদজ্ঞান তাৎকালিকভাবে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। কি সেই বৈলক্ষণ্য—যাহার ফলে এই সাধারণীকরণ বা universalisation সম্ভবপর হয়? কাব্যের ক্ষেত্রে দোষাভাব, এবং গুণ (যথা, ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ প্রভৃতি) ও অলঙ্কারসমূহের যথাযথ সন্নিবেশই এই সাধারণীকরণের মূলে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কাব্যের সহিত ব্যাবহারিক শব্দপ্রয়োগের পার্থক্য প্রধানত 'বক্রোক্তি' অথবা অলঙ্কার সমাবেশে। এইভাবে বিবিধগুণালঙ্কারমণ্ডিত, দোষসম্পর্কশূন্য শব্দসমূহের গ্রহণের দ্বারা কবি তাঁহার পাত্র, পাত্রী, দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে একটি শাশ্বতরূপ সংযোজনা করিতে সমর্থ হন, এবং তাহাদের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট শক্তির সঞ্চার করিতে পারেন, যাহা পাঠক অথবা শ্রোতার সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ বিলীন করিয়া দিতে পারে। নাট্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সামগ্রী অভিনীত পদার্থসমূহের সাধারণীকরণ বাস্তব করিয়া তুলে। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক এই চতুর্বিধ অভিনয়, বিবিধ নাট্যালঙ্কার ও লাস্যাঙ্গ, এবং গীত বাদিত্র ও আতোদ্যের বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা অভিনীত পদার্থসমূহ দেশ, কাল এবং অবস্থার সংকীর্ণ পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া সর্বদেশকাল-সাধারণ শাশ্বতরূপে সহৃদয়ের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। সুতরাং এই

সাধারণীকৃতি কাব্যের বিবিধ গুণ, অলংকার, রীতি, ছন্দঃ প্রভৃতি উপাদানের এবং নাট্যের বিচিত্র উপকরণের অলোকসাধারণ শক্তি।[১] অভিনয়ের ক্ষেত্রে রঙ্গপ্রযোজক যে-সকল চিত্র এবং পুস্তকর্মের (scenario) সমাবেশ করেন, পূর্বরঙ্গের অবতারণার সময় রঙ্গালয় যে তৌর্যত্রিকের বিচিত্র নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠে, পাত্র-পাত্রীগণের উক্তিসমূহ ভারতী, সাত্বতী, কৌশিকী এবং আরভটী-প্রমুখ নাট্যবৃত্তির যথোচিত সংঘটনাবশে যে অপরূপ ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে, ওই সমস্তই সহৃদয় দর্শকের পরিমিত সত্তাকে বিস্মরণের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্যই, এ সকলই অভিনীত পদার্থসমূহকে খণ্ডিত দেশকালের ক্ষুদ্র সীমা উত্তীর্ণ করিয়া দিবার উপকরণমাত্র, তাহার ব্যসনিতার উপকরণ নহে। এই সকল বিচিত্র পরিবেশ ও নাট্যাঙ্গের এমনই অলৌকিক মহিমা যে, অতিশয় অহৃদয় ব্যক্তিও রঙ্গালয়ের পরিধির মধ্যে অবস্থানকালে আপনার অজ্ঞাতসারেই সহৃদয়তায় দীক্ষিত হইয়া রসাস্বাদনক্ষম হইয়া উঠে।[২] গুণ, অলঙ্কার, রীতি, গীত, বাদিত্র, আতোদ্য, লাস্য প্রভৃতি কাব্য ও নাট্যের উপাদানসমূহের বর্ণনীয় ও অভিনেয় পদার্থ-সমূহের অন্তর্নিগূঢ় সর্বজনীনতা প্রকট করিয়া তুলিবার এবং পাঠক ও দর্শকের পরিমিত ব্যক্তিত্বের প্রাচীর ধ্বংস করিয়া তাহার মধ্যে অপরিমিত অহংতাবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিবার এই যে অলৌকিক ক্ষমতা, ইহাই আচার্য ভট্টনায়কের সিদ্ধান্তে 'ভাবনা' ব্যাপার বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু কাব্যবর্ণিত বা নাট্যাভিনীত পদার্থসমূহের সাধারণীকৃত দেশকালাতীত

১. "তস্মাৎ কাব্যে দোষাভাব-গুণা-লঙ্কারময়ত্বলক্ষণেন, নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ নিবিড়নিজমোহ-সঙ্কটতানিবারণকারিণা বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনাঽভিধাতো দ্বিতীয়েনাংশেন ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ..." —অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৮।

২. "...সাধারণ্যমহিম্না সকলভোগ্যত্বসহিষ্ণুভিঃ শব্দাদিবিষয়ময়ৈভি-(র্যৈ ?)-রাতোদ্য-গান-বিচিত্রমণ্ডপ-পদ-বিদগ্ধগণিকাদিভিরুপরঞ্জনং সমাশ্রিতং, যেনাহৃদয়োঽপি হৃদয়-বৈমল্যপ্রাপ্ত্যা সহৃদয়ীক্রিয়তে।..." —ঐ. পৃ. ২৮২-৮৩।

রূপের প্রতীতিই তো সহৃদয়ের রসাস্বাদের চরম কথা নহে। রসচর্বণাজনিত সামাজিকচিত্তে যে অলৌকিক আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার হেতু কি? ঐ আনন্দাংশের উৎস কোথায় নিহিত আছে, এবং কোন্ ব্যাপার বলেই বা সেই রুদ্ধ উৎসমুখ নিঃসারিত হয়? ভট্টনায়ক রসচর্বণায় এই আনন্দানুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সহৃদয়চিত্তের একটি বিশিষ্ট ব্যাপার (function) স্বীকার করিয়াছেন, যাহার নাম 'ভোগীকৃতি'। 'অভিধা' এবং 'ভাবনা'—পূর্ববর্ণিত এই দুইটি ব্যাপার যথাক্রমে 'শব্দ' ও 'অর্থের' স্বতন্ত্র শক্তি। কিন্তু 'ভোগীকৃতি' সম্পূর্ণরূপে সহৃদয়ের আন্তর ব্যাপার—ইহা একটি psychical process; সহৃদয়চিত্ত তখন বাহ্যবস্তু হইতে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হইয়া আন্তরজগতের সাধারণীকৃত বিজ্ঞানমাত্রসার পদার্থসমূহের আস্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত, উহা তখন একান্তভাবে অন্তর্মুখ। বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাবের সাধারণীকৃতির ফলে মানবচিত্তের যে স্বাভাবিক আসক্তি ও গ্রহণবর্জনস্পৃহা, তাহা তখনকার মত তিরোভূত হয়। ত্রিগুণাত্মক চিত্তে তখন রজোগুণ ও তমোগুণ ক্ষণিকের জন্য আবৃত ও অভিভূত হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ গুণদ্বয়-জনিত চাঞ্চল্য ও জড়তা, দুঃখ ও মোহ সহৃদয়ের অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হয়। সহৃদয়ের অন্তঃকরণ সেই সময়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেকের ফলে নিরতিশয় স্বচ্ছতা লাভ করে। তাহার মধ্যেই সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দময় পরব্রহ্ম—শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মতে যিনি 'পরমশিব', আপনার অখণ্ড স্বরূপে প্রকাশমান হন চিত্ত তখন নির্বিষয়, স্থির, মোহবিনির্মুক্ত,—আনন্দ ও বিজ্ঞানের আকর পরমশিবের সহিত ঐকাত্ম্যসূত্রে সম্বদ্ধ। বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়ায়, রজোবৃত্তির উদ্রেকবশত যে চাঞ্চল্য,—সাংখ্যপ্রস্থানের আচার্যগণের মতে যাহা সমস্ত দুঃখের নিদান, সেই অস্থৈর্য ও চাঞ্চল্য তখন লুপ্ত। ত্রিগুণাত্মক চিত্তের সত্ত্বগুণের উদ্রেকের ফলেই চৈতন্যের স্বরূপাবরক সমস্ত মল দূরীভূত হয়। পূর্ণপ্রকাশমান আত্মচৈতন্য তখন উচ্ছলিত, অপরিমিত স্বরূপানন্দের আস্বাদনে মগ্ন। বেত্তা ও বেদ্য তখন অভিন্ন, গ্রাহ্য ও গ্রাহকের

মধ্যে, ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে কোনও ভেদ তখন থাকে না। এই আস্বাদন একঘন—সমস্ত বিজাতীয় বিষয়চিন্তা হইতে নির্মুক্ত। কাব্যের ও নাট্যের লোকাতীত মহিমাবশে, স্বভাবত চঞ্চল ও দুঃখযোনি চিত্তে সত্ত্বোদ্রেকবশে চিদানন্দঘন আত্মতত্ত্বের এই একান্তভাবে বহির্বিষয়পরাঙ্‌মুখতা, বিষয়োপরাগবিনির্মুক্তি ও স্বরূপবিশ্রান্তি—ইহাই কবিকর্মজনিত আনন্দানুভূতির নিগূঢ় রহস্য। এইক্ষণে আত্মা বা পরমশিবের যত কিছু অবিদ্যারচিত আবরণ বা মল, সে সকলই অকস্মাৎ অপগত হয়। তখন অহংতাবোধ থাকে বটে, কিন্তু সে অহংতা (egoism) সর্বব্যাপক,—ব্যাবহারিক জীবনের খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন 'অস্মিতা' নহে। ব্যাবহারিক জীবনের অস্মিতা ও মমতা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের সীমার মধ্যে সম্বদ্ধ—দেহ আমার, পুত্র আমার, ঐশ্বর্য আমার, জায়া আমার, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি দরিদ্র, আমি ধনী এইরূপ। কিন্তু যখন কাব্যের সাধারণীকৃতি ও ভোগীকৃতির মহিমাবশে এই পরিচ্ছিন্ন অহংতাবুদ্ধি লুপ্ত হয়, তখন বিশ্বের সমস্ত পদার্থই, ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত কিছু সমস্তই আমার হইয়া দাঁড়ায়। সকলের মধ্যেই আমি নিজের আত্মাকে অনুভব করি। "সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।" আমি যেমন মানুষ, তেমনি আমি নদী, পর্বত, তরু, লতা, ওষধি, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ, বিহঙ্গম সমস্তই আমি। আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ যেমন আমার, সেইরূপ জগতের সকল প্রাণীর সুখ-দুঃখ, চিন্তা, প্রবৃত্তি সমস্তই তুল্যভাবে আমার। শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মতে এই যে ব্যাপক অহংতা ও মমতাবোধ, ইহার সহিত বৈদান্তিক দার্শনিকগণের অহঙ্কার ও মমকারের একান্ত শূন্যতা ও বিলুপ্তি—তাহার কোনও পার্থক্য নাই। সর্ববিধ সৃষ্টিকে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া চিন্তা করা এবং অহংজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলয়—'আমি ও আমার বলিয়া কিছুই নাই' এইরূপ বুদ্ধি, পরস্পর অভিন্ন। একটির দ্বারা যেমন আপনার খণ্ডিত অহংতাজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করিতে পারা যায়, অপরটিও সেইরূপ তুল্যভাবে মুক্তির সোপান। পূর্ণতা

শুধু শূন্যতারই নামান্তর মাত্র। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থাই, খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন অহংতাবোধই কেবলমাত্র সমস্ত দুঃখের হেতু—অবিদ্যার আধার। সেইজন্য একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়াছেন: "অহংকার ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাহা যদি দুষ্কর হয়, তবে অহংকারকেই আশ্রয় করিবে। কিন্তু সেই অহংবুদ্ধি সর্বত্র সমানভাবে জাগরূক থাকা চাই।"[১] সাহিত্যে রসাস্বাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইলেও, নিপুণভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহার উপযোগিতা ধরা পড়িবে। সহৃদয় দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী অভিনয় ও কাব্য-পাঠের অবসরে কবিবর্ণিত প্রত্যেক চরিত্রের সহিতই আসক্তিশূন্য ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া থাকে। আমি দুষ্মন্ত, আমি শকুন্তলা, আমি অনসূয়া, আমি প্রিয়ংবদা, আমি কণ্ব, আমি বিদূষক—অথচ আমি দুষ্মন্ত নই, শকুন্তলা নই, অনসূয়া নই, প্রিয়ংবদা নই, কণ্ব নই, বিদূষক নই।[২] সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই এই

---

১. "ত্যক্তব্যোঽহংকারঃ কিন্তু স যদি নৈব শক্যতে ত্যক্তুম্।
কর্তব্যোঽহংকারঃ কিন্তু স সর্বত্র কর্তব্যঃ।"—অপ্পয়দীক্ষিত

২. ভারতীয় দর্শনে আত্মার জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ক্লেশ ও কর্মবিপাকবশত কত বিচিত্র জাতি, আয়ু ও ভোগের মধ্য দিয়া আমার আত্মা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, সেই সকল ক্লেশকর্মবিপাকানুভবজনিত বিচিত্র বাসনা আমার চিত্তভূমিকে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে, বহুবর্ণ তন্তু যেমন পটকে বিচিত্র করিয়া রাখে, ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রন্থি যেমন মৎস্যজালকে চিত্রিত করিয়া রাখে। সুতরাং উপযুক্ত উদ্বোধক হেতুর সদ্ভাবে সেই সকল বিচিত্র বাসনাও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন: "ক্লেশকর্মবিপাকানুভবনির্বর্তিতাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং বিচিত্রীকৃতমিব সর্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততম্"।—যো. সূ. ভাষ্য ২.১৩। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতায় ও 'জীবনদেবতা' তত্ত্বে বিচিত্র জন্ম ও অনুভূতির মধ্য দিয়া আত্মার এই অগ্রগতির তথ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন, "যুগে যুগে এসেছি চলিয়া, স্খলিয়া স্খলিয়া, চুপে চুপে, রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে।" (বলাকা. ৮); "প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস / সুখের দুখের কাহিনী / পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই / অতীতের যত রাগিণী // পুরাতন সেই

আত্মানুভূতি সম্ভব হয় শুধু সর্বব্যাপক আত্মচৈতন্যের আবরক মলাপসরণের ফলে, উপরিবর্ণিত পূর্ণ অহংতাবোধের স্ফুরণের ফলে। এমন কি, রামায়ণ-

গীতি / সে যেন আমারি স্মৃতি / কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার / গোপনে রয়েছে নিতি / প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে / কত বা উঠিছে মেলিয়া / পিতামহদের জীবনে আমরা / দুজনে এসেছি খেলিয়া। /"—ইত্যাদি। অভিনয়ের স্থলে সহৃদয় সামাজিক যে স্ত্রী ও পুরুষ, পাত্র ও পাত্রীর বিচিত্র অনুভূতিসমূহের সাহত ঐকাত্ম্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহাও ওই একই কারণে। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারাও সহৃদয়ের এই অনুভূতি সমর্থন করিতে পারা যায়। প্রত্যেক প্রাণিদেহের গঠনের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই লক্ষণ বিদ্যমান আছে, ফলে তাহাদের মানসিক গঠনও উভয়লক্ষণাক্রান্ত। আমরা কেহই দৈহিক বা মানসিক, কোনও দিক দিয়াই পূর্ণ পুরুষ বা পূর্ণ স্ত্রী নহি—আংশিক পুরুষ এবং আংশিক স্ত্রী। তবে অংশের মধ্যে তারতম্য আছে বটে। সুতরাং আমাদের দেহ ও মনের এই দ্বিলিঙ্গতার (bisexuality বা hermaphroditism) ফলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ পাত্র পাত্রীর অনুভূতির সহিত আমরা নিজেদের ঐকাত্ম্য স্থাপন করিতে সমর্থ হই এবং ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত। তুলনীয়—

"For a long time it was believed, not only by the ignorant but also by the instructed, that masculine and feminine were two antagonistic and profoundly differentiated entities. Man and woman were set widely apart in our minds, and the concept of the integrity of our own sex was maintained as an inviolable characteristic of personality. To cast any doubt on one's manhood or one's womanhood was regarded as an insult, especially to the male. Because of this attitude, all intersexual states, whether they affected the physical state (hermaphroditism) or the psychological make up (intersexual conditions, homesexuality), were looked upon either as repulsive monstrosities or else as heinous sins.

"As a result of our biological survey, we are in a position to see that this was an entirely false way of looking at sex, and that we must change our views The two sexes, masculine and feminine, are not two separate and distinct entities standing widely apart. Rather must we regard them as two conditions that may approach each other and 'end by fusing in a phase of primitive ambiguity' (Maranon). In every male lurks a female, in every female a male, sometimes so arrogant as to mask the true personality, sometimes so shy as to be scarcely perceptible. No longer can we speak of the

পাঠকালে হনূমানের সাগর লঙ্ঘন প্রভৃতি অলৌকিক কার্যও তখন প্রকৃত সহৃদয়ের নিকট অপ্রাকৃত বলিয়া বোধ হয় না, উহার মধ্যেও তখন আমিত্ববোধ অনুস্যূত হইয়া থাকে। এই পরিপূর্ণ অহংতার স্ফুরণের দ্বারাই চিরাতীত ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষীকরণ ও শ্রবণের ফলে কোনও বাধবুদ্ধির উদয় হয় না,—কেন না, আমাদের অন্তর্গুহাশায়ী যে অখণ্ড, পরিপূর্ণ আত্মচৈতন্য বা পরমশিব, তিনি সমস্ত কালের সহভাবী,—তিনি অতীত, অনাগত ও বর্তমান প্রত্যেকের মধ্যে আছেন। এই পরিপূর্ণ আত্মতত্ত্বের অবচ্ছেদক কোনও জাতি (genus) নাই, ব্যক্তি (gender) নাই, দেশ নাই, কাল নাই। সেই জন্যই সহৃদয় পুরুষ ও রমণী, বালক ও বৃদ্ধ—প্রত্যেক পাঠক ও দর্শক সমানভাবে নাট্যবর্ণিত সর্বজাতীয় পদার্থের সহিত সহানুভূতি বোধ করিতে সমর্থ হন। সীতার দুঃখে যেমন আমরা কাতর হই, হনূমানের বীরত্বে তেমনই উৎসাহিত হই, আবার মহারাজ দুষ্মন্ত কর্তৃক অনুগম্যমান ত্রস্ত মৃগপোতকের ভীতিও[১] আমাদের

'male type' and of the 'female type', but rather of a series of infinite gradations 'which extend from a flagrant hermaphroditism to forms so alternated that they merge into normality itself" (Maranon)."—*The Physiology of Sex*: Kenneth Walker. পৃ. ৩২-৩৩ (Pelican Books. 1945), Freud-ও বলেন: "A certain degree of anatomical hermaphroditism really belongs to the normal. In no normally formed male or female are traces of the apparatus of the other sex lacking... The conception which we gather from this long known anatomical fact is that there is an original predisposition to bisexuality, that in the course of development this changes to monosexuality, leaving only slight remnants of the stunted sex.

"It was natural to transfer this view to the psychic sphere and to conceive the inversion in its aberrations as an expression of psychic hermaphroditism." —Sigmund Freud: *Three Contributions to the Theory of Sex*, পৃ. ৫৫৮ (*The Basic Writings of Sigmund Freud*: The Modern Library, New York, 1938).

১. যাঁহারা প্রসিদ্ধ ছায়াশিল্পী Walt Disney'র দ্বারা চিত্রিত ও প্রযোজিত *Bambi* ছায়াচিত্র দর্শন করিয়াছেন,—তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, একটি সামান্য তির্যকপ্রাণীর, ক্ষুদ্র

চিত্তে সমানভাবে ভয়ানক রসের রসের সঞ্চার করে,—এই দেশ-কাল-বয়োবস্থা-জাতি-ব্যক্তি প্রভৃতি ব্যাবহারিক অবিদ্যারচিত অবচ্ছেদক বা limitation-এর অতীত আত্মচৈতন্যের স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ অহংতাবোধ প্রত্যেকের সহিতই সমানভাবে অনুস্যূত হইয়া থাকে। সুতরাং অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে যে অলৌকিক প্রতীতির উদয় হয়, উহা যেমন এক দিকে একান্ত ব্যাপকভাবে personal বা আত্মকেন্দ্রিক, অপর দিক দিয়া বিচার করিলে উহা সম্পূর্ণ impersonal বা নৈর্ব্যক্তিক। কেন না, যে অহংজ্ঞানের মধ্যে কোনও খণ্ডতা নাই, তাহা অহংকারশূন্যতারই নামান্তর। পূর্বেই বলিয়াছি—অখণ্ড শূন্যতা ও অখণ্ড পূর্ণতা বিচারদৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন। এই জন্যই আচার্য ভট্টনায়ক সহৃদয়ের রসচর্বণাকে যোগিগণের ব্রহ্মাস্বাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ অহংতাবোধ, সত্ত্বোদ্রেক, চৈতন্যের অন্তর্মুখীনতা, স্বসংবেদন ও আনন্দনির্ভাস সমান।[১] তবে উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ কোথায়? সাহিত্যিক রসাস্বাদ ও জীবন্মুক্ত যোগীর আত্মসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দচর্বণার প্রকার এক হইলেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। যোগিগণের সাক্ষাৎকার বাহ্য ও আন্তর সমস্ত বিষয়ের সহিত অসংস্পৃষ্ট। কিন্তু সহৃদয়ের রসচর্বণা অন্তর্মুখীন হইলেও বাহ্যবস্তুর দ্বারা অনালিঙ্গিত হইলেও, আন্তর রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের প্রতিভাসের দ্বারা শবলিত। আত্মচৈতন্য যেমন স্বমহিমায় প্রকাশ পাইতে থাকে, সেইরূপ ওই চৈতন্যের

মৃগশিশুর জন্ম ও কৈশোরবৃত্তান্ত মানবের জীবননাট্যের মতই সহৃদয়ের চিত্তে বিভিন্ন রসের উদ্রেক করিতে পারে ও তাহাতে পরিপূর্ণ অহংতাবোধের জাগরণের প্রতি কোনই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না।

১. "পাঠ্যাদথ ধ্রুবাগানাৎ ততঃ সম্পূরিতে রসে।
তদাস্বাদভরৈকাগ্রো হৃষ্যত্যন্তর্মুখঃ ক্ষণম্॥
ততো নির্বিষয়স্যাস্য স্বরূপাবস্থিতৌ নিজঃ।
ব্যজ্যতে হ্লাদনিষ্যন্দো যেন তৃপ্যন্তি যোগিনঃ॥"—ব্যক্তিবিবেক, পৃ. ৯৪

স্ফুরণের দ্বারা আন্তর রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবও প্রকাশিত হইয়া উঠে। সেইজন্যই ভট্টনায়ক রসচর্বণাকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলিয়াছেন। সুতরাং রসচর্বণায় আত্মার আনন্দ ও চৈতন্যাংশ রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা উপরক্ত—ঐ সকল স্থায়িভাব চিদানন্দময় ব্রহ্মের উপাধি বা adjunct মাত্র। সেইজন্যই শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন রসানুভূতির স্থলে আনন্দোপলব্ধি যদিও সর্বসাধারণ, তথাপি সেই আনন্দের মধ্যে প্রকারভেদ আছে—বৈলক্ষণ্য আছে। একই স্ফটিকখণ্ড যেমন জপা, নীলোৎপল প্রভৃতি কুসুমের সান্নিধ্যবশত যথাক্রমে রক্ত নীল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ স্বরূপাবস্থিত আত্মচৈতন্যের নৈসর্গিক আনন্দ যদিও অপরিণামী ও ভেদশূন্য, তথাপি কাব্য ও নাট্যের ভাবনাব্যাপারের বশে রতিপ্রভৃতি বিচিত্র স্থায়িভাব যখন হৃদয়সংবাদক্রমে সহৃদয়ের অন্তরের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া নিরাবরণ চৈতন্যের সান্নিধ্যে উপস্থাপিত হয়, তখন সেই সেই স্থায়িভাবের দ্বারা উপরঞ্জিত আনন্দও স্বরূপত অভিন্ন হইলেও সহৃদয়ের অনুভূতিতে বিভিন্ন আকারে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। এই জন্য শৃঙ্গারে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি, করুণরসের চর্বণাজনিত আনন্দোপলব্ধি হইতে উহা বিলক্ষণ। কেন না, প্রথমটিতে আনন্দাংশের উপাধি রতি, দ্বিতীয়টিতে শোক।

সুতরাং ভট্টনায়কের মতে রসচর্বণার উপযোগী ব্যাপারত্রয় কল্পনা করিতে হয়। অভিধা, ভাবনা এবং ভোগীকৃতি। এই তিনটির মধ্যে 'ভোগীকৃতি' ব্যাপারটিই মুখ্য, অন্য দুইটি তাহারই অঙ্গমাত্র। সেইজন্য ভট্টনায়ক বলিয়াছেন : 'দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপারপ্রাধান্যে কাব্যগীর্ভবেৎ।'

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী টীকাকারগণ ভট্টনায়কের উপরিবর্ণিত 'ভুক্তিবাদ'কে সাংখ্যসিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কল্পনা করেন। সত্য বটে,—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় ভট্টনায়ক স্বীকার করিয়াছেন, এবং সাংখ্যদর্শনই উহাদের আকর। কিন্তু পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য

দার্শনিক প্রস্থানও সাংখ্যদর্শনের ঐ গুণত্রয়বাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার দ্বারা ভট্টনায়কের মতবাদ যে সাংখ্যসিদ্ধান্তের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ নিঃসন্দেহ উক্তি যুক্তির দিক্ দিয়া দুর্বল। সত্ত্বগুণের উদ্রেক এবং রজঃ ও তমোগুণের অভিভবের ফলে অন্তরে যে সুখ ও নৈর্মল্যের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে, ইহা কেবল সাংখ্যদর্শনেরই সিদ্ধান্ত নহে, পরন্তু অধিকাংশ আস্তিক্য-দর্শনেরই সাধারণ সিদ্ধান্ত—পারিভাষিক সংজ্ঞায় যাহাকে বলা হয় "সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত"। ভট্টনায়ক ভোগীকরণের ক্ষেত্রে রজঃ ও তমোগুণের অভিভব ও সত্ত্বোদ্রেকজনিত নৈর্মল্য ও সুখাভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার মতবাদ সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিপরীতগামী। সাংখ্যমতে সুখ জড় চিত্তের ধর্ম, চৈতন্য বা পুরুষের ধর্ম নহে; কিন্তু ভট্টনায়কের মতবাদ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, রসচর্বণাজনিত আনন্দ সচ্চিদানন্দময় আত্মচৈতন্যেরই স্বরূপ। সাংখ্যদর্শনই যদি আচার্য ভট্টনায়কের উপজীব্য হইত, তবে রসানুভূতি সুখ ও দুঃখ উভয়াত্মক হইত,[১] কিন্তু আমরা দেখিলাম ভট্টনায়কের রসচর্বণার মধ্যে দুঃখের লেশমাত্র নাই, উহা ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর পরিপূর্ণ আনন্দের আস্বাদ। সুতরাং ভুক্তিবাদ এবং সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে এইরূপ গূঢ় ভেদ বর্তমান থাকিতে আমরা কিরূপে ভট্টনায়ককে সাংখ্যমতানুসারী বলিয়া কল্পনা করিব?[২]

১. "যেন ত্বত্যাধারি—সুখদুঃখজননশক্তিযুক্তা বিষয়সামগ্রী বাহৈব। সাংখ্যদৃশা সুখদুঃখস্বভাবো রসঃ……"—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৮। সত্যসত্যই রসানুভূতির স্থলে দুঃখের অনুভূতি সম্ভব কিনা, ইহা স্বতন্ত্র বিচার সাপেক্ষ। 'নাট্যদর্পণ'কার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র রসানুভূতির এই দ্বৈধ স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

২. প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক Hiriyanna এই সকল ভেদ লক্ষ্য না করিয়াই 'কাব্যপ্রদীপ'-কারের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ'কে সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য: "I have stated that in not a few systems of philosophy, there was a deliberate application of fundamental principles to the interpretation of *Rasa*. The distinctive doctrines of more than one

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আচার্য ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ' কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং শারদাতনয় তাঁহার 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে ইহা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং আমরা তদনুসারেই ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদে'র ব্যাখ্যা দিয়াছি। কাশ্মীর প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রধান কেন্দ্র এবং কাশ্মীরই আচার্য ভট্টনায়কের জন্মভূমি। অভিনবগুপ্ত, কুন্তকাচার্য, মহিমভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন সমস্ত কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিকই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রস্থানের দার্শনিক ছিলেন—ইহা তাঁহাদের গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক প্রভৃতি আলোচনা করিলে বুঝা যায়। ভট্টনায়কও যে প্রত্যভিজ্ঞাবাদী দার্শনিক ছিলেন, ইহা তাঁহার রসসূত্রের ব্যাখ্যার ভাষা ও শৈলী হইতেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে। 'সংবিদ্‌বিশ্রান্তি', 'আনন্দঘন', 'উল্লাস' প্রভৃতি শব্দ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিশিষ্ট সম্পদ, এবং ভট্টনায়ক তাঁহার রসসূত্রের ভাষ্যে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনসম্মত এইরূপ বহু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'অভিনবভারতী'তে ভট্টনায়ক-রচিত যে মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন, সেইটি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি :

> "নমস্ত্রৈলোক্যনির্মাণকবয়ে শম্ভবে যতঃ।
> প্রতিক্ষণং জগন্নাট্যপ্রয়োগরসিকো জনঃ॥"

ইহার সহিত শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের অন্যতম প্রধান আচার্য উৎপলদেবের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি তুলনা করিয়া দেখিলে ভট্টনায়কের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় অবশিষ্ট থাকে কি ?—

system are found mentioned in Sanskrit works on Poetics. As an illustration of them, I shall take up the theory of *Rasa* associated with the name of *Bhattanayaka* and show how it is identical with the Samkhya theory......"—*Indian Aesthetics*: Proceedings and Transactions of the First Oriental Conference, Poona, 1919, পৃ. ২৬৬।

নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে॥

এই শম্ভু, শূলী বা পরমশিব বেদান্তদর্শনের আত্মচৈতন্যেরই নামান্তর। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের সহিত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রধানতম বৈলক্ষণ্য হইতেছে, এই আত্মতত্ত্বের স্বরূপ লইয়া। বেদান্তমতে আত্মা নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, বাহ্যপ্রপঞ্চের সহিত সংস্পর্শ-বিরহিত; কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে চৈতন্য সতত পরিস্পন্দশীল, উল্লাসময়, প্রপঞ্চের সৃষ্টিই আত্মার নিয়ত লীলা। বেদান্তমতে আত্মা উদাসীন, প্রত্যভিজ্ঞামতে আত্মার সহিত জগৎসৃষ্টিক্রিয়া সতত বিজড়িত। বেদান্তমতে জগৎ মায়াময়, মিথ্যা; প্রত্যভিজ্ঞামতে চৈতন্য ও প্রপঞ্চের সত্তা সমান্তরাল, সহভাবী, অবিচ্ছেদ্য। বেদান্তমতে অহংতা ত্রিগুণাত্মক জড়চিত্তের ধর্ম, শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে আত্মচৈতন্যের প্রকাশের মধ্যেই "পরিপূর্ণ" অহংতার স্ফুরণ বর্তমান, অহংতা চৈতন্যের ধর্ম, জড়ের নহে। বেদান্তমতে অহংতার বিলোপেই আত্মতত্ত্বলাভ সম্ভব, শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মতে খণ্ডিত অহংতা বিলুপ্ত করিয়া পরিপূর্ণ অহংতাবোধ জাগ্রত করিয়া তোলাই মুমুক্ষু যোগীর প্রধানতম লক্ষ্য। আর সব বিষয়ে বেদান্ত ও শৈবপ্রত্যভিজ্ঞা-প্রস্থানের মধ্যে কোনও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নাই। খণ্ডিত সত্তা, খণ্ডিত জ্ঞান, খণ্ডিত আনন্দের বোধ শুধু চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানেরই বিচিত্র লীলা, বেদান্তমতে এই অজ্ঞানেরই অপর নাম 'অবিদ্যা', শৈবপ্রত্যভিজ্ঞামতে 'মল'। সত্ত্বের উদ্রেকের ফলে এই অবিদ্যা, অথবা মল অপসারিত হইয়া আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশানন্দময় স্বরূপ অনাবৃত হইয়া পড়ে—তাহাই মুক্তি। কাব্যেরও তাহাই লক্ষ্য। বেদান্ত ও প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মতবাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সাম্যবশতই পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত আচার্য অভিনবগুপ্তের রসসিদ্ধান্তকে—যাহা 'অভিব্যক্তিবাদ'রূপে সাহিত্যমীমাংসাক্ষেত্রে পরিচিত, বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা 'অভিব্যক্তি-বাদে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে সেই মতবাদের পরীক্ষা করিব।

৬ অভিনবগুপ্ত : অভিব্যক্তিবাদ

"সর্বস্বং হি রসস্যাত্র গুপ্তপাদা বিজানতে"—মাণিক্যচন্দ্র স্থরি

আমরা ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছি। পরিশেষে, অভিনবগুপ্তাচার্যের রসসিদ্ধান্ত বর্ণনা করিব। আচার্য অভিনবগুপ্তের মতবাদ আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ে "অভিব্যক্তিবাদ" বলিয়া পরিচিত। ইহাই রসচর্বণার শেষ কথা। অভিনবগুপ্তই রসতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসক। পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণের মতবাদের যে সকল অনুভববিরুদ্ধ অযৌক্তিকতা, সে সকল পরিত্যাগপূর্বক আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার পূর্বাচার্যগণের সিদ্ধান্তসমূহের অন্তর্নিহিত সারতত্ত্বসকল সঙ্কলন করিয়া স্বকীয় সিদ্ধান্ত 'অভিব্যক্তিবাদে'র ভিত্তি ও সৌধ রচনা করিয়াছেন। স্থতরাং তিনি যে ভারতীয় রসসূত্রের ব্যাখ্যার জন্য পূর্বগামী আচার্যগণের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী, এ কথা তিনি নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। পূর্বগামী মনীষিগণের পরিকল্পিত 'বিবেকসোপানপরম্পরা'র সংস্কার সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য—পূর্বাচার্যগণের দূষণোদ্ভাবন তাঁহার লক্ষ্য নহে।[১]

"ভুক্তিবাদে"র বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—ভট্টনায়ক কাব্য এবং নাট্য উভয় ক্ষেত্রে তিনটি বিশিষ্ট শক্তি কল্পনা করিয়াছেন—অভিধা, ভাবনা এবং ভোগীকৃতি। প্রথমটি শব্দগত, দ্বিতীয়টি অর্থগত, তৃতীয়টি সহৃদয় শ্রোতা বা দর্শকের মানসব্যাপার। আচার্য অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়ককর্তৃক কল্পিত 'ভাবনা' এবং 'ভোগীকরণ'—এই শক্তিদ্বয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ

১. "উর্ধ্বোর্ধ্বমারুহ্য যদর্থতত্ত্বং ধীঃ পশ্যতি শ্রান্তিমবেদয়ন্তী।
অলং তদাদ্যৈঃ পরিকল্পিতানাং বিবেকসোপানপরম্পরাণাম্॥"
... ...
"তস্মাৎ সতামত্র ন দূষিতানি মতানি তান্যেব তু শোধিতানি।
পূর্বপ্রতিষ্ঠাপিতযোজনাসু মূলপ্রতিষ্ঠাফলমামনন্তি॥"—অভিনবগুপ্তাচার্যকৃত 'অভিব্যক্তিবাদে'র অবতরণিকা: অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৮০

করিয়াছেন। শব্দের অভিধা এবং অর্থের লক্ষণা—এই দুইটি মাত্র ব্যাপার বা function-ই কাব্যজ্ঞসমাজে পরিচিত। এতদতিরিক্ত 'ভাবনা'—যাহাকে ভট্টনায়ক 'সাধারণীকৃতি' বা universalisation বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং 'ভোগীকৃতি'—এইরূপ অপূর্ব শক্তিদ্বয়ের অস্তিত্ব তো সাধারণের অগোচর। 'ভোগীকৃতি' তো একপ্রকার প্রতীতি। তবে তাহার অপূর্ব নামকরণে কি ফল? আর কাব্যবর্ণিত অর্থের সাধারণীকরণের উদ্দেশ্যে ভট্টনায়ক যে ভাবনাখ্য ব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন—ঐরূপ ব্যাপার স্বীকার করিবারই বা কি এমন প্রয়োজন, যদি অন্য প্রকারে সাধারণীকরণ সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং ভট্টনায়কের সিদ্ধান্ত গৌরবদোষদুষ্ট ও নানারূপ অপূর্ব শক্তি কল্পনার ফলে যুক্তির দিক দিয়া দুর্বল। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয়ে ভট্টনায়কের মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি, ভট্টনায়কের মতে বিভাব এবং অনুভাবসমূহ যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া দেশকালানিয়ন্ত্রিত সাধারণীকৃত রূপে সামাজিকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ রতি প্রভৃাত আন্তরভাবসমূহও যাহা নায়কেরই একান্ত নিজস্ব, তাহাও কাব্য ও নাট্যের 'ভাবনা' ব্যাপারের মহিমাবশে অনুরূপভাবে সাধারণীকৃত হইয়া সহৃদয় শ্রোতা ও দর্শকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। ইহাকেই বলা হয় 'হৃদয়সংবাদ'। সুতরাং শ্রোতা বা দর্শকের স্বকীয় কোনও স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তার অপেক্ষা নাই। আমার রতিরূপ স্থায়িভাবের সংস্কার বা বাসনা (impression) না থাকিলেও কোনও ক্ষতিই নাই। তথাপি আমি দুষ্যন্তগত শকুন্তলাবিষয়ক রতিভাবের সাধারণীকৃত রূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, কোনও বাধাই থাকিবে না। ভট্টনায়কের মতবাদের ইহাই দুর্বলতা। শৃঙ্গার প্রভৃতি সাহিত্যিক রসানুভূতি যদি সহৃদয় শ্রোতা ও প্রেক্ষকের অন্তর্নিগূঢ় রতি প্রভৃতি তত্তৎ স্থায়িভাবের মৌলিক সত্তাকে অপেক্ষা না করে, যদি উহা সম্পূর্ণভাবে সহৃদয়ের আন্তরবাসনা নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, তবে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও রসের উপলব্ধি

করিতে সমর্থ হইবে। একজন জরন্মীমাংসক—যিনি জীবনেও যৌনরতির আস্বাদ অনুভব করেন নাই, যিনি আজীবন শুষ্ক বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা লৌকিক সকল আসক্তি উন্মূলিত করিবার জন্য তৎপর, তিনিও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী দর্শনে তুল্যভাবে শৃঙ্গাররসের আস্বাদন করিবেন! কিন্তু তাহা তো হয় না। রতিবাসনাহীন ব্যক্তির নিকট প্রণয়ের মধ্যেও কোনও রস নাই, মাধুর্য নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কোনও একটি বিশিষ্ট রসের অনুভূতির প্রতি সেই রসের অনুরূপ স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা নিয়ত অপেক্ষিত। নতুবা, রসানুভূতি নিতান্ত অসম্ভব। যাহাদের চিত্তে রতিভাবের বাস্তব সংস্কার বিদ্যমান নাই, সেই সকল প্রেক্ষক রঙ্গালয়ের কাষ্ঠ, কুড্য, অশ্মখণ্ডের মতই শৃঙ্গাররসানুভূতি বিষয়ে চেতনাহীন, জড়। অভিনবগুপ্তের এই মতবাদের ফলে রসচর্বণা অবাস্তব কাল্পনিকতার রাজ্য হইতে বাস্তব কার্যকারণতত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। রসতত্ত্বের কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি সহৃদয় সামাজিক, ইহা আমরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। অতএব ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যাও সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই করিতে হইবে। বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব—রসচর্বণার যত কিছু উপাদান বা কারণকলাপ, সে সকলেরই সমবায় সহৃদয়ের চিত্তে,—কেন না, সহৃদয়েই রসানুভূতির উদ্রেক ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কার্য ও কারণের একাশ্রয়তা বজায় রাখিতে হইলে, রসানুভূতির কার্যকারণতত্ত্ব বজায় রাখিতে হইলে, বিভাব প্রভৃতি কারণ ও রসাস্বাদরূপ কার্যের আধারের অভিন্নতা যাহাতে সংরক্ষিত থাকে, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—ইহাই দার্শনিক যুক্তিসঙ্গত। কার্যকারণতত্ত্বের এই মূল নিয়ম, 'সামানাধিকরণ্য' (co-inherence), রসাস্বাদের স্থলে কি করিয়া অব্যাহত রাখা যায়? 'রসাস্বাদ'—আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি,—সহৃদয় সামাজিকের আন্তর অনুভব-বিশেষ বা subjective feeling। কিন্তু রসানুভূতির যে সকল কারণ আমরা পরিগণন করিয়াছি,—বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব এবং সঞ্চারিভাব,—তাহাদের

মধ্যে প্রথম দুইটি বাহ্য বা objective, কেন না, উহারা সহৃদয় চিত্তের বহির্ভূত, পরিচ্ছিন্ন দেশকালের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। বাহ্য ও আন্তর বস্তুর সামানাধিকরণ্য বা co-inherence কিরূপে সম্ভব? সুতরাং রসানুভূতিরূপ কার্যের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমেই বাহ্য বিভাবাদির সহিত তাহার একাশ্রয়ত্ব প্রমাণ করিতে হইবে।

এই সামানাধিকরণ্য স্থাপন করিতে গিয়া আচার্য অভিনবগুপ্ত বৌদ্ধ যোগাচার-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ 'বিজ্ঞানবাদ' (idealism) আশ্রয় করিয়াছেন। যোগাচারমতে সমস্তই সংবিৎস্বভাব বা জ্ঞানাত্মক। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাহাকে দ্রষ্টা স্বকীয়জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বকীয় চিত্তবৃত্তির বহির্ভূত দেশকালপরিচ্ছিন্ন পৃথক্ ভাবপদার্থরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহারই চিত্তসন্তানমাত্র। আন্তরজ্ঞানকেই সে ভ্রমবশত বাহ্যদেশ-কালনিয়মিত সত্তার দ্বারা বিশেষিত করিয়া দেখিতেছে মাত্র। য়ুরোপীয় মনীষী বার্কলি (Berkeley) এই দার্শনিক প্রস্থানের প্রধান আচার্য। তাঁহার মতে কোনও বস্তুর সত্তা বলিতে শুধু তদ্বিষয়ক জ্ঞানমাত্রই বুঝায়,—জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর বাহ্যসত্তা সর্বতোভাবে কল্পনার অতীত। "Esse ist percipi"—"to be is to be perceived"—এই মতবাদ যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে সহৃদয়ের নিকট নটকর্তৃক অনুক্রিয়মাণ বিভাব-অনুভাব প্রভৃতি নাট্যোপযোগী অর্থ আপাতদৃষ্টিতে যদিও জড়, বাহ্য ও জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট, তথাপি তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহারা সহৃদয়েরই চিত্তসন্তান—আন্তর পদার্থকে বাহ্যরূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে মাত্র (ইংরেজীতে ইহাকে বলা হয়—hypostatisation)—"যদন্তর্জ্ঞেয়তত্ত্বং তদ্ বহির্বদবভাসতে"। রস যেরূপ সহৃদয়ের স্বকীয় অসাধারণ অনুভূতিবিশেষ, সেইরূপ তাহার কারণসমূহও দার্শনিক বিচারদৃষ্টিতে সমানভাবেই জ্ঞানস্বভাব। সুতরাং যেহেতু রসরূপ কার্য ও বিভাবাদিরূপ কারণের একই সহৃদয়ের চিত্তে সমাবেশ হইয়া থাকে, অতএ

কার্যকারণের সামানাধিকরণ্যের কোনও ব্যতিক্রমই রসানুভূতির স্থলে আশঙ্কা করা যায় না।[১]

প্রকারান্তরেও রসানুভূতি ও বিভাবাদি কারণের একাশ্রয়তা রক্ষা করা যাইতে পারে—বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের সাকার শাব্দবিজ্ঞানবাদ আশ্রয় করিয়া। ধনিক, রুয্যক প্রভৃতি পরবর্তী অনেক সাহিত্যমীমাংসক তাহাই করিয়াছেন। 'বাক্যপদীয়'-রচয়িতা আচার্য ভর্তৃহরি বলেন যে, শব্দের এমনই মহিমা যে তাহা শুনিলেই যুগপৎ চিত্তপটে অর্থের চিত্রটি অঙ্কিত হইয়া যায়। 'কংসবধ' প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যায়িকার সৌভিকগণকর্তৃক অভিনয়ের কালে যেমন নাটকীয় বস্তুবিষয়ে প্রেক্ষকের প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মে,—'এই ব্যক্তি কংস', 'এই ব্যক্তি কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণকর্তৃক কংস নিহত হইতেছে',—সেইরূপ কংসবধ বিষয়ক কাব্য-পাঠকালেও কংস প্রভৃতি শব্দ আপন অলৌকিক বিচিত্র মহিমাবশে অভিনয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও সহৃদয় পাঠকের চিত্তমুকুরে আপন আপন অর্থের প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত করিয়া দিতে পারে।[২] সহৃদয়ের নিকট নাট্যাভিনীত অর্থ যেরূপ প্রত্যক্ষ, কাব্যবর্ণিত কাহিনীও সেইরূপই প্রত্যক্ষ। তফাত শুধু এইটুকু যে, প্রথমটি ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি শাব্দ। সহৃদয় পাঠকের নিকট বাহ্য অভিনয়ের খুব বেশি আবশ্যকতা নাই, শব্দশ্রবণেই তাহার চিত্ত-রঙ্গমঞ্চে শব্দোপনীত পদার্থসমূহের মানস-অভিনয় চলিতে থাকে। 'শকুন্তলা' পাঠ করিতে করিতেই সে মানসচক্ষে মহর্ষি কণ্বের তপোবনের শান্ত পরিবেশ, দুষ্মন্তের রাজসভার ঐশ্বর্যপূর্ণ সাজসজ্জা, স্বর্গের মারীচতপোবনে বিরহক্লিষ্টা শকুন্তলার পাণ্ডুর দেহযষ্টি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এই যে মানসচিত্রপরম্পরা একটির পর একটি ভাসিয়া উঠিতেছে—

১. অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৩-৪৪।

২. 'শব্দোপহিতরূপাংস্তান্ বুদ্ধের্বিষয়তাং গতান্।
প্রত্যক্ষমেব কংসাদীন্ সাধনত্বেন মন্যতে।'—বাক্যপদীয়

ইহার কারণ কি? শব্দ, কেবলমাত্র শব্দ,—আর কিছুই নহে। সুতরাং সহৃদয়ের রসানুভূতির প্রতি যে শকুন্তলাদি বিভাব কারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে তাহারা তো সম্পূর্ণরূপে তাহারই আন্তর সৃষ্টিমাত্র! নাট্যরঙ্গমঞ্চের পরিদৃশ্যমান অনুকর্তা নট প্রভৃতিকে বিভাব বলিয়া লাভ কি? অতএব বাস্তবদৃষ্টিতে বিভাব প্রভৃতি সমস্তই সহৃদয়ের চিত্তে শব্দোপনীত মানস পদার্থ মাত্র—বাহ্য জড় পদার্থ নহে। সুতরাং রসও যখন সহৃদয়ের মানস অনুভূতি, বিভাব প্রভৃতিও যখন সহৃদয়েরই সাকার বিজ্ঞানমাত্র, তখন উভয়ের মধ্যে কার্যকারণভাবের ব্যাঘাত কি করিয়া থাকিতে পারে?

কিন্তু এ তো গেল শব্দময় কাব্যের ক্ষেত্রে। পদার্থাভিনয়াত্মক নাট্যস্থলে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সহিত আন্তর রসানুভূতির একাশ্রয়তা কিরূপে রক্ষিত হইবে? সেখানে তো আলম্বনবিভাব, উদ্দীপনবিভাব প্রভৃতি সমস্তই বাহ্যবস্তু! দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, কণ্বের তপোবনে মাধবীলতার বিবিক্তমণ্ডপ,—নাট্যের যত কিছু উপকরণ সকলই তো দর্শকচিত্তের বহির্ভূত? জগন্নাথ তাঁহার 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে অভিনবগুপ্তপাদের ব্যক্তিবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট রথ তুরগ প্রভৃতি উপকরণ যেমন আত্মচৈতন্যেরই অবিদ্যার বিলাসমাত্র, তাহাদের যেমন স্বতন্ত্র বাহ্য কোনও সত্তা নাই; কিংবা শুক্তিতে রজতভ্রান্তি যেমন বাস্তব রজতসংস্পর্শবিহীন, আত্মাশ্রিত অবিদ্যারই পরিণাম মাত্র, সেইরূপ নাট্যাভিনীত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি বিচিত্র পদার্থসমূহও স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের মত, অথবা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ীভূত রজতাদি বস্তুর মতই বাহ্যসত্তাশূন্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। বাহ্য ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষের জন্য যেমন চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যের অপেক্ষা করে, নাট্যাভিনীত পদার্থ প্রত্যক্ষের জন্য বহিরিন্দ্রিয়ের সেইরূপ সাহায্য অপেক্ষিত নহে। উহারা যেন স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের মত, অথবা ভ্রান্তরজতাদির মত ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষবিশেষ। ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ আত্মচৈতন্যই উহাদের প্রকাশক,

উহারা 'সাক্ষিভাস্য'—'বৃত্তিভাস্য' নহে।[১] সুতরাং রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব যেমন সহৃদয়ের আন্তরধর্ম, সেইরূপ বিভাব প্রভৃতি নাট্যের উপাদান—যাহারা সাধারণদৃষ্টিতে বাহ্যপদার্থরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহারাও তত্ত্বদৃষ্টিতে অনুরূপভাবে সহৃদয়েরই আন্তরভাব মাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে: বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি যদি সহৃদয়ের আন্তর ধর্মই হয়, এবং রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সহিত যদি তাহাদের সহৃদয়চিত্তে সমাবেশ বাস্তব হয়, তবে 'রসানুভূতি'র এই কাচিৎকতা (occasionality) কেন? আমি কেন সর্বদাই রসাস্বাদ করি না? উহার জন্য বিশিষ্ট দেশ এবং কালের অপেক্ষা কি জন্য? উত্তরে বলা হয়: আমাদের চৈতন্যের তিনটি অংশ (aspect) আছে—(১) সদংশ— যাহার ফলে 'আমি আছি' এইরূপ প্রতীতি হয়; (২) চিদংশ—যাহার ফলে 'আমি জানি' এইরূপ বোধ জন্মিয়া থাকে; এবং (৩) আনন্দাংশ—যাহার স্ফুরণের ফলে 'আমি সুখী' 'আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি' এইরূপ প্রতীতি সম্ভবপর হয়। এই প্রত্যেকটি অংশেরই এক একটি আবরক অজ্ঞান (nescience) আছে। উহার কাগ শুধু চৈতন্যের কোনও অংশবিশেষের স্ফুরণ আবৃত করিয়া রাখা। সদংশের আবরক অজ্ঞানকে বলা হয়—'অসত্তাপাদক' অজ্ঞান, কেন না, ইহার ফলে আমার প্রকৃত সত্তা চাপা পড়িয়া যায়, আমি আমার স্বকীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া পড়ি। চিদংশের আবরক অজ্ঞানকে বলা হয় 'অভানাপাদক' অজ্ঞান। ইহা আত্মার বিজ্ঞানাংশকে আবৃত করিয়া রাখে। বিভিন্ন বিষয়ের সহিত বিজ্ঞানাংশের সংস্পর্শের ফলেই সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু অভানাপাদক অজ্ঞান আমাদের চৈতন্যের বিজ্ঞানাংশ ও জ্ঞানের বিষয়—ঘট, পট প্রভৃতির মধ্যে একটি ব্যবধান রচনা করে, একটি পর্দা ফেলিয়া

---

১. 'বিভাবাদীনামপি স্বপ্নতুরগাদীনামিব রঙ্গরজতাদীনামিব সাক্ষিভাস্যত্বমবিরুদ্ধম্'—রসগঙ্গাধর, পৃ. ২৬।

দেয়। বাহ্যবস্তুর সহিত বিজ্ঞানাংশের সম্পর্ক তখন খণ্ডিত হইয়া যায়। তখন আমরা বলি, 'আমি ঘট জানি না,' 'আমি পট জানি না,' 'আমি ইহা জানি না', 'আমি উহা জানি না'। তৃতীয়, আনন্দাংশের আবরক যে অজ্ঞান, উহা 'অনানন্দাপাদক' অজ্ঞানরূপে পরিচিত। উহার কার্য আত্মার নির্মল আনন্দরূপকে ঢাকিয়া দেওয়া। এই আনন্দরূপের সহিত বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ বশতই আমরা সেই সেই বিষয় উপভোগের মধ্যে সুখের সন্ধান পাই। বস্তুত বাহ্য বিষয়ের কোনও স্বকীয় আনন্দরূপ নাই, আনন্দ কেবল আত্মচৈতন্যেরই অসাধারণ ধর্ম। পুত্র, কলত্র প্রভৃতি যে আমাদের প্রিয়, সে কেবল আমার আত্মা প্রিয় বলিয়া। চন্দনানুলেপন যে আমাদের সুখহেতু, সে শুধু আমার আত্মা সুখস্বভাব বলিয়া। যখন এই আনন্দাংশ অজ্ঞানের আবরণে অপ্রকাশিত থাকে, তখন আত্মার আনন্দরূপ স্ফুরিত হয় না। তখন সকলই দুঃখ, সকলই নিরানন্দ, সকলই অপ্রিয় তখন 'আমি সুখী' এইরূপ প্রতীতি হয় না, 'আমি দুঃখী' এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু সুখস্বভাব, আনন্দস্বভাব আত্মচৈতন্যে দুঃখ ও নিরানন্দের আরোপ কখনই বাস্তব হইতে পারে না, উহা ভ্রম মাত্র, এবং সেই ভ্রমের মূলে আছে অবিদ্যা—যাহা আনন্দাংশের স্বাভাবিক স্ফুরণকে ব্যাহত করিতেছে। এই আনন্দের আবরক অজ্ঞান যখন অপগত হয় তখন আত্মার প্রিয়রূপ আপন পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশ পায়। কবিকর্মের—তাহা কাব্যই হউক, নাট্যই হউক, চিত্রই হউক, অথবা ভাস্কর্যই হইক (আমরা এখানে 'কবি' শব্দের ব্যাপক অর্থ ধরিতেছি, ইংরেজীতে যাহাকে creative artist বলা হইয়া থাকে), তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য সহৃদয়ের আত্ম-চৈতন্যের এই আনন্দাবরক অজ্ঞানের অপসারণ, যাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় বলিতে পারা যায় 'আবরণভঙ্গ'। আনন্দস্বরূপ আত্মার অভিব্যক্তিসাধনই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য, এবং যে ব্যাপারবশে আত্মার আনন্দাংশের এই আবরণভঙ্গ সম্ভবপর হয়, তাহাকে ধ্বনিবাদিগণ 'ব্যঞ্জনাব্যাপার' (function

of suggestion) বলিয়া থাকেন। সাহিত্যবর্ণিত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি অর্থেরই এই অসাধারণ ব্যাপার আছে, লৌকিক অর্থের নহে।[1]

দেখা গেল, অভিনবগুপ্তের মতে রসানুভূতি শুধু সংবেদনঘন চৈতন্যের আনন্দাংশের আবরণভঙ্গমাত্র। কাব্যবর্ণিত অথবা নাট্যাভিনীত বিভাবাদি অর্থের ব্যঞ্জনাব্যাপারের অলৌকিক মহিমাবশে এই আবরণভঙ্গ সম্ভব হয়। ফলে বিশুদ্ধ নিঃসঙ্গ আত্মচৈতন্যের যে স্ববিশ্রান্ত স্ফুরণ তাহার মধ্যে সংবেদন এবং আস্বাদ—cognition এবং affection, consciousness এবং feeling, দুইই সমানভাবে বর্তমান। আমাদের আনন্দানুভূতির মধ্যেও বিজ্ঞানাংশের স্ফুরণ অব্যাহত থাকে। আমাদের রসানুভূতি 'বিজ্ঞানময় আনন্দানুভূতি', বিজ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যের আবরণহীন জ্যোতির্ময় প্রকাশ। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।"

কিন্তু স্বয়ম্প্রকাশ আবরণহীন চৈতন্যই যদি রসপদবাচ্য হয়, তবে ভরতের রসসূত্রের সঙ্গতি রহিল কোথায়? ভরত যে বলিয়াছেন—'অথ স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ'—তাহা রক্ষিত হইল কই? রস তো স্থায়িভাবের পরিণাম নহে, উহা তো চৈতন্যস্বরূপ? অভিনবগুপ্তাচার্য এই প্রশ্নের সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: সংবেদনঘন আত্মচৈতন্যের আনন্দানুভূতিই রসাস্বাদ। তথাপি স্থায়িভাবসমূহ সেই আনন্দানুভূতিকে চিত্রীকৃত (variegated) করিয়া তুলে। রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি স্থায়িভাবের উপযোগিতা আর কিছুই নহে, 'চিত্রতাকরণ' মাত্র। চৈতন্য এক ও অভিন্ন, উহার আনন্দস্বরূপেরও কোনও ভেদ বাস্তবদৃষ্টিতে সম্ভব নহে। তথাপি শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, বীর প্রভৃতি রসানুভূতি যে সহৃদয়ের চিত্তে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহার কারণ সেই সেই স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ

১. "তথা চাহুঃ—'ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ'—ইতি। ব্যক্তো ব্যক্তিবিষয়ীকৃতঃ। ব্যক্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিৎ।"—রসগঙ্গাধর, পৃ. ২৬।

হইয়া অখণ্ড ও ভেদশূন্য আনন্দময় চৈতন্যের মধ্যে আপন আপন বৈচিত্র্য সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন করিয়া তুলে। স্থায়িভাবসমূহ যেন বিভিন্ন বর্ণের কতকগুলি পুষ্পকোরক, এবং বিজ্ঞান ও আনন্দময় আত্মচৈতন্য যেন স্বচ্ছ স্ফটিকখণ্ড। বিচিত্র বর্ণের পুষ্পকোরকের সান্নিধ্যে আসিয়া স্ফটিকখণ্ডটি যেমন বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া দর্শকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ভেদরহিত আনন্দস্বভাব আত্মচৈতন্যের রসস্বরূপও বিচিত্র স্থায়িভাবের সংস্পর্শে আসিয়া শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি আপাতবিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তত্ত্বদৃষ্টিতে সমস্ত রসই কিন্তু আনন্দস্বরূপ চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশমাত্র।[১]

১. "অস্মন্মতে হি সংবেদনমেবানন্দঘনমাস্বাদ্যতে। তত্র কা দুঃখাশঙ্কা? কেবলং তস্যৈব চিত্রতাকরণে রতিশোকাদিবাসনাব্যাপারঃ, তদুদ্বোধনে চাভিনয়াদিব্যাপারঃ।"—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৯৩।

কাব্য ও অলঙ্কার

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সাহিত্যমীমাংসক ধারাধিপতি ভোজদেব মানবদেহের সহিত কাব্য বা শব্দাত্মক সাহিত্যের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

"শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর, রস (ভাব) প্রভৃতি কাব্যের আত্মা, (ওজঃ শ্লেষ প্রভৃতি) গুণ শৌর্য প্রভৃতির ন্যায়, (কাব্যের) দোষ-সমূহ (মানবদেহের) কাণত্বাদির ন্যায়, রীতিসমূহ অবয়বের সন্নিবেশের সহিত তুলনীয় এবং অলঙ্কারসমূহ কটক কুণ্ডল প্রভৃতির সদৃশ।"

'কাব্যমীমাংসা'-রচয়িতা মহাকবি রাজশেখরও সারস্বতেয় 'কাব্যপুরুষে'র বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"(হে বৎস!) শব্দ এবং অর্থ তোমার শরীর। সংস্কৃত তোমার মুখ; প্রাকৃত-ভাষানির্মিত তোমার বাহুদ্বয়; তোমার জঘনদেশ অপভ্রংশভাষাময়; তোমার পদযুগল পৈশাচভাষাবিনির্মিত। তুমি সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজোগুণযুক্ত। তোমার বচন উক্তিনৈপুণ্যে ভূষিত। রস তোমার আত্মস্বরূপ, তোমার রোমরাজি ছন্দোময়; অনুপ্রাস এবং উপমা প্রভৃতি তোমাকে অলঙ্কৃত করিতেছে।"

শব্দ এবং অর্থ যে সাহিত্যের দ্বৈধ শরীর তাহা পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে।[1] কিন্তু গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস ইহাদের স্বরূপ কি? শব্দ এবং অর্থ হইতে ইহাদের পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষণ কি করিয়া সম্ভবপর? সাহিত্যমীমাংসক-সম্প্রদায় কাব্যশরীর ও রক্তমাংসগঠিত পুরুষদেহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন বটে; কিন্তু এই সাদৃশ্যের কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে কি? ইহা কি false analogy নহে? পুরুষের

---

১. 'সাহিত্যের লক্ষণ'

চেতনা, কৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা তাহার আত্মাকে অনুমান করা সম্ভবপর; তাহার শৌর্য, দাক্ষিণ্য, দয়া প্রভৃতি গুণ সাধারণের অনুভবগোচর; কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণ যে তাহার শরীরকে ভূষিত করে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না; তাহারা যে পুরুষদেহের সহিত অভিন্ন নহে, তাহা প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু শব্দার্থময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি আত্মা, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতির সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতি সম্ভব? কাব্যশরীরের উপাদান শব্দ ও অর্থ হইতে তাহার আত্মা, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতির পৃথক্করণ (abstraction) কি কাব্যমীমাংসকগণের একটা নিছক কল্পনামাত্র নহে?

প্রথমত অলঙ্কার বিষয়েই আলোচনা করা যাউক। সাধারণ পাঠক যখন কাব্যসম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে যায়, তখন অলঙ্কারের কথা স্বতই তাহার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারজীবনের ভাষা ও সাহিত্য বা কাব্যের ভাষার মধ্যে প্রভেদ কোথায়?—সাধারাণ পাঠককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অনেকেই বলিবে, অলঙ্কারে। আমাদের ব্যবহারজীবনের ভাষা 'আটপৌরে', নিরাভরণ. শব্দকে মার্জিত করিবার, তাহাকে বিশিষ্টভাবে বিন্যস্ত করিবার দিকে আমাদের লক্ষ্যই থাকে না। ব্যবহারজীবনে আমরা যখন মাননীয় ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ-অবসরে, "মহাশয়! অনুগ্রহপূর্বক সভাস্থলে উপস্থিত হইলে বাধিত হইব" এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট সৌজন্য রক্ষিত হইল বলিয়া মনে করি, কবির লেখনী এই নিতান্ত সাধারণ আমন্ত্রণকেই কত বক্রভাবে, কত বৈদগ্ধ্যের সহিত পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন! "মহাশয়! আমাদের গৃহ অনুগ্রহপূর্বক অলঙ্কৃত করিবেন কি?" "মহাভাগের উদার আকৃতি দর্শনে আমাদের নেত্র সফল হইবে" ইত্যাদি। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে মহারাজ দুষ্যন্তের আকস্মিক আশ্রমপ্রবেশে বিস্মিতা অনসূয়া তাঁহার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য কত বক্রোক্তিরই আশ্রয় লইয়াছে—

"আর্যের মধুর বিশ্রম্ভালাপ আমাকে (এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিষয়ে) মন্ত্রণা

দিতেছে যে, আর্য কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন? কোন্ জনপদের অধিবাসিগণ মহাভাগের প্রবাসজনিত বিরহে পর্যুৎসুকহৃদয় হইয়া রহিয়াছে? কি নিমিত্তই বা আর্য এই নিরতিশয় সুকুমার আত্মাকে তপোবনপরিভ্রমণ-জনিত ক্লেশের ভাজন করিয়াছেন?"

আশ্রমকন্যা অনসূয়ার মুখে, "আর্য কোন্ দেশ হইতে আগমন করিতেছেন, কি জন্যই বা আর্যের এই তপোবনে আগমন?"—দুষ্মন্তের প্রতি এইরূপ নিরাভরণ প্রশ্ন নিতান্তই প্রাকৃতজনোচিত হইত; কালিদাস তাহাকে বক্র করিয়াছেন, তাহাতে বৈদগ্ধ্যযোজনা করিয়াছেন, যাহার ফলে উহা সাহিত্যে স্থানলাভের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই উক্তিকৌশল, এই "বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি," এই বক্রোক্তিই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নিদান। এবং সাহিত্যমীমাংসকসম্প্রদায় যে সকল উক্তিবৈচিত্র্য অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে সকলেরই মূলে আছে 'বক্রতা' বা 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি'। এই বক্রোক্তিরই অপর নাম 'অলঙ্কার'। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার এই বক্রোক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বক্রোক্তিই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। আচার্য কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"পদসমুদায়াত্মক বাক্যের সহস্র প্রকারে বক্রতা সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং সেই 'বক্রতা'র মধ্যেই সকল অলঙ্কারবর্গ নিঃশেষে অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

যেমন, 'মুখটি অতিশয় সুন্দর', এই বাক্যটিকেই 'মুখটি চন্দ্রের মত সুন্দর', 'মুখটি যেন চন্দ্র,' 'ইহা মুখ নহে, ইহা চন্দ্র,' 'এই মুখটি চন্দ্র হইতেও অধিকতর সুন্দর,' এইরূপে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের আকারে শত শত কবিজনোচিত বিদগ্ধভঙ্গীতে প্রকাশ করা যাইতে পারে। উদ্দেশ্য একই—মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা; বাক্যবিন্যাসেই কেবলমাত্র ভেদ। অতএব এই বিন্যাসভেদ বা বক্রতাই যে অলঙ্কারের

'জীবাতু' তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল, এবং এই বক্রোক্তিই 'লৌকিক' বাক্যসমূহকে কাব্যের পদবীতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকে। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের 'কাব্য' লক্ষণ পর্যালোচনা করিলে সাহিত্যক্ষেত্রে অলঙ্কারের প্রাধান্য অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইবে। চিরন্তন আলঙ্কারিক আচার্য ভামহ তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "সুন্দরীর মুখচ্ছবি যতই কমনীয় হউক না কেন, ভূষাহীন হইলে কখনই তাহা শোভা পায় না।" পরবর্তীকালে বামনাচার্য তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থের উপক্রমেই ভামহের এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, "অলঙ্কারবশতই কাব্য সহৃদয়গণের আস্বাদনীয় হইয়া উঠে।" সাধারণ লৌকিক বুদ্ধিতে কাব্যের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, পরবর্তী একজন আলঙ্কারিক মন্তব্য করিয়াছেন—

"যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অনলঙ্কৃত শব্দার্থযুগলকে কাব্যরূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনি কি জন্যই বা অনলকে অনুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করেন না?"

অভিপ্রায় এই : বহ্নিকে অনুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করা যেরূপ অস অলঙ্কার-বিহীন শব্দার্থের কাব্যত্বকল্পনা ততোধিক অসম্ভব। অধিক কি, সাহিত্যবিচারে অলঙ্কারের এই অত্যধিক প্রাধান্যই 'সাহিত্য-মীমাংসা'-শাস্ত্রের 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' ব্যপদেশের মূলে। সংস্কৃতসাহিত্যবিচারের যে কোনও গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু অলঙ্কারই নয়—ধ্বনি, রীতি, গুণ, দোষ প্রভৃতির বিশ্লেষণ এবং মীমাংসাও উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু অলঙ্কারবিচার আর সকল বিচারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এবং সেইজন্যই সাহিত্যমীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ সাধারণ পাঠকসমাজে 'অলঙ্কার' গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি'।

মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার এককালে সৌন্দর্যের অপরিহার্য উপাদান ছিল। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং উপমা, রূপক,

অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালঙ্কারও যে কবিকর্মের অপরিহরণীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কেন না, সাহিত্য অনেকাংশে সমসাময়িক লৌকিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি, তাহার মধ্য দিয়াই সমসাময়িক মানবের সৌন্দর্যবোধ ও রুচিজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।[১] এখনও মানবসমাজ অলঙ্কারের মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। পূর্বে যাহা স্থূল ছিল, এখন তাহাই সূক্ষ্ম হইয়াছে; যাহা গুরু ছিল, তাহা লঘু হইয়াছে; যাহা 'কুণ্ডল' ছিল, তাহা 'কর্ণিকা' হইয়াছে। "তাঁরা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্যলোকে"। কাব্যালঙ্কারের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি। নূতন নূতন অলঙ্কার উদ্ভাবিত হইতেছে, কত সূক্ষ্ম 'বক্রোক্তি', বাক্যযোজনায় কত নূতন বৈদগ্ধ্য! এ সমস্তই কাব্যের সৌন্দর্যসাধনের জন্য। কেন না, সৌন্দর্যই অলঙ্কার।

অলঙ্কার যে সৌন্দর্যসাধনের একটি বিশিষ্ট উপাদান, তাহা কোনও সহৃদয়ই অস্বীকার করিবেন না দোলায়িত শ্রবণকুণ্ডল যে কমনীয় রমণীমুখের সৌন্দর্য অধিকতর ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত করে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অনুভবসাক্ষিক। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে উপমা প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারসমূহের যে একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের রুচিবোধেরই পরিচায়ক। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা অলঙ্কারকেই সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অলঙ্কারকে বাদ দিয়া কবিকর্মের কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তাঁহারা যদি উপমানভূত নারীদেহের সহিত কাব্য-শরীরের পূর্ববর্ণিত সাধর্ম্য এই স্থলে লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবত এইরূপ প্রমাদে পড়িতেন না। কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অপসারিত করিলে ভূষণহীন নারীদেহের কি কোনও সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকে না? সাহিত্যে

১. "লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্"—নাট্যশাস্ত্র, ১.১১৩। 'নাট্য' বা 'দৃশ্যকাব্য' সম্বন্ধে এই উক্তি 'শ্রব্যকাব্য' সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রযোজ্য।

অলঙ্কারের আত্মভাব মানিয়া লইলে, তুল্যযুক্তিতে লৌকিক নারীসৌন্দর্যেরও এইরূপ অবস্থাই দাঁড়ায় বটে। কিন্তু কোনও সৌন্দর্যরসিক ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিয়া লইবেন না। নারীদেহের লাবণ্য আছে—মুক্তাফলের অন্তর্গত তরল কান্তির ন্যায় যাহার প্রভা। অলঙ্কারের অপসারণের দ্বারা সেই প্রভাতরল জ্যোতিকে অপসারিত করা যায় না। তাহাই নারীসৌন্দর্যের নিদান, তাহাই সৌন্দর্যের আত্মা। কাব্যের স্থলেও অলঙ্কারচ্যুতি কাব্য-সৌন্দর্যের ব্যাঘাত করিতে পারে না। উপমা, রূপক প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কার শব্দার্থরূপী কাব্যশরীর হইতে সরাইয়া লইলেও প্রকৃত সাহিত্যিক কবিকর্মের সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা যায় না। এবং সমস্ত অলঙ্কার বিযুক্ত করিয়া লইলেও ভূষণহীন কাব্যশরীরের যে কান্তি আপন মহিমায় দীপ্তি পাইতে থাকে, যাহা কাব্যদেহের লাবণ্যস্বরূপ, তাহাই কাব্যবস্তুর আত্মা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। আনন্দবর্ধনাচার্য প্রমুখ ধ্বনিবাদিগণ কাব্যের এই অন্তর্নিহিত লাবণ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই প্রাচীন ভামহ প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের অলঙ্কারের মোহ তাঁহাদের তত্ত্বদৃষ্টিকে আবৃত করিতে পারে নাই। এই লাবণ্যের অপর সংজ্ঞা 'ধ্বনি',—'বস্তুধ্বনি', 'অলঙ্কারধ্বনি', 'রসধ্বনি'। ইহাদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ কাব্যতত্ত্ব,—তাহা হইতেই কাব্যের উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি এবং তাহাতেই পর্যবসান। সেইজন্য রসধ্বনিই তাঁহাদের মতে কাব্যের আত্মা। সেই আত্মার সন্ধান যিনি পাইয়াছেন, তিনি কি কখনও অলঙ্কারের মোহে মুগ্ধ হইতে পারেন?

এখানে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন: 'ধ্বনিবাদিগণ কি তবে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারগুলিকে নির্বাসিত করিলেন? প্রকৃত কবিকর্ম কি তবে একেবারেই নিরলঙ্কার?'—ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আনন্দবর্ধনাচার্য সাহিত্যিক অলঙ্কারসমূহের উপযোগিতা ও অস্তিত্ব আদৌ অস্বীকার করেন নাই। প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার বিরোধ শুধু তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ লইয়া। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ লৌকিক

অলঙ্কারের সমস্ত ধর্ম নিঃশেষে সাহিত্যিক অলঙ্কারের স্কন্ধে চাপাইয়াছিলেন। কাব্যালঙ্কারসমূহ যে নারীদেহের প্রসাধনের সামগ্রী কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি লৌকিক অলঙ্কার হইতে কোনও অংশে পৃথক্ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কোনও আভাস তাঁহাদের গ্রন্থে নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, শ্রবণ হইতে কুণ্ডল অপসারিত করিয়া যেমন তাহার পরিবর্তে কর্ণিকাসংযোগ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কাব্যেও অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি শব্দার্থালঙ্কারসমূহ কবি তাঁহার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারেন। এই হানোপাদানবশত কাব্যসৌন্দর্যের এমন কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এইরূপ ধারণা তাঁহাদের ছিল না। অনেন্দবর্ধন কর্তৃক ধ্বনিবাদের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া গেল। আনন্দবর্ধন দেখাইলেন যে, পূর্বাচার্যকল্পিত অলঙ্কারের এই যথেচ্ছ সংযোগ-বিয়োগ সাহিত্যক্ষেত্রে কেন, লৌকিক প্রসাধনের ক্ষেত্রেও অসম্ভব। সাহিত্যের যাহা মূলীভূত তত্ত্ব, অর্থাৎ রসধ্বনি, অলঙ্কার তাহারই অনুযায়ী হইবে। আত্মার ঔচিত্য অনুযায়ী অলঙ্কারের যোজনা করিতে হইবে। অলঙ্কারের কোনও পৃথক্ সৌন্দর্য নাই। উপমা, যে উপমা বলিয়াই সর্বত্র সুন্দর হইবে, এমন কোনও নির্দিষ্ট বিধি নাই। অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে যতই শ্রুতিসুখকর হউক না কেন, সর্বত্রই তাহাদের এই মাধুর্য অখণ্ডিত থাকিবে, এইরূপ আশা করা যায় না। অভিনবগুপ্ত এই স্থলে একটি উদাহরণের দ্বারা ধ্বনিবাদগণের এই মতবাদ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, "শবশরীরে অলঙ্কারযোজনার দ্বারা কিছুমাত্র সৌন্দর্যসাধন করা যায় না, কেন না, সেখানে আত্মার অস্তিত্ব নাই। যতিশরীর অলঙ্কারমণ্ডিত হইলে দর্শকের হাস্যাবহ হইয়া উঠে, যেহেতু সেখানে আত্মার ঔচিত্য নাই।" অতএব কাব্যের আত্মস্বরূপ রসতত্ত্বের সদ্ভাব ও ঔচিত্য এই উভয়ের দ্বারা সাহিত্যে অলঙ্কার-যোজনা নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবেই অলঙ্কার সৌন্দর্যের কারণরূপে বিবেচিত হইবে। নতুবা রসৌচিত্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে কবি

অলঙ্কার-বিন্যাস করিবেন, তিনি সাহিত্যিক সৌন্দর্যের মূল তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পুষ্পভরণমণ্ডিতা শকুন্তলার যে মূর্তি মহারাজ দুষ্মন্তের দৃষ্টি বিমোহিত করিয়াছিল, সপ্তম অঙ্কে মহাকবি সেই শকুন্তলাকেই আবার নিরাভরণ মূর্তিতে দুষ্মন্তের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে আভরণ-বিন্যাস সম্ভোগের উপকরণ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিরাভরণ পাণ্ডুতাই বিপ্রলম্ভ ব্যথাকে মূর্তিমতী করিয়া তুলিয়াছে। সমাহিত মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্য প্রণয়মুগ্ধা পার্বতীর কত প্রসাধন, কত বিচিত্র আভরণ-বিন্যাস! কিন্তু উপেক্ষিতা, অবমানিতা পার্বতী যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার অঙ্গ আভরণহীন, 'বার্ধকশোভি বল্কল' তাঁহার ভূষা! ধ্বনিবাদিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সৌন্দর্যের এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং কবি ও সহৃদয়সমাজে ইহার প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। অলঙ্কারসমূহ—সাহিত্যিকই হউক, অথবা লৌকিকই হউক, যে সৌন্দর্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়, সে তাহাদের স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের জন্য নহে, প্রকৃত রসের উৎকর্ষসাধনের তাহারা উপায় বলিয়া। রসই উপেয়, অলঙ্কার তাহার উপায় মাত্র। যদি অলঙ্কারের অপসারণের দ্বারা রসবোধের গভীরতা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহাই কর্তব্য। নিরলঙ্কার স্বভাবোক্তিই সেখানে অলঙ্কৃত বক্রোক্তির সমস্থানীয়।

ধ্বনিবাদের প্রচারের ফলে অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যান্য আরও পরিবর্তন সংঘটিত হইল। প্রাচীন মতবাদের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, কাব্যদেহের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ অনেকটা নারীদেহের সহিত কটককুণ্ডলাদির সম্বন্ধের মতই। ইচ্ছানুযায়ী তাহার সংযোজন ও বিশ্লেষণ সম্ভবপর। কবি যেন পূর্বে মনে মনে অনলঙ্কৃত শুদ্ধ শব্দার্থযুগল কল্পনা করিয়া পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কারসমূহ তাঁহার রুচি অনুসারে কাব্যদেহে বিন্যস্ত করেন। সুতরাং অলঙ্কারযোজনার অব্যবহিত পূর্বে

অনলঙ্কৃত কাব্যশরীরের অস্তিত্ব তাঁহাদের মতে মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু অলঙ্কারযোজনায় ইহাই কি অনুভবসিদ্ধ পদ্ধতি? উত্তম কাব্যের যে সকল অলঙ্কার, তাহারা কি নারীদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কতকগুলি শিথিলবিন্যস্ত জড়-পদার্থমাত্র? যে আবেগবশে কবি তাঁহার অন্তর্নিরুদ্ধ রসধারা শব্দার্থ-যুগলের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই একই আবেশের দ্বারা কি অলঙ্কারসমূহও জন্মলাভ করে না? তাহাদের জন্য কি কোনও পৃথক্ প্রযত্নের বা অভিনিবেশের আবশ্যকতা উত্তমকবি উপলব্ধি করিয়া থাকেন? বিচার করিয়া দেখিলে প্রাচীন আচার্যগণের মতবাদের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। 'কাব্যের অলঙ্কার' এইরূপ উক্তির দ্বারা 'কাব্য' ও 'অলঙ্কারে'র মধ্যে যে ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহার মূলে কোনও অভ্রান্ত যুক্তি নাই, এবং তাহা সহৃদয়ের অনুভববিরুদ্ধ উত্তমকাব্যে শব্দ ও অর্থের সহিত অলঙ্কারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত স্বগত ভাবের প্রকাশের দিকেই তন্ময়ীভূত হইয়া থাকে, শব্দ এবং অর্থ স্বতই উৎসারিত হইয়া আসে—বিচিত্র বক্রোক্তির আকারে, বিবিধ অলঙ্কারের রূপ ধরিয়া। অতএব উত্তমকাব্যের যে সকল 'বক্রোক্তি' বা 'অলঙ্কার', তাহা শব্দার্থের কোনও বাহ্য বা আগন্তুক ধর্ম নহে। উহা শব্দার্থেরই অন্তরঙ্গ বিলাস। এইরূপে, যেসকল অলঙ্কার 'অপৃথগ্ যত্ননির্বর্ত্য' তাহারাই উত্তমকাব্যের প্রকৃত শোভার হেতু, তাহারাই প্রকৃত 'অলঙ্কার'। যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার কাব্যদেহের সহিত এইরূপ অন্তরঙ্গভাবে সম্বদ্ধ নহে। তাহাদের উদ্ভাবনের জন্য কবির স্বতন্ত্র অভিনিবেশ আবশ্যক। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত হইতে উহারা স্বত উৎসারিত হইয়া উঠে না। তাহা 'পৃথগ্ যত্ননির্বর্ত্য'। এইজন্য ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আচার্য আনন্দবর্ধন পুনঃ পুনঃ 'ধ্বনিকাব্যে' বা উত্তমকাব্যে' অনুপ্রাস প্রভৃতি বর্জন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকৃত বক্রোক্তি বা অলঙ্কার কবির চিন্তাধারারই অন্তরঙ্গ রূপ মাত্র। কিন্তু যে সকল অলঙ্কার উদ্ভাবনের জন্য কবিচিত্তের পৃথক্ অভিনিবেশ প্রয়োজন, তাহাদের সহিত কবির

চিন্তাধারার কোনও আন্তর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেইজন্য, আনন্দবর্ধনাচার্য উঁহাদিগকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কার্য ও অলঙ্কারের মধ্যে অন্তরঙ্গতার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া লৌকিক অলঙ্কারসমূহের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন। ধারাধিপতি ভোজদেব তাঁহার 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' শীর্ষক আলঙ্কারিক নিবন্ধে বলিয়াছেন: "অলঙ্কারসমূহ ত্রিবিধ—বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ ও মিশ্র। বহিরঙ্গের উদাহরণ যেমন বস্ত্র, মাল্য, (কটক, কেয়ুর প্রভৃতি) বিভূষণ। অন্তরঙ্গ যেমন, দন্তপরিকর্ম, নখচ্ছেদ এবং কেশবিন্যাস প্রভৃতি। মিশ্র যেমন, স্নান, ধূপ এবং (চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি) বিলেপন।"

সৌন্দর্যসম্বন্ধে যাঁহার সূক্ষ্মবোধ আছে, তিনিই উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগের যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। বস্ত্র মাল্য কুণ্ডল অপেক্ষা স্নান, ধূপবাস, কুঙ্কুমবিরচিত পত্রলেখা অধিকতর রমণীয়; তদপেক্ষা রমণীয় নখচ্ছেদ এবং অলকরচনা। ইহারা প্রত্যেকেই যে নারীদেহের প্রসাধনের উপাদান, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই রমণীয়তার তারতম্য কিসের জন্য? সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে, অন্তরঙ্গতার তারতম্যই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? অলঙ্কার্য নারীদেহের সহিত যে অলঙ্কারের যত ঘনিষ্ঠ, যত অন্তরঙ্গ, যত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহার সৌন্দর্যই তত অধিক। বস্ত্রমাল্যবিভূষণ যত সহজে শরীর হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে, সুরভিচন্দনের সুগন্ধ কিংবা কপোলবিন্যস্ত কুঙ্কুমরচিত পত্রলেখা, শুভ্রচন্দনের ললাটিকা মুছিয়া ফেলা তত সহজ নহে। সেইজন্য বিদগ্ধ রমণীগণের প্রসাধনের সামগ্রী কালাগুরুপত্রলেখা, অলকরচনা। কটককুণ্ডলের স্থূল প্রাকৃতহৃদয়হারী ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধকে পীড়া দেয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই তত্ত্ব। কাব্যালঙ্কারসমূহকেও ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যিনি সুকবি তিনি বিদগ্ধ নারীর ন্যায় অলঙ্কার নির্বাচনের সময় (যদিও

প্রকৃতপক্ষে তিনি বুদ্ধিপূর্বক নির্বাচন করেন না) যমক-অনুপ্রাস প্রভৃতি একান্ত বাহ্য অলঙ্কারসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলেন। কাব্যদেহের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতিশয় শিথিল, নারীদেহের সহিত বস্ত্রমাল্যবিভূষণের ন্যায়। তাঁহারা যে সকল অলঙ্কার রচনা করেন, তাহা কাব্যশরীরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট—ললাটিকার ন্যায়, পত্রবিশেষকের ন্যায়। প্রথমত অলঙ্কার বলিয়া তাহাদের চিনিতেই পারা যায় না, শব্দও অর্থের সহিত তাহারা যেন একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। মহাকবিগণের অলঙ্কাররচনার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

দেখা গেল, মহাকবিগণের লেখনীতে কাব্যদেহ হইতে শব্দার্থালঙ্কাররাজিকে পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ করা দুষ্কর। শব্দার্থরূপী কাব্যদেহের সহিত তাহারা সম্পূর্ণরূপে একতা প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে: প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যে অলঙ্কারসমূহকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতবাদের কি তবে কিছুমাত্র ভিত্তিই নাই? অলঙ্কার কি কখনই কাব্যের আত্ম-পদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না? কাব্যদেহের সহিত সাযুজ্য লাভই কি তবে তাহাদের বিবর্তনের চরম নিষ্ঠা? তাহারা কি কাব্যের গভীর অন্তঃপুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে একেবারেই অসমর্থ? ইহার উত্তর দিয়াছেন আনন্দবর্ধনাচার্য ও অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন' ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন: "প্রাচীন আচার্যগণের অলঙ্কার বিচার শুধু বাচ্য অলঙ্কারসমূহকে কেন্দ্র করিয়া। যে সকল অলঙ্কার অতি স্ফুটভাবে, স্পষ্ট কথায় কবি তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য সেই সকল অলঙ্কারেরই মুখ্যত বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ওই সকল বাচ্য অলঙ্কারই কাব্যের আত্মা। কিন্তু আমরা দেখিলাম, অলঙ্কার, যাহা স্পষ্টভাবে কবির লেখনীতে প্রকাশিত হয়, তাহারা কখনই কাব্যের আত্মতত্ত্বের সহিত ঐক্য লাভ করিতে পারে না। দেহৈক্যপ্রাপ্তিই বাচ্য অলঙ্কারসমূহের বিবর্তনের চরম নিষ্ঠা।

তাহার জন্যও আবার অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। মহাকবি প্রসাধন-নিপুণা বিদগ্ধ পুরন্ধ্রীর ন্যায় অলঙ্কারবিন্যাসে যতই কৌশলের পরিচয় দিন না কেন, তাঁহার লেখনী বাচ্য অলঙ্কারবর্গকে কখনই কাব্যশরীরের মর্যাদা উত্তীর্ণ করাইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিতে পারে না। কিন্তু সেই অলঙ্কার যখন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হয়, যখন সাক্ষাৎভাবে বাচ্য না হইয়া কাব্যের অনুরণনের (undertone) দ্বারা প্রতীত হয়, তখন তাহাই অনায়াসে কাব্যের আত্মার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের এমনই অলৌকিক মহিমা। স্পর্শমণির মত তাহা শরীরকে আত্মায় পরিণত করিয়া দিতে পারে, বহিরঙ্গকে অন্তরঙ্গতম করিয়া তুলিতে পারে, যাহা ছিল তুচ্ছ অলঙ্কার তাহাই ব্যঞ্জনার অনির্বচনীয় স্পর্শ লাভ করিয়া অলঙ্কার্য হইয়া উঠে।"—সুতরাং প্রাচীন আচার্য ও ধ্বনি-সম্প্রদায়ের নব্য সাহিত্যমীমাংসকগণের মধ্যে ভেদ শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যে। অলঙ্কারের আত্মভাব ধ্বনিবাদীরাও মানিয়া লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন, কিন্তু তাহা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হইতে হইবে। 'বাচ্য' অলঙ্কারের সে ঐশ্বর্য নাই। কিন্তু, যদিও ধ্বনিসম্প্রদায়ের নবীন আচার্যগণ বিশেষ ক্ষেত্রে অলঙ্কারেরও আত্মভাব মানিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের মতে রসই কাব্যের মুখ্য আত্মা, কেন না, কাব্যের সমস্ত উপাদানের রসেই পর্যবসান। রসই কাব্যের অন্তরতম তত্ত্ব। ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে রসকে বীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১] যেমন ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, ক্রমে যেমন তাহা মনোহর পুষ্পপল্লবে বিভূষিত হইয়া উঠে, এবং তাহার চরম পরিণতি যেমন বিচিত্র ফলসম্ভারে, সেইরূপ কবির অন্তর্গূঢ় রসবীজ আপন প্রাণশক্তির উল্লাসবশে শব্দ, অর্থ, অলঙ্কাররূপে আপনাকে অঙ্কুরিত, কুসুমিত, মঞ্জরিত করিয়া তুলে, সর্বশেষে পরিণত হয়

১. "যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ"—নাট্যশাস্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

সহৃদয়ের রসচর্বণায়। এই রসাস্বাদই কাব্যবৃক্ষের অমৃতময় ফল। সুতরাং রসবীজ হইতে কাব্যের উৎপত্তি, রসাস্বাদেই ইহার পরিসমাপ্তি। বৃহৎ শাখাপল্লববিশোভিত বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র অখণ্ড বীজেরই প্রাণশক্তির বিবর্তন মাত্র, সেইরূপ শব্দ অর্থ অলঙ্কার—কাব্যের যত কিছু উপাদান সমস্তই কবিচিত্তে নির্বিভাগ, অখণ্ড রসানুভূতির বিবর্তন মাত্র, কবির আন্তর পরিস্পন্দেরই বাহ্য আকার মাত্র। কবির কাব্যসৃষ্টির ইতিহাস শুধু তাঁহার নিবিড় রসানুভূতিরই আবেগময় বিবর্তনের ইতিহাস।

শব্দার্থসূচী

ভরত	নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা। আনুমানিক খৃঃ ১ম শতক।
ভামহ	'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের প্রণেতা। আঃ খৃঃ ৭ম শতক।
দণ্ডী	'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের রচয়িতা। আঃ খৃঃ ৭ম শতক।
অভিনবগুপ্ত	দার্শনিক ও আলঙ্কারিক। খৃঃ ১০ম শতক। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের 'লোচন' টীকা এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের 'অভিনবভারতী' নামক ভাষ্য তাঁহার দুইটি প্রধান আলঙ্কারিক নিবন্ধ।
মম্মটাচার্য	'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের প্রণেতা। খৃঃ ১১শ শতক।
উদ্ভট	কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক। আবির্ভাব-কাল খৃঃ ৮ম শতক। ইঁহার 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ' একখানি প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক নিবন্ধ। 'ভামহ-বিবরণ' নামে ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের উপর ইঁহার একখানি প্রসিদ্ধ টীকা ছিল। সেখানি অধুনালুপ্ত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অন্যতম

	ভাষ্যকার বলিয়াও ইহার প্রসিদ্ধি আছে।
আন্বীক্ষিকী	ন্যায়শাস্ত্র বা Logic।
আনন্দবর্ধন	কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক ও দার্শনিক। খৃঃ ৯ম শতাব্দী। 'ধ্বন্যালোক'-রচয়িতা।
পরীবাহ	পয়ঃপ্রণালী।
উপোদ্‌ঘাত	অবতরণিকা, ভূমিকা।
লোকায়তিক	চার্বাক-সম্প্রদায়ের দার্শনিক (Materialists)।
ভূতচৈতন্যবাদী	পঞ্চভূতের মিশ্রণ হইতেই চৈতন্যরূপ (consciousness) একটি বিশিষ্ট ধর্মের উদয় হয়, এই মত যাঁহারা স্বীকার করেন। যেমন, তাম্বুল, খদির, চূর্ণক প্রভৃতির মিশ্রণে রক্তিমা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ।
অভিধাশক্তি	function of denotation।
ব্যঙ্গ্য	বাচ্য অর্থ-ব্যতিরিক্ত প্রকরণ, বক্তৃ-বোদ্ধব্য প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যবশতঃ প্রতীয়মান অর্থান্তর। ইংরাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে suggested sense।
ব্যঞ্জনা	ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতির উপযোগী শব্দ ও অর্থের ব্যাপারবিশেষ।

শারদাতনয়	'ভাবপ্রকাশ'-গ্রন্থের রচয়িতা। খৃঃ ১২শ-১৩শ শতাব্দী।
মহর্ষি ব্যাস	পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যকার।
উদয়ব্যয়শালী	আবির্ভাব-তিরোভাবশালী।
অস্তময়	বিলয়, তিরোভাব।
হেমচন্দ্র	জৈন আচার্য। 'কাব্যানুশাসন'-নামক আলঙ্কারিক নিবন্ধের রচয়িতা। খৃঃ ১২শ শতাব্দী।
পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ	বিখ্যাত বৈয়াকরণ, কবি ও আলঙ্কারিক। 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থের রচয়িতা। বাদশাহ্ শাহ্জাহানের সভাকবি ছিলেন। খৃঃ ১৭শ শতক।
সঙ্গীতরত্নাকর	সংস্কৃতে সঙ্গীতবিদ্যা-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ। রচয়িতা শার্ঙ্গদেব। খৃঃ ১৩শ শতক।
ভট্টলোল্লক	আলঙ্কারিক। নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য-লেখকরূপে প্রসিদ্ধ। অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তী।
কুশীলব	অভিনেতৃনট।
নাট্যদর্পণকার	রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র। ইঁহারা জৈন-সম্প্রদায়ের লেখক। খৃঃ ১২শ শতক।
আচার্য ভট্টতৌত	আচার্য অভিনবগুপ্তের অন্যতম

সাহিত্যগুরু। ইঁহার 'কাব্যকৌতুক'-নামক আলঙ্কারিক নিবন্ধ অধুনালুপ্ত।

ভট্টশঙ্কুক — অভিনবগুপ্তের পূর্বগামী আচার্য, নাট্যশাস্ত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাতারূপে প্রসিদ্ধ।

সংশয়াত্মক বিরুদ্ধো-ভয়কোটিক জ্ঞান — সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে সংশয় (doubt)কে 'বিরুদ্ধোভয়কোটিক জ্ঞান বলা হয়। কেননা, সংশয়ের স্থলে চিত্তবৃত্তি দুইটি বিরুদ্ধ (contrary or contradictory) কোটি (পক্ষ, extreme or alternative)-এর মধ্যে দোলায়িত হইতে থাকে। যেমন, 'এটি কি স্থাণু, বা পুরুষ?'

পরামর্শজ্ঞান — হেতু বা middle term-এর পক্ষ বা minor term-এ অবস্থিতির জ্ঞান।

অর্থক্রিয়া — প্রয়োজনসিদ্ধি। বৌদ্ধদর্শনের একটি প্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দ।

সংবাদিভ্রম, বিসংবাদিভ্রম — যে ভ্রমের স্থলে ঈপ্সিত বস্তু লাভ ঘটিয়া থাকে, তাহাকে সংবাদিভ্রম কহে। তাহা না হইলে, উহা বিসংবাদি-ভ্রম রূপে পরিচিত। সংবাদ = correspondence।

ধর্মকীর্তি	খ্যাতনামা বৌদ্ধদার্শনিক। 'প্রমাণ-বার্তিক', 'ন্যায়বিন্দু' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক নিবন্ধের রচয়িতা।
অনুমিতিপ্রমা	valid inferential knowledge।
রুয্যক	বিখ্যাত কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক ও টীকাকার। খৃঃ ১২শ শতাব্দী।
ভট্টনায়ক	অভিনবগুপ্তের পূর্বগামী আচার্য ও ধ্বনিবাদের প্রধান সমালোচক। ইঁহার 'হৃদয়দর্পণ' নামে অলঙ্কারনিবন্ধ বর্তমানে অপ্রাপ্য। ইনি নাট্যশাস্ত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাতারূপেও প্রসিদ্ধ।
ভাবনা	function of universalisation, বা সাধারণীকৃতি।
ভোগীকৃতি	relish বা রসাস্বাদনব্যাপার।
গুণ	শব্দ ও অর্থের বিশিষ্ট বিন্যাসজনিত কাব্যের উৎকর্ষহেতু কতকগুলি ধর্ম।
আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য, সাত্ত্বিক	যথাক্রমে, অঙ্গবিক্ষেপ, বাক্যপ্রয়োগ, বেশভূষা এবং মনোবিক্রিয়ার সাহায্যে প্রকটিত চতুর্বিধ অনুকৃতি বা অভিনয়।
ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী, আরভটী	চারিটি বিশিষ্ট নাট্যবৃত্তি।
শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণ	অনুভূত (perceived) ও স্মৃত

(recollected) বস্তুর মধ্যে ঐক্য বা অভেদের উপলব্ধিকে দর্শনশাস্ত্রে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) কহে। যেমন, 'এই সেই দেবদত্ত।' সেইরূপ জীবাত্মা এবং পরমশিব বা পরমাত্মা, এই উভয়ের মধ্যে যতক্ষণ না 'আমিই সেই' এইরূপ ঐক্যানুভূতি বা প্রত্যভিজ্ঞা ঘটে ততক্ষণ মুক্তি হইতে পারে না। এই মত শৈবপ্রত্যভিজ্ঞা-বাদরূপে প্রখ্যাত।

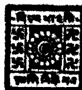
শবলিত	চিত্রিত বা variegated।
সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত	সকল দার্শনিক প্রস্থানের সাধারণ সিদ্ধান্ত। তন্ত্র=শাস্ত্র।
কুন্তকাচার্য	বিখ্যাত কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক। 'বক্রোক্তিজীবিত'-রচয়িতা। খৃঃ ১০ম শতক।
আচার্য উৎপলদেব	কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞাপ্রস্থানের পরমাচার্য ও অভিনবগুপ্তাচার্যের পরমগুরু।
মল	প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে বেদান্তসম্মত অবিদ্যা (nescience)'র প্রতিশব্দ।
মাণিক্যচন্দ্রসূরি	জৈন আলঙ্কারিক ও মম্মটের কাব্যপ্রকাশের অন্যতম টীকাকার। খৃঃ ১২শ শতক।

লক্ষণা	কোনও শব্দের বাচ্যার্থ বাধিত হইলে যে ব্যাপারের দ্বারা ঐ বাচ্যার্থের সহিত সাদৃশ্য, সামীপ্য, বিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও অর্থান্তরের বোধ হয়, তাহাকে লক্ষণাব্যাপার কহে, এবং সেই ব্যাপারের দ্বারা বোধিত অর্থকে লক্ষ্যার্থ কহে।
যোগাচারসম্প্রদায়	বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম সম্প্রদায়-বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বাহ্য কোনও জ্ঞেয় বস্তুর সত্তা নাই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এই মতবাদ Subjective Idealism বলিয়া পরিচিত।
ধনিক	ধনঞ্জয়কৃত 'দশরূপক'-নামক নাট্য-বিষয়ক গ্রন্থের বৃত্তিকার। ইঁহার রচিত বৃত্তির নাম 'অবলোক'। খৃঃ ১০ম শতাব্দী।
সৌভিক	নট।
সাক্ষিভাস্য ও বৃত্তিভাস্য	অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণামকে বৃত্তি কহে। যেখানে আত্মা অন্তঃকরণবৃত্তির সাহায্যে বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে, সেখানে বিষয়টি 'বৃত্তিভাস্য'; কিন্তু যেখানে

	বৃত্তির কোনও প্রয়োজন হয় না, সেখানে উহা 'সাক্ষিভাস্য'।
অসত্তাপাদক, অভানাপাদক ও অনানন্দাপাদক অজ্ঞান	যথাক্রমে আত্মার সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ অংশের আবরক অজ্ঞান।
আবরণভঙ্গ	আত্মার স্বরূপ-আবরক ত্রিবিধ অজ্ঞানের বিলয়।

বঙ্গসাহিত্যে নারী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৭ ॥

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

৭৯. ভারত ও মধ্য এশিয়া

৮০. ভারত ও ইন্দোচীন

৮১. ভারত ও চীন

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৮২. বৈদিক দেবতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৩. বঙ্গসাহিত্যে নারী

৮৪. সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৮৫. বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৬. গণিতের রাজ্য

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

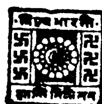
বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ হইতে ১৩৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বঙ্গসাহিত্যে নারী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৭ মাঘ

ম্ল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপ্লিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৩·১

স্বীকৃতি

বঙ্গসাহিত্যে নারী ও সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী এই দুই গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রাবলীর অধিকাংশ শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী দিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত মানকুমারী বসু ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর তৈলচিত্র ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে রক্ষিত লাবণ্যপ্রভা সরকারের চিত্র বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর চিত্র শ্রীঅতুল বসু কর্তৃক অঙ্কিত ও তাঁহারই সৌজন্যে প্রাপ্ত; কৃষ্ণভাবিনী দাসের চিত্র মিস্ লার্চার অঙ্কিত প্রতিকৃতির অনুকৃতি। বঙ্গসাহিত্যে নারী গ্রন্থে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর চিত্রখানি শিল্পী উইলিয়ম আর্চার কর্তৃক অঙ্কিত।

লেখিকাদের আত্মীয় ও সুহৃদ্বর্গের নিকট হইতেও অনেকগুলি ছবি পাওয়া গিয়াছে, যথা, শ্রীঅমিয়া ঠাকুর—প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী; শ্রীঅগ্রভূষণ দাসগুপ্ত—অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত; শ্রীকল্যাণী মল্লিক—হিরণ্ময়ী দেবী; শ্রীকানাইলাল সরকার—রাসসুন্দরী দেবী, শ্রীসরলাবালা দাসী; শ্রীগণেশচন্দ্র গুহ—শ্রীবিনয়কুমারী ধর, প্রমীলা নাগ; শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—শ্রীহেমলতা দেবী; শ্রীদীপক চৌধুরী—সরলা দেবী; শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী—বনলতা দেবী; শ্রীমীরা সেন—কামিনী রায়; শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়—সারদাসুন্দরী দেবী, মোহিনী দেবী; শ্রীসুকুমার মিত্র—লজ্জাবতী বসু, কুমুদিনী বসু; শ্রীরণজিৎ রায়—শ্রীনিরুপমা দেবী। শ্রীঅমিতা ঠাকুর, শ্রীঅশোকা রায়, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার ও শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের নিকট হইতেও চিত্রসংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

গত শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যেসকল মহিলা বিশিষ্টতা অর্জন করেন এই গ্রন্থে তাঁহাদের পরিচয় ও রচনাপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে; গ্রন্থশেষে বর্তমান শতাব্দীর লব্ধ-প্রতিষ্ঠ মহিলা-সাহিত্যিকগণের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নাই।



স্বর্ণকুমারী দেবী



কামিনী রায়



সরলা দেবী

দেড় শত বৎসর পূর্বে—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। প্রধানত সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুর-প্রাচীর মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল; মেয়েরা ঘরে বসিয়া শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে বিদ্যাচর্চা করিতেন। 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্ক-বাগীশ একবার স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :

"কলিকাতা নগরে মান্য লোকদিগের বালিকারা প্রায় সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেন, *প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পরিবারগণের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস স্বাভাবিক প্রচলিতরূপ হইয়াছিল, বিশেষত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্র *প্রাপ্ত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যা *প্রাপ্তা হরসুন্দরী দাসী সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী এই তিন ভাষায় এমত সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে ভয় করিতেন।...শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যোষ্ঠা কন্যা [সুরসুন্দরী দেবী] বর্তমানা থাকিলে মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার অক্ষর শ্রেণী ও নানা প্রকার রচনা দেখাইয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম..। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব [সাতু বাবু] মহাশয়ের কন্যা গৌড়ীয় ভাষা, উর্দ্দু ভাষা, ব্রজভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, এবং দেবনাগরাক্ষর লিখন পঠন বিষয়ে পণ্ডিতেরাও তাহার ধন্যবাদ করেন, বিশেষত শিল্পবিদ্যায় ঐ কন্যার যে প্রকার ব্যুৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করি ইংলণ্ডদেশীয়া প্রধানা শিল্পকারিকারাও তাঁহার শিল্পকর্ম্মদর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিবেন।" (৩১ মে, ১৮৪৯)

ইহা ত হইল সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের কথা। সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না; বরং প্রাচীনাদের অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার ছিল, যে-মেয়ে লেখাপড়া করে সে "রাঁড়" (বিধবা) হয়। এই শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াই রামমোহন রায় ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে সহমরণ-বিষয়ে বাদানুবাদে এক স্থলে প্রতিপক্ষকে বলিয়াছিলেন :

"আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"

যে-সময়ে রামমোহন এই তিরস্কার-বাণী উচ্চারণ করেন, ঠিক সেই বৎসরেই কলিকাতায় সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয়ের সূচনা হয়।

অন্যান্য অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের ন্যায়, অগ্রণী হিসাবে ইহার গৌরবও মিশনরীদেরই প্রাপ্য। তাঁহাদেরই নিরলস চেষ্টায় অচিরাৎ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সূত্রপাত হয়। এই ব্যাপারে তাঁহারা কয়েকজন দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির—যথা, সভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব, কলিকাতা স্কুল-বুক ও স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, জোড়াসাঁকো-রাজপরিবারের রাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রভৃতির সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। গৌরমোহন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক—অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে প্রকাশিত এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথনে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে সে সময় সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়েরা বিদ্যাচর্চায় কত দূর অনগ্রসর ছিলেন তাহার একটি চিত্র পাওয়া যাইবে :

"প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখাপড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রী-লোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখাপড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখাপড়া

যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড়২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখাপড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখাপড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এতদিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধূলা ও নাটরঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘরকন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুরবাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায়২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশাল আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেদে দেখ দিদি বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোট২ কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি বেটাছেলের মত লেখাপড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অংকুরে জানা যায়।" পৃ ১-৪

কিন্তু এত করিয়াও মিশনরী-পরিচালিত বালিকাবিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ ইঁহাদের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা যে অবিমিশ্র সদিচ্ছাপ্রসূত ছিল না, খৃীস্টধর্ম বিস্তারই যে মুখ্য লক্ষ্য ছিল, তাহা ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে একমাত্র দরিদ্র-ঘরের—অনেক স্থলে নিম্নবর্ণের ছাড়া কোনো শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যোগদান করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাইবার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। এই

বাধা সর্ব্বপ্রথম দূর করেন, তৎকালীন সরকারী শিক্ষা-সংসদের সভাপতি ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন)। তিনি রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার-প্রমুখ এদেশের কয়েক-জন সুসন্তানের সহায়তায় ১৮৪৯ সনের ৭ই মে কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয় (বর্তমানে বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন।(১) তদবধি দেশে প্রকাশ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইহারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অনতিকালমধ্যে আমরা কোনো কোনো বঙ্গমহিলাকে পর্দার অন্তরাল ভেদ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখি। তাঁহাদের রচিত কবিতাবলী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে সাদরে গৃহীত হইতে থাকে।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গমহিলা-রচিত সর্বপ্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়; উহা 'চিত্তবিলাসিনী' নামে একখানি নাতিদীর্ঘ কাব্য (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭২), লেখিকা—কৃষ্ণকামিনী দাসী।(২) গুপ্ত-কবি ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৮-১১-১৮৫৬) লেখেন :

"আমরা পরমানন্দ-সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে 'চিত্তবিলাসিনী' নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠানন্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি, অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এ-দেশে প্রচলিতা হইতেছে, তাহার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ,..অবলাগণ বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অবনী-মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমারদিগের প্রার্থনা।"

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' (দ্রঃ ১৫, ২৬, ৩০ মে, ১৮৪৯) ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৪ মে), এই বিদ্যালয়টিকে 'বিক্টরিয়া বালিকাবিদ্যালয়' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় ইহা এই নামেই পরিচিত ছিল, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

২ মিসেস মুলেন্স (Mullens) ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে "স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত" 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (পৃ ৩০৬) প্রকাশ করেন। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি, ইনি একজন বঙ্গমহিলা, চক্রবেড়িয়া-নিবাসী খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, পাদরি মুলেন্সকে বিবাহ করেন। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' সম্বন্ধে পাদরি লং তাঁহার পুস্তক-তালিকায় এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন : "In the guise of fiction, written for native Christian women, to shew the practical effects of Christianity in forming marriage connections, behaviour to husbands, moral training of children and women's duty to the poor and sick, the bad effects of debt, and of secluding females; of domestic economy, cleanliness, cheerfulness, industry, attending God's house, reading the Bible. Appended to it is a very useful list of suitable names for Native Children."

রচনার নিদর্শনস্বরূপ এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য কাব্যখানির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

দয়া ছাড়া ধর্ম্ম নাই।

পুরুষের উক্তি : ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী।
কিসের লাগিয়ে ভ্রমিতেছ একাকিনী॥
বয়েসে নবীন অতি রূপ মনোহর।
আছ রঙ্গে নাহি সঙ্গে সঙ্গিনী অপর॥
কি নাম কাহার কন্যা বল রসবতি।
অপ্সরী কিন্নরী কিম্বা হবে দেবজাতি॥

কামিনীর উক্তি : আমি হে রমণী, আছি একাকিনী,
কুলের কামিনী তায়।
তুমি হে এখানে, কিসের কারণে,
বল ওহে যুবরায়॥
একি তব রীত, হেরি বিপরীত,
নাহি চিতে কিছু ভয়।
রমণীর পাশে, এলে অনায়াসে,
কিরূপেতে মহাশয়॥
আলাপ করিতে, বাসনা মনেতে,
নাহি ভাব তাহে লাজ।
আমি নারী জেতে, তোমার সহিতে,
পরিচয়ে কিবা কায॥..

পু। দেবগণ মধ্যে হয় আমার বসতি।
ধর্ম্ম নামে খ্যাত আমি শুন রসবতি॥
সমাদরে যারা করে আমার সাধন।
তাদের শরীরে করি সতত ভ্রমণ॥
মর্ত্ত্যলোকে সেই হেতু আমার বসতি।
আপন বৃত্তান্ত ধনি কহ লো সম্প্রতি॥

কা। প্রবৃত্তির কন্যা আমি দয়া নামে খ্যাত।
শ্রদ্ধা নামে ভগ্নী মম জগতে বিদিত॥
মর্ত্ত্যলোকে মহাত্মাগণের অন্তরেতে।
নিবাস আমার তাই ভ্রমি হেনমতে॥

সুরগণ শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম মহামতি।
এরূপ ব্যাভার কেন অবলার প্রতি॥
তোমার উচিত কভু না হয় এমন।
ছাড় ছাড় পথ করি স্বস্থানে গমন॥ ..

পু। দয়া ছাড়া ধর্ম্ম বল আছে কোন খানে।
যেখানেতে দয়া দেখ ধর্ম্ম সেইখানে॥
অতএব কেন কর এমন ভাবনা।
দয়া ছাড়া ধর্ম্ম প্রিয় কখন হবে না॥
দয়া হীনে ধর্ম্মের নাহিক হয় গতি।
দয়া ধর্ম্ম দুয়ে হয় একাধারে স্থিতি॥

কা। শপথ করিতে যদি পার মহাশয়।
তবে সে আমার ইথে হইবে প্রত্যয়॥
যেখানেতে রব আমি সেইখানে রবে।
তিলেক তিলার্দ্ধ নাহি ছাড়াছাড়ি হবে॥
তুমি ধর্ম্মরাজ হও সত্যের আশ্রয়।
ত্রিসত্য করিলে পরে ঘুচিবে সংশয়॥ ..

দুই জনে সত্য বন্ধ করি হেন মতে।
পারিজাত হার ছিল দোঁহার সনেতে॥
আপন আপন করে লইয়ে আপন।
উভয়ে উভয় গলে করিল অর্পণ॥
হেন কালে আচম্বিতে নিদ্রাভঙ্গ হলো।
কিছু নাহি জানিলাম পরে কি ঘটিল॥

'চিত্তবিলাসিনী'র প্রকাশকাল হইতে পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে (১৮৫৬-৬৬) আমরা আরও সাতজন গ্রন্থকর্ত্রীর সন্দর্শন পাই।(৩) ইঁহাদের নাম ও রচনা :

১। বামাসুন্দরী দেবী (পাবনা) : 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।' ৪ বৈশাখ ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)। পৃ. ২০।

৩ *General Report on Public Instruction* . . for 1865-666 (p. 111) and 1866-67 (p. 82).

এই সন্দর্ভটির ভূমিকায় লোকনাথ মৈত্রেয় লিখিয়াছেন :

"ইহার রচয়িত্রী তিন বৎসরের অধিক হইবে না, বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। যত্ন সহকারে বিদ্যার্জ্জনে নির্বিষ্টমনা হইলে আমাদের দেশীয় রমণীগণ যে কত অল্পকাল মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিতা হইতে পারেন, তাহা এদেশের লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য।"

২। হরকুমারী দেবী (কালিঘাট) : 'বিদ্যাদারিদ্রদলনী' (কাব্য) ..১২ আশ্বিন ১৭৮৩ শক (ইং ১৮৬১)। পৃ. ৮৪। পুস্তকে লেখিকা নিজ নাম এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"পঞ্চমীতে যেই দ্রব্য না করে ভক্ষণ।
তার আদ্য বর্ণ অগ্রে করিয়া গ্রহণ॥
কর্কট মিথুন রাশে হয় যেই নাম।
রচয়িত্রী সেই দেবী কালীঘাট ধাম॥"

৩। কৈলাসবাসিনী দেবী (দুর্গাচরণ গুপ্তের পত্নী) : 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (সন্দর্ভ)..১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৩)। পৃ. ৭২। 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি'..১৭৮৭ শক (ইং ১৮৬৫)। পৃ. ৩৯।

৪। মার্থা সৌদামিনী সিংহ : 'নারীচরিত'..ইং ১৮৬৫। পৃ. ৯৪।

৫। রাখালমণি গুপ্ত : 'কবিতামালা'..ইং ১৮৬৫। পৃ. ৭২।

৬। কামিনীসুন্দরী দেবী (শিবপুর) : 'উর্বশী নাটক'..১২৭২ সাল (ইং ১৮৬৬)। পৃ. ৮৫।

গ্রন্থকর্ত্রীর নাম "দ্বিজতনয়া" আছে। কিন্তু ইঁহার পরবর্তী পুস্তক 'বালা বোধিকা'য় (ইং ১৮৬৮) "উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী প্রণীত" মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গমহিলাদের মধ্যে কামিনীসুন্দরীই প্রথমে নাটকরচনায় হস্তক্ষেপ করেন।

৭। বসন্তকুমারী দাসী (বরিশাল) : 'কবিতামঞ্জরী'।

একে যথোচিত শিক্ষার অভাব, তাহার উপর সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা—ইহা স্মরণ করিলে স্বল্পশিক্ষিতা এইসকল কুলবালার প্রথমোদ্যম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে না।

ক্রমশ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাতেও বঙ্গমহিলারা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' বামাগণের রচনার জন্য পত্রিকার কয়েক পৃষ্ঠা উন্মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। চারি দিকেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের আন্দোলন মাথা তুলিল। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে সরকার বেথুন কলেজের সহিত একটি শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের সূচনা করিলেন; কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজগুলিও, বিশেষত কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীল দল, স্ত্রীশিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হইতে লাগিল। যে-সকল মহিলা ইতিপূর্বে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও অশিক্ষিতা ভগ্নীগণকে বিদ্যাশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সহিত পরবর্তী দশ-এগার বৎসরে সাহিত্য-মন্দিরের পূজারিণীর সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহাদের দান কেবলমাত্র সাহিত্যের কাব্য-বিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইঁহাদের সকলের নামধাম ও রচনার দীর্ঘ তালিকা না দিয়া মাত্র কয়েকজনের উল্লেখ করিলেই চলিবে; তাঁহারা

নবীনকালী দেবী : 'কামিনী কলঙ্ক' (উপন্যাস) .. এপ্রিল ১৮৭০।
হেমাঙ্গিনী : 'মনোরমা' (আখ্যায়িকা) .. জুলাই ১৮৭৪।
সুরঙ্গিনী দেবী (প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর পত্নী) :
'তারাচরিত' (রাজস্থানীয় ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা) .. জানুয়ারি ১৮৭৫।
ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণী : 'রূপ-জালাল' (প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা) .. ঢাকা ১৮৭৬।
রাসসুন্দরী (কিশোরীলাল সরকারের মাতা) :
'আমার জীবন' .. ডিসেম্বর ১৮৭৬।(৪)

৪ প্রথম সংস্করণের পুস্তকের এই প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। স্মৃতিকথায় সন-তারিখের গণ্ডগোল হওয়া স্বাভাবিক; রাসসুন্দরী লিখিয়াছেন : "১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হইয়াছে, আর এই বহি ১২৭৫ সালে যখন প্রথম ছাপা হয়, তখন আমার বয়ঃক্রম উনষাইট বৎসর ছিল।"

শেষোক্ত গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য ; ইহা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত আত্মকথা। রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'আমার জীবন' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমার মা বলিলেন, এই যে, আমাদের দালানে ঠাকুর আছেন, তাঁহারি নাম দয়ামাধব, তিনি ঠাকুর। কল্য তোমাদের যে লোক নদীর কূল হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছিল, সে মানুষ। তখন আমি বলিলাম, মা তুমি বলিয়াছিলে, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও, আমাদের দয়ামাধব আছেন। তবে যে কালি যখন ভয় হইল, আমরা দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া কত ডাকিলাম, আইলেন না কেন? মা বলিলেন, ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া ডাকিয়াছিলে। দয়ামাধব তোমাদের কান্না শুনিয়া ঐ মানুষ পাঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছেন। আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্ব স্থানেই আছেন, এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন।

"সেই পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও শুনিয়া থাকেন। এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা! সকল লোক যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের? মা বলিলেন, হাঁ, ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি, সকল লোকেই তাঁহাকে ডাকে, তিনি আদিকর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভাল বাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।

"বাস্তবিক পরমেশ্বর যে কি বস্তু, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সকল লোক পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, তাহাই শুনিয়া থাকি, এই মাত্র জানি। মা বলিলেন, তিনি ঠাকুর, এজন্য সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মন অনেক সবল হইল। বিশেষ সেই দিবস হইতে আমার বুদ্ধির অংকুর হইতে লাগিল। আর পরমেশ্বর যে আমাদের ঠাকুর, তাহাও আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম। আর আমার মনে অধিক ভরসা হইল। পরমেশ্বরকে মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনেন, তবে আর কিসের ভয়, এখন যদি আমার ভয় করে, তবে আমি মনে মনে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। মার ঐ কথা আমার চিরস্থায়ী হইয়াছে, মা বলিয়াছেন, আমাদের পরমেশ্বর আছেন।"

২

গত শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এমন এক প্রতিভাশালিনী মহিলা আবির্ভূত হইলেন যাঁহার গদ্য-পদ্যে আমরা সর্বপ্রথম শিল্পসুষমার আস্বাদ পাইলাম, যাঁহার হাতে বঙ্গভারতীর বীণায় মৌলিক নারী-সুর ঝংকৃত হইল; ইনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রতিভার যাদুস্পর্শে সর্বপ্রথম ইঁহার রচনাই রসমণ্ডিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গল্প উপন্যাস, কবিতা গান, নাটক প্রবন্ধ ও বিজ্ঞান—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁহার দান স্বীকৃত হইতে থাকে। এই সাফল্যের প্রভাব অচিরাৎ পরিলক্ষিত হয়। এই সময় হইতে শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত এমন কতকগুলি মহিলা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে, যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :

স্বর্ণকুমারী দেবী। আনুমানিক ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা জোড়া-সাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরপরিবারে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা; রবীন্দ্রনাথের ভগিনী। ১৮৬৭ সনের ১৭ই নবেম্বর ১৩ বৎসর বয়সে জানকীনাথ ঘোষালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বর্ণকুমারীর সুদীর্ঘ জীবন বাণী-সাধনায় সমুজ্জ্বল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার দান সুবিপুল। বঙ্গমহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সার্থক উপন্যাস, গাথা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী :

১ দীপ-নির্ব্বাণ (উপন্যাস) : ১২৮৩ সাল (১৫-১২-১৮৭৬)। পৃ ৩২১।

২ বসন্ত উৎসব (গীতিনাট্য) : ১৮০১ শক (৪-১১-১৮৭৯)। পৃ ৪০।

৩ ছিন্নমুকুল (উপন্যাস) : (৪-১১-১৮৭৯)। পৃ ২৩৮।

৪ মালতী (উপন্যাস) : ১২৮৬ সাল (২৫-৩-১৮৮০)। পৃ ৪৪।

৫ গাথা : ১২৮৭ সাল (২০-১২-১৮৮০)। পৃ ৯৫।

৬ পৃথিবী (বৈজ্ঞানিক পুস্তক) : আশ্বিন ১২৮৯ (২৭-৯-১৮৮২)। পৃ ১৮৪।

৭ সখিসমিতি : ১২৯৩ সাল (১২-৮-১৮৮৬)। পৃ ২৪।

৮ মিবাররাজ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৮০৯ শক (১৭-৬-১৮৮৭)। পৃ ৮০।

৯ হুগলীর ইমামবাড়ী (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : পৌষ ১২৯৪ (৮-১-১৮৮৮)। পৃ ২৫৬।

১০ বিদ্রোহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭ (৯-৮-১৮৯০)। পৃ ২৮২।

১১ বিবাহ-উৎসব (গীতি-নাট্য) : (১৩-৫-১৮৯২)। পৃ ২৩।

১২ নবকাহিনী (ছোট গল্প) : (১৭-৮-১৮৯২)। পৃ ১২৮।

১৩ স্নেহলতা বা পালিতা (উপন্যাস) :

১ম খণ্ড। ১২৯৯ সাল (১৩-১০-১৮৯২)। পৃ ২৩৮।

২য় খণ্ড। ফাল্গুন ১২৯৯ (১৫-৩-১৮৯৩)। পৃ ১৮২।

১৪ ফুলের মালা (উপন্যাস) : (১২-৩-১৮৯৫)। পৃ ১৫৯।

১৫ কবিতা ও গান : কার্তিক ১৩০২ (১-১২-১৮৯৫)। পৃ ২৪০।

১৬ কাহাকে? (উপন্যাস) : জুলাই ১৮৯৮। পৃ ১২১।

১৭ কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা : ইং ১৯০১, জ্যৈষ্ঠ। পৃ ৮১।

১৮ দেবকৌতুক (কাব্যনাট্য) : ১৩১২ সাল (২৬-২-১৯০৬)। পৃ ৯৬।

১৯ কনে-বদল (প্রহসন) : বৈশাখ ১৩১৩, ইং ১৯০৬। পৃ ৫৮।

২০ পাকচক্র (প্রহসন) : (২৮-২-১৯১১)। পৃ ৭০+১৮।

২১ রাজকন্যা (নাট্যোপন্যাস) : (১৭-৪-১৯১৩)। পৃ ৮২।

২২ নিবেদিতা (নাটক) : ৩ এপ্রিল ১৯১৭। পৃ ৬০।

২৩ যুগান্ত কাব্যনাট্য : (২০-১-১৯১৮)। পৃ ৩৬।

২৪ বিচিত্রা (উপন্যাস) : ১ বৈশাখ ১৩২৭ (৭-৫-১৯২০)। পৃ ১৫৭।

২৫ স্বপ্নবাণী (উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ (২৪-১০-১৯২১)। পৃ ১৭২।

২৬ মিলন রাত্রি (উপন্যাস) : জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ইং ১৯২৫। পৃ ২৮৫।

২৭ দিব্য-কমল (নাটক) : (১৪-৪-১৯৩০)। পৃ ১৬৩।

স্বর্ণকুমারী অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তকেরও রচয়িত্রী। তিনি অতীব যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল 'ভারতী' সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩২ সনের ৩রা জুলাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রসন্নময়ী দেবী। ইনি সার্ আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা; জন্ম ১৮৫৭ সনে। ইঁহার পিতা পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম-নিবাসী দুর্গাদাস চৌধুরী। দশ বৎসর বয়সে পাবনা গুণাইগাছা গ্রাম-নিবাসী কৃষ্ণকুমার বাগচীর সহিত প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয়। বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত হন; সেই অবধি তিনি পিত্রালয়েই কাটাইয়াছেন।

প্রসন্নময়ী শৈশব হইতেই সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বনলতা' ও 'নীহারিকা' কাব্য দুইখানি তাঁহাকে সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা :

১ আধ আধ ভাষিণী (কাব্য) : ১২৭৬ সাল (১৪-২-১৮৭০)। পৃ. ১২।

২ পূর্ব্বস্মৃতি। কৃষ্ণনগর ২১ বৈশাখ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)।(৫)

৩ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন (কবিতা) : (২৭-১২-১৮৭৫)। পৃ. ২৬।

৪ বনলতা (কাব্য) : ১২৮৭ সাল (২০-৫-১৮৮০)। পৃ. ১১৯।

৫ নীহারিকা (কাব্য) :

১ম ভাগ, ১২৯০ সাল (২৩-৮-১৮৮৪)। পৃ. ১৪৯।

২য় ভাগ, অগ্রহায়ণ ১৮১৮ শক (১১-১২-১৮৯৬)। পৃ. ১৬২।

৬ আর্য্যাবর্ত্ত (ভ্রমণ) : পৌষ ১২৯৫ (১২-১-১৮৮৯)। পৃ. ১৭৭।

৭ অশোকা (উপন্যাস) : ১২৯৬ সাল (১০-৪-১৮৯০)। পৃ. ৬২।

৮ তারাচরিত (জীবনী) : ১৩২৪ সাল (৩-৯-১৯১৭)। পৃ. ১১৬।

৯ পূর্ব্বকথা (জীবনী) : ১৩২৪ সাল (১৯-১০-১৯১৭)। পৃ. ১৮৭।

১৯৩৯ সনের ২৫এ নবেম্বর প্রসন্নময়ী পরলোকগমন করিয়াছেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জ্ঞানদানন্দিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়।

৫ এই পুস্তিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সাধারণী' (৩ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন : "কৃষ্ণনগরে যে জাতীয় সম্মিলন সভা হইয়াছিল, তাহাতে প্রসন্নময়ী এই 'পূর্ব্বস্মৃতি' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই পূর্ব্বস্মৃতিতে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আস্থা হইল ও ভবিষ্যৎ আশা জাগ্রতা হইল। প্রসন্নময়ী দেবী ভারতের জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন, আর ভারতমহিলার জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন। আমরাও অশ্রুপাত করিলাম।"

১৮৫৯ সনে, আট বৎসর বয়সে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত জ্ঞানদানন্দিনীর বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহ ও নিজের যত্ন-চেষ্টায় জ্ঞানদানন্দিনী নিজেকে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। পুরাতন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার এই কয়টি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

শ্রাবণ, ১২৮৮ : ইংরাজ-নিন্দা ও দেশানুরাগ
আশ্বিন, ১২৮৮ : স্ত্রী-শিক্ষা
অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ : কিণ্ডারগার্টেন।
মাঘ-চৈত্র ১২৯০; বৈশাখ-আষাঢ়-শ্রাবণ-আশ্বিন ১২৯১ } ভাউ সাহেবের বখর (মরাঠী হইতে অনূদিত)

জ্ঞানদানন্দিনীর নিকট হইতে আমরা দুইখানি সুলিখিত শিশুপাঠ্য পুস্তক লাভ করিয়াছি; সেগুলি :

১ টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ (নাটিকা) : (৬-৬-১৯১০)। পৃ. ১৭।

২ সাত ভাই চম্পা (নাটিকা) : (২৬-১২-১৯১১)। পৃ. ৫২।

১৩৪৮ সালের ১৫ই আশ্বিন, ৯০ বৎসর বয়সে, জ্ঞানদানন্দিনী পরলোকগমন করিয়াছেন।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী। শরৎকুমারীর জন্ম ১৮৬১ সনের ১৫ই জুলাই। তাঁহার পিতার নাম শশিভূষণ বসু (কলিকাতা চোরবাগানের বসু-বংশজাত); তিনি ১৮৬৩ সনে চাকুরী উপলক্ষে সুদূর লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। শরৎকুমারীর শৈশব লাহোরেই কাটে। ১৮৭১ সনের ১২ই মার্চ আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী-বংশের অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অক্ষয়চন্দ্র সুকবি ছিলেন; স্বামীর ন্যায় শরৎকুমারীও মাতৃভাষার পরম অনুরাগিণী ছিলেন। পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে তাঁহার বহু রস-রচনার সন্ধান মিলিবে। তাঁহার প্রথম রচনা 'কলিকাতার স্ত্রীসমাজ' ১২৮৮ সালের ভাদ্র ও কার্তিক-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এক মাত্র 'শুভবিবাহ' (মার্চ ১৯০৬) ছাড়া শরৎকুমারীর আর কোনো রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এই সামাজিক চিত্রখানি বঙ্গসাহিত্যে লেখিকাকে একটি

বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছে। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

"এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই।"

তাঁহার সমগ্র রচনাবলী সম্প্রতি গ্রন্থাবলী-আকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

শরৎকুমারীর শেষজীবন বৈধব্য অবস্থায় কাটে; স্বামীর মৃত্যুর (৫-৯-১৮৯৮) ২২ বৎসর পরে—১৯২০ সনের ১১ই এপ্রিল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (মোক্ষদা দেবী)। ইনি ডবলিউ. সি. বোনার্জীর সহোদরা। বউবাজারের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের বিশ্বনাথ মতিলালের দৌহিত্র শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মোক্ষদায়িনী উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বন-প্রসূন' কাব্য সমালোচনাকালে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯) যে মন্তব্য করেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য :

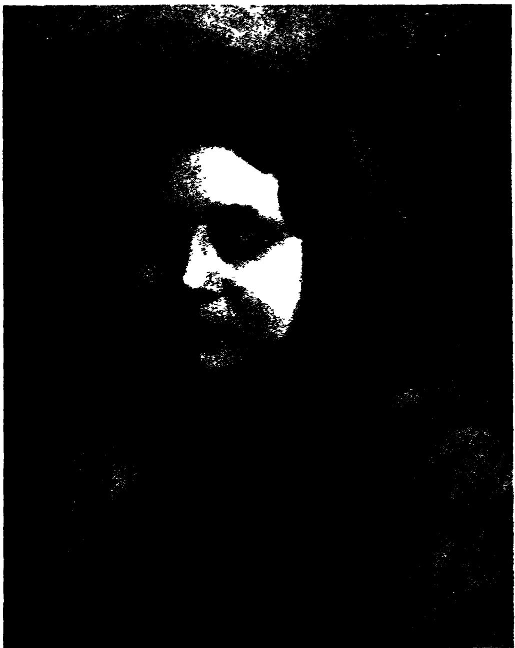
"মুখোপাধ্যায় মহাশয়ার কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তিনি ক্ষমতাশালিনী বটে।..আমরা এই গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য গুণের প্রশংসা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাব্যগত সাহসের প্রশংসা করিব। সকলেই জানেন, বাঙ্গালায় সাহিত্যসংগ্রামক্ষেত্রে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্বিতীয় মহারথী। তাঁহার প্রতি শরসন্ধানে সাহস করে বাঙ্গালার পুরুষ লেখকদিগের মধ্যে এমন শূর বীর কেহ নাই। তাঁহার প্রণীত "বাঙ্গালীর মেয়ে" নামক কবিতার জ্বালায় অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে আজিও কাতর। আজি সেই আঘাতের প্রতিশোধের জন্য এই কাব্যবীরাঙ্গনা বদ্ধপরিকর—ধৃতাস্ত্র। হেমচন্দ্রের ঐ কবিতার উত্তরে মোক্ষদায়িনী "বাঙ্গালির বাবু" শিরোনামে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি বড় রঙদার—লেখিকার লিপিশক্তিপরিচায়িকা—আদ্যোপান্ত পাঠের যোগ্য।"

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা মোক্ষদায়িনী-লিখিত 'বাঙ্গালির বাবু' কবিতাটির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু।
দশ্‌টা হ'তে চারটাবধি দাস্য বৃত্তি করা
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।



মানকুমারী বসু



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী



জ্ঞানদানন্দিনী দেবী



প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী

উকীল, ডেপুটি কেহ, কেহ বা মাষ্টার,
সব্‌জজ কেরাণী কেহ, ওভারসিয়ার,
বড় কর্ম্ম বড় মান, অহঙ্কার কত
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারা দিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।”

আমরা মোক্ষদায়িনীর রচিত এই তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি :

১ বন-প্রসূন (কাব্য)। ইং ১৮৮২।
২ সফল স্বপ্ন (ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস)। ইং ১৮৮৪ (১২ ডিসেম্বর)। পৃ ১৬৯।
৩ কল্যাণ-প্রদীপ (জীবনী)। অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। পৃ ৪২৯।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। ইঁহার জন্ম ১৮৫৮ সনের ১৮ই আগস্ট। পিতার নাম হারাণচন্দ্র মিত্র। দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্র দত্ত, বউবাজার-নিবাসী অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র দুর্গাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৮৪ সনে গিরীন্দ্রমোহিনীর বৈধব্য ঘটে। তিনি দ্বাদশ বর্ষ হইতেই কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত ‘অশ্রুকণা’ বাংলা-সাহিত্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থগুলির তালিকা :

১ জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী : (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২)। পৃ ১৭।
২ কবিতাহার (কাব্য) : ২৯ মাঘ ১২৭৯ (ইং ১৮৭৩)। পৃ ৩৯।
৩ ভারত-কুসুম (কাব্য) : ১ কার্তিক ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)। পৃ ৮৮।
৪ অশ্রুকণা (কাব্য) : ১২৯৪ সাল (ইং ১৮৮৭)।
৫ আভাষ (কাব্য) : ১২৯৭ সাল (৫-৪-১৮৯০)। পৃ ১৪১।
৬ সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য) : ১ কার্তিক ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ ১০৩।
৭ শিখা (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৮-৪-১৮৯৬)। পৃ ১৫৮।
৮ অর্ঘ্য (কাব্য) : ১৩০৯ সাল (১০-৯-১৯০২)। পৃ ৮২।
৯ স্বদেশিনী (কাব্য) : ১৩১২ সাল (২৫-২-১৯০৬)। পৃ ২৭।

১০ সিন্ধুগাথা (কাব্য) : ১৩১৪ সাল (৬-৫-১৯০৭)। পৃ ৮২।

১৯২৪ সনের ১৬ই আগস্ট গিরীন্দ্রমোহিনীর মৃত্যু হইয়াছে।

মানকুমারী বসু। ১৮৬৩ সনের ২৫এ জানুয়ারি যশোহর জেলায় শ্রীধরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে মানকুমারীর জন্ম হয়। ইনি মাইকেল মধুসূদনের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার পিতার নাম আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী। ১৮৭৩ সনে, দশ বৎসর বয়সে, বিদ্যানন্দকাটী গ্রামের বিবুধশংকর বসুর সহিত মানকুমারীর বিবাহ হয়। উনিশ বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই ইঁহার বৈধব্য ঘটে। বিধবা হইবার পর সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে মানকুমারীর মন বসিত না, ইনি শেষে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির তালিকা দিতেছি :

১ প্রিয়প্রসঙ্গ বা হারাণো প্রণয় (গদ্য-পদ্য) : ইং ১৮৮৪ (২৪ ডিসেম্বর)। পৃ ১৩০।
২ বনবাসিনী (উপন্যাস) : ভাদ্র ১২৯৫ (৫-৯-১৮৮৮)। পৃ ২৩।
৩ বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম (সন্দর্ভ) : (১৫-৭-১৮৯০)। পৃ ১২।
৪ দুইটি প্রবন্ধ : ১২৯৮ সাল (২২-১২-১৮৯১)। পৃ ৩২।
৫ কাব্যকুসুমাঞ্জলি (কাব্য) : ইং ১৮৯৩ (২ অক্টোবর)। পৃ ২৭১।
৬ শুভ সাধনা (গদ্য-পদ্য সংকলন) : ১৩০১ সাল।
৭ কনকাঞ্জলি (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৯-১০-১৮৯৬)। পৃ ২৬০।
৮ বীরকুমার-বধ কাব্য : ১৩১০ সাল (১০-৫-১৯০৪)। পৃ ২৩৫।
৯ বিভূতি (কাব্য) : চৈত্র ১৩৩০ (১২-৪-১৯২৪)। পৃ ৩১১+১।
১০ সোনার সাথী (কাব্য) : (২-৫-১৯২৭)। পৃ ৫০।
১১ পুরাতন ছবি (আখ্যায়িকা) : (২৫-৭-১৯৩৬)। পৃ ১৩১।

ছোট গল্প রচনায় মানকুমারী সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'কুন্তলীন-পুরস্কারে'র প্রথম (১৩০৩), তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে (১৩০৫-৬) তাঁহার গল্প স্থান পাইয়াছিল। ১৯৪৩ সনের ২৬এ ডিসেম্বর, ৮১ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কামিনী রায়। ১৮৬৪ সনের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে এক বৈদ্য-পরিবারে কামিনী দেবীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৬ সনে কামিনী বেথুন ফিমেল

স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সনে স্ট্যাটুটরি সিবিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯০৯ সনে তাঁহার বৈধব্য ঘটে।

কামিনী আট বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার 'আলো ও ছায়া' কাব্যখানি সাহিত্য-সমাজে তাঁহাকে স্থায়ী আসন দান করিয়াছিল। কামিনী রায়ের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :

১ আলো ও ছায়া (কাব্য) : ইং ১৮৮৯ (১ নবেম্বর)। পৃ. ১৬৮।
২ নির্মাল্য (কাব্য) : (১ এপ্রিল ১৮৯১)। পৃ. ৮০।
৩ পৌরাণিকী (কাব্য) : ১৮১৯ শক (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ৬০।
৪ গুঞ্জন (শিশুরাজ্যের কবিতা) : ১৩১১ সাল (১৫-৫-১৯০৫)। পৃ. ৬৬।
৫ ধর্ম্মপুত্র (গল্প) : ১৩১৪ সাল (১৫-৭-১৯০৭)। পৃ. ৪২।
৬ অশোক-স্মৃতি (জীবনী) : (২ জুন ১৯১৩)। পৃ. ৩২।
৭ শ্রাদ্ধিকী (জীবনী) : ইং ১৯১৩ (৪ জুন)। পৃ. ১০৩।
৮ মাল্য ও নির্ম্মাল্য (কাব্য) : ইং ১৯১৩ (২৫ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৬০।
৯ অশোক-সঙ্গীত (সনেটগুচ্ছ) : ইং ১৯১৪ (২৩ ডিসেম্বর)। পৃ. ৫৮।
১০ অম্বা (নাট্যকাব্য) : ইং ১৯১৫ (৮ এপ্রিল)। পৃ. ১০৪।
১১ সিতিমা (গদ্য নাটিকা) : ইং ১৯১৬ (১৭ এপ্রিল)। পৃ. ৬২।
১২ বালিকা শিক্ষার আদর্শ—অতীত ও বর্ত্তমান (নিবন্ধ) : (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ৩৫।
১৩ ঠাকুরমার চিঠি (কবিতা) : (১৭ মে ১৯২৪)। পৃ. ২৩।
১৪ দীপ ও ধূপ (কাব্য) : ইং ১৯২৯। পৃ. ১৭৬।
১৫ জীবনপথে (সনেটগুচ্ছ) : ইং ১৯৩০। পৃ. ৭০।

১৯৩৩ সনের ২৭এ সেপ্টেম্বর কামিনী রায়ের মৃত্যু হইয়াছে।

কুসুমকুমারী দেবী। ইনি বরিশালের অন্তর্গত লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরীর পত্নী, কবি দেবকুমার রায় চৌধুরীর জননী। কুসুমকুমারী স্বামীর নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া স্বীয় অবসরকাল মাতৃভাষার

সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; তিনি কোনো পুস্তকেই নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই :

১ স্নেহলতা (সামাজিক উপন্যাস) : ১১ মাঘ ১২৯৬ (২৭-২-১৮৯০)। পৃ ১৯২।(৬) "কোন মহিলা কর্ত্তৃক প্রণীত।"

২ প্রেমলতা (সামাজিক উপন্যাস) : ১১ আশ্বিন ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ ২৬৮।

৩ প্রসূনাঞ্জলি (সন্দর্ভাবলী) : ১৩০৭ সাল (৩০-৯-১৯০০)। পৃ ২৭+১৬।

৪ শান্তিলতা (উপন্যাস) : (২৭-৯-১৯০২)। পৃ ২৫৭।

৫ লুৎফ-উন্নিসা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) : ১৩১২ সাল (৩-৯-১৯০৫)। পৃ [illegible]।

কুসুমকুমারীর পুস্তকগুলি(৭) সুধীসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছিল। 'স্নেহলতা'-পাঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন :

"সমাজচরিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানা সুন্দর গ্রন্থ। স্বাধীন রাজ্য হইলে ইহার পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রেমলতা' পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"আমার বিবেচনায় গ্রন্থখানি যত দূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই। প্রত্যেক পরিবারে এক একখানা প্রেমলতা থাকা বাঞ্ছনীয়।"

১৩২২ সালের ভাদ্র মাসে কুসমুকুমারী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। (৮)

বিনয়কুমারী বসু (ধর)। ১৮৭২ সনের নবেম্বর মাসে বিনয়কুমারীর জন্ম। তাঁহার পিতা কাশীচন্দ্র বসু; মাতা ললিতমণি বসু, ব্যারিস্টার

৬ স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠায় 'স্নেহলতা' নামে একখানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছিলেন। কুসুমকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' বাহির হইলে স্বর্ণকুমারী তাঁহার উপন্যাসখানির নাম পরিবর্তন করিয়া 'পালিতা' রাখেন ('ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৭ দ্রষ্টব্য)।

৭ ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ১৮৭৮ সনে বরিশাল হইতে প্রকাশিত "কুসুমকুমারী"-রচিত 'কুমুদিকা' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য আছে। ইনি ও [illegible]মকুমারী দেবী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

৮ দ্রঃ 'ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩২২।

মনোমোহন ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদরা। ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ডাক্তার ভারতচন্দ্র ধরের সহিত বিনয়কুমারীর বিবাহ হয়; এই বৎসরের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'সাহিত্যে' ইঁহার নামের শেষে 'বসু' আছে, কিন্তু পৌষ-সংখ্যায় 'ধর' দেখিতেছি। তিনি বেথুন কলেজের এক জন প্রাক্তন ছাত্রী; বারো-তেরো বৎসর বয়স হইতেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১২৯৫ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' তাঁহার একটি প্রাথমিক রচনা—"জাগো (বালিকার রচনা)" স্থান পাইয়াছিল। বিনয়কুমারীর কবিতা 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'দাসী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে সাদরে স্থান লাভ করিত। আমরা তাঁহার দুইখানি কাব্যের উল্লেখ পাইয়াছি; উহা :

১ নব মুকুল (কাব্য) : (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭)। পৃ. ৯০।

২ নির্ঝর (কাব্য) : (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১)। পৃ. ১০২।

প্রমীলা বসু (নাগ)। ১৮৭১ সনে প্রমীলার জন্ম। তাঁহার পিতা বিজয়চন্দ্র বসু; মাতা লালমণি বসু, মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা সহোদরা। ইঁহার পিত্রালয় বিক্রমপুর। ১২৯৭ সালে বিলাত-ফেরত ডাক্তার গঙ্গাকান্ত নাগের সহিত প্রমীলার পরিণয় হয়।(৯) অতি অল্প বয়সেই ইঁহার কাব্য-প্রতিভা স্ফুরিত হয়। ১২৯৩ সাল হইতে ইঁহার রচিত কবিতা 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য' (১২৯৮-১৩০০, ১৩০৪-৫), 'প্রতিমা' প্রভৃতি সে যুগের শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রমীলার এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

১ প্রমীলা (কাব্য) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ. ১২৫।

২ তটিনী (কাব্য) : ইং ১৮৯২। পৃ. ১৪৮।

১৩০৩ সালে প্রমীলা অকালে পরলোকগমন করেন।(১০)

কৃষ্ণভাবিনী দাস। আনুমানিক ১৮৬৪ সনে বহরমপুরের অন্তর্গত কাজলা গ্রামে এক জমিদার-গৃহে কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে বউবাজার-নিবাসী শ্রীনাথ দাসের পুত্র—'সেণ্টুরী কলেজ'-প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি স্বামীর সহিত

৯ দ্র° "শুভদিনে"—'প্রতিমা' অগ্রহায়ণ ১২৯৭।

১০ দ্র° "প্রমীলা নাগ" কবিতা : শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—'সাহিত্য', পৌষ ১৩০৩।

বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার পর, তাঁহার লিখিত 'ইংরাজদের পর্ব্ব' ও 'বিলাতের গল্প' ১৮৯২ সনের 'সখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিদুষী মহিলার বহু সুলিখিত সন্দর্ভ 'ভারতী' (১২৯৬..), 'সাহিত্য' (১২৯৮..), 'প্রদীপ' (১৩০৪..), 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতির পুরাতন পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কৃষ্ণভাবিনী নারীকল্যাণ-কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তিনি ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বিলাত-ফেরত হইয়াও তিনি বৈধব্যাবস্থায় হিন্দু বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৯ সনের ২৭এ ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।(১১)

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা। ১৮৭০ সনে পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে অম্বুজাসুন্দরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর একজন উকীল ছিলেন। কবি রজনীকান্ত সেন এই গোবিন্দনাথেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। অম্বুজাসুন্দরীর বিবাহ হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কৈলাসগোবিন্দ দাসের সহিত। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার অন্তরে কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়; বিদ্যোৎসাহী স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা বিকশিত হয় ও তিনি বিদ্যাচর্চা করিবার সুযোগ লাভ করেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা,' 'সাহিত্য', 'নব্যভারত' প্রভৃতি মাসিকপত্রে ও 'কুন্তলীন-পুরস্কারে' অম্বুজাসুন্দরীর গদ্য-পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি এই :

১ কবিতালহরী : (১০-৯-১৮৯২)। পৃ. ২১।
২ অশ্রুমালা (কাব্য) : (১২-১০-১৮৯৪)। পৃ. ২৪।
৩ প্রীতি ও পূজা (কাব্য) : ১৩০৪ সাল (২-৯-১৮৯৭)। পৃ. ১৪১।
৪ খোকা (শোক-কবিতা) : সংবৎ ১৯৫৯ (২৫-৪-১৯০৩)। পৃ. ২১২।
৫ প্রভাতী (উপন্যাস) : ইং ১৯০৫ (১০ জুলাই)। পৃ. ৪৬।
৬ দুটি কথা (গল্প) : ১৩১২ সাল (৬-২-১৯০৬)। পৃ. ৬৯।
৭ ভাব ও ভক্তি (কাব্য) : ১৩১৩ সাল (২৫-১-১৯০৭)। পৃ. ১৬৮।
৮ গল্প : ১৩১৩ সাল (১৭-৪-১৯০৭)। পৃ. ১৭৭।
৯ প্রেম ও পুণ্য (কাব্য) : ১৩১৭ সাল (২০-৫-১৯১০)। পৃ. ১৮৩।

১১ দ্রঃ 'ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৩২৯।

ইহা ছাড়া তিনি ভাগবতের সারাংশ লইয়া 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' (ইং ১৯৩২) ও পরে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণকেলিরসালাপ' (১৩৪১), 'শ্রীশ্রীরামকীর্ত্তি সুধা', 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে অম্বুজাসুন্দরীর মৃত্যু হইয়াছে।

মৃণালিনী সেন। ১৮৭৯, ৩রা আগস্ট মৃণালিনী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ডাক্তার লাড্‌লিমোহন ঘোষ। ইনি ১৩ বৎসর বয়সে পাইকপাড়ার ভূম্যধিকারী ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সহিত পরিণীতা হন। বিবাহের দুই বৎসর পরে ইঁহার বৈধব্য ঘটে। স্বামি-বিয়োগ-বিধুর অবস্থায় মৃণালিনী কাব্য-চর্চায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা এই চারিখানি কাব্যগ্রন্থ লাভ করিয়াছি :

১ প্রতিধ্বনি (কাব্য) : ১৩০১ সাল (১০-৮-১৮৯৪)। পৃ ১৮৪।
২ নির্ঝরিণী (কাব্য) : ১৩০২ সাল (৭-৫-১৮৯৫)। পৃ ১৬৩।
৩ কল্লোলিনী (গীতিকাব্য) : ১৩০৩ সাল (ইং ১৮৯৬)। পৃ ২৩৭।
৪ মনোবীণা (কাব্য) : মাঘ ১৩০৬ (২৪-৪-১৯০০)। পৃ ২৫৯।

১৯০৫ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনের সহিত মৃণালিনীর বিবাহ হয়। ইনি স্বামীর সহিত বহু দিন বিলাতে কাটাইয়াছেন। নারীপ্রগতিমূলক বহু কার্যে ইঁহার নাম যুক্ত দেখা যায়।

সরোজকুমারী দেবী। ইনি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগিনী। ইঁহার জন্ম ৪ নবেম্বর ১৮৭৫ তারিখে। দশ বৎসর বয়সে (ইং ১৮৮৬) কলুটোলার সেন-বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ সেনের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়; যোগেন্দ্রনাথ সম্বলপুরের গভর্নমেণ্ট উকীল ছিলেন। সরোজকুমারী বিবাহের পর নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ১২৯৫ সাল হইতে তিনি 'ভারতী'তে ও ১২৯৭ সাল হইতে 'সাহিত্যে' লিখিতে শুরু করেন। তাঁহার রচিত এই কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান মিলিয়াছে :

১ হাসি ও অশ্রু (কাব্য) : মাঘ ১৩০১ (ইং ১৮৯৫)। পৃ ২৯৫।
২ অশোকা (কাব্য) : ১৩০৮ সাল (৬-৭-১৯০১)। পৃ ২৭৪।
৩ কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প : ১৩১২ সাল (৩০-১১-১৯০৫)। পৃ ৩১৬।
৪ শতদল (কাব্য) : (২৬-৯-১৯১০)। পৃ ১০২।

৫ অদৃষ্ট-লিপি (গল্প) : (২২-৩-১৯১৫)। পৃ. ১৭৭।

৬ ফুলদানি (গল্প) : (৮-১০-১৯১৫)। পৃ. ১৫৫।

১৯২৬ সনে সরোজকুমারীর মৃত্যু হইয়াছে।(১২)

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (সরস্বতী)। ১৮৭৮ সনে নগেন্দ্রবালার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নৃত্যগোপাল সরকার। দশ বৎসর বয়সে তিনি হুগলি জেলার সুখড়িয়া গ্রাম-নিবাসী খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফীর সহিত বিবাহিত হন। খগেন্দ্রনাথ সাব-রেজিষ্ট্রার ছিলেন। বিবাহের পর হইতে নগেন্দ্রবালা কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার রচিত এইসকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :

১ মর্ম্মগাথা (কাব্য) : ১৩০৩ সাল (২৫-৯-১৮৯৬)। পৃ. ১৭০।

২ প্রেম-গাথা (কাব্য) : অগ্রহায়ণ ১৩০৫ (১০-১২-১৮৯৮)। পৃ. ১৫৫।

৩ নারীধর্ম্ম (সন্দর্ভ) : (৪-১২-১৯০০)। পৃ. ১০৮।

৪ অমিয়গাথা (কাব্য) : ১৩০৮ সাল (২৫-৩-১৯০২)। পৃ. ২১০।

৫ ব্রজগাথা (কাব্য) : (২০-১২-১৯০২)। পৃ. ২৫০।

৬ ধবলেশ্বর (কাব্য) : (১৭-৩-১৯০৩)। পৃ. ২২।

৭ গার্হস্থ্যধর্ম্ম (সন্দর্ভ) : (১২-১২-১৯০৪)। পৃ. ১২৮।

৮ বসন্ত গাথা (কাব্য) : (২৩-১-১৯০৫)। পৃ. ৩১।

৯ কণা (কাব্য) : ১৩১২ সাল (১৬-৬-১৯০৫)। পৃ. ৬০।

১০ কুসুম গাথা (কাব্য) : ১৩১২ সাল (১২-১২-১৯০৫)। পৃ. ৯০।

১১ সতী (সামাজিক উপন্যাস) : ১৩১৩ সাল (২-৮-১৯০৬)। পৃ. ৭৮।

১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসে অকালে নগেন্দ্রবালার মৃত্যু হইয়াছে।(১৩)

হিরন্ময়ী দেবী। ইনি স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র 'সখা'য় (ডিসেম্বর ১৮৮৩) প্রকাশিত 'ভাইবোনের দোলনা' কবিতাটিই বোধ হয় ইঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। ১২৯১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতী' ও ১২৯২ সালের 'বালকে'ও ইঁহার কয়েকটি প্রাথমিক রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় হিরন্ময়ীর বহু গদ্য-পদ্য রচনার সন্ধান মিলিবে। পুস্তকাকারে তিনি কোনো কিছুই রাখিয়া

১২ দ্র° 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

১৩ দ্র° 'জাহ্নবী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।



প্রসন্নময়ী দেবী



প্রিয়ম্বদা দেবী



হিরণ্ময়ী দেবী



শরৎকুমারী চৌধুরাণী



রাসসুন্দরী দেবী



সরলাবালা দাসী



বিনয়কুমারী ধর



প্রমীলা নাগ

যান নাই। ইনিও অন্যতর সম্পাদিকারূপে তিন বৎসর 'ভারতী' পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৫ সনের ১৩ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সরলা দেবী। ইনি স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা; জন্ম ১৮৭২ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর। ১৮৯০ সনে ইনি বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ সনে পঞ্জাবের আর্যসমাজ-নেতা পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ১৯২৩ সনের ৬ই আগস্ট রামভজের মৃত্যু হয়।

জীবনের দীর্ঘকাল দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিলেও সরলা দেবী মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে শৈশবাবধি সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বালকে' তাঁহার লিখিত প্রথম রচনা—'দুর্ভিক্ষ (বালিকার রচনা)' প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সনের নবেম্বর-সংখ্যা 'সখা'য় তাঁহার পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা 'পিতামাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য' স্থানলাভ করে; রচনার শেষে লেখিকার বয়স '১২ বৎসর ১১ মাস' দেওয়া আছে। ১২৯৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া সরলা দেবী 'ভারতী'তে বহু গদ্য-পদ্য রচনা ও স্বরলিপি প্রকাশ করিয়াছেন; ১৩০০ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' তাঁহার কৃত 'বন্দে মাতরং' গানের স্বরলিপি স্থান পাইয়াছে। তিনি অনেক কাল 'ভারতী'ও সম্পাদন করিয়াছেন। একদা তাঁহার রচনা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাও অর্জন করিয়াছিল। সরলা দেবী তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :

"'ভারতী'তে আমার আঠার উনিশ বৎসরের লেখা 'রতিবিলাপ' ['ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৯] ও 'মালবিকা-অগ্নিমিত্র' ['ভারতী ও বালক,' পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র ১২৯৮] পড়ে' তাঁর লেখা চিঠি। সে চিঠি সাহিত্য দায়রায় দণ্ডায়মান একজন নবীনের উপর তাঁর রায়—বা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে আদর করে নেওয়া। যদিও রবিমামার চিঠিতে তাঁরও appreciation ব্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও সেদিন সাহিত্যসম্রাট্ ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বঙ্কিমের রায়ে নিজেকে বেশি চরিতার্থ মনে করলুম।..শ্রীশ মজুমদার প্রভৃতি বন্ধুদের কাছে বঙ্কিম আমার লেখাগুলি সম্বন্ধে না কি নিজের সবিস্ময় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—তা তাঁদের লিখিত বঙ্কিমের জীবন-প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বঙ্কিমের লিপি আর অন্যের লিপিতে অনেক তফাৎ। বঙ্কিমের লিপিখানি ছিল পুরো বঙ্কিমী ঠাটের সাহিত্যের একখানি হীরের কুচি। বিদূষক সম্বন্ধে আমার মন্তব্যের

সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি। তার উল্লেখ করে "গরীব বিদূষকের" পক্ষ নিয়ে তাঁর সরস লেখনী দুই এক ছত্রে কি হাস্যের ছটাই তুলেছিল। তাই বলছি তাঁর চিঠিখানি ছিল একটি সাহিত্যিক ক্ষুদ্র রসকুম্ভ।"

সরলা দেবীর বাংলা পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা খুবই কম। তিনি নিজেই জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :

"আজ পর্যন্ত আমার সব লেখাই প্রায় 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই নিবন্ধ এবং গানগুলি আমার খাতায় বা গায়কদের মুখে মুখে। আমার লেখা-কুমারীরা মাসিকে সাপ্তাহিকে দৈনিকে ছাপাসুন্দরী হয়েছে কিন্তু গ্রন্থের ঘরণী হয় নি—মাত্র গুরুদাস চাটুয্যে কোম্পানীর আট আনার এডিশনে ছাপান 'নববর্ষের স্বপ্ন' নামে কতকগুলি ছোট গল্প, বড় বড় সভাসমিতিতে ভাষিত ইংরেজি ও বাঙ্গলা বক্তৃতা, 'বঙ্গের বীর' সিরিজের দুখানি পুস্তিকা ও ইদানীংকার দুয়েকটি আধ্যাত্মিক বিষয়ের বই ছাড়া। লাহোর থেকে দুএকবার আগেকার লেখাগুলি বই আকারে ছাপাবার চেষ্টা করে ব্যর্থশ্রম হয়েছি। 'কবিমন্দির' প্রভৃতি দুতিন ফর্মা ছেপে, প্রেসওয়ালাদের পকেটে টাকা ভরে' রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেছে।"

আমরা সরলা দেবীর লিখিত এই কয়খানি পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাইয়াছি :

১ শতগান (স্বরলিপি সহ) : বৈশাখ ১৩০৭ (ইং ১৯০০)। পৃ. ২১৬।

২ বাঙ্গালীর পিতৃধন : (২৬-৫-১৯০৩)। পৃ. ৯।

৩ ভারতস্ত্রী-মহামণ্ডল : (৭-৩-১৯১১)। পৃ. ২৪।

৪ নব-বর্ষের স্বপ্ন (গল্প) : শ্রাবণ ১৩২৫ (১৫-৭-১৯১৮)। পৃ. ১৫২।

৫ কালীপূজার বলিদান ও বর্ত্তমানে তাহার উপযোগিতা (২-২-১৯২৬)। পৃ. ২১।

৬ শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রিপূজা (ইং ১৯৪১)।

৭ বেদবাণী (আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার উপদেশাবলী 'সরলা দেবী কর্ত্তৃক লিখিত) : ১ম খণ্ড (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)—১১শ খণ্ড (পৌষ ১৩৫৭) ইং ১৯৪৭-৫০।

১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তারিখে, ৭৩ বৎসর বয়সে, সরলা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (১১-১১-১৯৪৪—৯-৬-১৯৪৫) 'জীবনের ঝরা পাতা' নামে জীবনস্মৃতি বিবৃত করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার লিখিত 'আমার বাল্যজীবনী'

('ভারতী,' বৈশাখ ১৩১২) ও 'রবীন্দ্রনাথ' ('ভারতবর্ষ,' কার্তিক ১৩৪৬) প্রবন্ধ দুইটি পঠিতব্য।

প্রিয়ম্বদা দেবী। ইনি প্রসন্নময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান। ১৮৭১ সনে পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯২ সনে প্রিয়ম্বদা বেথুন কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই মধ্যপ্রদেশের ব্যবহারাজীব তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর যাইতে-না-যাইতেই তাঁহার বৈধব্য (১৬-৯-১৮৯৫) ঘটে।

শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার অনুরাগ ছিল। ১২৯২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'ফুল' নামে একটি ক্ষুদ্র সন্দর্ভই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পর-বৎসর 'ভারতী ও বালকে' (কার্তিক ১২৯৩) তাঁহার একটি 'গান' "বালিকার রচনা" হিসাবে মুদ্রিত হয়। ১৩০৫ সাল হইতে 'ভারতী'তে তাঁহার গদ্য-পদ্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুকবি হিসাবে প্রিয়ম্বদা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী :

১ রেণু (কাব্য) : (১-৯-১৯০০)। পৃ. ৬৯।
২ তারা (শোক-কবিতা) : (১৮-১১-১৯০৭)। পৃ. ৩৪।
৩ পত্রলেখা (কাব্য) : (১০-১-১৯১১)। পৃ. ১৫৮।
৪ ঝিলে জঙ্গলে শিকার (অনূদিত) : (১৫-৯-১৯২৪)। পৃ. ৯৮।
৫ অংশু (কাব্য) : শ্রাবণ ১৩৩৪ (ইং ১৯২৭)। পৃ. ১২৫।
৬ চম্পা ও পাটল (কাব্য) : (ইং ১৯৩৯)। পৃ. ৩৮।

ইহা ছাড়া তিনি তিনখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—'অনাথ' (১৮-২-১৯১৫), 'কথা ও উপকথা' ও 'পঞ্চুলাল' (ইং ১৯২৩) রচনা করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রিয়ম্বদার মৃত্যু হইয়াছে।(১৪)

সরলাবালা দাসী। বাংলায় যে-কয়খানি সুপরিচিত শোক-কাব্য আছে, তাহার মধ্যে সরলাবালা দাসীর 'প্রবাহ' অন্যতম। তিনি কিশোরীলাল সরকারের কন্যা, ডাক্তার সরসীলাল সরকারের ভগিনী। ১২৮২ সালের ২৫এ অগ্রহায়ণ তাঁহার জন্ম, এবং ১২৯৪ সালে রায়-বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের

১৪ দ্রং 'ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪১।

পুত্র শরচ্চন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। ১৩০৫ সালের কার্তিক মাসে তাঁহার বৈধব্য ঘটে।

তরুণ বয়স হইতেই সরলাবালার কাব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত 'লজ্জাবতী' নামে কবিতাটিই বোধ হয় তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। 'সাহিত্য,' 'প্রদীপ' প্রভৃতি বহু সাময়িক-পত্রিকাতে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ছোট গল্প রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব কম নহে; তাঁহার প্রথম গল্প 'ঘরের লক্ষ্মী' তৃতীয় বর্ষের 'সাহিত্যে' (কার্তিক ১২৯৯) মুদ্রিত হয়। 'উৎসাহ,' 'জাহ্নবী,' 'উদ্বোধন' প্রভৃতির পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে সরলাবালার বহু গদ্য-পদ্য রচনার সন্ধান মিলিবে। তিনি যে কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তালিকা :

১ প্রবাহ (শোককাব্য) : ১৩১১ সাল (৮-১০-১৯০৪)। পৃ. ২৫৩।
২ চিত্রপট (গল্প) : (১৫-১-১৯১৭)। পৃ. ২০৪।
৩ নিবেদিতা (জীবনী) : জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ (১০-৬-১৯১২)। পৃ. ৫৩।
৪ কুমুদনাথ (জীবনী) : ১৩৪৪ সাল (১-৩-১৯৩৮)। পৃ. ১৫৩।

লজ্জাবতী বসু। ইনি স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। ইঁহার বহু কবিতা 'সাহিত্য' (১৩০০..), 'প্রদীপ,' 'নব্যভারত,' 'প্রবাসী' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজকে আনন্দ দান করিয়াছে। ইনি আজীবন কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া ১৯৪২ সনের ২১এ আগস্ট, বাহাত্তর বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

লাবণ্যপ্রভা বসু (সরকার)। ইনি সার্ জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী; ১৯০৭ সনে হেমচন্দ্র সরকার, ডি. ডি.র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লাবণ্যপ্রভা বিদুষী মহিলা ছিলেন। দৈনিক ধর্ম সাধনের সাহায্যার্থ লিপির আকারে সংকলিত তাঁহার 'দৈনিক' গ্রন্থখানি (প্রথমার্ধ ১৮৯৯, উত্তরার্ধ ১৯০১) বহু ক্ষুধিত আত্মার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি 'নীতি-কথা', 'গৃহের কথা,' 'পরিণয়,' 'কবি ও কাব্যের কথা,' 'পৌরাণিক কাহিনী' (১ম



সরোজকুমারী দেবী



অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা



লাবণ্যপ্রভা সরকার



সারদাসুন্দরী দেবী



মৃণালিনী সেন



লজ্জাবতী বসু



কৃষ্ণভাবিনী দাস

খণ্ড, মহাভারত; ২য় খণ্ড রামায়ণ), 'শ্রদ্ধায় স্মরণ' (১৩১৯) প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িত্রী। তিনি সুপরিচিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'মুকুলে'র শেষ তিন বৎসর সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ইঁহার রচিত 'আমিষ ও নিরামিষ আহার' (ইং ১৯০০..) সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নহে।

সারদাসুন্দরী দেবী। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জননী; জন্ম ১৮১৯ সনে। ১৮৯২ ও ১৯০০ সনে ইঁহার বিবৃত আত্মকথা যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ১৯১৪ সনের জানুয়ারি মাসে 'কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

পঙ্কজিনী বসু। ১৮৮৪ সনে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগর গ্রামে পঙ্কজিনীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তফী। তেরো বৎসর বয়সে বজ্রযোগিনী গ্রামে কুমুদবন্ধু বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুবোধ বসুর সহিত পঙ্কজিনীর বিবাহ হয়। সতের বৎসর পূর্ণ হইতে-না-হইতেই ২ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সকল কবিতাই বিবাহের পরে রচিত। ১৯০১ সনে 'হেলেনা' কাব্যের লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র স্বীয় ভূমিকা সহ 'স্মৃতি-কণা' নামে পঙ্কজিনীর কবিতাগুলি প্রকাশ করেন। পনর বৎসর পরে ১৯১৬ সনে ইহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়; এই সংস্করণে খ্যাতনামা পণ্ডিত হরিনাথ দে কর্তৃক 'সূর্যমুখী' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদও স্থান পাইয়াছে।

অন্নদাসুন্দরী ঘোষ। ১৮৭৩ সনের ৩১এ ডিসেম্বর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী রামচন্দ্রপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত গুহ-পরিবারে অন্নদাসুন্দরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মোহনচন্দ্র গুহ। বারো বৎসর বয়সে নিকটবর্তী গাভা গ্রামের ক্ষেত্রনাথ ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (২৭ মে ১৮৮৬)। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র—রংপুর কারমাইকেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ। অন্নদাসুন্দরী উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বহু কবিতা 'দাসী,' 'বামাবোধিনী পত্রিকা,'

'অন্তঃপুর', 'নব্যভারত' প্রভৃতিতে সাদরে স্থান লাভ করিয়াছিল। বরিশালের 'ব্রহ্মবাদী' নামক মাসিকপত্রেও তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নদাসুন্দরীর লিখিত কবিতাগুলি পুত্র দেবপ্রসাদ ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে 'কবিতাবলী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্বে—১৩৫৭, ৪ঠা শ্রাবণ—অন্নদাসুন্দরী পরলোকগমন করিয়াছেন।

এই ক্রমোন্নতির জের আজও পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বঙ্গসাহিত্যে মহিলার দানের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, কাব্য ও কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কেহ কেহ স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। যিনি বর্তমান কাল পর্যন্ত এই ইতিহাসের জের টানিবেন, সাহিত্যে বঙ্গমহিলার দীর্ঘতর তালিকা তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে হইবে; কারণ, স্বভাবতই জীবনের নানা ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্রেও নারীদের অভিযান ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী এবং সাময়িক-পত্রের লেখিকা হিসাবে এই শতাব্দীর গোড়া হইতে—

অনিন্দিতা দেবী, অনুরূপা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা দেবী, আশালতা সিংহ, ইন্দিরা দেবী (চৌধুরাণী), ইন্দিরা দেবী (বন্দ্যোপাধ্যায়), উমা দেবী (গুপ্ত), উমা রায়, ঊর্মিলা দেবী, কুমুদিনী মিত্র (বসু), গিরিবালা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জ্যোতির্মালা দেবী, তুষার দেবী, দুর্গাবতী ঘোষ, নিরুপমা দেবী, নিরুপমা দেবী (সেন), নিস্তারিণী দেবী, পারুল দেবী, পূর্ণশশী দেবী, প্রতিভা বসু, প্রতিমা দেবী (ঠাকুর), প্রফুল্লময়ী দেবী (ঠাকুর), প্রভাবতী দেবী, ফুলকুমারী গুপ্ত, বাণী গুপ্তা, বাণী রায়, বিনোদিনী দাসী, বিমলা দাশগুপ্তা, বীণা দাস (ভৌমিক), মিসেস আর.এস.হোসেন, মৈত্রেয়ী দেবী, রক্তমালা দেবী, রমা চৌধুরী, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী, রাণী চন্দ, রাধারাণী দেবী (অপরাজিতা দেবী), লীলা দেবী (চৌধুরী), শরৎকুমারী দেবী, শান্তা দেবী, শান্তিসুধা ঘোষ, শৈলবালা ঘোষজায়া, সরযূবালা দাসগুপ্তা, সীতা দেবী, সুখলতা রাও, সুরমাসুন্দরী ঘোষ, সুরুচিবালা সেনগুপ্তা, স্নেহলতা সেন, হাসিরাশি দেবী, হেমন্তবালা দেবী, হেমলতা দেবী, হেমলতা সরকার

প্রমুখ লেখিকাদের নামের সহিত পাঠকেরা পরিচিত হইতেছেন এবং প্রতিদিন আরও নূতন নাম তালিকায় ভুক্ত হইতেছে। ইঁহাদের অনেকেই ক্ষমতাশালী লেখিকা এবং ব্যাপকতর আলোচনার দাবী রাখেন।

বিষয়-সূচী

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৭ ॥

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী

৭৯. ভারত ও মধ্য এশিয়া

৮০. ভারত ও ইন্দোচীন

৮১. ভারত ও চীন

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৮২. বৈদিক দেবতা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৩. বঙ্গসাহিত্যে নারী

৮৪. সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৮৫. বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৬. গণিতের রাজ্য

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ হইতে ১৩৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৭ ফাল্গুন

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৩·১

কেবলমাত্র গ্রন্থ-রচনাতেই নয়, সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও বঙ্গমহিলারা ধীরে ধীরে কম কৃতিত্ব অর্জন করেন নাই। বেথ্‌ন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে দেশে সর্বত্র ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষা প্রসার পাইতে থাকে। মহিলাকুলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদের রচনাবলী প্রকাশের জন্যও বটে, স্ত্রীপাঠ্য-বিষয়-সম্বলিত পত্র-পত্রিকাও ক্রমশ দেখা দিতে লাগিল। এগ্‌লির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার-সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' (আগস্ট ১৮৫৪), মজিলপ্‌রনিবাসী উমেশচন্দ্র দত্তের মাসিক 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (আগস্ট ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত পাক্ষিক 'অবলা-বান্ধব' (২২ মে ১৮৬৯) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।(১) অন্তঃপ্‌রবাসিনীদের জ্ঞানার্জনস্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল; ক্রমশ তাঁহারা নিজেদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠিলেন। এ বিষয়ে আন্দোলনের ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন; দেশে মহিলা-সম্পাদিত সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হইল।

আমরা গত শতাব্দীর মহিলা-পরিচালিত যেসকল বাংলা পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাইয়াছি, অগ্রে সেগ্‌লির কথা আলোচনা করিব।

বঙ্গমহিলা। মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র—'বঙ্গমহিলা' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র, খিদিরপ্‌র-নিবাসিনী জনৈক মহিলার সম্পাদনায় ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭০) প্রকাশিত হয়। শ্‌নিয়াছি, ইনি ডবলিউ. সি. বোনার্জীর ভগিনী মোক্ষদায়িনী ম্‌খোপাধ্যায়। 'বঙ্গমহিলা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক) লেখেন :

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। একটি হিন্দ্‌ স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে ম্‌দ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি

---

১ এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি সাময়িকপত্র : রেঃ এস. সি. ঘোষ-সম্পাদিত 'জ্যোতিরিঙ্গণ' (মাসিক), জ্‌লাই ১৮৬৯। ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'নারী-শিক্ষা পত্রিকা' (মাসিক), অক্টোবর ১৮৭০। বরিশাল হইতে প্রকাশিত 'বালারঞ্জিকা' (সাপ্তাহিক), এপ্রিল ১৮৭৩। 'হেমলতা' (পাক্ষিক), অক্টোবর ১৮৭৩। ডাঃ ভুবনমোহন সরকার-সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা' (মাসিক), এপ্রিল ১৮৭৫। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজ্‌মদার-সম্পাদিত 'পরিচারিকা' (মাসিক), মে ১৮৭৮।

বঙ্গদেশের সকল শ্রেণী স্ত্রীলোকদিগের মুখস্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এ দেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল। আমরা হৃদয়ের সহিত ইহার পোষকতা করিতেছি এবং আশা করি যে, কয়েক সংখ্যা পত্রিকাতে যেমন স্ত্রীজনোচিত শান্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে, চিরকালই সেইরূপ দেখিতে পাইব। সম্পাদিকা যদি অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে ব্যগ্র না হইয়া আমাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝিয়া ও সমুচিত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া প্রস্তাব সকল প্রকটিত করেন, এখানি ভদ্রসমাজে অত্যন্ত আদরণীয় হইবে।"

রচনার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম সংখ্যা 'বঙ্গমহিলা'য় প্রকাশিত 'স্বাধীনতা' নামে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিতেছি :

"প্রকৃত স্বাধীনতা কি? বোধ করি, এ কথা নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে বুঝেন না, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকেন। বঙ্গমহিলারা যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, কিন্তু কেহ কেহ তাহা পরাধীনতা জ্ঞান করিয়া স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত বলিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিতে পারি না। ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে এদেশীয় কতকগুলিন লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্ত্রীজাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোকে মনে করিলেই যে ঘোড়া চড়িয়া উড়িয়া যায়, ইচ্ছামতে পরপুরুষের সহিত হাস্যকৌতুক অথবা নৃত্যাদি করে, লজ্জাহীনার ন্যায় পুরুষদের সঙ্গে গান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরিয়া যথাতথা বেড়াইয়া বেড়ায়, এমন স্ত্রীলোকদিগকে কি বলা যায়? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহস কুলায় না। নম্রতা এবং লজ্জা-শীলতাই স্ত্রীলোকদের প্রধান গুণ। যে সকল স্ত্রী লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক নম্রতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বীরবেশে দেশ বিদেশে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে তাহারা কি স্ত্রী? না বীর? নারীজাতির এই সকল কার্য্য কি ভদ্রোচিত? না সভ্যোচিত? অথবা তা স্বাধীনতার ফল? এরূপ স্বাধীনতা যে বঙ্গস্ত্রীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান রমণীগণই তাহার প্রমাণস্থান। তাঁহারা ইউরোপীয় কামিনী-দের ন্যায় স্বাধীনতা লাভে লোলুপ হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণে এ পর্য্যন্তও সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা ও সলজ্জভাব অবলোকন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যেন তাঁহারা উক্তরূপ স্বাধীনতালাভার্থে স্ব স্ব প্রকৃতির উপরে বল প্রকাশ করিতেছেন।

"ঐরূপ স্বেচ্ছাচারিতারূপ স্বাধীনতায় বঙ্গমহিলাদের কাজ নাই। তাঁহাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কে বলে যে বঙ্গমহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ আছে? তাঁহারা কি আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না? আত্মীয়স্বজনের বাটীতে কি গমনাগমন করিতে পারেন না? তাঁহাদের মন কি স্বাধীন নহে? তবে তাঁহারা পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

"বঙ্গমহিলাদের অনেক অভাব আছে, একথা আমরা পূর্ব্বাবধিই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আর সেই সকল অভাব যে ক্রমে ক্রমে মোচন হইবে এক্ষণে তাহার আকার-প্রকারও দেখিতেছি। শিক্ষাভাব এদেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু অধুনা বঙ্গাঙ্গনাগণের জন্যে সেই শিক্ষার দ্বার মুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান পোষাক পরিবর্ত্ত হউক, উচ্চতর শিক্ষা লাভ হউক, তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য, ভদ্র ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী জগতের আর কোথায়ও নাই। (সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অনেক স্থলে ভারতীয় নারীজাতিকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।) তখনই দেখিব যে বঙ্গস্ত্রী রত্নবিশেষ

অনাথিনী। ইহাই মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা; (২) সম্পাদিকা—থাকমণি দেবী; প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫)। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ শ্রাবণ ১২৮২) লিখিয়াছিলেন :

"অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা)—শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িকপত্র এ দেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনল্প আহ্লাদের কারণ হইবে।"

২ 'অনাথিনী' প্রকাশিত হইবার তিন মাস পূর্বে নসীপুর হইতে ভুবন-মোহিনী দেবী-সম্পাদিত 'বিনোদিনী' প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব দিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে "ভুবনমোহিনী দেবী"—এই নামের আড়ালে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইহাকে মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বলা উচিত হইবে না।

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা সাব-রেজিস্টার অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্মস্থল ধূলিয়ান হইতে 'অনাথিনী' প্রকাশ করেন। থাকমণি দেবী সম্ভবত তাঁহার কন্যা হইবেন। 'বান্ধব' (ভাদ্র ১২৮২) লিখিয়াছিলেন :

"শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা।"

হিন্দুললনা। বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। এই পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৪ সালের মাঘ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) মাসে বারাকপুরের নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দুললনা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (১৮ ফাল্গুন) লিখিয়াছিলেন :

"হিন্দুললনা—এতন্নাম্নী একখানি পত্রিকার ১ম কান্ড ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিন্দুললনা কর্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় লিখিয়াছেন : 'বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশ-হিতৈষিণী তথা বঙ্গবাসিনীগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী একটি হিন্দুমহিলা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিতা হয়। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক দ্বারা সংবাদপত্র প্রচারের সূত্রপাত তিনিই করিয়া দেন। আমরা তাঁহারে সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিলেও তাঁহার পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা করি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৯।১০ মাস চলিয়া বন্ধ হইলে পর..।' হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।..বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।"

ভারতী। 'ভারতী'র নাম সাহিত্য-সংসারে সুবিদিত। ইহা ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৭৭) মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী—সকলেই সম্পাদকীয় চক্রের মধ্যে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৯০ সাল পর্যন্ত, সাত বৎসর, সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের পত্নী সাহিত্যানুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর অপমৃত্যুর (৮ বৈশাখ ১২৯১) সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র সেবকেরা উহার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঘোষণা করেন—

"ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।"

কবি অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথার্থই লিখিয়াছেন :

"ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারে গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল,—ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।"

অতঃপর 'ভারতী'র লালন-পালনের ভার প্রধানত স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার দুই কন্যার হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের কার্যকাল এইরূপ—

৮ম-৯ম বর্ষ :	১২৯১-১২৯২ সাল	'ভারতী'	স্বর্ণকুমারী দেবী
১০ম-১৬শ বর্ষ	১২৯৩-১২৯৯ সাল	'ভারতী' ও বালক'	ঐ
১৭শ-১৮শ বর্ষ	১৩০০-১৩০১ সাল	'ভারতী'	ঐ
১৯শ-২১শ বর্ষ	১৩০২-১৩০৪ সাল	'ভারতী'	হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী
২৩শ-৩১শ বর্ষ	১৩০৬-১৩১৪ সাল	'ভারতী'	সরলা দেবী
৩২শ-৩৮শ বর্ষ	১৩১৫-১৩২১ সাল	'ভারতী'	স্বর্ণকুমারী দেবী
৪৮শ-৫০শ বর্ষ	১৩৩১ বৈশাখ- ১৩৩৩ আশ্বিন	'ভারতী'	সরলা দেবী

'ভারতী'র খ্যাতি ও গৌরবের কৃতিত্ব প্রধানত রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ াথ সত্যেন্দ্রনাথের হইলেও সম্পাদিকাদের হস্তে ইহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সম্পাদিকাগণের বহু সুলিখিত রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলংকৃত করিয়াছিল।

পরিচারিকা। ১২৮৫ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (৮ মে ১৮৭৮) এই নামের একখানি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কেশবচন্দ্রের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বৎসর পরে 'পরিচারিকা'র পালনের ভার পড়ে আর্যনারীসমাজের উপর; এই সমাজের পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী পত্রিকাখানির সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' ২৯ জুলাই ১৮৮৭ (১৪ শ্রাবণ ১২৯৪) তারিখে যে মন্তব্য করেন তাহা উদ্ধারযোগ্য :

"আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, 'পরিচারিকা' কাগজখানি পুনরায় বামাগণের পরিচর্য্যায় বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় যিনি ইহার অধিকাংশ

লেখা লিখিতেন তিনি এক্ষণে সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত দুই বারের নমুনা যাহা দেখা গেল তাহা আশাজনক। স্ত্রীলোকের পত্রিকা স্ত্রীলোক দ্বারা প্রচারিত হয় ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? বামাকুল-হিতৈষী মহাশয়েরা এরূপ সুরুচিসম্পন্ন জাতীয় স্বভাবের পক্ষপাতী আর্য্যগুণ-বিশিষ্ট পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।"

মোহিনী দেবীর মৃত্যুর (৬ মে ১৮৯৪) পর ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী (৩) কিছু দিন 'পরিচারিকা' পরিচালন করিয়াছিলেন।

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কুচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবী সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা'র নব পর্যায় প্রকাশ করেন; ইহার প্রথম সংখ্যায় 'পূর্ব-কথা'র উল্লেখ আছে, উহা এইরূপ :

"নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিচারিকার প্রথম প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার প্রবর্তক এবং তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।..

"কিছু কাল পরে ইহা আর্য্যনারীসমাজের মুখ্য পত্রিকারূপে বাহির হয়। তখন ইহার সম্পাদনের ভার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবীর উপর পড়ে। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন; কর্ম্মের বোঝা নামাইয়া সংসারের নিকট যখন তিনি ছুটি লইলেন, তাঁহার অতি সাধের পরিচারিকাও তখন কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় কিছু কাল ভাসিয়া বেড়াইয়া কাল-সাগরে ডুবিয়া গেল।

"প্রথম বারের পালা শেষ হইবার পরে আর্যনারীসমাজের চেষ্টায় পরিচারিকার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। শেষে ইহার পরিচালনার ভার আর্য্যনারীসমাজের তরফ হইতে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবীর উপর অর্পিত হয়। তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর নানা কারণে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তখন পত্রিকার ভার তদীয়া চতুর্থ সহোদরা শ্রীমতী মণিকা দেবী গ্রহণ করেন। অষ্টাবিংশতি বর্ষ জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নানা কারণে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।"

৩ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় সুচারু সেন-সম্পাদিত 'পরিচারিকা'র "২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা"র প্রকাশকাল—৩০ এপ্রিল ১৮৯৬ (বৈশাখ ১৩০৩) পাওয়া যাইতেছে।



স্বর্ণকুমারী দেবী



হিরণ্ময়ী দেবী সরলা দেবী



ইন্দিরা দেবী



প্রতিভা দেবী



মোহিনী দেবী



প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী



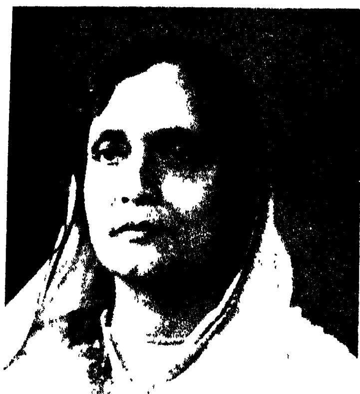
হেমলতা দেবী



জ্ঞানদানন্দিনী দেবী



গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী



কুমুদিনী বসু



নিরুপমা দেবী



বনলতা দেবী

খৃষ্টীয় মহিলা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৮৭ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৮১) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কুমারী কামিনী শীল। ইহাতে মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন :

"খৃষ্টীয় মহিলা—মাসিকপত্র—কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লেখেন, প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা। এক একটী পদ্য প্রবন্ধ অতি সুন্দর লেখা হয়।"

বঙ্গবাসিনী। ইহাই বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ১৮৮৩ সনের শেষ ভাগে কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। ১২ আশ্বিন ১২৯০ (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩) তারিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' 'বঙ্গবাসিনী'র এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :

"বঙ্গবাসিনী। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা।—ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ১৷৷৹ টাকা, মফস্বলে ২।৹। আকার দুই ফরমা, ডিমাই এক শিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগজ! প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত হইবে, নগদ মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

"লেখিকাগণ।—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, নিস্তারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণকামিনী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অনুপমা দেবী, কুসুমকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদমুখী দেবী, তরঙ্গিণী ঘোষ।

"এই সকল বঙ্গমহিলাগণ কর্ত্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আগামী আশ্বিন [কার্ত্তিক ?] মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাল ভাল সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করা হইবে।...বঙ্গবাসিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অশিক্ষিত লোক শিক্ষার প্রধান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন সুশিক্ষিতা রমণী লিখিবেন, নানা কারণ বশতঃ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না।..শ্রীগিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষ। বঙ্গবাসিনী কার্য্যাধ্যক্ষ। কলিকাতা নর্থ সুবার্বণ টালা, ২ নং বঙ্গবাসিনী কার্য্যালয়।

পরবর্তী ১৫ই অগ্রহায়ণ (৩০ নবেম্বর) তারিখে 'বঙ্গবাসিনী'র ১ম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' এইরূপ লেখেন :

"বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক পত্রিকা, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বঙ্গবাসিনীগণের হিতোদ্দেশ্যে সম্পাদিত। কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহার ভাষাদিগত কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই উত্তম হইয়াছে।"

সোহাগিনী। মাসিক পত্রিকা, প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল ১৮৮৪)। কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে 'সোহাগিনী' সম্পাদন করিতেন। ইহা ১ নং গরানহাটা স্ট্রীট হইতে হৃদয়লাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত।

বালক। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :

"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"

এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'বালক' 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

বিরহিণী। মাসিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—কার্তিক ১২৯৫ (অক্টোবর ১৮৮৮)। ইহা সম্পাদন করিতেন সুশীলাবালা দেবী। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৭, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জি লেন, কলিকাতা। ইহা প্রধানত গল্পের কাগজ ছিল।

পুণ্য। ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর ১৮৯৭) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় 'পুণ্য' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্র-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানব-

মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে।"

প্রজ্ঞাসুন্দরী ৩য় বর্ষ (১৩০৭-৮) পর্যন্ত 'পুণ্য' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুর। এই নামের একখানি মাসিকপত্রিকা ১৩০৪ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৯৮) মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদিকা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা দেবী। 'অন্তঃপুর' "কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত"। প্রথম সংখ্যায় 'প্রস্তাবনা'য় সম্পাদিকা পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

> "আজকাল মাসিকপত্রিকার অভাব নাই, রমণীদিগের উপযোগী পত্রিকাও কয়েকখানা সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়া রমণীদিগের উন্নতির সহায়তা করিতেছে। আমরাও আজ ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া রমণীদিগের ও তাহাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি। অন্যান্য খ্যাতনামা পত্রিকার সহিত প্রতিযোগিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সেরূপ দুঃসাহসও নাই। কেবল বঙ্গরমণীদিগের আপনাদের যৎসামান্য শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইব এই আশা।"

'অন্তঃপুর' দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সচিত্র মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। বনলতা দেবীর মৃত্যু হইলে যাঁহারা এই পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল—

১৩০৭ মাঘ (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)- ১৩১১ বৈশাখ (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)	হেমন্তকুমারী চৌধুরী
১৩১১ জ্যৈষ্ঠ (৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)- ১৩১১ ভাদ্র (৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)	কুমুদিনী মিত্র
১৩১১ আশ্বিন (৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)- ১৩১১ মাঘ (৭ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)	লীলাবতী মিত্র
১৩১১ ফাল্গুন, চৈত্র (৭ম বর্ষ, ১১শ ১২শ সংখ্যা)	সুখতারা দত্ত
১৩১২ বৈশাখ (৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) . .	ঐ

১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯১৫) বিরাজমোহিনী রায় সম্ভবত 'নব পর্য্যায়ে'র 'অন্তঃপুর' প্রকাশ করেন।

ইহাই হইল ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলা-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার তালিকা। সংখ্যায় এগুলি অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া অনেকটা বিস্তৃতভাবে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইল। প্রধানত পুরুষ-পরিচালিত পত্রিকাগুলির আদর্শে গঠিত হইলেও নারীকণ্ঠে নারীসমাজের অভাব-অভিযোগ ও কর্তব্যের কথা এগুলিতে ধ্বনিত হইতে থাকে। এই পত্রিকাগুলিকে ভিত্তি করিয়াই পরবর্তী কালে বঙ্গমহিলাকুলের বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

২

বিংশ শতাব্দীর গোড়া (ইং ১৯০১) হইতে আজ পর্যন্ত পুরুষ-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সঙ্গে মহিলা-পরিচালিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পত্র-পত্রিকার তেমন সংখ্যাবাহুল্য ছিল না। এই সময়কার পত্রিকাগুলির পরিচয় দিতেছি—

মুকুল। ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'মুকুল' নামে বালক-বালিকাদের উপযোগী একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। ষষ্ঠ বর্ষের (১৩০৭ সাল) 'মুকুল' সম্পাদন করেন শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা দেবী। চব্বিশ বৎসর চলিয়া 'মুকুলে'র প্রচার রহিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৪ (প্রকাশকাল মে ১৯১৮) হইতে ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (প্রকাশকাল জুলাই ১৯১৯) পর্যন্ত সম্পাদিকা-হিসাবে লাবণ্যপ্রভা সরকারের নাম পাওয়া যাইতেছে। ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে ইহার নব পর্যায় প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা শকুন্তলা দেবী। ৩য় বর্ষ হইতে বাসন্তী চক্রবর্তী সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; তিনি ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত 'মুকুল' পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ভারত-মহিলা। ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সহধর্মিণী সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় 'ভারত-মহিলা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত

হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

"এ দেশের নারী জাতির কল্যাণকল্পে সুপরিচালিত একখানি মাসিক পত্রের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। রাজনীতিই হউক, আর শিল্পবিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে, পুরুষ-শক্তি কখনও সম্যক্ বিকশিত হইতে পারে না। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে পুরুষের সহিত নারীকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষ সে বন্ধন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বিধাতার বিধান ব্যর্থ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই ছিন্ন-পক্ষ বিহঙ্গিনীর সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত বিহঙ্গের ন্যায়, এদেশের পুরুষেরাও সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-প্রযত্ন হইতেছেন। নারীকে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দুষ্কর কর্ম্মের কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য 'ভারত-মহিলা'র জন্ম। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'ভারত-মহিলা' এ দেশ ও বিদেশের চিন্তাশীল পুরুষ ও রমণীগণের নারীজাতির উন্নতিবিধায়ক চিন্তার ফল বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিবে। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের উন্নতিসাধক অন্যান্য বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইবে।"

'ভারত-মহিলা' প্রথম কয়েক বৎসর সগৌরবেই চলিয়াছিল। ইহা ১৩ বৎসর জীবিত ছিল।

জাহ্নবী। ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সম্পাদনায় 'জাহ্নবী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার ৩য় বর্ষ—১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন 'অশ্রুকণা'-রচয়িত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

"জাহ্নবীর উদ্দেশ্য কি বলিতে হইলে, মোটামুটি সাহিত্যালোচনাই বলিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনে এই নব চক্ষুরুন্মীলিত সুপ্রভাতে সমাজের শিক্ষা দীক্ষা যে নূতন পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর, তাহা নূতন করিয়া না বলিলেও চলে। এই গড়িয়া তুলিবার দিনে যে একপ্রাণতা, বন্ধন-দৃঢ়তার আবশ্যক, জাহ্নবী তাহারই প্রার্থিনী। মুখ্যতঃ নিষ্পিষ্ট সমাজের আচার ব্যবহারের সংশোধন ও ধর্ম্মালোচনাই জাহ্নবীর জীবন-ব্রত।"

সুষ্ঠুভাবে তিন বৎসর (১৩১৪-১৬) পত্রিকা পরিচালনার পর গিরীন্দ্রমোহিনী অবসর গ্রহণ করেন; সঙ্গেসঙ্গে 'জাহ্নবী'ও লুপ্ত হয়।

সুপ্রভাত। ১৩১৪ সালের শ্রাবণ মাসে 'সুপ্রভাত' পত্রের উদয়। এই সচিত্র মাসিক-পত্রিকার সম্পাদিকা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (পরে 'বসু')। 'সুপ্রভাতে'র কণ্ঠে এই কবিতাটি শোভা পাইত—

"সত্য সেবা ব্রতে সিদ্ধিলাভ কর
নবশক্তি হৃদে ফুটিবে,
একতা মন্ত্রের মঙ্গল ডোরে
তন্দ্রা অলসতা ছুটিবে।"

মহিলা-পরিচালিত মাসিকপত্রগুলির মধ্যে 'সুপ্রভাতে'র স্থান অতি উচ্চে; নয় বৎসর যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইবার পর ইহা লুপ্ত হয়।

গৃহলক্ষ্মী। ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে শান্তিময়ী সেনের সম্পাদনায় এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষেই বোধ হয় ইহা লুপ্ত হয়।

ভারত-লক্ষ্মী। ১৩১৭ সালের চৈত্র মাসে এই নামের একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা যোগমায়া মাতাজী তপস্বিনীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

মাহিষ্য-মহিলা। ইহা একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা; ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে উদয়পুর শান্তিনিকেতন (নদীয়া) হইতে কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'মাহিষ্য সমাজের অসাড় দেহে শক্তি সঞ্চরণ করিবার নিমিত্তই' ইহার আবির্ভাব। ইহাতে 'রমণীগণের কর্ত্তব্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পাতিব্রত্যধর্ম্ম, সন্তান-প্রতিপালন, গুরুজনের প্রতি ব্যবহার, রন্ধন-প্রণালী, মুষ্টিযোগ, মহাভারতীয় নীতিকথা, প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীধর্ম্ম সংগৃহীত হইয়া বিশদভাবে আলোচিত' হইত। 'মাহিষ্য-মহিলা' অনিয়মিত ভাবে চার-পাঁচ বৎসর জীবিত ছিল।

প্রেম ও জীবন। মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩১৯; সম্পাদিকা হেমলতা দেবী। ১৯ নং ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আনন্দ-সংগীত পত্রিকা। এই 'সঙ্গীত বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা' ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবীর সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ইঁহাদের যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকাখানি আট বৎসর—১৩২৮ সালের আষাঢ়

সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে আশুতোষ চৌধুরী ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :

"আমাদের দেশ হইতে বিশুদ্ধ আর্য্য সংগীতের চর্চ্চা ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। যদিও সংগীতের উন্নতিকল্পে দুই একটি সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলির দ্বারা সংগীতের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে কোনও উদ্যোগ হয় নাই। আমরা দেশ হইতে সেই অভাব মোচন করিবার জন্য 'সংগীত সংঘ' নামে একটি শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছি। যাহাতে সংগীতে ও যন্ত্রাদি বাদনে বালক বালিকাগণকে যথারীতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুণী সংগীতজ্ঞদিগের একত্র সমাবেশ করিয়া আর্য্য সংগীতের শিক্ষাপ্রণালী যাহাতে যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয় তাহার জন্য এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের সংগীতের অনেক তত্ত্ব ও অনেক যন্ত্রাদি লোপ পাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এমন সময়-কাল পড়িতেছে যে মনে হয় বুঝি বা অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে আর্যসংগীত ও আর্য্যযন্ত্রাদি লোপ পাইবে ও তাহার আসন বিদেশী সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রাদি অধিকার করিয়া বসিবে।..

"সহজে গান শিক্ষা হইবার অভিপ্রায়ে একটি সংগীত-পত্রিকা বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, ইহার নাম 'আনন্দ-সংগীত পত্রিকা' রাখা হইল। এই পত্রিকা বাহির করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই স্বরলিপি শিক্ষা করিয়া গানগুলিকে সহজে নিজের আয়ত্তে আনা। এখন অনেকে নানা প্রণালীতে নিজের সুবিধামত স্বর-লিপি বাহির করিয়া গানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছেন। আমাদের দেশের গানগুলি কত রকমে লোপ হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত এবং যাহাতে এগুলি স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে সকলে চেষ্টা করিতেছেন ইহা খুব সুখের বিষয়। খালি তো গানের শব্দ প্রয়োগে গান গাইতে পারা যায় না। সুর তাল লয়ে শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কণ্ঠস্বরে বাহির হওয়া চাই। একটি কথা আমি বলিতে চাই। নানা প্রণালীতে সংগীত লিপিবদ্ধ করিবার উপায় বাহির না করিয়া সহজ সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা সহজে লোকের যাহাতে বোধগম্য হয় এমন উপায় এবং যেটি বহু বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে সেই পদ্ধতি আমাদের মতে অবলম্বন করা উচিত। 'সংগীত-প্রকাশিকা' নামে একটি সংগীত পত্রিকা অনেক বৎসর হইতে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাতে নানা দেশের গান আমার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্ভাবিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে এত দিন লিপিবদ্ধ হইয়া চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাঁচি বাস করায় এবং আরও অন্যান্য কারণে ইহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়

যে এত বড় কাজের জন্য কেহ সহানুভূতি দেখান নাই, কত উদার স্বভাবাপন্ন মহানুভব কত ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মারা আছেন তাঁহারা অনায়াসে অর্থের সাহায্য করিয়া এটি রক্ষা করিতে পারিতেন।..আমি এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এই পত্রিকার সম্পাদিকার ভার লইয়া যদি কিছু করিতে পারি সেই চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছি। সকলে অনুগ্রহ করিয়া ইহা চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করিয়া দেখিবেন কত সহজ উপায়ে এই স্বরলিপি অনুসারে গান শিক্ষা করা যায়। সঙ্গীত সঙ্ঘে যত গান হিন্দুস্থানী ও ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবে। এবং অন্যান্য সঙ্গীতও প্রকাশিত হইবে।

"সঙ্গীত যে কাহাকে বলে তাহার উপক্রমণিকা খুব সংক্ষেপে বলিয়া সহজে গান শিক্ষার স্বরলিপি প্রণালী এই পত্রিকাতে দেখাইয়া দেওয়া হইবে।..যে প্রণালীতে যে স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে সঙ্গীত-প্রকাশিকা এত দিন প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা গান ও সেতারের গতের সুর লিখিয়া পাঠকদিগের শিক্ষার জন্য সেই প্রণালীতে স্বরলিপি প্রকাশ করিব। ইহার প্রথম সূত্রপাতে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী'তে বাহির করিয়াছিলেন ইহা প্রায় ৩০ বৎসরের কথা। ইহার সহজ সংকেত একবার শিখিয়া লইলে গান শিক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে।"

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে অসংখ্য স্বল্পায়ু পত্রিকার আবির্ভাবে আমরা জর্জরিত হইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেশের নারী-সমাজও পিছাইয়া থাকেন নাই। পশ্চিম হইতে প্রগতির বন্যা আসিয়াছে, পুরুষদের সঙ্গে তাঁহারাও প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কথা নিজের ভাষায় বলিতে চাহিয়াছেন, সুতরাং প্রগতিমূলক বিবিধ পত্র-পত্রিকা পরিচালনা করিতে তাঁহারা প্রয়াস পাইয়াছেন। শিশুদের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে আস্থা হারাইয়া তাঁহারা নূতন পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা-বিষয়ক প্রচার চাহিয়াছেন, সে সম্পর্কেও নানা পত্রিকার উদ্ভব হইয়াছে। মুসলমান মহিলা-সমাজেও নবজাগরণ আসিয়াছে, তাঁহারাও যথাসাধ্য এই উদ্যমে যোগ দিয়াছেন, নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেও মেয়েরা পশ্চাৎপদ থাকিতে চাহেন নাই। রাষ্ট্রনীতি-সংক্রান্ত সাধারণ ও দলগত পত্রিকাও তাঁহারা বাহির করিয়াছেন। অধিকাংশই স্থায়ী হয় নাই। নাম পাইয়াছি কিন্তু পত্রিকা সংগ্রহ করা যায় নাই; আমাদের সাধ্যমত সন্ধান করিয়া বিলুপ্তির গর্ভ হইতে যে-কয়টিকে উদ্ধার করিতে

পারিয়াছি সে-কয়টির উল্লেখ করিলাম; পরবর্তী অনুসন্ধানকারীরা, আশা করি, আমা অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান হইবেন। তবে দীর্ঘস্থায়ী অথবা উৎকর্ষের দিক দিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে স্থানলাভ করিবার যোগ্য পত্রিকাগুলি বোধ হয় বাদ পড়ে নাই।(৪)

পরিচারিকা (নব পর্য্যায়)। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা, সম্পাদিকা কুচবিহারের রানী নিরুপমা দেবী; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩২৩। পত্রিকার কণ্ঠে 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' এই পংক্তিটি শোভা পাইত। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

> "পরিচারিকার নব পর্য্যায় বাহির হইল।..সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয় ৪০ বৎসরের কথা, যখন বাঙ্গালা দেশে পরিচারিকার প্রথম আবির্ভাব হয়। তখনকার সমাজ ও এখনকার সমাজে অনেক প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য জিনিসটা বোধ হয় সর্ব্ব স্থানে ও সর্ব্ব কালে নিজস্ব একটা স্বাতন্ত্র্যের উপর খাড়া হইয়া থাকিতে চায়, সুতরাং তখনকার দিনে মুখ্য ভাবে যাহা স্ত্রীশিক্ষার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনকার দিনে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঠিক যদি সে সেই উদ্দেশ্যেই আবার আসিয়া থাকে, তবে তাহার ললাটে বোধ হয় লজ্জার ছাপ পড়িবে না।"

রানী নিরুপমার সম্পাদনায় নব পর্য্যায়ের 'পরিচারিকা' আট বৎসর (১৩২৩-৩১) সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল।

আন্নেসা। ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসে, বেগম সফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; নারীকল্যাণই ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। 'আন্নেসা' "মোহম্মদ আবদুর রসিদ সিদ্দিকী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও পরিচালিত" হইত।

৪ মেয়েদের স্কুল-কলেজ হইতে সাময়িকভাবে পত্র-পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সীতা দেবী-সম্পাদিত মাসিক 'দীপালি' (ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, ফাল্গুন ১৩২৭), সুবর্ণময়ী গুহ-সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'দীপক' (পাবনা বালিকা-বিদ্যালয়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৮), সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রদীপ' (শিবপুর ভবানী বালিকাবিদ্যালয়, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮) পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'কিশোরী' (সুধা দেবী-সম্পাদিত, আশ্বিন ১৩৩৮), 'রূপরেখা' (জাহান-আরা চৌধুরী, পৌষ ১৩৩৯; পর-বৎসর হইতে 'বর্ষবাণী' নামে), 'সোনার কাঠি' (রাধারাণী দেবী, আশ্বিন ১৩৪৪), 'উৎসব' (শান্তা দেবী-সম্পাদিত, মাঘ ১৩৪৫) প্রভৃতির মত বার্ষিক সংকলনও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই শ্রেণীর সাময়িকপত্রের বিবরণ সংকলন করিবার চেষ্টা করি নাই।

বাঙ্গলার কথা। ১৩২৮ সালের ১৪ই আশ্বিন, শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় "বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র" 'বাঙ্গলার কথা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গলার কথা' প্রসঙ্গে সম্পাদক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সংগত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

"আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তি-সংগত, ন্যায়-সংগত, আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সংগত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সংগত, আমাদের ধর্ম্ম-সংগত, জগতের ধর্ম্ম-সংগত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।..."

চিত্তরঞ্জন কারাবরণ করিলে তৎপত্নী বাসন্তী দেবী ১২শ সংখ্যা (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১) হইতে 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদিকা হন। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। ইহাতে শরৎ চন্দ্রের অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শিক্ষার বিরোধ,' 'স্বরাজ সাধনায় নারী,' 'সত্য ও মিথ্যা,' 'মহাত্মাজী' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নব্যভারত। এই সুপরিচিত মাসিক পত্রখানি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্নের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র প্রচার অব্যাহত রাখেন। সম্বৎসর-মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে (১২ ভাদ্র ১৩২৮) ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কার্ত্তিক যুগ্ম-সংখ্যা হইতে

তৎপত্নী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র সম্পাদিকা হন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ১৩৩২ সাল (৪৩শ বর্ষ) পর্যন্ত জীবিত ছিল।

শ্রেয়সী। ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর পত্নী কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় শান্তিনিকেতন হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ সহ কঠোপনিষদের এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরাঃ
তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধুর্ভবতি।
হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥"
"শ্রেয়ঃ প্রেয় সবাইকে পায়।
দেখে' বেছে' ন্যায় যে যেটা চায়॥
যে ন্যায় শ্রেয়—সে পায় ফুল।
যে ন্যায় প্রেয়—খোয়ায় মূল॥"
—কঠোপনিষদ্‌, ১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী, ২য় শ্লোক

প্রধানত শান্তিনিকেতনবাসিনী মহিলাদের রচনা 'শ্রেয়সী'তে স্থান পাইত। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়। এক বৎসর চলিবার পর পত্রিকাখানি 'শান্তিনিকেতন' পত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত পত্রের 'নারী-বিভাগ'-রূপে কিরণবালা সেনের সম্পাদনায় ১৩৩০ সালের বৈশাখ হইতে পৌষ পর্যন্ত 'শ্রেয়সী' জীবিত ছিল।

সেবা ও সাধনা। ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাসের সম্পাদনায় এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা একা ইন্দুনিভা দাসই সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মাতৃ-মন্দির। ১৩৩০ সালের আষাঢ় মাসে এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যতম সম্পাদক অক্ষয়কুমার নন্দী প্রথম বর্ষের শেষে লেখেন :

"মেয়েদের মধ্যে সাধারণ রকম কিছু কিছু উপদেশ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল। নিজেদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের বিজ্ঞাপন-প্রচার—এ ব্যবসায়-বুদ্ধিটুকুও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। দুই তিন সংখ্যা বের হবার পর বোঝা গেল,

'রথ দেখা আর কলা বেচা' একসঙ্গে করতে গেলে রথ-দর্শন সার্থক হয় না, প্রাণের নিবেদন ঠাকুরের কাছে পৌঁছে না। আমরা অতঃপর ইহাকে মহিলাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী একখানি আদর্শ মাসিক পত্রিকায় পরিণত করতে চেষ্টা পেয়েছি।" (চৈত্র ১৩৩০)

প্রথম পাঁচ বর্ষ (১৩৩০-৩৪) সুরবালা দত্ত এবং পরবর্তী সপ্তম ও অষ্টম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত সুশীলা নন্দী 'মাতৃ-মন্দিরে'র যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ইহার পর পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়।

বঙ্গনারী। ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে ময়মনসিংহ হইতে এই মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদিকা চিন্ময়ী দেবী।

শ্রমিক। সন্তোষকুমারী গুপ্তার সম্পাদনায় এই নামের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৩৩১ সালে প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরা হিতৈষী। ৭০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে গুরুদয়াল সিংহের সম্পাদনায় কুমিল্লা হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর কমনীয়কুমার সিংহ পিতৃপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি জীবিত রাখেন। ১৩৩১ (?) সালে কমনীয়কুমারের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা ঊর্মিলা সিংহ অনেক দিন 'ত্রিপুরা হিতৈষী' পরিচালন করিয়াছিলেন।(৫)

বঙ্গলক্ষ্মী। ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ (১৯২৫, নবেম্বর) মাসে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্রস্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :

"বাংলা দেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া তথাকার নারীদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য 'সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি' নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহারই মুখপত্রস্বরূপ 'বঙ্গলক্ষ্মী' বাংলার নারী-সমাজের সেবার জন্য প্রকাশিত হইল। ইহাতে বাংলার মহিলাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা, নারীশিক্ষার অবস্থা এবং নারী-জাতির উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে।

৫ দ্র. 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

"সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য না করিলে এ যুগে কোন কার্য্যে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। নারীগণও তাঁহাদের উন্নতিসাধন মিলিতভাবে করিলে তাহা সহজসাধ্য হইবে। সুতরাং প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়া নারীগণ যাহাতে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, সেই সহজ সরল সত্যটি নারীসমাজের অন্তরে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দেওয়াই 'বঙ্গলক্ষ্মীর' প্রধান উদ্দেশ্য।"

'বঙ্গলক্ষ্মী' আগাগোড়াই মহিলা-হস্তে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সম্পাদিকাগণের কার্যকাল এইরূপ :

১৩৩২ অগ্রহায়ণ-১৩৩৩ চৈত্র	কুমুদিনী বসু, বি. এ.
১৩৩৪ বৈশাখ-কার্তিক	লতিকা বসু, বি. লিট্ (অক্সন)
১৩৩৪ অগ্রহায়ণ-১৩৫৫ কার্তিক	হেমলতা দেবী (ঠাকুর)
১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ	হেমলতা দেবী, শান্তা দেবী ও আরতি দত্ত

পাপিয়া। ঢাকা হইতে বিভাবতী সেনের সম্পাদনায় 'পাপিয়া' নামে ছোটদের একখানি সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় মাসে। পর-বৎসর ইহা মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয় এবং '১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের আশ্বিন মাসে।

অর্ঘ্য। ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩৩৪; সম্পাদক প্রভাবতী পাইন ও অনিল ধর।

তরুণ শক্তি। মানভূমের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামের কর্মিসংঘ ও আশ্রমের মুখপত্রস্বরূপ এই পত্রিকাখানি জন্মগ্রহণ করে; পুরুলিয়া হইতে ইহা প্রকাশিত হইত। ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতা রাজনৈতিক অপরাধে কারাবরণ করিলে 'তরুণ শক্তি'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন রাজবালা দেবী।(৬)

আলোক। আলোক-সঙ্ঘের মুখপত্রস্বরূপ এই মাসিকপত্রখানি প্রভাত-রঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবীর সম্পাদনায় ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় প্রকাশ :

"সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট পথিকে লেখক সমাজে ও পাঠক সমাজে সুপরিচিত করা তোলাই হচ্ছে এর কাজ।"

৬ দ্র. 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

মন্ত্র। সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; পরিচালিকা তরুবালা সেন; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৭, শনিবার।

জয়শ্রী। ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রথমে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। লীলাবতী নাগ (পরে 'রায়') ইহার সম্পাদিকা। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য

> "বর্ত্তমান যুগের মেয়েদের চিন্তা ও কর্ম্মের গতি নির্দ্দেশ এবং ভাবী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন কার্য্যে স্থান গ্রহণের সহায়তা করা।"

একাধিক বার সরকারী লাঞ্ছনার ফলে মাঝে মাঝে 'জয়শ্রী'র অদর্শন ঘটিয়াছে। প্রথম বারে প্রায় দেড় বৎসর বন্ধ থাকিয়া, ১৩৪৫ সালের আষাঢ় মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইহার পর প্রায় তিন বৎসর চলিবার পর পত্রিকাখানির প্রচার ছয় বৎসর বন্ধ থাকে। ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন মাস (১১শ বর্ষ) হইতে 'জয়শ্রী' পুনরায় প্রচারিত হইতেছে; এই সংখ্যার সূচনায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

> "দীর্ঘ ছয় বৎসর পর জয়শ্রী আবার উপস্থিত করছে তার বক্তব্য দেশের কাছে।..
>
> "জয়শ্রীর বলবার কথা কি? সর্ব্বধ্বংসী পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জয়শ্রী করে চলেছে আপোষহীন সংগ্রাম। কিন্তু কেবলমাত্র পরাধীনতা দূর করার দ্বারাই নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে না। নূতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে, তার রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ নিয়ে জয়শ্রীর ধারণা ও পরিকল্পনা ক্রমশঃ তার পাতায় প্রকাশ পাবে।
>
> "রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'জয়শ্রী' সমাজতন্ত্রবাদী। তবে অর্থনৈতিক সার্ব্বভৌমত্বকে সে স্বীকার করে না। সংস্কৃতি ও সমাজক্ষেত্রে জড়বাদী ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে বহুবাদী ব্যাখ্যায় সে বিশ্বাসী। বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তির মধ্য দিয়ে সে তার বক্তব্যকে উপস্থিত করতে চেষ্টা কর্‌বে।"

'জয়শ্রী' মহিলা-পরিচালিত পত্রিকা; বিভিন্ন সময়ে যাঁহারা ইহার পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল :

১ম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৮	লীলাবতী নাগ
২য় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৩৯	শকুন্তলা দেবী
৩য় বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪০	ঐ, বীণাপাণি রায়, এম. এ. (শেষার্ধ)

৪র্থ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪১	ঊষারাণী রায়
৫ম বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪২	ঐ
৬ষ্ঠ বর্ষ	প্রচার বন্ধ ছিল
৭ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৫-জ্যৈষ্ঠ '৪৬	লীলাবতী নাগ
৮ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৬-জ্যৈষ্ঠ '৪৭	লীলাবতী রায়
৯ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৭-জ্যৈষ্ঠ '৪৮	লীলা রায়
১০ম বর্ষ, আষাঢ় '৪৮-চৈত্র '৪৮	ঐ
১১শ-১৩শ বর্ষ, ফাল্গুন '৫৩-মাঘ '৫৬	ঐ
১৪শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৫৭-	ঐ

অঙ্কুর। ইহা ছোটদের মাসিকপত্র; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১৩৩৮ (আগস্ট ১৯৩১)। সম্পাদক রেঃ সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথম সংখ্যায় লেখেন :

> "তোমাদের আনন্দ ও শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে উদ্যোগী হইয়াছি।—আমি সৎ উদ্দেশ্যে দেশের বালক বালিকাদের কল্যাণার্থে স্বল্প মূল্যে ইহা প্রকাশ করিলাম।...এই কাগজখানি ভারতবিখ্যাত *Treasure Chest* নামক ইংরাজী কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উক্ত কাগজখানা যে ভাল এ বিষয় কাহারও অবিদিত নহে, সুতরাং উক্ত কাগজের অনেকাংশ বাঙ্গালায় তর্জ্জমা হইবে এবং যে সকল বালক বালিকা ইংরাজী জানে না তাহারাও তাহা পড়িবার সুযোগ পাইবে।"

চতুর্দশ বর্ষ (আগষ্ট ১৯৪৪) হইতে 'অঙ্কুর' লাবণ্যপ্রভা মল্লিক, বি. এ., বি. টি-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

মহিলা বান্ধব। মহিলাদের এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন মিশনরী মহিলারা। আমরা বোলপুর হইতে প্রকাশিত ১৯৩২ সনের পত্রিকা (৪৮শ ভাগ) দেখিয়াছি; উহা মিসেস্ এস. কে. মণ্ডল-সম্পাদিত।

বুলবুল। এই পত্রিকাখানি বৎসরে তিন বার প্রকাশিত হইত। মহম্মদ হবিবুল্লা ও শামসুন নাহার ইহা সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৪০। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকে পরিণত হয়। 'বুলবুল' ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে লুপ্ত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।

আগন্তুক। পরিমল মিত্রের পরিচালনায় এই মাসিকপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে।

এডুকেশন গেজেট। ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে অনুরূপা দেবী (কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে) এই সাপ্তাহিক বার্তাবহের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।(৭)

রূপশ্রী। এই নামের একখানি মাসিক পত্রিকা ১৩৪১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী বেলা দেবী (ঘোষ) দুই বৎসর সুষ্ঠুভাবে পত্রিকাখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অনুভব ও সাহিত্য। এই নামের একখানি মাসিকপত্র জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্তের সম্পাদনায় ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়।

গৃহ-লক্ষ্মী। ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি (শারদীয়া সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত হয়; সম্পাদিকা কনকপ্রভা দেব 'নিবেদনে' লেখেন :

"দেশের এই দুর্দ্দিনে নারীপ্রগতির গতি ও প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মকে সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সংবাদপত্রের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, শ্রীহট্ট, তথা সমগ্র আসামে মাতৃজাতির উন্নতিবিধায়ক নারী পরিচালিত কোন সংবাদপত্র নাই। সেই অভাব যথাসাধ্য দূর করিয়া বাংলা ও আসামের নারীজাতিকে জগৎবরেণ্য করিয়া তুলিবার জন্য আমরা ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা এই 'গৃহ-লক্ষ্মী' নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিলাম। জানি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম,—জানি আমাদের এই দরিদ্র পীড়িত দেশে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ—পদে পদে লাঞ্ছনা ইহার পুরস্কার। তবুও ইহা মাথা পাতিয়া লইয়াছি। ভরসা—মা, ভগিনী ও স্বদেশবাসিগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আমার এ অযোগ্যতার ভিতর দিয়াও যদি নারীজাতির কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হয় তবে জীবন সার্থক মনে করিব।"

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের প্রায় এক বৎসর পরে 'ভাদ্র ১৩৪৫' সংখ্যা প্রকাশিত হয়; এই সংখ্যাটিকে 'প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা'

৭ দ্র. 'শনিবারের চিঠি', বৈশাখ ১৩৪১।

বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা 'শারদীয়া সংখ্যা'; ইহাতে ২২-৯-৩৮ তারিখে ট্রেনে লিখিত 'রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর বাণী' মুদ্রিত হইয়াছে। 'গৃহ-লক্ষ্মী'র ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মাঘ ১৩৪৫ হইতে পত্রিকাখানির নামকরণ হয়—**'জাগৃহি'** "আসামের মহিলা-পরিচালিত একমাত্র বাংলা মাসিক"। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে :

> "'গৃহলক্ষ্মী' আজ 'জাগৃহি' নাম ধারণ করিয়া পাঠকপাঠিকার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে আমাদের শুভানুধ্যায়ী লেখক লেখিকাদের তাগিদ অপর দিকে প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের মুখপত্ররূপে 'গৃহলক্ষ্মী'র নাম পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় তাই আজ জাগৃহি নারী জাগরণের বার্ত্তা বহন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা আমাদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। নারী-জাতির যুগযুগান্তর সঞ্চিত বেদনার অবসানই আমাদের আদর্শ।"

আমরা 'জাগৃহি'র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার পর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না।

মন্দিরা। ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

> "পত্রিকার নাম 'মন্দিরা' কেন হল সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আশা করি 'মন্দিরা' নিজেই নিজের পরিচয় দেবে এবং সেটাই হবে সব চেয়ে ভালো পরিচয়। তবু, উদ্যোগীদের পক্ষ থেকে কিছু বলা দরকার।
>
> "জাতির জীবনে আজ চলার গতিবেগ এসেছে। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—সর্ব্বদিকেই আজ মুক্তি-অভিযান সুরু হয়েছে। এই মুক্তি-অভিযানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায় মন্দিরা।"

প্রথম দশ বৎসর 'মন্দিরা'র সম্পাদন-ভার মহিলা-হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের নাম ও কার্যকাল এইরূপ :

১৩৪৫ বৈশাখ - ১৩৪৬ চৈত্র	কমলা চট্টোপাধ্যায়
১৩৪৭ বৈশাখ - ১৩৪৯ শ্রাবণ	কমলা দাশগুপ্তা
১৩৪৯ ভাদ্র - ১৩৫২ অগ্রহায়ণ	স্নেহলতা সেন
১৩৫২ পৌষ - ১৩৫৪ চৈত্র	কমলা দাশগুপ্তা

বিজয়িনী। শিলচর হইতে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাখানির প্রকাশ-কাল আশ্বিন ১৩৪৭; সম্পাদিকা অরুণ চন্দের সহধর্মিণী জ্যোৎস্না চন্দ,

বি. এ.। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা এইরূপ লেখেন :

"মহিলা সমাজের নিজস্ব একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও এতদঞ্চলে মাসিক পত্রিকা পরিচালনের পৌনঃপৌনিক ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়া বহু ভয় ভাবনার মধ্যে আমরা স্থানীয় 'নারীকল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে ও সাহায্যে নারী সমাজের সেবাকল্পে 'বিজয়িনী' নামক সাময়িক পত্র লইয়া আপনাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম।..আমাদের পরম সৌভাগ্য যে যাত্রারম্ভে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করিয়া সস্নেহে ইহার নামকরণ করিয়াছেন।..আমাদের মহিলাসমাজে দুঃস্থ সহায় সম্বলহীনার সংখ্যা অগণিত। বিজয়িনী প্রকাশ দ্বারা আর্থিক কোন লাভ হইলে তাহা দুঃস্থ সমাজের কল্যাণার্থে ব্যয় করিবার এক পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিয়াছি।"

আমরা প্রথম বর্ষের 'বিজয়িনী'র সংখ্যাগুলির সন্ধান পাইয়াছি। তাহার পর বোধ হয় ইহার আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।(৮)

শিক্ষা। এই মাসিকপত্রখানির প্রথম প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৪৭; সম্পাদিকা অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সহধর্মিণী স্বর্ণপ্রভা সেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকাংশ মুদ্রিত আছে :

"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। "শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।"

প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত 'আমাদের কথা'য় প্রকাশ :

"সমগ্র জগৎ যখন রণকোলাহলে শব্দায়মান, আমাদের অস্তিত্ব যখন দোলায়মান, আমরা সেই সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করিলাম; কারণ যত দিন বাঁচিয়া আছি তত দিন অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ যদি করিতে পারি তবে ইহাই বা কেন পারিব না? শিক্ষার পরিকল্পনা, তাহার আলোচনা ও বিচার, নিত্যকালের ব্যাপার, সাময়িক উত্তেজনার ফল নহে। আমাদের দেশে যাঁহারা এ বিষয়ে দেখিয়াছেন ও ভাবিয়াছেন তাঁহাদের সাধনার ফল আমরা কিছু পরিমাণে পাইতে পারিব, এবং তাহাতে আমাদের চিন্তাও পরিণতি লাভ করিবে, এই আশায় 'শিক্ষা' পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করা গেল।"

৮ অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'গৃহ-লক্ষ্মী' ও 'বিজয়িনী' পত্রিকা দুইখানির সন্ধান দিয়াছেন।

'শিক্ষা' এখনও চলিতেছে। কেবল মধ্যে এক বৎসর চারি মাস ইহার প্রচার বন্ধ ছিল; দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ৮ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪৯) পর্যন্ত চলিবার পর তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১৩৫০, অগ্রহায়ণ হইতে।

আশ্রমী। কেশবলাল বসু ও কমলবাসিনী দেবীর সম্পাদনায় রংপুর হরিসভা হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সনের ১লা জানুয়ারি।

মেয়েদের কথা। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। কল্যাণী সেন, এম. এ. ইহার সম্পাদিকা। "বঙ্গবাসী ও প্রবাসী সকল বাঙালী মহিলাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগস্থাপন ও পরস্পরের সহায়তায় আদর্শ ও কল্পনার উন্নতি" ইহার উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্গত ছিল।

'মেয়েদের কথা' নানা কারণে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই; মাঝে মাঝে অদর্শনও ঘটিয়াছে। ১৩৫৩ সালে চতুর্থ বর্ষের পত্রিকা প্রচারিত হইবার পর ইহার বিলুপ্তি ঘটে।

জাগরণ। ত্রৈমাসিক পত্র, বাঁকুড়া তরুণী সঙ্ঘ হইতে সুলতানা বেগমের সম্পাদনায় ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়।(৯) ছয় সংখ্যা প্রকাশের পর ইহা অদৃশ্য হইয়াছিল।

প্রভাতী। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানিও বাঁকুড়া হইতে সুধা ঘোষের সম্পাদনায় ১৩৪৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার ২য় সংখ্যার প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৪৯।

অর্চ্চনা। ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'অর্চ্চনা'র প্রথম আবির্ভাব। এই মাসিকপত্রের ৪০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) হইতে চিত্রিতা দেবী অন্যতর সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯ ঠিক এই সময়ে বাঁকুড়া হইতে "অরুণকুমারী রায়"-সম্পাদিত 'নবীনা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অরুণকুমার রায় নামে এক ছাত্র তখন বাঁকুড়ায় কলেজে পড়িত, নিবাস বরিশালে। সে ভাল বাংলা লিখিতে পারিত। অরুণকুমারই "অরুণকুমারী" হইয়া 'নবীনা'র সম্পাদিকা হইয়াছিল।

মাতৃভূমি। এই মাসিক পত্রিকার ৮ম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (মাঘ ১৩৫২) হইতে অমিতা দত্তমজুমদার, এম. এ. সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

পরিক্রমা। এই ঋতু-সংকলনের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৫৩। সম্পাদিকা কল্যাণী মুখোপাধ্যায়। ইহার মাত্র চারিটি সংখ্যা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহিলা। বীণা গুহ, এম. এ.-র সম্পাদনায় "মহিলাদের একমাত্র মুখপত্র" 'মহিলা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসে। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

"মহিলাতে রসসাহিত্যের পরিবেশন করিতে গল্প উপন্যাস কবিতা ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রবন্ধাদি, যেমন সব কাগজে থাকে, তেমনি থাকিবে—অধিকন্তু থাকিবে মেয়েদের জ্ঞাতব্য ও ব্যাবহারিক দিক, যাহা বর্ত্তমানে অন্য কোনও পত্র পত্রিকায় থাকে না।..আমরা পরিকল্পনা করিয়াছি যে, মহিলাতে সাহিত্য ছাড়া, রূপচর্য্যা, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, দেহচর্চ্চা অর্থাৎ স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ইত্যাদি, গৃহ ও গৃহস্থালী, সেলাই, রান্না, পরিচ্ছদ, চিত্রকলা, ও আল্পনা, সঙ্গীত, কুটীরশিল্প, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি, শিক্ষা, নারীজাতির জ্ঞাতব্য ও আলোচ্য প্রশ্নোত্তর এবং কন্যা, জায়া ও জননীর কর্ত্তব্য বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা থাকিবে। এতদ্ভিন্ন দেশ-বিদেশের নারী, সাময়িক অনুবাদসাহিত্য, মেয়েদের উল্লেখযোগ্য রচনার নাম, মেয়েদের সভা-সমিতির সংবাদ, মেয়েদের অভাব অভিযোগ, মেয়েদের খেলাধুলা প্রভৃতির সংবাদও নিয়মিত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।"

'মহিলা'র দ্বিতীয় বর্ষ হইতে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী আশা দেবী, এম. এ. সম্পাদিকা নিযুক্ত আছেন; "সম্পাদনা-পরিষৎএর সভানেত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী"।

মহিলা-মহল। "মহিলা পরিচালিত ও সম্পাদিত অ-দলীয় পাক্ষিক পত্রিকা"; সম্পাদিকা অঞ্জলি সরকার এম. এ., কমলা মুখোপাধ্যায় এম. এ. ও গীতা বোস; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১ আষাঢ় ১৩৫৪। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকাগণ প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :

"অতি অল্পসংখ্যক বাঙলা পাক্ষিক পত্রের মধ্যে 'মহিলা-মহলে'র একটি বিশিষ্ট আসন প্রাপ্য, কারণ, এর পরিচালনা এবং সম্পাদনার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন মেয়েরা। বর্ত্তমান সমস্যা-বিড়ম্বিত দিনে মেয়েদের এমন একটি মুখপত্রের অবশ্যই প্রয়োজন যার ভিতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের অসংখ্য সমস্যা সম্বন্ধেও নিজেরা আলোচনা

করতে পারেন। এমন কি সমাজকে সচেতন করতে পারেন, বিবিধ দুরারোগ্য কঠিন ও জটিল রোগ যা আমাদের সমাজ-জীবনকে নানাভাবে বিপন্ন করে ব্যক্তি ও সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে সে-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। আর পারেন জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে। শুধু সাহিত্যের পসরা নিয়ে ভাবরাজ্যে বিচরণ করবার জন্যে 'মহিলা-মহলে'র আবির্ভাব নয়—মেয়েদের জীবনের সত্যিকারের যে সব সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হয়ে ক্ষয়রোগের মতো মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক শান্তি ও দাম্পত্য-জীবনকে নষ্ট করছে তার সমাধান করা এবং সমাজ-জীবন থেকে নানাবিধ কু-আচার ও কু-নীতিকে বিদেয় করতে 'মহিলা-মহল' কৃতসঙ্কল্প। 'মহিলা-মহল' নামকরণের উদ্দেশ্য নয় পুরুষদের এর এলাকা থেকে বহিষ্কৃত করা, যে ভাবে যেটুকু সাহায্য তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে, অকুণ্ঠিত এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তা' গ্রহণ করা হবে। তবে মেয়েদের উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশে যেন বাধা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এই অ-দলীয় পত্রিকাটি।"

১৩৫৫ সালের ১লা আষাঢ়-সংখ্যা হইতে অঞ্জলি সরকার একাই পত্রিকার সম্পাদিকা হন। ১৩৫৬ সালের ১লা ভাদ্র হইতে গীতা বোস 'মহিলা-মহল' সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। চতুর্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৫৭) হইতে ইহা মাসিকে পরিণত হইয়াছে।

সংগঠন। ১৩৫৪ সালের ২রা শ্রাবণ এই নামের একখানি পাক্ষিক পত্রিকা শচীন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে :

" 'সংগঠন' সাহিত্যিক-ও-সাহিত্য-ঘেঁষা পত্রিকা হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। জাতির এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির ও সংযমের যথাযথ বিকাশে যে রচনা সাহায্য করিবে ও যে রচনার প্রয়োজন থাকিবে তাহাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 'সংগঠনে'র বিশেষ অঙ্গ হইবে "চিন্তয়াসি", সংবাদ সংগ্রহ, গঠনকর্ম্ম-বিবরণ, কর্ম্মী-সংবাদ, জাতীয় সঙ্গীত ও স্বরলিপি, জাতীয় পুস্তক পরিচয় ও প্রশ্ন উত্তর। এতদ্ভিন্ন গঠনকর্ম্মবিষয়ক নানা প্রশ্ন ও সমস্যা কর্ম্মিগণের ও বিশেষজ্ঞগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে এবং গঠনকর্ম্মিগণ যে ভাবধারা দেশে সঞ্জীবিত করিতে চাহেন তাহার দ্রুত প্রচারের জন্য উপযুক্ত প্রচারপদ্ধতি ও তাহার জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত গান, নাটক ইত্যাদি প্রকাশিত হইবে। জাতিগঠনের মূল নীতি ও বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা যাহাতে এই গঠনকর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই 'সংগঠনে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।"

১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর শচীন্দ্রনাথ শোচনীয় ভাবে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী অংশুরাণী মিত্র পঞ্চম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৫৪) হইতে 'সংগঠন' পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা হইতে 'সংগঠন' মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বেগম। নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় "মহিলাদের সচিত্র সাপ্তাহিক" 'বেগম' প্রকাশিত হয় ৩রা শ্রাবণ ১৩৫৪ (২০ জুলাই ১৯৪৭)। ইহা মুসলিম নারীদের দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত। "নারীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল তথা দেশের ও দশের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন এই সাপ্তাহিকের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" প্রথম বর্ষের ১২শ সংখ্যা (২রা নবেম্বর) হইতে নূরজাহান বেগম একক পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়া আসিতেছেন।

শতাব্দী। মাসিক পত্র, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৪; সম্পাদক মুরারি দে ও সুজাতা ঘটক। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় বিবৃতিতে প্রকাশ :

"বাঙ্গালার এক দুর্যোগময় সংকটমুহূর্ত্তে 'শতাব্দী' আত্মপ্রকাশ করল। বাঙ্গালার আকাশ বাতাস আজ দুঃখভারাক্রান্ত। শারদ-শ্রী আজ বাঙ্গালাকে আনন্দ দান করতে পারছে না আজ বাঙ্গালা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বিমর্ষ। আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের মুখে বাঙ্গালাকে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে বিভক্ত হতে হয়েছে।..

"নূতন জাতি, নূতন দেশ গঠন করবার মহান্ ব্রতে আমরা সবাইকে আহ্বান করি!.. আজ মায়ের কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা নেবো—আমরা বৃথা সময় ক্ষেপণ করবো না, প্রতিটি মুহূর্ত্তে আমরা জাতিগঠনমূলক কর্ম্মে নিযুক্ত করবো, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজেদের মনকে পঙ্কিল করে তুলবো না, জাতির কল্যাণে মনকে সব সময় নিয়োজিত করবো। আজ আমাদের একটি মাত্র ব্রত, সে ব্রত হচ্ছে দেশকে গড়ে তোলা।..

"সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ধ্বংস করে, তারই উপর আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আদর্শ সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের মহান্ ব্রত নিয়ে আজ সবাইকে বৃহৎ সংহতির সাধনায় নিয়োজিত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দায়িত্ব নিয়ে যে সরকার কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন তাকে নৈতিক সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি আজ বিপন্ন—'শতাব্দী'র ব্রত হচ্ছে সেই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'শতাব্দী' জনগণকে

সচেতন করে তুলবে। তাই 'শতাব্দী' আজ তরুণ সমাজের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে: তাদের সকল শক্তি দিয়ে—'শতাব্দী'র ব্রতকে সার্থক করে তুলুন।"

'শতাব্দী'র আর একটি মাত্র সংখ্যা ১৩৫৫ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; উহা "শতাব্দীর বিশেষ শিশু ও মহিলা সংখ্যা"।

ললিতা। সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা অরুণা বসু। ১৯৪৭ সনের শেষার্ধে ইহার একটি মাত্র সংখ্যা বউবাজার, মডার্ন আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

তরুণের স্বপ্ন। ১৯৪৮ সনের ২৩শে জানুয়ারি (নেতাজীর জন্মতিথি) এই সচিত্র সাপ্তাহিকের প্রথম আবির্ভাব। ইহার সম্পাদিকা মালবিকা দত্ত। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

"সাপ্তাহিকটির নাম দিয়েছি আমরা 'তরুণের স্বপ্ন'। এ থেকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই বোঝা যায় যে পত্রিকাটি হতে চলেছে তরুণ সমাজের মুখপত্র—সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি; সব কিছু মিলিয়ে তরুণ মনের বিভিন্ন চিন্তাধারার যে সমন্বিত রূপ, হাজার হাজার তরুণজীবন স্বদেশের উন্নতিকল্পে যে স্বপ্নজাল সৃষ্টি করেন মনে মনে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে 'তরুণের স্বপ্নে'র পাতায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজ জন্মলাভ করেছে এ সাপ্তাহিকটি।"

বর্তমানে 'তরুণের স্বপ্ন' মাসিক পত্রে পরিণত হইয়াছে।

উজ্জ্বল ভারত। মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ), সহ-সম্পাদক রেণু মিত্র, এম. এ.; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল মাঘ ১৩৫৪।

"উজ্জ্বল ভারত কতকগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অসম্বন্ধ সমষ্টি হবে না। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি জীবনের সকল দিকই ব্যক্তি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে, এবং সে সবের মধ্যে একটি organic জীবনের সমগ্রতার খোঁজ পাওয়া যাবে।"

প্রথম সংখ্যার সূচনায় 'আমাদের কথা' মুদ্রিত হইয়াছে; ইহাতে প্রকাশ :

"ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশকবলমুক্ত। এই মুক্ত ভারতকে মথিত করিয়া একটি উজ্জ্বল ভারত এবং তাহার অনুপ্রেরণায় একটি 'এক জগৎ' (One World) গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের প্রগতিশীল ও তেজস্বী ব্যাখ্যান-

সাহিত্য সৃষ্টি এবং তাহারই ভিত্তিভূমিতে বাস্তবের দেশে, সর্ব্ববিধ সংগঠনক্ষেত্রে তাহার কর্ম্মগত ছন্দের ও প্রয়োগ-কৌশলের সম্যক্ আস্বাদন করাই এই উজ্জ্বল-ভারত পত্রের পরম প্রয়োজন।"

'উজ্জ্বল ভারত' এখনও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

ছেলেমেয়ে। এদের যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের জন্যে। সম্পাদিকা বাণী হালদার ও বেলা ভট্টাচার্য। 'ছেলেমেয়ে' একখানি সুপরিচালিত সচিত্র পত্রিকা, কিন্তু ইহা মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক, কোনো পর্যায়েই পড়ে না। এ যাবৎ ইহার তিনটি মাত্র খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে :

১ম খণ্ড	শ্রাবণ ১৩৫৫ (১৫ই আগস্ট ১৯৪৮)
২য় খণ্ড	মাঘ ১৩৫৫
৩য় খণ্ড	আশ্বিন ১৩৫৬

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে শিশু পালনের অব্যবস্থায় যে শত শত অনাদৃত শিশু রুগ্ন, অসহায়—বিকলস্নায়ু হয়ে জাতিকে পঙ্গু ক'রে তোলে, তার অবসান ঘটুক। 'শিশু ভাবী জাতির পিতা, জাতির মেরুদণ্ড'—এই উপলব্ধি শুধু মুখের কথায় পর্য্যবসিত না হয়ে তাকে সুন্দর ক'রে তোলার প্রয়াস যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, সমাজ-ব্যবস্থায় গৃহে জাতির সম্পদ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও লালনের সুব্যবস্থার পূর্ণ আয়োজন হোক্।"

ঘরে বাইরে। ইহা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাসিক মুখপত্র; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৫; সম্পাদিকা অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী মঞ্জুশ্রী দেবী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

"'ঘরে বাইরে' কি লিখবে, কি বলবে, কাদের কথাকে তুলে ধরবে সামনে—প্রশ্ন আসবে পাঠক পাঠিকাদের তরফ থেকে। বাংলাদেশে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের কাছে এর উত্তরও খুব অজানা নয়। আত্ম-রক্ষা সমিতি সেই মেয়েদেরই প্রতিষ্ঠান,—যারা সমাজে, সংসারে, অর্থনীতি আর রাজনীতি ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায় না কোনদিন; বঞ্চিত হয় সকল রকম অধিকার

থেকেই। এই মেয়েদের সঙ্গত অধিকারের দাবী নিয়েই আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলন। যে সমাজ এবং শাসনব্যবস্থা নারীর শক্তিকে করে অপচয়, বঞ্চিত করে তাকে মানুষের অধিকার থেকে—সে ব্যবস্থাকে 'সুশাসন' বা সুবিচার বলে মেনে নেয় নি আত্মরক্ষা সমিতি, নেবেও না কোনদিন। এই বঞ্চিত মানুষের কথাকেই 'ঘরে বাইরে' পেঁাছে দেবে ঘরে ঘরে। এদেরই বঞ্চিত জীবনের লাঞ্ছিত চেহারাকে কথায়-কাহিনীতে ফুটিয়ে তুলবে 'ঘরে বাইরে'।

"এক ফালি জমির অভাবে যে কৃষক-বধূর শান্ত-সুশ্রী সংসারখানি উৎসন্নে গেল, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়েও যে মজুর মেয়েটি শিশুর মুখে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারলো না, বেকার স্বামীর সংসারে যে মেয়েটি স্বামী-সন্তানের উপোস সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিল—তাদের খবর সংবাদপত্রে স্থান পায় না। অথচ এই তো আমাদের সোনার বাংলার ঘরের কথা। 'ঘরে বাইরে'র পাতায় পাতায় আসন নেবেন এঁরাই; আর আসন নেবেন তাঁরা—যাঁরা মুখ বুজে মরণকে মেনে না নিয়ে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের পথে পা দিয়েছেন, অপমৃত্যুর হাত থেকে মানুষ ও মনুষ্যত্বকে বাঁচাবার আকাঙ্ক্ষায় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পান নি যাঁরা।

"এই তো গেল ঘরের কথা। 'ঘরে বাইরে'র দরজা খোলা থাকবে দেশবিদেশের বোনদের জন্যও সাগ্রহ, সমাদরে। সমস্যায় ও সংগ্রামে যাদের মিল আছে, সমাধানের পথে যারা অগ্রণী, ভৌগোলিক সীমারেখা টেনে নাম তাদের বিদেশী হলেও, দূরের মানুষ নয় তারা। এমনি আপন জনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে সঙ্কোচ করবে না 'ঘরে বাইরে'।..

"মেয়েদের মুখপত্রে শুধু কি নীরস, কঠোর, একঘেয়ে বঞ্চিত জীবনের ঘ্যানঘ্যানানি দিয়ে থাকবে ঠাসা? আর ঠাঁই হবে না সরস মধুর গল্প-কবিতা-সুসাহিত্যের? সুসাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা না তুলেও মুখপত্রের তরফ থেকে এর সহজ জবাব হোল—'নিশ্চয়ই হবে'। শুধু স্মরণ রাখতে অনুরোধ—নিরুদ্দেশ যাত্রা 'ঘরে বাইরে'র নয়। যুগান্তের বঞ্চনা, মানুষ্যত্বের চরম অবমাননা, নারীত্বের সীমাহীন লাঞ্ছনা থেকে যে মেয়েরা মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে চাইছে—সুসাহিত্য তাদের মনে আনবে আশা, বুকে দেবে ভরসা—শিল্পীর কাছে সাধারণ মানুষের দাবী তো এই-ই।..

"লেখিকারা লিখবেন আর পাঠিকারাই পড়বেন—এমন পর্দ্দানশীন জেনানা মহল মোটেই নয় কিন্তু 'ঘরে বাইরে'। এ ব্যাপারে সমান অধিকার ঘোষণা থাকলো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে।"..

চার-পাঁচ সংখ্যার পর সম্পাদিকা 'ঘরে-বাইরে' প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হন।

একাল। সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদিকা শিপ্রা গুহ। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল মহালয়া ১৩৫৫। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদিকা লিখিয়াছেন :

"আজকের দিনে মানুষের নিরপেক্ষ সত্যবোধ ও সত্যপ্রকাশই একমাত্র পাথেয়। সেই নিরপেক্ষ সত্যবোধই 'একালে'র প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করবে। 'একালে'র মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হবে মানুষের মনুষ্যধর্ম্মী মনের দ্বারা।..'একাল' শুধু সঙ্কীর্ণতম বর্ত্তমানের অরাজকতা, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মহাযুদ্ধের অসহায় আর্ত্তনাদ নয়, 'একাল' সেই আগামী কালের মুখপাত্র, সেই দিনের পথপ্রদর্শক, সেখানে মানুষের দুঃখের শান্তি, সভ্যতার কল্যাণী রূপ। 'একালে'র কথা শুধু সর্ব্বনাশের কথা নয়; সে কথা—প্রতিশ্রুতির কথা, অঙ্গীকারের কথা।

"এই যান্ত্রিক সভ্যতাক্লিষ্ট মানুষের মনে যে সনাতন সত্য আর্ত্তনাদ করছে তাকেই মুক্ত করার কাজ 'একালে'র।..সেই সত্যই মানুষকে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যা নিরপেক্ষ, প্রত্যক্ষ। 'একাল' সেই মানব সভ্যতার জন্মলগ্নে সত্যের পূজারী হতে চলেছে। তার প্রকৃত পরিচয় মানুষের শুভ বুদ্ধির নিরপেক্ষ সত্য নির্ণয়েই।..

"আমি সেই সাধারণ লেখক সমাজকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই—যাদের মাথায় আছে নতুন চিন্তাধারা, কলমে আছে জোর কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রের অভাবে তা লোকচক্ষুর অন্তরালে অবহেলিত। এ ছাড়া 'একাল' পত্রিকা প্রকাশের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

ইহার মাত্র দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয় বা শেষ সংখ্যার তারিখ ২৬ কার্তিক ১৩৫৫।

শ্রীমতী। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা মীরা চৌধুরীর সম্পাদনায় এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানির আবির্ভাব ১৩৫৫ সালের কার্তিক মাসে। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :

"আমাদের দেশ ও সারা পৃথিবীতে নানান কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে; কিন্তু সমস্যা রয়েছে, একথা জোর গলায় প্রচার করলেই সমস্যার সমাধান হয় না।.. আমাদের দরকার এখানে সমস্যাগুলি ভাল ক'রে তলিয়ে বোঝবার; আমরা মেয়েরা, সেখানে কি করতে পারি, কোন পথ ধরতে পারি, বাঁ কি ডাইনে কোন মোড় নিতে পারি, এ সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে ব'লে মনে করি।—আমাদের আশা আছে, সন্ধানী আলো যেমন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিকে কোথায় প্রশস্ত পথ, কোথায় খানা ডোবা, কোথায় পথচলা সরু বাঁকা পথ, কোথায়

ভাঙ্গা সেতুর নির্দেশ দেয়, তেমনি এখানেও; কোথায় আমরা রয়েছি, ও কোন রাস্তা ধরে কত দূর যেতে পারি, তার থেকে একটা আন্দাজ অন্তত আমরা সেই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে পাব। অন্ধকারে, বিচারবুদ্ধিহীন আবেগে কিছু একটা করার তাগিদে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেয়ে পথঘাট জেনে অগ্রসর হওয়া ভাল নয় কি?

"আর একটা খুব বড় অথচ সহজ সত্য আছে, যেটা আমরা ভুলে যাই বা যার যথেষ্ট মর্যাদা দিই না। আমরা ভুলে যাই যে দেশের শাসনতন্ত্রের যে পরিবর্তনই আসুক না কেন, আমাদের বাড়ীঘরকে সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত করবার, আমাদের ছেলেমেয়েদের সুস্থ, শিক্ষিত ও যথাযথভাবে গড়ে তোলবার, আমাদের পারিবারিক জীবনকে প্রীতি ও স্নেহের ভিত্তিতে স্থাপন করার, রুচি ও কলার অনুশীলন করার, পুরোনো-কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে এগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা কখনও যাবে না। এদের দাবী কমবে না বরং বাড়বে। রাজনীতিক বা অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যত এগিয়ে যাই-ই না কেন, আমাদের পারিবারিক জীবন যদি অসুস্থ, অজ্ঞ ও কুরুচিপূর্ণ হয়, তাহলে অন্য সব উন্নতি স্থায়ী হবে না; তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। এ সম্বন্ধে শুধু সজাগ নয়, আমাদের সক্রিয় হ'তে হবে। এই পত্রিকা যদি সামান্যভাবেও সেদিকে সাহায্য করতে পারে, তবে তার সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য কতটা সফলতা সে বিষয় লাভ করবে, তা' নির্ভর করে পাঠকপাঠিকাদের সহযোগিতায় ও নির্ভীক সমালোচনায়। আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব—ও সেই ভাবে পত্রিকাখানিকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করব।..."

'শ্রীমতী' এখনও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

জয়া। ভূতপূর্ব 'ঘরে বাইরে'-সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী দেবী ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় সরকার ইহার প্রচার রহিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই 'ভাগবতীকথা পত্রিকা' মাসিক আকারে ১৩৫৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কিরণচন্দ্র দে চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নবম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৫৬) হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন অনুরূপা দেবী।

সুলতানা। "পূর্ব্ব পাকিস্তানের সর্ব্বপ্রথম মহিলা সাপ্তাহিক।" প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৯। সম্পাদিকা বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজু। বাংলার মহিলা-সমাজের উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়া এই

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু দীর্ঘজীবী হইতে পারে নাই; ইহার শেষ সংখ্যার তারিখ ২৯এ এপ্রিল।

নওবাহার। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৫৬; সম্পাদিকা মাহ্‌ফুজা খাতুন, কবি গোলাম মোস্তাফার পত্নী। ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ :

" 'নওবাহার' কোন দলীয় প্রচার-পত্র নয়। এ নিছক একখানি সাহিত্য-পত্র। ইহাতে থাকিবে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের প্রকাশ। বাস্তব রাজনীতির কোন আলোচনা ইহাতে থাকিবে না, তবে রাজনৈতিক চিন্তা ও দর্শন—যাহা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—তাহার আলোচনায় বাধা নাই।

"পাকিস্তান-বিরোধী কোন বিষয়বস্তুও 'নওবাহারে' স্থান পাইবে না; তবে প্রয়োজন বোধে কোন কোন বিষয়ে সুস্থ গঠন-মূলক সমালোচনা ও ইঙ্গিত দ্বারা গভর্নমেণ্ট এবং দেশবাসীকে আমরা সাহায্য করিব।..

"নারী-প্রগতি 'নওবাহারে'র অন্যতম সাধনা হইবে। তবে নারী-প্রগতির আধুনিক বিকৃত আদর্শ আমরা গ্রহণ করিব না। নারীর সত্যিকার জাগরণই আমরা কামনা করিব। ইসলাম নারীজাতিকে যে অধিকার ও মর্য্যাদা দিয়াছে, তাহাকে সমাজে আমরা রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিব। পাকিস্তানের নারীরা যাহাতে পাকিস্তানমনাঃ হইয়া উঠেন; গৃহ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মুসলিম জাহানের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধ যাহাতে তীক্ষ্ণ হয়, এবং সর্ব্বোপরি বিশ্ব-সভায় যাহাতে বাংলার মুসলিম নারী তাঁহার গৌরবময় আসন লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য 'নওবাহার' সর্ব্বদাই তাঁহাদের খিদমতে হাজির থাকিবে।"

মানসী। "পূর্ব্ববঙ্গের অভিজাত মাসিক পত্রিকা", পাবনা হইতে ১৩৫৭ আশ্বিন মাসে প্রকাশিত। সম্পাদিকা—কুমারী জ্যোৎস্নারাণী দত্ত, সহঃসম্পাদিকা—অণিমা গুপ্তা।

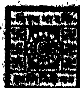
এই ইতিহাস হয়ত সম্পূর্ণ নয়। দ্রুত ধাবমান কালের সহিত তাল রাখিয়া নারীরাও চলিতে চাহিয়াছেন, নূতন যুগের নূতন কথা বলিবার জন্য তাঁহাদের কণ্ঠ মুখর হইয়াছে। বর্ষারম্ভে নবাঙ্কুরের মত নব নব পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ করিয়াছে, আবার কালের স্রোতে তাহাদের বিলয়ও ঘটিয়াছে, আমাদের কাল পর্য্যন্ত তাহাদের প্রভাব পৌঁছায় নাই। উপযুক্ত কর্ম্মী সন্ধানের কাজে হস্তক্ষেপ করিলে, আমার বিশ্বাস আছে, বাঙালী মেয়েদের সমগ্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ইতিহাস এক দিন উদ্ঘাটিত হইবে। সে কাজের ভার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

বিষয়-সূচী

ওড়িয়া সাহিত্য

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫৮ ।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

৯১. ওড়িয়া সাহিত্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

৯২. অসমীয়া সাহিত্য

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

৯৩. জৈনধর্ম

ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

৯৪. ভাইটামিন

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

৯৫. মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণমনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০-১৩৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৯০ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

ওড়িয়া সাহিত্য

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৮ শ্রাবণ

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
৬.১

ভূমিকা

ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে ঐক্যসূত্রের মধ্যে তাহার সাহিত্য অন্যতম। ভাষা ও লিপির স্থানীয় পার্থক্য সত্বেও উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে সংস্কৃতি এক, সাহিত্য এক। সেইজন্য আমরা যতই পরস্পরের সাহিত্য লইয়া চর্চা করিব, ততই পরস্পরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইব বলিয়া আমার বিশ্বাস।

পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদার পরিকল্পনায় ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁহার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে পারিলে আজ আমাদের পরস্পর সম্বন্ধ মধুময় হইয়া উঠিত— বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী পরস্পরের ঐতিহ্য জানিতে পারিয়া পরস্পরে শ্রদ্ধাবান হইতাম। কিন্তু আমরা তাহা পারিলাম না। ভারতে ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের গণ্ডী ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া এখন বিলোপের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে; আমাদেরই কৃতকর্মের অথবা অক্ষমতার পরিণাম, দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

ওড়িয়া সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। পরলোকগত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয় প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বর্তমান লেখককে এ বিষয়ে বাংলায় চর্চা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহার পর ১৯২৩ সালে স্যর আশুতোষ অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই ১৯২৩ আর আজ ১৯৫১।

পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে ওড়িয়া সাহিত্যের আনুপূর্বিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাংলায় মূল অনুবাদ করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই— পাঠকের পক্ষে সাধারণত ওড়িয়া উদ্ধৃতি বুঝিতে কঠিন হইবে না

বলিয়া মনে করি। কিন্তু উচ্চারণের জন্য বর্ণকে যথাযোগ্য চিহ্ন দিয়া সুনির্দিষ্ট করিতে পারি নাই। ওড়িয়ায় ন ও ণ-এর উচ্চারণ পৃথক, ণ সত্যসত্যই মূর্ধন্য। ল দুই জাতীয়, মূর্ধন্য ল উচ্চারণে ড়-এর কাছাকাছি আসিয়া যায়। ওড়িয়া 'য়' ও 'অ'তে স্পষ্ট প্রভেদ আছে, আমরা বাংলায় সে প্রভেদ বড় করি না। এই প্রভেদগুলি যথাস্থানে দেখাইয়া দিতে পারি নাই; তবে সেজন্য অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটিবে না।

পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আমার কৃতজ্ঞতা অর্জন করিলেন, কারণ তাঁহারা ভারতভাষা-চর্চায় আমাকে আনুকূল্য করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কর্মীরা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতার সহিত সাহায্য না করিলে ইহার প্রকাশকাল আরও ব্যাহত হইত।

বাংলা ও উড়িষ্যা, দুই দেশ পাশাপাশি; ওড়িয়া সাহিত্য আমাদের প্রতিবেশী সাহিত্য। তাহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে চাহিব, ইহা তো সাধারণ কৌতূহলের কথা। এককালে বাংলা ও উড়িষ্যার যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল; সে যোগ এখনও আছে। রাজনৈতিক চেষ্টায় সে যোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কারণ তাহা সংস্কৃতির যোগ। ব্যক্তির জীবনে নাড়ির যে টান, জাতীয় জীবনে সংস্কৃতির টান তাহার অনুরূপ; বাহিরের আগন্তুক কারণে সে টান অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে।

উড়িষ্যা আজ বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র; তাহার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় কালক্রমে তাহার সংস্কৃতিকে আরও বিশিষ্ট, আরও স্বতন্ত্র করিয়া তুলিবে। প্রতিবেশীর প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার যে সাধনা, উড়িষ্যা আজ সেই সাধনায় ব্রতী। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র আত্মস্থ হউক, তাহাদের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকুক, তাহাতে পরস্পরের পক্ষে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হইবে না, বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য পরস্পরকে বরং আরও ভালো করিয়া জানিতে হইবে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সামান্য নহে। হৃদয়ের অনুভূতিকে সাহিত্য বহন করিয়া আনে, রাখিয়া দেয় দূর-দূরান্তের ভবিষ্যবংশীয়দের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে; তাহা অন্তরের যোগকে দৃঢ় করে, শিথিল করে না। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র আছে, তাহা আছে আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে ছড়াইয়া। বৈশিষ্ট্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ভারতের ঐক্যের ও অখণ্ডতার এত বড় প্রমাণ আর কিছু আছে কি না সন্দেহ।

যেসব বাঙালী উড়িষ্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এখানে স্মরণীয়। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব লইয়া বিস্তর গবেষণা করিয়া গিয়াছেন; মনোমোহন চক্রবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর

শেষভাগে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল-এর মুখপত্রে প্রকাশিত করেন ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ; প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর মত বৈষ্ণবশাস্ত্রে রসিক পণ্ডিতেরা উড়িষ্যার ভক্তদের লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন গাঙ্গুলি মহাশয়দ্বয় উড়িষ্যার ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন ; অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতভাষ বিভাগের দিক হইতে ওড়িয়া সাহিত্যের নিদর্শন সংকলন করিতে করিতে সাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন, অধ্যাপক প্রভাত মুখোপাধ্যায় উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা করিয়াছেন ; তা ছাড়া অধ্যাপক নির্মলকুমাব বসুব কনারকের মন্দির ও উড়িষ্যার স্থাপত্যের মূলনীতি সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ, এবং ডক্টব বিমানবিহারী মজুমদারের শ্রীচৈতন্যচরিতেব উপাদান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

২

ওড়িয়া সাহিত্যের প্রাচীনতম উদাহরণ খুজিতে গিয়া গোলে পড়িতে হয়, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের রূপ হইতে আমাদেব প্রাদেশিক ভাষাগুলি কখন কি ভাবে স্বতন্ত্র রূপ পাইল, তাহার বিচার করিতে হয়। সে বিচার চূড়ান্ত নহে। প্রমাণ পাওয়া ও তাহা পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করার উপর বিচার নির্ভর করে। ইতিহাসের আশ্রয় তো অবশ্যই লইতে হয়। উড়িষ্যায় তাম্রলিপি ও শিলালিপির অভাব নাই ; এখনও কতই-না 'পাথুরে প্রমাণ' দুর্গম বনে-জঙ্গলে অযত্নে পড়িয়া আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য আলোচনার পূর্বেও রাজনৈতিক ইতিহাসের খানিকটা দিগ্‌দর্শন প্রয়োজনীয়। বৌদ্ধ জৈন হিন্দু প্রভৃতি নানা ধর্মাবলম্বী বিবিধ বংশের

কীর্তিকলাপের কথা ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ হইতে আরম্ভ করি।

মত্রদেশের অন্তর্গত গঙ্গবাড়িতে প্রসিদ্ধ ধনকনকসমৃদ্ধ অনন্তবর্মা গঙ্গবংশের প্রবর্তক। অনন্তবর্মার পব কয়েকজন রাজা হন, তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম কামার্ণব নামে একজন পবাক্রান্ত রাজা ছিলেন, কলিঙ্গদের সাহায্যে তিনি উড্রদেশ জয করেন। তাঁহার পরে চোড়গঙ্গদেব বা গঙ্গেশ্বরদেব গঙ্গা হইতে গোদাববী পযন্ত বিস্তৃত ভূভাগ জয় করিয়া কর আদায় কবিয়াছিলেন। ইনিই উৎকলের প্রথম 'সম্রাট'। একাদশ শতকেব শেষাংশে সিংহাসনে আরোহণ কবিয়া ইনি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব কবেন। ইঁহার বংশে অনঙ্গভীমদেব জন্মগ্রহণ কবেন, তাঁহাব পুত্র নবসিংহদেব— ইনিই লাঙ্গুলা নরসিংহদেব। এই নবসিংহদেব ১২৩৮ হইতে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কবেন, ইনি যুদ্ধে মুসলমানদিগকে পবাজিত কবেন, এবং দেশবিশ্রুত কনারকের মন্দির ইঁহাবই কীর্তি।

গঙ্গবংশীয় শেষরাজার পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহাব পরে সূর্যবংশীয় কপিল সামন্ত বায় রাজা হন। পঞ্চদশ শতকেব মধ্যভাগে (সম্ভবত ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি পুবীক্ষেত্রে অভিষিক্ত হইয়া 'কপিলেশ্বর দেব' এই (কাহারও মতে বাজার নাম কপিল ভানু বা কপিল নবসিংহ) নাম ধারণ কবেন। আজকালকার পণ্ডিতদের অধিকাংশেবই ধারণা, ইনি প্রকৃতপক্ষে গঙ্গবংশেবই। ইঁহাব বাজত্বেব সময় হইতে এক বিশেষ অব্দ চলিয়া আসিতেছে— কপিলেশ্বরাব্দ। কপিলেশ্বরদেব ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি বীর যোদ্ধা ছিলেন, দক্ষিণে গঙ্গবংশীয় খেমণ্ডির রাজা বিদ্রোহ করিলে তাহা নিবাবণ করেন, আবার বঙ্গের সুলতান নাসিরুদ্দীনেব সঙ্গে যুদ্ধ কবিয়া তাঁহাকেও হারাইয়া দেন। পরে তিনি ক্রমে ক্রমে বিজয়নগর, 'বাহমনি' বাজ্য, বিদর্ভ রাজ্য, ও দক্ষিণে রামেশ্বর

পর্যন্ত বিজয়-পতাকা উড়াইয়াছিলেন, এবং বিজয়-অভিযান হইতে ফিরিবার সময়ে বিজয়বাটিকায় (এখনকার 'বেজোয়াড়া', এবং ওড়িয়ায়, বিজয় করিয়া প্রত্যাবর্তন অর্থে 'বিজয়-বাহুড়া'), কিছুকাল বিশ্রাম করেন। ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাব দেহান্ত হয়।

কপিলেশ্বর বা কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র পুরুষোত্তম দেব। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব কবেন। পুরুষোত্তম দানশীল ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি কাঞ্চীবাজদুহিতা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ কবেন, পদ্মাবতীকে লাভ করিবাব জন্য তাঁহাকে যুদ্ধ পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল। পুরুষোত্তমের কাঞ্চী-বিজয় ওডিয়া সাহিত্যে রূপ পাইয়াছে।

পুরুষোত্তমদেবেব পর প্রতাপরুদ্রদেব বাজা হন। ইহার সময়ে উড়িষ্যাব উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কোন প্রবল বাজা প্রতিবেশী না থাকায় ইনি অনায়াসে উড়িষ্যা রাজ্যের সীমানা বিস্তাব করিতে পাবিতেন, অন্তত সে চেষ্টা তাঁহাব থাকিতে পাবিত, কিন্তু তিনি সেদিক দিয়াই যান নাই। কিন্তু তাঁহাকে দূববর্তী রাজ্যেব প্রবল আক্রমণ প্রতিহত কবিতে হইয়াছিল। তিনি ১৫৪০ সাল পযন্ত জীবিত ছিলেন, তাঁহাবই রাজত্বকালে চৈতন্যদেব উড়িষ্যায় আসেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিষয়ী এবং রাজা-মহারাজাব মুখ দর্শনে ইচ্ছুক না থাকিলেও প্রতাপরুদ্র সুকৌশলে এবং ভক্তি ও বৈষ্ণবোচিত দীনতাব গুণে তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হন।

প্রতাপরুদ্রেব মৃত্যুর পব তাঁহার দুই পুত্র পর পব সিংহাসনে বসেন। মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর কূটচক্রান্তেব বলে উভয়কেই হত্যা করান, তাহার পর তিনি নিজেই রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। কপিলেন্দ্র হইতে প্রতাপরুদ্র পর্যন্ত উডিষ্যা এযাবৎকাল তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল; ঠিক এই সময়ে উত্তরভাবতে বিদেশী মুসলমানদের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু উড়িষ্যা জয় করা তো দূরের কথা, তাহারা সেখানে প্রবেশের অধিকার

লাভেই সমর্থ হয় নাই। তখনকার দিনে পথঘাট নিরাপদ ছিল না, বিদ্যা-শিক্ষার জন্য উড়িষ্যা হইতে কাশী বা অন্যত্র যাওয়া সাধারণত বিপজ্জনক ছিল; তাই ওড়িয়া বিদ্যার্থিগণ নিজের দেশে থাকিয়াই বিদ্যার্জন করিতে বাধ্য হন। ফলে উড়িষ্যার স্মৃতি, উড়িষ্যাব ন্যায়শাস্ত্র—এসকলের স্বাতন্ত্র্য আসিল, ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতিও দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িল, সারলা দাস প্রমুখ লেখকের আবির্ভাবও সম্ভব হইল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা উপেক্ষিত হয় নাই; কপিলেন্দ্রদেব নিজেই সংস্কৃত ভাষায় পরশুরাম-বিজয় নামে এক নাটক লেখেন, সরস্বতী-বিলাস নামে সংস্কৃতে নিবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ না কি প্রতাপরুদ্রের রচনা।

প্রতাপরুদ্রদেবের দুই পুত্রকে হত্যা করিয়া গোবিন্দবিদ্যাধর উড়িষ্যাব রাজা হইয়া বসিলেন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার পিতা কয়েকটি গ্রামের অধিকারী বা 'ভোগী' ছিলেন বলিয়া গোবিন্দ-বিদ্যাধরের বংশকে 'ভোগী' বা 'ভোই' বংশ বলে। আট বৎসর রাজত্ব করার পর গোবিন্দবিদ্যাধরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ও পৌত্র পরপর রাজা হইলেন, অবশেষে তেলিঙ্গা মুকুন্দদেব ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবর বাদশাহ যখন একে একে উত্তরভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন মুকুন্দদেব মোগল সম্রাটের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। আকবর যখন চিতোর আক্রমণে ব্যস্ত, তখন কিন্তু বঙ্গের নবাব সুলেমান কররানি অতর্কিতে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। মুকুন্দদেবের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া সুলেমান পলাইয়া যান। মুকুন্দদেব তাঁহাকে দামোদর পর্যন্ত তাড়া করিয়া যান, হুগলী জেলার ত্রিবেণী পর্যন্ত তিনি আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু নিজ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় হার স্বীকার করিয়া মুকুন্দদেব সন্ধি করিতে বাধ্য হন, এবং কটকে ফিরিয়া আসেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় কটক আক্রমণ ও অধিকার করেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদের

সঙ্গে যুদ্ধে মুকুন্দদেব নিহত হন। কালাপাহাড় পুরীর দিকে অগ্রসর হইলেন। উড়িষ্যার গৌরবরবি অস্ত গেল।

পাঠানেরা কটকের বারবাটি কেল্লা দখল করিয়া বসিল বটে, কিন্তু মুসলমান প্রভাব উড়িষ্যার বেশি দূর ছড়াইয়া পড়িতে পারিল না। সামন্ত নরপতিরা স্ব স্ব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহু বিস্তৃত রাজ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড শাসন করিতেন, এই দিক দিয়া দেখিলে উড়িষ্যা বহুধা বিভক্ত ছিল, এখন সেখানে প্রধানত দুই ভাগ স্পষ্ট করিয়া দেখা দিল। একদিকে সমতল সুগম ক্ষেত্রে মোগলবন্ধ, সেখানে মোগলদের অধিকার, পাঠানেরাও মোগলবাদশাহের প্রতিপত্তিকে অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠিত রহিল, দেশের অন্যান্য ভূস্বামীরাও মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত দুর্গম গিরিদরিকান্তার-পরিরক্ষিত গড়জাত, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকারী হিন্দুরাজগণ বস্তুত স্বাধীন ভাবেই নিজেদের রাজ্য শাসন করিতেন। এ পর্যন্ত সংস্কারকের সংশুদ্ধির স্পর্শ এড়াইয়া গড়জাত তাহার সনাতন সরল ঐতিহ্যকে মানিয়া চলিয়া আসিতেছিল, ভারতের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও বহুলপরিমাণে কমিয়া যাইতে বাধ্য। ইংরেজশাসিত ও ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষের মধ্যে যে সীমারেখা, ইংরেজ-শাসনের অবসানে তাহা তো বিলীন হইবেই, উড়িষ্যায়ও সকল অংশের সমত্ব কালক্রমে অধিকতর পরিস্ফুট হইবে, গড়জাতের স্বতন্ত্র সত্তা আজও আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা বেশি দিন এভাবে থাকিবে না, থাকিতে পারে না।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া উড়িষ্যায় মোগল-পাঠানের প্রভাব ছিল, তাহার পরে মারাঠা শক্তি উড়িষ্যায় আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল। বিনা যুদ্ধে এ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই, এবং প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যও গড়জাতে সর্বত্র জয়লাভ করিতে পারে নাই। অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শনের

মধ্যে কটকের কাঠজোড়ি নদীর ধারে ধারে যে প্রস্তরনির্মিত বাঁধ, তাহা মারাঠাদের তৈয়ারি না হউক, তাহাদের দ্বারা সংস্কৃত বলিয়া জনশ্রুতি।

মারাঠা ও ইংরেজের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লইয়া যে কলহ হয় তাহার অবসান ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা হতবল হইলেও তাহাদের আধিপত্য বড় কমে নাই। তখনও ফরাসী-ইংরেজে দস্তুরমত সাম্রাজ্যঘটিত বিরোধ চলিতেছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা ও ইংরেজের মধ্যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে ঐ বৎসরে উড়িষ্যা ইংরেজের শাসনে আসে। সেই হইতে উড়িষ্যা, ভারতে ব্রিটিশশাসিত অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে।

৩

প্রথম ওড়িয়া লিপির আবির্ভাব— না বিবর্তন বলিব ?— কোন সময়ে হইয়াছিল, সাহিত্যই বা কবে রচিত হইতে আরম্ভ হইল, কি ছিল তাহার রূপ, এসব প্রশ্ন এখানে ওঠা স্বাভাবিক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে গিয়া বৌদ্ধ গান ও দোহা খুজিয়া বাহির করেন। তাঁহার মতে সেগুলি হাজার বছরের পুরানো বাংলা। কিন্তু তাহার ভাষা, বিশেষ করিয়া শব্দসংগঠন দেখিয়া পূর্বভারতের বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিতেরা তাহাকে আপনার আপনার বলিয়া দাবি করিতেছেন। আসাম ও মিথিলার মত উড়িষ্যাতেও দাবি জানানো হইয়াছে যে, ঐ দোহাগুলি বাংলার নহে, অন্য প্রদেশের। পূর্বভারতের সংস্কৃতি এতই একরূপ, এবং ভাষার দিক দিয়াও পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় এত সাদৃশ্য আছে যে, ভাষা বিষয়ে মীমাংসার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়। সাধনপদ্ধতি, পদবন্ধ, ঐতিহ্য— এ-সকলের কথাও আলোচনা করিতে হইবে বই কি। বাংলার সম্বন্ধে

এইটুকু বলা চলে যে, অপভ্রংশ হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করিবার পথে দোহার ভাষা বাংলার দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছে। তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, তখনও বাংলা স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে ভাগ হয় নাই। দোহা যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোনও সাধক যে বাঙালী ছিলেন, ইহা অস্বীকার করা চলে না, কেহ কেহ ওড়িয়া ছিলেন, বা উড়িষ্যা হইতে গিয়াছিলেন, এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। লেখক লইয়া আলোচনায় লাভ নাই, ভাষা লইয়াই বিচার চলিতে পারে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের ঝোঁক এ পর্যন্ত বাংলার দিকেই দেখা যাইতেছে।

পুরাতন তাম্রশাসনে সন্ধান লওয়া যাক। পণ্ডিতেরা অনন্তবর্মদেবের (মণ্ডাসা) ৯১৩ শকাব্দের, অর্থাৎ ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের, তাম্রশাসনের তৃতীয় ফলকে দেখিয়াছেন—

সরদের সনিধে গাড়সীমা এতশ্চ ভিতুরু সামান্থ পদনব ·

ইহার মধ্যে 'ভিতুরু' কথাটায় ওড়িয়া পঞ্চমী বিভক্তি '-রু', 'গাড' কথাটা ওড়িয়া শব্দ, স ব ম স্পষ্ট বাংলা অক্ষর, এবং ঐসকলের অন্য কয়েকটি বর্ণ সাধারণ ওড়িয়া লিপি।

চর্যাগীতির মধ্যে যে মিশ্রণ বা মিলন, এখানেও তাহার পরিচয় পাই। পরে অবশ্য ভুবনেশ্বর ও কনারকের লিপির নিদর্শনে ওড়িয়া বর্ণ আরও স্পষ্ট হয়।

শিলালিপিতে ওড়িয়া শব্দের প্রয়োগ এই প্রথম।

৪

লোকে মুখে মুখে গান রচনা করে, গান গায়, পরবর্তী যুগে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জোড়াতালি দিয়া ছোট ছোট আখ্যায়িকা বা গাথা প্রস্তুত করে। ধীরে ধীরে একটা সাহিত্যিক রীতি গড়িয়া উঠিলে তবে বড় বড় আখ্যায়িকা

রচিত হয়। ক্রমে বড় বড় কাব্যের অনুবাদ প্রস্তুত হয়, পুরাণেরও অনুবাদ করা হয়, এসকলের জন্য যথেষ্ট ধৈর্যের এবং ভাষার প্রসারের প্রয়োজন হয়। ওড়িয়া সাহিত্যে এই সাহিত্যরীতি কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আলোচনা-সাপেক্ষ। একপ্রকার শ্লোক প্রাচীনকালে জনগণের মুখে মুখে শোনা যাইত, 'খনার বচন' 'ডাকের বচন' নামে তাহাদের পরিচয়। বাংলায় ও অসমিয়ায় এরূপ বিস্তর বচন আছে। ওড়িয়াতে ডাকের বচন 'কৃষিপরাশরে' কিছু কিছু সংগ্রহ করা আছে। দুই একটি উদাহরণ দিই—

যেবে বর্ষই মাঘর শেষ   ধন্য সে রাজা ধন্য সে দেশ।

আবার—

উত্তর মেঘ দক্ষিণে পশে   নাথে বোইলে পুতা নিশ্চে বরষে।

এইভাবে লোকযাত্রার সম্বন্ধে বহুলোকের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অথবা—

শ্রাবণ মাসর কৃষ্ণা চৌথি।
চৌদিগ যেবে মেঘ ন উঠি॥
পূর্ব পশ্চিমে যেবে ন বহুই বা,
বাপা বোইলে পুত রে দেশান্তর যা॥

ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য কিন্তু অনেক পরিমাণে সংস্কৃতের অনুগামী; সুতরাং সংস্কৃত ভাষার রীতি ও সাহিত্যভাবনা, ওড়িয়া তৈরিই পাইয়াছে, সমস্তটা নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হয় নাই। বিশেষ লক্ষণযুক্ত এক শ্রেণীর কবিতা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার নাম চৌতিশা। ওড়িয়ায় বিস্তর চৌতিশা আছে। চৌতিশার অর্থ— বর্ণমালার চৌত্রিশ বর্ণের প্রত্যেকটি বর্ণ দিয়া আরম্ভ করা এক এক চরণ, এমন ধারা কবিতা বা পদ। এইসব পদ সুর করিয়া গাওয়া হইত, গাহিবার জন্যই চৌতিশার রচনা। তবে প্রাচীন ওড়িয়ায় সব কবিতাই তো গাওয়া হইত, বাংলারই বা অন্যরূপ কিসে? অধুনালুপ্ত প্রাচীসমিতি কয়েকবৎসর

পূর্বে জানাইয়াছিলেন, প্রায় দুই শত চৌতিশা সেদিন পর্যন্ত সমিতির হস্তগত হইয়াছে। পরবর্তীকালের বহু কবি বহু চৌতিশা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রথমযুগের কিছু কিছু চৌতিশা এখনও আছে ; প্রাচীন চৌতিশার মধ্যে কলসা চৌতিশার নাম করা যাইতে পারে। ইহার রচয়িতার নাম ছিল বচ্ছাদাস (বৎসদাস ?)। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

> কহন্তি কামিনী শুণ হেমন্ত দুলণি। কাহুঁবরে বরিলে তুম্ভর পিতামণি ॥
> কুল মূল গোত্র আদি নাহিঁ জাণ তার। কনকবেদীবে বুঢা বসিছি মধ্যর ॥

একজন নারী আসিয়া পার্বতীকে বলিল, শোন গো হিমালয়ের দুলালি ! তোমার বাবা কাহাকে বর বলিয়া বরণ করিলেন ? তাহার কুল বংশ গোত্র কিছুই তো জান না ; বুড়া দিব্য গিয়া কনকবেদীর মাঝখানে বসিয়াছে। এমন ধারা বুড়া বর, ভালো করিয়া দেখিয়া লও। বরের পাশে তোমাকে যে উহার নাতনীর মত মনে হইবে। তোমার কপালে বড় কষ্ট ; উহার দাঁত নাই, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না ; রাত্রে এই বুড়াকে দেখিলে ভয় পাইবে যে ! সখীর কথা শুনিয়া পার্বতী মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অমনি 'কি হইল' 'কি হইল' বলিয়া মা ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। মেয়ে বলিলেন—

> দইনি কবি কহুছি শুণ মোব মায়ে। দন্তে তিরিণ ধবিণ ওলগই পাযে ॥
> দরিদ্র হীন বুঢাবু যেবে মোতে দেবু। দুই নয়নরে মোব মবণ দেখিবু ॥

মাগো, শোন্নো, দীনভাবে বলিতেছি— দন্তে তৃণ ধরিয়া, পায়ে দণ্ডবৎ হইয়া বলি : আমাকে যদি দরিদ্র হীন বুড়ার হাতে দাও, তাহা হইলে দুই চোখে আমার মরণ দেখিতে পাইবে।

এমন কথার পর মায়ে-ঝিয়ে হিমালয়ের কাছে চলিলেন, সব কথা শুনিয়া হিমালয় বলিলেন—

> বিচার ন কর মাএ ঝিএ দুহেঁ তুম্ভে। বিকল মনরু ছাড কহুঅছুঁ আম্ভে ॥
> ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবতাএ ছন্তি তাঙ্কু বেঢ়ি। বড় ভাগ্যবন্ত গৌরী পুণ্যে অছি বঢ়ি ॥

তোমরা মায়ে-ঝিয়ে দু জনা বিচাব কবিঁও না, আমি বলিতেছি, মনেব এই অস্থিবতা ছাড। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবতা তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন, গৌবীব ভাগ্য ভালো, তাহার পুণ্যবল খুব।

হিমালয়েব কথা অনুসারে বিবাহ হইল। তাহার পব হইল অন্যান্য মঙ্গল উৎসব—

সুলক্ষণে বরকন্যা কবুছন্তি ভাব।
শোভা পাড়ছন্তি দুঁহে বতি কামদেব॥
হেমন্তব বাণী দেখি সন্তোষ হোইলে।
হীন পবপঞ্চ বেশ যহুঁ পকাইলে॥
হোইলে সন্তোষ যে সকল লোক দেখি।
হাস্য কবুছন্তি সহী সঙ্গাতুণী দেখি॥
ছছন্দে চউঠি সাবি কাদ খেলি গলে।
ছ সাত অষ্টমঙ্গলা উচ্ছব সারিলে॥
ক্ষিতিপতি ঠাকুব সে কপিলাসে স্থিতি।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি বচ্ছাদাস কলসা পঢন্তি॥

বিবাহেব চতুর্থ দিবসেব পব মেয়ে-ছেলে সকলে কাদা-হলুদ খেলে, জামাই একা একদিকে। ষষ্ঠ দিনে বেদীতে কড়ি পুতিতে হয়। সপ্তম দিনে মঙ্গলসূত্র খুলিয়া দেয়, মেযেবা আসিয়া ববকন্যার মঙ্গলসূত্র খোলে। অষ্টমদিনে জামাই ও শ্বশুববাড়ীব লোক (স্ত্রী সমেত) কেহ কাহাবও মুখ দেখে না।

এই 'বচ্ছাদাস' বা বৎসদাস কে ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও বিবরণ জানা যায় না। কিন্তু চৌতিশাকারদেব মধ্যে ইঁহাকে প্রাচীনতম বলিয়া গণ্য কবা হয়।

চৌতিশা বাগরাগিণী সহকারে গাওয়া হইত। তাই ইহাকে বর্তমান উড়িষ্যাবাসীদেব মধ্যে কেহ কেহ অমিশ্র ওড়িয়া কবিতা বলিয়া মনে কবেন, এবং বর্তমান যুগের (বিশেষত বাঙালীপ্রভাবে রচিত)

উড়িয়া কবিতাকে বিকৃত বলিয়া ভাবেন। চৌতিশার গুরুত্ব কতদূর, ইহা হইতেও তাহা অনুমান করা যায়।

এই চৌতিশাব একটি প্রকারভেদ হইল কোইলি। কোইলি কথার অর্থ কোকিল। কবিতার প্রতি বিভাগের আরম্ভে ও শেষে 'কোইলি' বলিয়া ডাক আছে। কাঠামো কিন্তু চৌতিশাবই অনুরূপ। বিষয় যাহাই হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। এমন কি, এই যে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ কয়েকবৎসব পূর্বে গত হইয়াছে, যাহার কবাল ছায়া কযেক বৎসব পূর্বে আমাদের দেশে পড়িয়াছিল, তাহা লইয়াও কোইলি রচিত হইযাছে। এই জাতীয় গীতের মধ্যে মার্কণ্ড দাসেব 'কেশব কোইলি' প্রথম বলিয়া কিংবদন্তী আছে। বিজয়চন্দ্র মজুমদাব মহাশয়ের মতে ইহা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত, তাহাব পরবর্তী নহে। শ্রীমদ্ভাগবতেব ভ্রমরগীতে গোপীরা যেমন খোলাখুলি উদ্ধবের সঙ্গে কথা না বলিয়া ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, এই কোইলিটিতে তেমনি কোকিলকে উপলক্ষ্য কবিয়া যশোদাব যাবতীয কথা বলা হইয়াছে। একটু নমুনা—

> কোইলি। কেশব যে মথুরাকু গলা।
> কাহা বোলে গলা পুত্র বাহুড়ি নইলা॥ (লো কোইলি)
> কোইলি। খণ্ডক্ষীর দেবি মুঁ কাহাকু।
> খাইবার পুত্র গলা মথুবাপুবকু॥ (লো কোইলি)
> কোইলি। গলা পুত্র বাহুড়ি নইলা।
> গহনত বৃন্দাবন শোভা ন পাইলা॥ (লো কোইলি)
> কোইলি। ঘব মোর ন মণন্তি নন্দ।
> ঘটন ন দিশে পুর ন থিলে গোবিন্দ॥ (লো কোইলি)
> কোইলি। নন্দ দেহ পাষাণে গঢ়িলা।
> নয়নে কজ্জল দেই রথে বসাইলা॥ (লো কোইলি)

এই ভাবে এ কোইলি চলিযাছে। চৌত্রিশা চৌত্রিশ অক্ষরে, ক হইতে ক্ষ পর্যন্ত। ক চ ট ত প এই পাঁচটি বর্গ, য র ল ব এই চারটি,

শ ষ স, হ ও ক্ষ মোট চৌত্রিশ। ঙ বা ঞ স্থলে ন, যেমন উপরে 'নন্দ'; সেইরূপ ণ স্থলে অন্ বা অ বা আ, ষ স্থলে স, ঙ স্থলে ল।

শঙ্কর দাসের বারমাসী কোইলিতে কিন্তু এই চৌতিশার চিহ্ন মাত্র নাই। তিনি অগ্রহায়ণ হইতে বর্ষ গণনা করিয়াছেন—'এহি মগুশির মাস· ·', মগুশির অর্থাৎ মার্গশীর্ষ, অগ্রহায়ণ।

৫

প্রবচন, চৌতিশা ও কোইলিব কথা বাদ দিয়া, সারলা দাসের মহাভারতকে নিঃসন্দেহে ওডিয়া সাহিত্যের প্রথম জয়স্তম্ভ বলা যাইতে পারে। লেখক বার বার নিজেব দৈন্যের কথা বলিযাছেন, গ্রন্থারম্ভে গণেশ-বন্দনাব সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন কবিয়াছেন—

জন্মে জন্মে শূদ্রমুনি যে সাবলা দাস।

গণেশ-বন্দনাব পরেই তিনি সারলাদেবীব বন্দনা করিয়াছেন। কটক জেলার অন্তর্গত জগৎসিংপুরের নিকটে ঝঙ্কড় নামে গ্রাম, সেই গ্রামে মাহেশ্বরী শ্রীসারলাচণ্ডী বিবাজ কবেন, প্রত্যক্ষ দেবতা তিনি, তাঁহার আজ্ঞামতে তাঁহার সন্তান ভাষায ভারতকথা বলিয়াছেন—

সাবলা চণ্ডী সাক্ষাতে অটই ভৈরবী।
তাহাব পুত্র সাবলা দাস মুহিঁ কবি॥
সুপ্রসন্নে আজ্ঞা মোতে দেলে শাকম্ভবী।
লভ তু বিলাস মহাভাবত বিস্তারি॥
শুণ সুজ্জ বুধজনে কবি একচিত্ত।
জন্মক মূরুখ মুহিঁ মুহই পণ্ডিত॥

সারলা চণ্ডী সাক্ষাৎ ভৈরবী, আমি তাঁহার পুত্র কবি শ্রীসারলা দাস

দেবী সুপ্রসন্ন হইয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, মহাভারত প্রচার করিয়া তুমি আনন্দলাভ কর। পণ্ডিতেরা একমনে শ্রবণ করুন; আমি আজন্ম মূর্খ। পণ্ডিত নহি।'

এইভাবে কবি বার বার শূদ্রমুনি বলিয়া, অপণ্ডিত বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাভারতের কথা ইচ্ছামত বা প্রয়োজনমত বাড়াইয়াছেন কমাইয়াছেন। পর্বানুক্রমণিকাতেও অন্ধভাবে মূলের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার পর্বানুক্রমণিকা মূল মহাভারতের অনুযায়ী নহে। তাঁহার পর্বক্রম এইরূপ: আদ্যপব, তাহার পর সভাপর্ব বনপর্ব বিরাট-পর্ব উদ্‌যোগপর্ব ভীষ্মপর্ব দ্রোণপর্ব কর্ণপর্ব শল্যপর্ব ঐষিকপর্ব গদাপর্ব শান্তিপর্ব অশ্বমেধ আশ্রমিক মুষলীপর্ব স্বর্গারোহণ— এসব তিনি অনুবাদ-মাত্র করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, যুধিষ্ঠিরের জন্মকাল নির্দেশ করিতে গিয়া মূল মহাভারতে যাহা তিন চরণে বলা হইয়াছে, সারলা দাস তাহা চারগুণ বাড়াইয়া বারো চরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই বাড়ানো নিরর্থক হয় নাই, গ্রহ-নক্ষত্রের আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য সম্বন্ধে তাঁহার যে গভীর জ্ঞান ছিল, বর্ধিত আয়তনে তাহা দেখাইবাব তিনি সুযোগ পাইয়া গেলেন। তেমনই, উত্তরার বিবাহ সময়ে তিনি বৈদিক কর্মকাণ্ডে তাঁহার গভীর জ্ঞানের প্রমাণ দিয়াছেন, মূলে কিন্তু ইহার কোনও প্রসঙ্গ নাই। সেইরূপ, চিকিৎসা-বিদ্যাতেও সারলা দাস যে বিজ্ঞ ছিলেন, অনুবাদ করিতে গিয়া পাঠককে সে কথাও বলিয়াছেন। শমীবৃক্ষে পাণ্ডবদের লুকানো অস্ত্র খুজিতে গিয়া বিরাটপুত্র উত্তরকে সাপে কামড়াইল, অর্জুন মন্ত্রবলে তাহাকে সুস্থ করেন। সেই মন্ত্রের মধ্যে আবার গোরক্ষনাথের নামও ইঙ্গিতে করা হইয়াছে। এইভাবে সারলা দাসের মহাভারতের অনুবাদে তাঁহার বহু বিষয়ে জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আদিপর্বে কপিলেশ্বরদেবের নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান

হয়, কপিলেশ্বর তখন উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব এবং দুর্দান্ত যোদ্ধা; দক্ষিণে কাঞ্চী পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কুলবর্গের অধিপতি বলিয়া তাঁহাকে কুলবর্গেশ্বর বা কলাবর উপাধি দেওয়া হয়। সারলা দাসেব মহাভারতে ভীমসেনকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছে। মূল মহাভারতে আছে, পাণ্ডবেরা জতুগৃহদাহের পর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গেলেন; এই মহাভারতের মতে তাঁহারা গোদাবরীর দক্ষিণ-পূর্বে ওরাদি পর্যন্ত যান, সেখানে ভীমকে মায়ের প্রহরায় রাখিযা অন্য পাণ্ডবেরা গোদাবরীতে গেলেন। গ্রন্থে কপিলেন্দ্রের নাম (১৪৩৫-৬৫ খ্রীঃ রাজত্বকাল) উল্লেখ আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহার রচনা কাল নির্দেশ কবিযাছেন ১৪৩৬ হইতে ১৪৬৯ এই সময়ের মধ্যে, কেহ কেহ বলেন ১৪৫২ হইতে ১৪৭৯ এই কয বৎসরের মধ্যে। সম্ভবত ১৪৬০-এব পবে ইহা রচিত হয।

গ্রন্থকার বংশ-পরিচয়ের দিক দিয়াই যান নাই, শুধু একবার তাঁহার অগ্রজের নাম করিয়াছেন—

> কনকপুর পাটণা ঘর পশু‍র্বাম। মুহিঁ তার অনুজ সারলা দাস নাম॥

স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে জানিতে পাবি, সাবলাদেবীর পীঠস্থানে এক শূদ্র বাস করিত, সে ভালো কথকতা কবিতে পারিত, মহাভারত সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট। সে ছেলেদের ডাকিয়া মহাভারতের উপাখ্যান শোনাইত, এবং কে কতদূব মনে রাখিতে পারিয়াছে তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিযা লইত। শ্রোতাদেব মধ্যে সকলের চেয়ে ছোট ছিল সিদ্ধেশ্বর পরিডা। সে মনে রাখিতে পারিত না বলিযা বকুনি খাইত। সে না কি একবার রাগ করিয়া দেবীর স্থানে হত্যা দেয়, এবং তাহার দৃঢ়তার বলে দেবীর প্রসাদ লাভ করে। রাত্রে সে যাহা দেখিত, দিনের বেলায় বসিযা বসিয়া তাহা লিখিত। এই সিদ্ধেশ্বরের নামই না কি সারলা দাস।

আত্মীয়-স্বজনের কথা বিশেষ উল্লেখ না করিলেও সারলা দাস কিন্তু পূর্বজন্মেব পরিচয় দিয়াছেন। এক জন্মে তিনিই ছিলেন কালিদাস, পরে অন্য জন্মে মহাকাল, এ জন্মে হইলেন সারলা দাস, ভাবী চতুর্থজন্মের কথাও স্বীকার কবিয়াছেন। তবে সে জন্মে কি নাম ধারণ কবিবেন তাহা লিখিয়া যান নাই। তাই পরবর্তীকালে নৃসিংহপুবাণ-বচয়িতা পীতাম্বব দাস দাবি কবিয়া গিয়াছেন যে তিনিই পূর্বজন্মে সারলা দাস ছিলেন। পীতাম্বর দাস নিজের পবিচয় সবিস্তাবে দিয়া গিয়াছেন—

মোর পিতামহ থিলে লক্ষ্মীধব দাস। বিষ্ণুঙ্কর পদাম্বুজে বহুত বিশ্বাস॥
বালুঙ্কেশ্বব নামরে তাঙ্ক জ্যেষ্ঠসুত। জাণন্তি সদগুরুপদ সেবি বেদতত্ত্ব॥
সেহু পুণি বিষ্ণুঙ্কব অত্যন্ত ভকত। প্রভুঙ্ক পাদরে সদা দেইথান্তি চিত্ত॥
সে মোহব পিঅব মুঁ তাহাঙ্ক আত্মজ। মোব নাম অটই পীতাম্বব দ্বিজ।
দেখিলি এ কলিকাল মাযা অন্ধকাব। মনমধ্যে ভালি ভালি কর্ইঁ বিচার॥

লক্ষ্মীধর দাস ছিলেন কবিব পিতামহ, পবম বৈষ্ণব। তাঁহাব জ্যেষ্ঠপুত্র বালুঙ্কেশ্বব, তিনি বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন, সদ্‌গুরুব সন্ধান জানিয়াছিলেন। তিনি পবম বিষ্ণুভক্তও ছিলেন, সর্বদা বিষ্ণুব চরণে তাঁহাব মন পড়িয়া থাকিত। তাঁহাবই পুত্র পীতাম্বর 'দ্বিজ'।

বিচার কবিয়া পীতাম্বর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে কলিকালে ভবসাগব পাব হইতে বিষ্ণুই একমাত্র তরণী। বিষ্ণুধ্যানে গভীর রাত্রে দেবী সবস্বতী প্রসন্না হইলেন। কবে দেবীব প্রসাদলাভ করিলেন সে দিনক্ষণ কবির মনে আঁকা ছিল। গ্রন্থে তিনি সে কথা লিখিয়াও গিয়াছেন। প্রসন্না হইয়া দেবী বলিলেন, তুমি এখন নৃসিংহপুরাণ গ্রন্থ রচনা কর, তাহা পড়িয়া ও শুনিয়া লোকে মুক্তি পাইবে—

এমন্ত আকুল মনে করন্তে মুঁ ধ্যান। বাত্রে বাক্যদেবী মোতে হোইলে প্রসন্ন॥
বীর কিশোর দেবঙ্ক বতিশ অঙ্করে। সিংহমাস শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিরে॥
সোমবার হোইথিলা আসিণ সে দিন। মো আগরে উভা হোই বোইলে এসন॥
নৃসিংহপুরাণ গ্রন্থ কর তুহি এবে। শুণিণ পঢ়িণ জনে নিস্তার পাইবে॥

সারলা দাসের রচনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁহার ছন্দের সঙ্গে দাণ্ডিবৃত্তের নাম করিতে হয়। তাঁহার মহাভারত, উড়িষ্যায় সুপ্রচলিত বলরাম দাসের রামায়ণ, পীতাম্বর দাসের নৃসিংহপুরাণ—এসব গ্রন্থ দাণ্ডিবৃত্তে লেখা। দাণ্ডিবৃত্ত অর্থে বুঝিতে হইবে এমন বৃত্ত যাহাতে দুই চরণের শেষে শব্দের মিল আছে বটে, কিন্তু দৈর্ঘ্য একরূপ নহে, বসিয়া পড়া কঠিন, পড়িতে গেলে যেন দৌড়াইতে হয়। যেমন—

কলিকাল ধ্বংসন ভোগেণ কোটিপূজা।
প্রণমিতে থটই দেবাধিদেব কপিলেশ্বর মহারাজা॥

প্রথম চরণে চৌদ্দ অক্ষব, পবেবটিতে একুশটি, একেবাবে দেড়গুণ, তবু শেষের দিক মিলিয়াছে। পববর্তী যুগে, বিশেষ কবিয়া বর্ত্তমান কালে, যাঁহারা সংস্কাবকেব মন লইয়া এই সব গ্রন্থ সম্পাদন কবিতে বসিয়াছেন, তাঁহাবা ইহা কাটিয়া ছাঁটিয়া 'নিয়মিত' কবিতে গিয়াছেন। ফলে একাকাব হইযাছে, সেই প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আব নাই।

প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যে সাবলা দাসেব পব বলবাম দাস স্মবণীয়। সাবলা দাস যেমন মহাভাবতেব অমৃতময়ী কথা ওড়িয়া ভাষায় প্রচাব করিলেন, বলবাম দাস তেমনি বামায়ণেব উপাখ্যান প্রচার কবিযা ওড়িয়া সাহিত্যেব সম্পদ্ বাড়াইলেন। তাঁহার পিতা সোমনাথ মহাপাত্র ছিলেন 'মহাপাত্র' মন্ত্রী, তাঁহাব মায়েব নাম ছিল মনোমায়া। গ্রন্থ লিখিবাব কৃতিত্ব তাঁহাব ছিল না, বত্রিশ বৎসব বয়সে এত বড একখানা বই লিখিবেন, সে ক্ষমতা তাঁহাব কোথায়? পণ্ডিতদেব মুখ হইতে যাহা কিছু শ্রদ্ধাভবে শুনিযাছেন, তাহাব কিছু কিছু মনে ধারণ করিয়া বাব বাব আবৃত্তি কবিয়া তিনি এই বামায়ণ লিখিযাছেন। যিনি জগমোহন, অব্যয়, অরূপ পুরুষ, কৃষ্ণরূপে যাঁহাব অনন্ত অপূর্ব তনু, তাঁহাবই প্রসাদে সাবদা কবিকে দয়া করিয়াছেন, কবিব মুখ দিযা বামায়ণ গ্রন্থ উচ্চারণ করাইয়াছেন, আর ইহা যে-সে গ্রন্থ নয়, ইহাতে এক লক্ষ পদ আছে!

সুন্দরকাণ্ডের প্রথমে তিনি এ বামাযণেব নামও দিয়াছেন, 'জগমোহন বামায়ণ।'

'জগমোহন' বোলি এ বামাযণ নাম।
তথ্য কবি ভজিলে পাইব বিষ্ণু স্থান॥

১৮৯২ সালে কটক হইতে এই গ্রন্থেব যে সংস্কবণ বাহিব হয়, তাহাতে প্রকাশক গোবিন্দ বথ কিন্তু লিখিয়াছিলেন, বলবাম দাস একদণ্ডও বিলম্ব না কবিযা অবিবাম পবিশ্রমে এক 'দাণ্ডে' বা এক পথে চলিয়া যাইতেন বলিযা গ্রন্থেব নাম হইযাছে দাণ্ডিবামাযণ। দাণ্ডিবৃত্তের প্রয়োগ আছে বলিয়াও ঐরূপ নামকবণ সম্ভব হইতে পাবে।

জগমোহন বামাযণেব প্রায় অধিকাংশ চবণ চৌদ্দ অক্ষবে, যেমন—

শ্রীজগন্নাথঙ্ক আজ্ঞা শিররে মুঁ ধবি।
গ্রন্থ বখানিবা ইচ্ছা আদি অন্ত কবি॥
শুনিবা হে সুজ্জনে শ্রীবাম মহিমা।
সদাশিব ছামুবে যা পুচ্ছা কলে উমা॥

সুতবাং সাবলা দাসেব অনুবৃত্তি সহজ ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। এইভাবে যুগ যুগ ধরিযা বামাযণ-মহাভাবত, ভাবতেব অন্যান্য প্রদেশেব মত উড়িষ্যাকেও তাহাদেব অমৃতধারায় পুষ্ট কবিয়া আসিয়াছে।

বলবাম দাসেব অন্য দুইটি উল্লেখযোগ্য বচনা— কমললোচন চউতিশা ও মৃগুণী স্তুতি, বিশেষ কবিয়া এইজন্য উল্লেখযোগ্য যে, পববর্তী কালের কবিদেব বচনাব সঙ্গে মিলাইযা দেখিলে বোঝা যায় যে কবিকে শিক্ষানবিশী কবিতে হইযাছিল।

কমললোচন চউতিশাব আকাব অতি সংক্ষিপ্ত, নবাক্ষবী বৃত্ত, 'কমললোচন' কথাটি দিয়া আবম্ভ, তাই নামকবণ ঐরূপ—

কমললোচন শ্রীহরি। করেণ শঙ্খচক্রধারী॥
খগ আসনে খগপতি। খটন্তি লক্ষ্মী সবস্বতী॥

গরুড আসনে মুরাবি। গোপরে রখিলে বাছুরী ॥
ঘন কঠিন কলেবব। ঘটন শ্রীমুখ সুন্দর ॥

বলরাম দাসের মৃগুণী স্তুতি হইল মৃগীর প্রার্থনা। মৃগী বা হরিণীর নাম তাবাবতী। তাবাবতীব বড বিপদ ; তাহাব সম্মুখে ব্যাধ ধনুকে শবযোজনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে আছে ফাঁদ পাতা, দুই পাশের বন আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে, নিকটেই আছে একপাল শিকাবী কুকুব, হবিণী গর্ভবতী, দ্রুত পলাইবার শক্তি তাহার নাই, তাহাব উপব প্রাণ অপেক্ষা প্রিয শাবকেরা কোলের কাছে। মৃগী ভাবিতেছে— কোথায় যাইব, কে বক্ষা করিবে ? যিনি গজেন্দ্রের মোক্ষ সাধনে সমর্থ ছিলেন, সেই জগৎপাতার নিকটে সে আত্মসমর্পণ করিল। তাহাব দৈন্য দেখিযা দযাময় আজ্ঞা দিলেন, ইন্দ্র স্বযং আসিযা মৃগীকে এসকল বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, বলবাম দাসেব মৃগুণী স্তুতির আখ্যান-ভাগ ইহাই, তবে ইহাব মঙ্গলাচরণ আছে, ফলশ্রুতি আছে। ইহা একেবাবে চৌদ্দ অক্ষবে পযার ছন্দে রচিত ; মধ্যে মধ্যে দার্শনিক শিক্ষা আছে, যাহাব মধ্যে সমগ্র জাতিব চিন্তাধাবা রূপ পাইয়াছে , যেমন—

দইব বিপাক কথা কে কবিব আন।
যাহা সে কপালে ধাতা করিছি লিখন ॥
বিধি অনুসারে হুএ কর্মব উদিত।
কর্ম অনুসারে জীব হুএ আতযাত ॥

বলরাম দাসেব নামে অন্য লেখাও প্রচলিত আছে—অমরকোষ গীতা, গুপ্ত গীতা, কিন্তু সে সকল নবাক্ষরী বৃত্তে রচিত। অমরকোষ গীতার সঙ্গে কিন্তু অমরকোষ অভিধানের কোনো সম্পর্ক নাই, অমরকোষ গীতায পার্বতীব প্রশ্নেব উত্তরে ভগবান শঙ্কর বুঝাইতেছেন বেদান্ত প্রতিপাদিত যোগসম্মত দেহতত্ত্ব, কারণ যাহা আছে দেহে বা পিণ্ডে, তাহাই তো আছে ব্রহ্মাণ্ডে।

মহাভারতের মত ভাগবতের অনুবাদও ওড়িয়া জনসাধারণের নিকটে অতি আদবেব, এমন কি এ কথাও বলা যায় যে ভাগবতের অনুবাদ আরও বেশি আদরেব। ভাগবতেব অনুবাদক হইলেন জগন্নাথ দাস, ইনিও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেব সমসাময়িক। ইহার বাড়ি ছিল পুরী জেলায়, কপিলেশ্বর শাসনে (শাসন কথাটার অর্থ, ব্রাহ্মণদেব সেবাব জন্য প্রাচীনকালে রাজদত্ত নিষ্কব গ্রাম), কপিলেন্দ্রদেবের নামে ও দানে এই গ্রামের প্রতিষ্ঠা। বাল্যকালে প্রথামত তিনি সংস্কৃত পড়েন, এবং ব্যাকবণ ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তাহার পব তিনি ভাগবত পডিতে আবম্ভ কবিলেন। তাঁহার পিতাব ইচ্ছা ছিল, তিনি বিবাহ কবিয়া সংসাবী হন, কিন্তু জগন্নাথ তাহা অস্বীকার কবেন, এবং আঠাব-উনিশ বৎসব বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। প্রতাপরুদ্র তখন রাজা, রাণী ও তাঁহার পবিচাবিকাদেব কোনও উপলক্ষে বাস করিবাব জন্য একটি সাধারণ বকমেব ভবন নির্মিত হইযাছিল, জগন্নাথ পুবীতে আসিয়া সেইখানে বাস কবিতে থাকেন; এই স্থানের নাম ওডিয়া মঠ, মঠের প্রথম মোহন্ত ছিলেন জগন্নাথ স্বয়ং। মঠে মোহন্তপবম্পবাব চিত্রবেখা এখনও দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে। কযেক মাস মঠে কাটাইয়া তিনি সে মঠও ছাডিয়া দিলেন, এবং সমুদ্রতীরে একান্ত নিভৃতে বাস কবিবাব জন্য চলিয়া গেলেন। সমুদ্রতীবে যে স্থানে তিনি বাস করিতে লাগিলেন, তাহার নাম এখন 'সাতলহবী'। কিংবদন্তী এই যে, সমুদ্রগর্জন যাহাতে ক্ষীণ হয়, ও তাঁহাব ধ্যানভঙ্গ কবিতে না পাবে, সেজন্য স্বয়ং সমুদ্র সাত লহর বা সাতটা ঢেউয়ের ব্যবধানে সবিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দাসকে শ্রীমন্দিবে পুবাণপাঠে রত দেখেন, নবীন সাধুকে দেখিয়া তিনি এতই খুশি হন যে তাঁহাকে 'অতিবড' বলেন, সেই হইতে জগন্নাথেব শিষ্যপরম্পরা 'অতিবড়ী' সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

জগন্নাথ সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত ওড়িয়া ভাষায় রূপান্তরিত করেন এবং নূতন এক ছন্দের সৃষ্টি করেন। নয়টি অক্ষর দিয়া এই ছন্দের সৃষ্টি, তাই ইহার নাম নবাক্ষরী বৃত্ত। উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে এই ভাগবতের প্রচার আছে। প্রত্যেক গ্রামে আমাদের দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত ভাগবতটুঙ্গী আছে। যে একেবারে নিরক্ষর, সেও শুনিয়া শুনিয়া ভাগবত শিখিয়াছে। মহাপ্রভুকে প্রতাপরুদ্র যখন জিজ্ঞাসা করেন, কি করিয়া জগন্নাথের ভিতর দিয়া রাধাকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন মহাপ্রভু না কি এই অতিবড স্বামীকেই দেখাইয়া দেন।

বলরামের মত জগন্নাথও মৃগুণীস্তুতি রচনা করেন, বিপন্না হরিণী বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য জগন্নাথদেবের নিকট স্তব করিতে আরম্ভ করিল। বিপদভঞ্জন তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। এই মৃগুণীস্তুতি বা হরিণীস্তুতি একাধিক কবি রচনা করিয়াছেন, জগন্নাথের রচনা তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা তিনটি সংস্কৃত শ্লোকের ওড়িয়ায় ভাবগত অনুবাদ, কিন্তু নবাক্ষরী বৃত্তে নয়। ভণিতায় আছে— 'কহে জগন্নাথ ভুম্বর সার'।

জগন্নাথের আর একটি রচনা, তাঁহার অর্থ কোইলি। কেশব কোইলির কথা পূর্বে বলিয়াছি, ইহা তাহার টীকাস্বরূপ। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, কেশব কোইলি আরও বহু বৎসর পূর্বেকার।

জগন্নাথদাসের নামের সঙ্গে আরও দুইটি বইয়ের নাম বিশেষভাবে জড়িত, গুপ্তভাগবত ও তুলাভিণা। একটি হইল শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ, অন্যটি হর-পার্বতী সংবাদ। দুইটিই নবাক্ষরী বৃত্তে রচিত। তবে তুলাভিণার অর্থ অধিকাংশ স্থলে গদ্যে দেওয়া রহিয়াছে। এইগুলি বাস্তবিক জগন্নাথ দাসের রচনা কি না সে বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, কবির রচনাবৈশিষ্ট্য এই দুইটির মধ্যে দেখা যায় না। তুলাভিণার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিছু আছে, এবং তুলাভিণা নামে

এক তান্ত্রিক সম্প্রদায়ও আছে বলিয়া মনোমোহন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, যদিও পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র তেমন কিছু খুজিয়া পান নাই। সুতবাং তুলাভিণাব মূল্য আছে অন্য দিক দিয়া।

ওড়িয়া ভাগবতে বাসপঞ্চাধ্যায়ী বর্ণনায় জগন্নাথদাস মূলসংস্কৃতের 'অনয়াবাধিতো নূনং'— ইহাব 'অনয়া' অর্থে বৃন্দাবতীব নাম কবিযাছেন, রাধার নয়—

এমন্ত মনে গর্ব করি। ত'হা জানিলে নরহবি॥
গোপীঙ্ক ভাব জাণিবাবে। মাযা মোহিলে নদীতীরে॥
গোপী বৃন্দাবতী নাম। থিলা সে কৃষ্ণসন্নিধান॥

পরবর্তী কালে অন্যান্য ওড়িযা কবিবা বৃন্দাবতীব মহিমার কথাই বলিয়াছেন।

চৈতন্যদেবেব সঙ্গে আর একজন তরুণ বৈষ্ণবেব দেখা হয়, তাঁহাব নাম অচ্যুতানন্দ। তাঁহাব পিতা দীনবন্ধু পদস্থ বাজকর্মচাবী ছিলেন, কর্মকুশলতার জন্য খুঁটিযা উপাধি লাভ কবেন। অল্পবযসেই অচ্যুতানন্দ বিষয়ে বিবাগী হইয়া পুবীতে যান এবং মহাপ্রভুব আদেশে তাঁহাব দীক্ষা হয়। পুরীতে বাঁকি নদীব তীবে তাঁহাব মঠ আছে, নাম গোপালমঠ। কটকজেলার অসুরেশ্বর পবগণায় নেম্বালো নামক স্থানে তিনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাটাইয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। শূদ্র বলিয়া তিনি নিজেব পবিচয় দেন—

জাত হেলুঁ ওড়রাষ্ট্রে শূদ্রকুলে পুনি।

শূন্যসংহিতা, অণাকাব সংহিতা, ব্রহ্মশেঙ্কুলি, লেখন, নবগুঞ্জরী, ব্যাল্লিশ চৌপদী, হরিবংশ— এই সব হইল অচ্যুতানন্দেব বচনা, কতকগুলি মালিকাও তাঁহার নামে চলিয়া আসিতেছে। আগত-ভবিষ্যত তাঁহাব লেখা বলিয়া প্রসিদ্ধি। কলিযুগগীতাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন; গীতা নাম দেওয়াব অর্থ, কৃষ্ণার্জুন-সংবাদের কাঠামো

ইহাতে বজায় রাখা হইয়াছে। ইহা তিন অধ্যায়ের পুস্তক, প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অচ্যুতের ভণিতা আছে। কলিকালের সম্বন্ধে একটি কথা যাহা তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার খানিকটা যে সত্য তাহা আজ সকলেই স্বীকাব কবিবেন—

যে যেতে চষিলে তাকু ন অণ্টিব কিছি।
ঘবে কবে জণে জণে হেবে পরবাসী।
সুনারূপা আদি ধাতু সস্তা হোই যিব।
কেবল ধান-চাউল মহাবগ হেব॥

যে যতই চাষ করুক, কিছুতেই কুলাইবে না, প্রতি পরিবারে একজন কবিয়া লোক প্রবাসী হইবে। সোনারূপা হইয়া যাইবে সস্তা, শুধু ধান চাউল হইবে আক্রা। গুরুভক্তি গীতাব ষষ্ঠ ছন্দে অচ্যুত করতাল, বেণু, বংশী, শঙ্খ ইত্যাদি পূজাব কথা বলিয়া শেষে নিজেব পবিচয় দিতেছেন—

ওডিশা দেশবে প্রচর। আজ্ঞা যে নদিযা ঠাকুর॥
সে আজ্ঞা মনবে সুমরি। গোপাল কুলকু উদ্ধরি॥
এণ মুঁ লভিলি জনম। তুম্ভঙ্ক দেলি দীক্ষাধর্ম॥
গুপত গুপত গুপত। কেবেহেঁ ন কর উকত॥
চিত্র উৎপলা নদীতীর। সুহাঙ্গ নেমাল উত্তর॥
এ স্থলে জনম লভিলি। দীন অচ্যুত ভবে ভুলি॥

অচ্যুত দীক্ষাগ্রহণ কবিয়াছিলেন সনাতন গোঁসাইয়ের কাছে। এই সনাতন কিন্তু গৌড়ীয় নহেন বলিয়া মনে হয়। অচ্যুত তাঁহার পরিচয় দিযাছেন—

দোলী গ্রামে তাঙ্ক বাস বৈবাগ সে দেহী।
একই শিষ্য মুহিঁ তাঙ্ক আর শিষ্য নাহিঁ॥
মুহিঁ শিষ্য মুহিঁ পুত্র মুহিঁ তাঙ্ক ভৃত্য।
ক্ষেত্রবরে শ্রীগুরু মো সমাধি বিহিত॥

ভজনকুটী সান্নিধ্যে গোপ্য যে সমাধি।
ক্ষীণরূপে এথারে মো নাম খিব ভেদি ॥• •

জ্যেষ্ঠ দশমীর দিন মো জন্মগুপত।
প্রতিপালি করিব যে দাস হে অচ্যুত ॥

লোকমুখে অচ্যুতেব নামের সঙ্গে আব-একজনের নাম জড়িত আছে, তাঁহার নাম যশোবন্ত। যশোবন্ত জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু বড দরিদ্র ছিলেন, এমন কি, অভাবেব তাডনায় তাঁহাকে চুবি পর্যন্ত করিতে হয়। সেজন্য তাঁহার শূলদণ্ডের বিধান হয়। বিপদে পডিয়া যশোবন্ত জগন্নাথের স্তব করেন, ও বিপদ হইতে উদ্ধাব লাভ কবেন। ধর্মে তাঁহার মতি হয় এবং দিন দিন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বাড়িতে থাকে। চউবাশি আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাব এক বচনা আছে, তাহাতে না কি তাঁহাব জীবনকথা পাওয়া যায়। তাঁহাব নিজের লেখা প্রেমভক্তিব্রহ্মগীতা ও গোবিন্দচন্দ্র টীকা আছে— বই দুখানি প্রামাণ্য কি না সন্দেহ। গোবিন্দচন্দ্র ও বাংলায় গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস ও গোপীচাঁদেব গান একই বিষয় অবলম্বনে বচিত। একখানি শৈবতন্ত্রগ্রন্থেব অনুবাদও তাঁহাব নামে চলে— শিবস্বরোদয়।

অনন্ত 'শিশু অনন্ত' নামেই পরিচিত। ইহার জন্ম করণকুলে, বাড়ি ছিল পুরী জেলাব বালিপাটনা নামক থানায়। অনন্তকে শিশু কেন বলা হয়, সে সম্বন্ধে এক বিচিত্র কাহিনী আছে। শ্রীমন্দিরে লক্ষ্মীনাবায়ণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদেব দর্শনার্থে জগন্নাথদাস ও অনন্ত গিয়া উপস্থিত। জগন্নাথ লক্ষ্মীনাবায়ণেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিবাব জন্য সখীরূপ ধারণ করিলেন, অনন্ত শিশুর রূপ ধবিলেন। সেই হইতে অনন্ত নামের পূর্বে 'শিশু' শব্দটি আসিয়া জুটিল। অনন্ত বাৎসল্যভাবেব সাধক ছিলেন, সম্ভবত তাই এই বিশেষণ। আগতভবিষ্য মালিকা শিশু অনন্তদাসের নামেও চলিয়া আসিতেছে।

শিশু অনন্তের রচিত আগতভবিষ্য মালিকায় আছে, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ

কটি হইতে জাত হন অচ্যুত, মুখ হইতে যশোবন্ত, হৃদয় হইতে শিশু অনন্ত, দক্ষিণ ভুজ হইতে বলরাম; আর জগন্নাথের জন্ম রাধার হাস্য হইতে। কৃষ্ণাবতারে এই পাঁচ সখাই ছিলেন— দাম, সুদাম, সুবল, সুবাহু ও শ্রীবৎস। তখন অচ্যুতই ছিলেন সুদাম।

বলরামদাস, জগন্নাথদাস, অচ্যুত, অনন্ত ও যশোবন্ত — এই পাঁচজনকে 'ব্রহ্মজ্ঞানী' বা 'সৎপন্থী' মনে করা হইয়া থাকে; 'পঞ্চসখা' এই নামও দেওয়া হয়। আধুনিক যুগে কবি নন্দকিশোর বল গাহিয়াছেন—

> উৎকল গবভুঁ কেতে সাধুভক্তসুত,
> জনমি করিলে প্রিয় মাতৃকোল পূত।
> পঞ্চসখা আদিভক্ত
> যোষি 'ব্রহ্মজ্ঞান' কলে দেশ সুপবিত্র।

কিন্তু ইঁহারা সকলে এক সময়ের নহেন; বলরাম ও জগন্নাথ, এই দুইজন পূর্ববর্তী ও পরস্পরের সমসাময়িক, অন্য তিন জন অল্পবিস্তর পরবর্তী কালের। বলরাম ও যশোবন্ত এই দুই জনের মধ্যে কোনও বিষয়ে সাম্য বা সখ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। উভয়েই ভক্ত ছিলেন, সাহিত্য রচনাও করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিচয় ছিল, অথবা একই ভাবের সাধনা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কই! অবশ্য বিভিন্ন কালে জন্মিয়াও পাঁচ জন সখা হইতে পারেন, 'একই সময়ে জন্মিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গী হইবেন' এমন নাও হইতে পারে; বরং নামধর্ম প্রচারের জন্য খানিকটা আগে পরে জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক বা সম্ভব। আর-একটা কথা — পঞ্চসখা, না, পঞ্চশাখা? পাঁচ জনই যে স্বতন্ত্র শাখা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন!

উড়িষ্যার সর্বসাধারণে সুপ্রচলিত কাব্য রসকল্লোল সম্ভবত এই সময়ের রচনা। কবির নাম দীনকৃষ্ণ দাস। রসকল্লোল চব্বিশটি ছান্দে সম্পূর্ণ। কংসভারে প্রপীড়িত পৃথিবীর প্রার্থনায় পুরুষোত্তম

যদুকুলে অবতীর্ণ হইলেন, এই উপাখ্যান দিয়া গ্রন্থের আরম্ভ, এবং ইহার শেষ হইল উদ্ধবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণেব গোপীসন্দেশ শ্রবণে। ইহার মধ্যে বসেব কল্লোল তো আছেই, তা ছাড়া বচনাব এক বিশেষ লক্ষণও উল্লেখযোগ্য। চব্বিশটি ছান্দেব প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল চবণের আরম্ভ 'ক' দিয়া। এই শৈলী পববর্তী কালে প্রাচীন অন্য কোনও কোনও কবি গ্রহণ কবিয়াছেন। কবিত্ব অক্ষুণ্ণ বাখিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন কবা, সম্ভবত ইহাই এরূপ রচনাব উদ্দেশ্য। কবিত্ব যে সর্বদা অকুন্ঠিত আছে সে কথা অবশ্য বলা চলে না। যেমন—

কব কব অরবিন্দে পাদকঞ্জ। কঞ্জনেত্র মণ্ডিছন্তি নেত্রকুঞ্জ ॥
কঞ্জশিব আবির্ভাব যেউ কৃষ্ণ। কৃষ্ণচিন্তি সে বৃষ্ণকু মহাতৃষ্ণ ॥

দীনকৃষ্ণ দাস নামে আব-এক জন কবি আছেন, ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীব। ইনি বসবিনোদ নামে এক কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আত্মপবিচয় কিছু কিছু দিয়াছেন। প্রথমোক্ত দীনকৃষ্ণ আর্তত্রাণ চউতিশা লিখিয়া গিয়াছেন, বাবমাস কোইলি, গুণ্ডিচাবিজে, উজ্জ্বলনীলমণিকাবিকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেব সঙ্গে তাঁহাব নাম বিজড়িত। দুই দীনকৃষ্ণ, না এক, সে বিষয়ে পণ্ডিতেবা একমত নহেন, বসকল্লোল-কাব ও বসবিনোদ-কাব, দুইজনেব বিষয়গত ও ভাষাগত পার্থক্য আছে, ভাবগত তো আছেই। বসকল্লোলে বিবহ, বসবিনোদে আছে মিলন। পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র ভাষাগত পার্থক্য দেখাইয়া বলিতেছেন, রসবিনোদ-কারেব ভাষায় বালেশ্ববেব প্রভাব, বসকল্লোলেব তাহা নয়। বসকল্লোলেব শব্দালঙ্কাব প্রাচুর্যের কথা মনে কবিয়া তাহাব কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফেলিতে মন চায়, কিন্তু ওডিয়া সাহিত্যেব ইতিহাস যাঁহাবা লিখিয়াছেন তাঁহারা কেহ কেহ কবিকে ষোড়শ শতাব্দীতে স্থান দিযাছেন। ইহার পক্ষে যুক্তিও আছে। কাব্যের একাংশে কবি দুঃখ কবিয়া বলিয়াছেন, আমি যে সকল ফুল দিয়া মালা গাঁথিলাম, বর্তমান কালে তাহার আদর

করিবার লোক নাই। কবি যদি সত্য সত্যই চৈতন্যদেবের অনেক কাল পরের হইতেন, তাহা হইলে এরূপ আক্ষেপ করিতে হইত না। সুতরাং তাঁহাকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, কিংবা অল্প কিছুকাল পরের বলিয়া ধরিয়া লইলে তিনি ষোড়শ শতাব্দীরই কবি, এরূপ মনে করাও যাইতে পারে।

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব উড়িষ্যায় যথেষ্ট পড়িয়াছে। পূর্ব হইতেই উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে প্রবণতা ছিল, মহাপ্রভু দীর্ঘকাল পুরীতে বাস করিয়া তাহাকে ভিন্ন একটা রূপ দিলেন। ফলে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম দুই স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান উপজীব্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ, উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মেব প্রধান উপজীব্য উক্ত মহাগ্রন্থের দশম স্কন্ধ। একটিতে ভক্তির প্রাবল্য, অন্যটিতে জ্ঞানের; একটির প্রাণশক্তি রাধা, অন্যটির বৃন্দা। বৈষ্ণবধর্মেব দুইজন কবির নাম ও সামান্য কিছু পরিচয় দিতেছি।

রাজা দিব্যসিংহদেব ১৬৮৯-৯০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা দিব্যসিংহদেবের অষ্টম অঙ্কে, ১৬৯৫-৯৬ সালে, ভূপতি পণ্ডিত প্রেমপঞ্চামৃত বচনা শেষ করেন। ইঁহার নামে ভূপতি চউতিশাও প্রচলিত আছে। প্রেমপঞ্চামৃতে কবি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

পশ্চিমা বিপ্র সারস্বত। নাম যে ভূপতি পণ্ডিত॥
শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর। উৎকলদেশর ঠাকুর॥ • •

এ বীবরব বইষ্ণব। নাম শ্রীদিব্যসিংহ দেব॥
লক্ষে রাজাঙ্ক মৌড়মণি। সুন্দরপণে অগ্রগণি॥
কন্দর্পসম মোহে রূপে। পৃথিবী পূরিত প্রতাপে॥
পণ্ডিত ধার্মিক বিবেক। সঙ্গীত বিদ্যা সুরসিক॥
কাম শাহাস্ত্র অনুভবি। শ্রীকৃষ্ণরস কাব্য কবি॥
প্রজাপালন বিপ্রভক্ত। দয়ালু দাতা বাক্য সত্ত॥

এতে লক্ষণে সে রাজন। তাহাঙ্কু করি দরশন।
কীর্ত্তি কবিত্ব বর্ণিবারঁ। শুনি সন্তোষ নৃপবর।
ধন বসন ভূমিদান। দেলে সে হোই সুপ্রসন্ন।
দেখি অনুগ্রহ বিশেষ। ছাড়ি অইলু নিজদেশ।

কাব্য রচনা করিবাব পর কবিকে প্রমাণ করিতে হইল যে ইহা রসোত্তীর্ণ। রাজাও রসিকাগ্রগণ্য, সুতরাং তাঁহার বুঝিতে দেরি হইল না যে এই রস পুরাণ শাস্ত্রের নহে, ইহা কৃষ্ণের অতিরস, তিনি কবিকে শাসনদানে অনুগৃহীত কবিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কবি অপার্থিব রসে মজিয়াছিলেন, তাহাতে রস পাইলেন না।

কবি ছিলেন পশ্চিমা সাবস্বত ব্রাহ্মণ, রাজা দিব্যসিংহদেবের বিশেষ অনুগ্রহ তিনি পাইয়াছিলেন। গুণানুরাগী বাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভূপতি পণ্ডিত কটক শহরের পশ্চিম দিকে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দী বাংলা মৈথিলী, বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার জ্ঞান ছিল—

পশ্চিমা ভাষারে কবিত্ব বঙ্গলা ভাষা তিরিহোত্র।

এবার নূতন শিক্ষা নূতন দীক্ষা হইল—

উৎকল ভাষা নব শিক্ষা আন্তব বইষ্ণব দীক্ষা।

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা তিনি গ্রহণ করিলেন চৈতন্যদাসের মঠে গিয়া, চৈতন্যদাসেব নিকট হইতে। পূর্বে শ্রীকপালমোচন, পশ্চিমে লোকেশ্বরের স্থান, এই দুই শিবের মাঝে চৈতন্যদাসের মঠ। চৈতন্য-দাসের তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, 'তুমি উৎকল ভাষায় কাব্য রচনা কর, গোবিন্দকথা আশ্রয় কবিয়া চৌতিশা চৌপদী গীত লিখিতে হইবে।' শিষ্য তদনুসাবে দিব্যসিংহ রাজার অষ্টম অঙ্কে মকরমাস শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে বইখানি শেষ করেন। চৈতন্যদাস নিজেও যে বংশীধর কৃষ্ণের নির্মল প্রেমে ভাবিত।

প্রেমপঞ্চামৃত দশ অধ্যায়ে লেখা, নবাক্ষরী বৃত্তে। ইহার মধ্যে

ভক্তিরসের স্পষ্ট ও মর্মস্পর্শী প্রকাশ আছে। ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া কবি কোথাও সংকোচ করেন নাই। কবি বলিতেছেন, কৃষ্ণমহিমা সকল কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর কৃষ্ণকথা না থাকিলে সংস্কৃত ভাষাব গৌরবই বা কোথায়?—

কৃষ্ণমহিমা যঁহি শুনি সে সর্ববাক্যরে মূর্ধনি।
যেবে ন থাই কৃষ্ণরস সে সংস্কৃতে কার্য কিস।

তাহা ছাড়া, তিনি যে ভাবগ্রাহী, অন্তব দেখেন, ভাষার বিচাব করেন না। তাই কবি ভূমিকায় বলিতেছেন—

কি পরাকৃত কি সংস্কৃত সে ভাবগ্রাহী নন্দসুত।
গালি শুণই গোপীমুখে বেদন শুণে তেড়ে সুখে।
এ ভাবি মনেবে বিচাবি ভাষাঙ্কু অবগ্যা ন করি।
সুজনে শুণ দেই চিত্ত নির্মল গোবিন্দ চবিত।

গ্রন্থখানি আমাদের দেশীয় প্রশ্নোত্তরের আদর্শে লিখিত, এবং ইহার ফলশ্রুতি হইল অহৈতুকী ভক্তি। ইহা বাস্তবিক পক্ষে বাসলীলার অনুবাদ নহে, রাসলীলার উপর টীকা। আমবা চারিদিকে কর্মসাগরেব মধ্যে ডুবিয়া আছি, কেহই তাহা এড়াইয়া যাইতে পারি না। কর্মপাশ ছেদনের উপায় হইল, কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ, ও সমস্ত কর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। নির্গুণ শুদ্ধভক্তি পাইতে হইলে সদ্গুরুব আশ্রয় লইতে হয়, সাধুসঙ্গ করিতে হয়। গ্রন্থখানি দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে মন জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্রহ্ম কি কবিয়া গোপকুলে আসিতে পাবেন? জ্ঞান পরীক্ষিৎ রাজার উপাখ্যান আবম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানেব চরণ চিহ্ন দর্শনে বৃন্দার শোক, চতুর্থে গোপিকাভক্ত-ভগবান সংবাদ, পঞ্চমে বেদকন্যা বচন নির্ণয়, ষষ্ঠেও তাহাই, সপ্তমে মণিকন্যা বচন নির্ণয়, অষ্টমে গোপকন্যা বচন নির্ণয়, নবমে রাসলীলা কথন, দশমে কর্মবন্ধ মোক্ষ। এই দশম অধ্যায়েই কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

অন্য কবির নাম বৃন্দাবতী দাসী। বৃন্দাবতী দাসীর পূর্ণতম-চন্দ্রোদয় নবাক্ষরী বৃত্তে রচিত, বিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, ব্রজে গিয়া হইলেন পূর্ণতম; তাঁহার করুণারূপ মন্দর গিরি, কবির ভাগ্যরূপ অনন্ত রজ্জু দিয়া মন্থন করিলে কৃষ্ণচরিত সুধাসিন্ধু হইতে যে অমৃত উঠিবে, যে চন্দ্রোদয় হইবে, তাহাতে 'অঘ অবিদ্যা অন্ধকার' তখন তখনই দূর হইয়া যাইবে। দ্বাদশ পুরাণ ও অন্য বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কবি ব্রজের কৃষ্ণের নির্দেশে ধ্যানের বিধান বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার জীবন যে বৈষ্ণবভক্তিশাস্ত্রের ভাবপ্রবাহেই কাটিয়াছে। কৃষ্ণের পূজা তাঁহার পতিকুলের বংশানুক্রমিক কর্তব্য কর্ম। অভিরাম গোস্বামী মহাপ্রভুর সমসাময়িক, বয়সে কিছু বড় ছিলেন; তাঁহার ছিল সখ্যভাবের সাধনা। বৃন্দাবতীর গুরুদেব দয়ালদাস এই অভিরাম গোস্বামীর শিষ্যপরম্পরাভুক্ত। সুতরাং বৃন্দাবতীর সাধনাও সখ্যভাবের সাধনা; তাই কবি সুকৌশলে এই আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন যে, "তুমি কুলনারী, কুলনারীর পক্ষে 'অন্য পুরুষের রূপ গুণ ভাল' এরূপ বলা উচিত নয়, ইহা কুলনারীর শিষ্টাচার নয়।" তিনি আপত্তির উত্তরে বলিয়াছেন—

> সুজনে শুনিবা যুগতে। কহই তুম্ভব অগ্রতে॥
> সে মোর সুহস্তি যে পর। পতিঙ্ক সখা প্রভু মোর॥
> সে ঘেনি পতিঙ্ক সমানে। ধ্যান করই তাঙ্ক মনে॥
> তেজি কুটুম্ব বন্ধুগণ। গৃহ সম্পত্তি ধন জন॥
> ভজিলি চরণে তাঙ্কর। বন্ধুঙ্কু দেখাই সুন্দর॥

আত্মপরিচয় দিতে গিয়া বৃন্দাবতী দাসী বলিয়াছেন— তাঁহার শ্বশুর স্বামী পুত্র নাতি সকলেরই কৃষ্ণচরণে ভক্তি ছিল, এবং সকলেই অন্তত একখানি করিয়া ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়া ভক্তিশাস্ত্রের কলেবর বাড়াইয়াছেন। শ্বশুর জগন্নাথদাস কৃষ্ণকথা গীতে গাহিয়াছেন, স্বামী কৃষ্ণকথা বলিয়াছেন

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বচন্দ্রোদয়ে, পুত্র হরিভক্তিচন্দ্রোদয় রচনা করিয়াছেন, পৌত্র লিখিয়াছেন উপাসনা-চন্দ্রোদয়।

গ্রন্থ রচনার কালনির্দেশও বৃন্দাবতী দাসী করিয়া গিয়াছেন—

শক অবদ ছড়দশ।	শত এক বিংশ বরষ॥
দিব্যসিংহ দেব রাজন।	ত্রিদশ অংকে এ রচন॥
বৈশাখ মাস শুক্লপক্ষে।	পঞ্চমী মৃগশিরা ঋকে॥
শুভে হোইলা গ্রন্থশেষ।	শুনি সকল পাপ নাশ॥

ষোল শত শকাব্দ আর একুশ বৎসর, অর্থাৎ ১৬২১ শকাব্দ, অর্থাৎ ১৬৯৯ সাল, অবশ্য উড়িষ্যার ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবের হিসাব মতে দিব্যসিংহদেবের সিংহাসনে আরোহণের যে সময় দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে ইহা ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়। কাব্যের দিক দিয়া বিচার করিলে বৃন্দাবতী দাসীর রচনায় যথেষ্ট কবিত্ব আছে; কৃষ্ণকথা-বর্ণনার মধ্যে মাধুর্য তো থাকিবেই, সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে একটা আন্তরিকতার ভাবও ফুটিয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কিন্তু সরলতা ও চাতুর্যের আপাতবিরোধ সত্ত্বেও উভয়ের সমন্বয় হইযাছে দেখিতে পাই।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম তেইশটি শ্লোকের রচনায় প্রতি পদে পূর্বপদের শেষ দুই অক্ষরের অনুবৃত্তি হইয়াছে, ইহাকে ওড়িয়ায় শৃঙ্খলা বলে, যেমন—

বন্দই প্রভু পীতাম্বর।	বরজরাজ রূপ ধর॥
ধরণীভার বিনাশন।	শনক আদি নিস্তারণ॥
রণরে দুষ্টকু নিপাত।	পাতনা যার এ সমস্ত॥
মস্তকে শিখীপুচ্ছ যার।	জার সে ব্যাজে গোপীঙ্কর॥
কর বিনাশ ইন্দ্রমান।	মানবে ধর গোবর্ধন॥
ধনদ-সুত-পাপহারী।	হারিলা ধাতা মায়া করি॥

ভীমা ধীবর ও দ্বারকা দাস এই সময়ের কবি। ভীমা ধীবরের কপটপাশা ওড়িয়া ভাষায় প্রসিদ্ধ; মহাভারত হইতে দ্রৌপদীর

অপমান আখ্যান বস্তু লইয়া ইহা বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে ওড়িয়া ধীবর-সমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বারকা দাস অন্তত তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন— গুপ্তগীতা, প্রেমরসচন্দ্রিকা ও সপ্তপোই। ইনি সহজিয়াপন্থী ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

৬

কিন্তু উড়িষ্যায় গানের ও কাব্যেব রাজা হইলেন উপেন্দ্র ভঞ্জ। তাঁহাব নামে শ্লোক চলিত আছে—

> উপইন্দ্র বীববব টেকি বেনি বাহাকু।
> ভূমিতলে কবিপণে ন গণই কাহাকু॥
> জয়দেব দীনকৃষ্ণ পদে মোর শরণ।
> আউ সবু কবিঙ্কর মাথে বাম চবণ॥

উপেন্দ্র ভঞ্জেব বাজবংশে জন্ম, সে বংশের উপাধি 'ভ্রমববর'। উপেন্দ্র বীরবর দুই হাত উর্ধ্বে উঠাইয়া আস্ফালন কবিয়া চলিতেছেন। পৃথিবীতে তিনি কাহাকেও কবি বলিয়া গণনা কবেন না। জয়দেব ও দীনকৃষ্ণ এই দুইজনেব চবণে তাঁহার শরণ, আর সব কবির মাথায় তিনি বামচবণ অর্পণ কবেন।

স্পর্ধিত উক্তি, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা উপেন্দ্র ভঞ্জের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছিল, তাঁহাকে মানাইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকগুলি কাব্য, লোকে শুধু 'ছান্দ'ও বলে। এই ছান্দ আবার সংস্কৃত কাব্যের সর্গেরও অনুরূপ। যেমন, কবির রসলেখা বাইশ ছান্দে লেখা। প্রত্যেক ছান্দ আবার সুর করিয়া পডিতে হইবে, নতুবা ঠিক ঠিক পড়া হইবে না, গান কবিয়া পড়িবারই কথা। রসোদয় নামে বিখ্যাত বন, চোল-দেশের নিকটে, মলয়গিরির কোলে। সেখানে ঋষি তপস্যানিরত;

তাঁহার সাড়ে সাত শত শিষ্য একে একে গৃহী হইলেন। ঋষি তাহার কিছুই জানেন না, তাঁহার ধ্যান যে ভাঙ্গে নাই। বারো বৎসর একজনও কেহ তাঁহার পরিচর্যার জন্য নিকটে আসে নাই, তিনি তাহা জানিতেও পাবেন নাই। বারো বৎসব পবে ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি বনের বাহিরে আসিলেন, এবং চোলরাজার নিকটে গিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিতে চাহিলেন। বাজাব সম্মতিক্রমে বিবাহ হইল, নায়িকা রসলেখা এই বাজকন্যা ও ঋষিপত্নী। তাহাব সঙ্গী চাই, মুনি দেশান্তর হইতে তাহার জন্য সখীদেব সযত্নে লইয়া আসিলেন, বিমলা কমলা পবিমলা বিধুমালা চারুশীলা মঞ্জুলা ও সুশীলা। এই হইতে কাব্যেব আবম্ভ। কাব্য শেষ কবার সময় ছন্দোবন্ধে কবি বচনাকাল নির্দেশ কবিয়া দিয়াছেন, কৌশলে পদসংখ্যাও বলিয়া দিয়াছেন—

> দিব্যসিংহ গজপতি অঙ্ক সাতবিংশতি শেষ দিনে শেষ এহু গীত।
> দেশে দেশে হেউ খ্যাত মোহ এ বসিকচিত্ত হরিহর কবন্তু এমন্ত হে॥ •
>
> সাধুজনো এহুগীত দ্বাবিংশতি ছন্দে।
> নিশ্চে অছি ষটশত ষষ্ঠীপদ হে॥

দিব্যসিংহ ১৬৯২-৯৩-এ সিংহাসনে বসেন, তাহাব পব ২৭ অঙ্ক হিসাব কবিলে ২২ বৎসব হয়, অর্থাৎ ১৭১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দ, তাহারও শেষ দিন 'সিংহ শুক্ল একাদশী' হিসাব করিয়া পণ্ডিতেবা স্থির করিয়াছেন উহা ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দেব ২১শে আগস্ট।

গঞ্জামের গুমসর বাজবংশে উপেন্দ্র ভঞ্জের জন্ম। তিনি ৪৩ খানি কাব্য লিখিয়া যান বলিয়া প্রসিদ্ধি। রাজবংশে জন্মিয়াও স্বেচ্ছায় বা ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁহাকে বাজ্যেব বাহিরে থাকিতে হইয়াছিল, সম্ভবত সেই কারণে তাঁহার পক্ষে এতগুলি কাব্য লেখা সম্ভব হইয়াছিল। ওড়িয়া কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথমে পৌবাণিক কাহিনীর ধারা ছাড়িয়া লৌকিক কাব্যেব চর্চা করেন।

উপেন্দ্র ভঞ্জের বৈদেহীশ বিলাসের ধরন দীনকৃষ্ণ দাসের রসকল্লোলের অনুযায়ী, অর্থাৎ সমগ্র কাব্যের প্রত্যেক চরণের আদ্যাক্ষর এক। নমুনা দিতেছি—

বিজয়ি বীর। বিজয় কর যিবা মিথিলাপুর।
বাহার হোই বিহার ঙহি কথন্তি মুনিবর॥
বৈদেহী যে সুন্দরীব্রজে অমূল্যচূড়ামণি।
বর্তমান সে ভূত ভবিষ্যে নাহিঁ নোহিব পুণি॥
বশীকরণমন্ত্র ধারণ দারুণ উচ্চাটন তা চাক।
বিধিসুন্দরী পুরন্দরী যে তাহাকু বোলিবাক॥
বিহিলা বিহি প্রভা এ কাঁহি শোভা সংগ্রহ পাই।
বণা বিবেক পণ্ডিতলোকমানঙ্কু করি দেই॥

প্রায়ই প্রত্যেক ছান্দেব শেষে সেই ছান্দেব পদসংখ্যা দেওয়া আছে, যেমন, চৌত্রিশ ছান্দের শেষে—

বুঝহে। বুদ্ধ উত্তম কোবিদ হে।
বান পদে উপইন্দ্রভঞ্জ বীরবব শেষ করে ছান্দ যে॥

বায়ান্ন পদে এই সর্গ, সেই কথা কবি জানাইয়া দিলেন।

প্রত্যেক ছান্দের পদসংখ্যাও 'ব' দিয়া আরম্ভ বায়ান্ন, বেয়াল্লিশ, ইত্যাদি। আটত্রিশ ছান্দের শেষে আছে—

বয়ালিশ পদরে এ চমৎকার। বুধে হেলা ন করি মনে বিচার যে।
বোলই উপইন্দ্রভঞ্জ এ গীত। বৈদেহীশবিলাস নাম উদিত যে॥

বৈদেহীশবিলাসে যেমন রামবন্দনা আছে, লাবণ্যবতীর মত কাব্যেও তেমনই প্রতি সর্গে বা ছান্দে বামবন্দনা আছে—

ভাবি সীতারাম পাদসরস। উপইন্দ্র বীরবর হরষ॥ (তৃতীয় ছান্দ)

হে রাম কামসুন্দর গুণবন্ত শিলীমুখধনু ধারণ।
সীতাম্বুজমুখী প্রীতি প্রমোদিত হরি মিত্রপণ প্রমাণ॥

জান বিরহ। বিপত্তি হর ততপর।

কহে উপইন্দ্রভঞ্জ বীরবর। এ ছান্দ অতি মনোহর॥ (দ্বাদশ ছান্দ)

কবির আর একটি প্রসিদ্ধ কাব্যের নাম কোটিব্রহ্মাণ্ডসুন্দরী।

এরূপ কাব্যরচনায় শব্দপ্রাচুর্য একান্ত প্রয়োজনীয়। উপেন্দ্র ভঞ্জের শব্দসম্পদ অত্যধিক ছিল বলিয়াই হয়তো সঙ্গীতে এক অভিধান—গীতাভিধান — তাঁহার নামে চলিয়াছে। অভিধানটি অনেকটা সংস্কৃত মেদিনীকোষের মত, শব্দের শেষ অক্ষর অনুসারে শব্দ সাজানো হইয়াছে। যেমন, 'কান্ত' ও 'খান্ত'। খ দিয়া আছে—

খ শব্দ বর্তে ইন্দ্রিয়ে, সুখে, স্বর্গে, আহরি, ক্ষিতি, গগনে।
শঙ্খসংখ্যারে কপাল, অস্থি, কম্বু, নিধি, দৈত্য অভিধানে॥
শিখী বোলন্তি অগ্নিকি, ময়ূরকু; নখ কররুহ, শুক্তি।
নখী গন্ধদ্রব্য, নখী সিংহ, শ্বান, নখী তপস্বী, বোলন্তি॥

উপেন্দ্র ভঞ্জ আমাদের দেশের কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। তাঁহার আর একজন সমসাময়িক কবির নাম করি, ইনি বাংলা দেশের নহেন, উড়িষ্যারই। ভক্তচরণ দাসের মথুরামঙ্গল উড়িষ্যার লোকপ্রিয় গ্রন্থ। ইহা ত্রিশ ছান্দে সম্পূর্ণ: অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণবলরামকে লইয়া ধনুর্যজ্ঞ দেখিবার জন্য মথুরাতে গেলেন, চানূর মর্দন, কংসনিপীড়ন, উদ্ধব সংবাদ, ভ্রমরগীত, রাধাকৃষ্ণের পত্রবিনিময়, কৃষ্ণের নিকটে উদ্ধবের প্রত্যাগমন, ইহাই হইল কাব্যের আলোচ্য বিষয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া এই কাব্য রচিত। বিভিন্ন রাগে নিবদ্ধ গ্রন্থের আরম্ভে, সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর, কংস যে তাহার মন্ত্রী অক্রূরকে মিথ্যা ছলে কৃষ্ণবলরামকে আনিবার জন্য পাঠাইতেছে, তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আরম্ভে প্রার্থনা এইরূপ—

মোহ মোহিত কলা দিবানিশ। মর্মে ঘোটি রহিলা পাপরাশ॥
চলি মুহই যাতনারে পড়ি। দিনু দিনু আয়ুষ গলা ঝড়ি॥
এণু বিচার করি-মোর চিত্তে। বুদ্ধি ন দিশে তরিবি কেমন্তে॥

কৃষ্ণচরিত্ত অমৃতবারিধি। কলি কলুষ রোগকু ঔষধি॥
তহिँ কিছি প্রসঙ্গরে কহিবি। দুষ্ট পাতক ভোগকু দহিবি॥
গীত করি রঞ্চিবি হরিলীলা। দয়া কর হে স্বামি নন্দবলা॥
যেঁউ রূপে কংস কেশী বধিল। এথি পরে নানা দুষ্ট সাধিল॥
তাহা কহিবাকু মোর বিচার। রাগবন্ধরে করিবি প্রচার॥
মোর হৃদয়ে বসি দিঅ কহি। ভক্তচরণ এতেক মাগই॥

সুদীর্ঘ কাব্যের প্রায় সর্বত্র ভাষা ও ভাব এইরূপ সহজ সরল সরস। গ্রন্থশেষে কবি বলিতেছেন—

দেখ এ অনিত্য অঙ্গ ক্ষণক হুঅই ভঙ্গ
চির হোই কেবেহেঁ ন রহে।
ধনজন তাত মাত এ যেনি বিজুলি মত
কেহি কাহা সঙ্গবে ন যাএ হে॥ নবমানে।
এণু ভজ গোবিন্দ চরণ। ন পাইব যমর কষণ হে॥

ভক্তচরণের আবির্ভাব-কাল লইয়া অনেক আলোচনার পর পণ্ডিত আর্তবল্লভ মহান্তি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ১৮০০ সালের পরও কবি জীবিত ছিলেন। অনুমান করা যায়, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার কাছাকাছি এই কাব্য রচিত হয়। খুরধা, বানপুর, দশপল্লা প্রভৃতি স্থানে কবির স্মৃতি-জড়িত মঠ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এবং পুরী জেলার নিকটে রণপুর রাজ্যের মধ্যে সুনাখলা গ্রামের মঠে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। তাঁহার কাব্যপাঠে অনুমান করা সহজ, ভক্তচরণ জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন মধুর রসের রসিক।

৭

উপেন্দ্র ভঞ্জের সঙ্গে ভক্তচরণের নাম করিয়াছি; কিন্তু উপেন্দ্র ভঞ্জের পরে কবি হিসাবে নাম করিতে হয় সদানন্দ কবি সূর্যব্রহ্মের। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, চোরচিন্তামণি নামে তাঁহার যে কাব্য আছে

তাহাতে তাঁহার পূর্ব-পরিচয় কিছু কিছু তিনি নিজে দিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের কথা—

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর।
সে আশ্রয় গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।
তদনুগ শ্রীঅনন্ত আচার্য গোস্বামী॥
সে শিষ্য শ্রীরঘুগোপাল গোস্বামী পুণি;
তাঙ্ক অনুগত লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী॥
ঠাকুরাণী গঙ্গামাতা তাঙ্ক কৃপাপাত্র।
শ্রীবনমালী দাস গোস্বামী সে আশ্রিত॥
তাঙ্ক সেবক শ্রীকিশোরদাস নামরে।
সাধুচরণ দাস আশ্রয় সে পয়রে॥
সদানন্দ কবিসূর্য ব্রহ্মা নামে খ্যাত॥

ষোল ছান্দে পূর্ণ তাঁহার চিটাউ চন্দ্রোদয়ে কবি নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

নুয়াগড়ে শবণকুল নামরে গ্রাম। ভিকারীপড়া শাসন মোর পূর্বাশ্রম॥
ঘুমসর দশপল্লা এ মানঙ্কে রহি। ককৈ নিকটে গমলেকা সংস্থিহি॥
মধুপুর নিজস্থান অদ্যাপি মোহর। সুদর্শন নরেন্দ্র যহিঁ নরেশ্বর॥
মো নাম হে গ্রামদত্ত মাতৃপিতৃদত্ত। সাধুদত্ত গুরুদত্ত রাজদত্ত মত॥
উদ্ধব যে সদাশিব সদানন্দ দাস। সাধুচরণ দাস ব্রজমোহন দাস॥
রাজদত্ত পদ কবিসূর্যব্রহ্মা খ্যাতি। এ সকাশু এ নামকু কবই ভগতি॥
কঁউদেশ ভাষাগ্রন্থে কঁউ নাম ভণি। বিজ্ঞ তাহা সম্পাদিবে এসকাশুঁ জাণি॥

দেখা যাইতেছে, কবিসূর্য ব্রহ্ম তাহা হইলে রাজদত্ত নাম। শোনা যায়, বীরকিশোর দেব তাঁহার রাজত্বকালে (১৭২৭-৮৩) না কি এই উপাধি কবিকে দান করেন। সদানন্দ তাঁহার গুরুদত্ত নাম, দীক্ষার নাম। নবদ্বীপ বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি যখন দেশে ফিরেন, তখন তিনি তরুণ বয়স্ক অভিমন্যুকে দীক্ষা দেন; তখন সদানন্দের

বয়স ৪০, অভিমন্যুর বয়স ২০ বৎসর। প্রথমে তাঁহার মঠ ছিল বালিয়ায়, কিন্তু পরে শিষ্যের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় কবি দীক্ষিতপড়ায় স্বতন্ত্র মঠ স্থাপন করেন।

যুগল রসামৃত লহরী, যুগল রসামৃত ভঁউরী, প্রেমলহরী, প্রেমভঁউবী, প্রেমতবঙ্গিনী, নিস্তাব নীলমণি, বিশ্বস্তববিহার, মোহনলতা, প্রেমকল্পলতা, চিটাউচন্দ্রোদয়, চোবচিন্তামণি প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ সদানন্দেব রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীগজপতির আদেশে ললিতালোচনা নামে একখানি কাব্যও তিনি বচনা কবিযা গিযাছেন।

সদানন্দের কাব্য-ধারা সর্বদা সরসগতিতে চলিযাছে, কবির মধ্যে বিনয় যেমন, দৃঢ়তাও তেমন আছে।

সদানন্দ কবি সূর্য ব্রহ্মা ভণি। জীব যাউ এহি বস গণি গণি। (১৮ ছান্দ)

আবার—

কবি সূয ব্রহ্মা এ পিপীলিকা। সিংহ সঙ্গে বাঁধে প্রীতিপতাকা॥ (৬ ছান্দ)

বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণেব ভাব দেখাইয়া তিনি বলিতেছেন—

এ সদানন্দ কবিসূর্য ভ্রমর মনপ্রাণ বিক্রীত কৃষ্ণ পযবে যে।

আবার—

ভল মন্দ কিছি মুঁ জাণই নাহিঁ, তাহা লেখুছি যাহা কুহন্তি সেহি যে॥ (৯ ছান্দ)

সদানন্দের বাধাকৃষ্ণ বিষযক গান এখনও গ্রামে দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্যকে তিনি হবিনামমূর্তি আখ্যা দিয়াছিলেন। চোরচিন্তামণি কাব্যে তিনি রাধাকৃষ্ণ মিলনের কথা গাহিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক ছান্দে আছে গৌরচন্দ্রেব কথা, গৌবচন্দ্রিকা। চৈতন্য ও গদাধর রস সম্ভোগ কবিবেন, তাঁহাদেব শোনাইবার জন্যই যেন তাঁহার কাব্য-রচনার এসব চেষ্টা। তথাপি সদানন্দের কাব্যসুধার যত আদর ও খ্যাতি উড়িষ্যার পণ্ডিত সমাজে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হয় নাই।

তাঁহার শিষ্য অভিমন্যুর উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি। অভিমন্যুর সময় মোটামুটি ১৭৫৮ হইতে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরা যায়। তাঁহার পূর্ণ নাম অভিমন্যু সামন্তসিংহার; জন্ম যাজপুরের অন্তর্গত অলতি পরগণার বালিয়া গ্রামের নিকটে ১১৬৫ সালে, মৃত্যু ১২১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাসপ্তমী দিবসে। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহাব প্রমাণ তাঁহাব কাব্যের সর্বত্র পাওযা যায়। তাহা ছাড়া মারাঠি, বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা ও গণিতশাস্ত্রে তাঁহাব জ্ঞান ছিল। কিন্তু লেখা-পড়ার ফলে ঘসিযা মাজিয়া তাঁহাব কবিত্ব লাভ হয় নাই, সাধু মহাপুরুষের মন্ত্রোপদেশে তাঁহাব কবিত্বের স্ফূর্তি হইয়াছিল। এ বিষয়ে কিংবদন্তী আছে। চৌদ্দ বৎসর বযসে তাঁহাব বিবাহ হয, উনিশ বৎসর বয়সে পিতৃ-হীন হইয়া সংসাবে তিনি বীতস্পৃহ হন, সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার কনিষ্ঠের হাতে দিয়া তিনি ইষ্টদেব বাধামোহনেব উপাসনায় ও কাব্য-রচনায কাল অতিবাহিত কবেন। সুলক্ষণা, প্রেমচিন্তামণি, রসবতী, প্রেমকলা প্রভৃতি কাব্য-রচনাব পব তিনি কৃষ্ণ বিষয়ে মন দেন, তাহার ফলে বিদগ্ধচিন্তামণি কাব্য। বসবতী ও সুলক্ষণা প্রেমের কাহিনী; সুলক্ষণা দুর্যোধনেব কন্যা, শাম্ব তাঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত প্রথায় বিবাহ করেন। সুলক্ষণা, বসকল্লোল ও বৈদেহীশবিলাসের আঙ্গিকে রচিত, ইহার প্রতি চবণের আত্মক্ষব 'স'। প্রেমকলাযও উপেন্দ্র ভঞ্জেব বচনারীতি অনুসরণ কবা হইয়াছে। প্রেমতবঙ্গিণী কিন্তু বাসপঞ্চাধ্যায়ীর আদর্শে।

বিদগ্ধচিন্তামণি বাধাকৃষ্ণলীলা লইয়া বচিত, এ কথা বলিযাছি; আবও বলা চলে, ইহা রূপ গোস্বামীব বিদগ্ধমাধবের আধারে লেখা। ইহা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ; ১০৮ অষ্টোত্তব শত ছান্দে সম্পূর্ণ হইবে এরূপ পরিকল্পনা ছিল, ৯৬ ছান্দ পর্যন্ত লেখাও হইয়াছিল। তাহার পর এই প্রতিভাবান কবি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন ও বৃন্দাবনে যান। সেখানে তিনি অকালে পবলোক গমন করায় এই কাব্য আর

শেষ হয় নাই। উৎকলীয় কবিদের অগ্রণীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। উপেন্দ্র ভঞ্জের চাতুর্য ও সাধুচরণ বা সদানন্দের সরলতা, উভয়ে আসিয়া তাঁহার কাব্যে মিলিয়াছে। সেইজন্য তিনি ভঞ্জ ও কবিসূর্য অপেক্ষাও লোকপ্রিয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিদগ্ধচিন্তামণির প্রথম ছান্দ, কাব্যের মঙ্গলাচরণ। অকারাদি পঞ্চাশ বর্ণের ক্রমে ইহা লিখিত। ইহার শব্দচাতুর্য দেখাইতে হইলে মূলের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করিতে হয়—

অপ্রাকৃত প্রেমমূর্তি জয় রাধা হরি।
অব্যক্ত লীলাকু ব্যক্ত কর অবতরি হে॥
আদি-অনাদি-কারণ নির্গুণ সগুণ।
আত্মারাম সনাতন ব্রহ্ম-নিরূপণ হে॥

ঋকার-৯কার-এর কঠিন বাধা কবি অবলীলাক্রমে পার হইয়া গিয়াছেন। তাহার পর ব্যঞ্জনবর্ণে আসিয়া তিনি নিবেদন করিতেছেন—

কামনা-কলপতরু চিন্তামণি নাম।
কলপুছি কবিত্বে বর্ণিবাকু তব প্রেম হে॥
খগপতি পূর্ণ কর এ মোর মানস।
খিতিপাবন মঙ্গল বর্ণিবি তো যশ হে॥
গুণগ্রাহকে গাইবে চিন্তিলা সুপ্রেম॥
গীত হেব বিদগধ চিন্তামণি নাম হে॥
ঘৃণারে ঘোষিলে নর পাইবে নির্বাণ।
ঘৃতবত রসিকহৃদকু রবি জাণ হে॥
উভাস-অন্ধার-অজ্ঞানকু এ চন্দ্রমা।
উইঁলা রবি এ ধীরচক্র সুখসীমা হে॥
চন্দ্ররু শীতল বাহুঁ সূর্যরু বিমল।
চরিত গঙ্গা নির্মল সিন্ধুরু অথল হে॥

এরূপ কবিতা সর্বত্র এক প্রকারের হইতে পারে নাই, কবিও সে কথ.

পূর্বভাগে বলিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই কাব্যের কোনও কোনও জায়গা হইবে দ্রাক্ষার পাকের মত, সর্বাংশে কোমল, মধ্যভাগে ঈষৎ কঠিন; কোথাও হইবে গুড়ের পাকের মত, সর্বাংশে কোমল; কোথাও হইবে নারিকেল পাকের মত, বাহিরে কঠিন, ভিতরে কোমল; আবার কোথাও বা হইবে খেজুরের পাকের মত, বাহিরে কোমল, ভিতরে কঠিন। কৃষ্ণের বাল্যপৌগণ্ডলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি একচল্লিশ শ্লোকে দ্বিতীয় ছান্দ রচনা করিয়াছেন, প্রতিশ্লোকের প্রতিচরণে আদ্য-যমক।

ধীরে ধীরে শুণ এ উত্তাক চরিত।
পুণ্য পুণ্যজনে কলে সংসাক হত॥
মহী মহীশঙ্ক তাপ অমাপ হেলা।
নাগ নাগরে অবনী বুড়া ন গলা॥
পর পরজাঙ্ক বিত্ত হরিলে বলে।
সুর সুরদ্বেষ ত্রাসে বিবস হেলে॥

প্রথম 'ধীরে' শব্দের অর্থ পণ্ডিতেরা, দ্বিতীয়টির অর্থ ধীর ভাবে। দ্বিতীয় চরণের প্রথম 'পুণ্যে'র অর্থ ধর্মকার্য, দ্বিতীয়টির অর্থ রাক্ষস। তৃতীয় চরণে মহী ও মহীশ, পৃথিবী ও রাজা, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। চতুর্থ নাগ কথাটার অর্থ বাসুকি ও পর্বত।

এইরূপে কাব্যের রস গ্রহণ করিতে গেলে বহু শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্য ও জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদগ্ধচিন্তামণি পড়িতে গেলে তাই টীকা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, এবং সে টীকা বুঝিবার জন্যও পাঠকের সংস্কৃত শব্দবন্ধনের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। উড়িষ্যার পাশ্চাত্য শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া হয়তো বর্তমান যুগেও — স্বাধীন ভারতেও — বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে

যে, ঐ কারণেই প্রাচীন সাহিত্য বুঝিবাব ও তাহার মাধুর্য ও চাতুর্য উপলব্ধি করিবাব ক্ষমতা সাধারণের এখনও বেশ খানিকটা আছে।

উপরে বলিয়াছি, অভিমন্যুব কাব্যে সকল গুণের সমাবেশ আছে, বিভিন্ন 'পাকে'র আয়োজন আছে। ভাবগম্ভীর শব্দসরল দুই চারিটি পদবন্ধ উদ্ধৃত কবিয়া এইখানেই অভিমন্যু-প্রসঙ্গ শেষ করি—

প্রণয় পরিপাটী অকথন। মন জাণিলে ন জণে বচন।
জন্মান্ধ জড় বধির যেমন্ত। সুখী হোএ স্বপ্নে দেখি সঙ্গীত।
ভাবি ভাবি মনে যে। কি কহিব সে বিবেকানুষ্ঠানে॥
এ প্রেমবিযোগিমানঙ্কু ঝোলি। প্রেমপথিকঙ্ক পথসংখালি।
প্রেমিঙ্কি দযিনি এ মার্গে বস। ক্ষীবসাবগ্রাহী যেমন্ত হংস।
কৃষ্ণপ্রেম ভাবি হে। দীন অভিমন্যু বোলাএ কবি॥

৮

প্রাচীন কবিদের ধাবা অনুসবণ ও বর্ণনা কবিতে গিয়া উনবিংশ শতকে আসিয়া পা দিযাছি। কিন্তু ইতিমধ্যে গুরুতব পরিবতন আবম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ওডিয়া সাহিত্যেব প্রকাশভঙ্গী ভাবঘন কাব্যবন্ধ ছাডাইয়া অভিনব গদ্যে ফুটিয়া বাহিব হইতেছিল। তখনও মাবাঠাদের প্রতাপ উডিষ্যায প্রচণ্ড। বাংলা দেশে গদ্যেব আবম্ভ হইল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগে, অবশ্য তাহাব পূর্বে তাহাব সূচনা হইয়াছিল দলিল-দস্তাবেজে, পত্রলিখনে, সাহিত্যেব আনাচে কানাচে। উডিষ্যায কিন্তু তাহার পূর্বে গদ্যকাহিনী বাহিব হইয়া গিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্যভাব-প্রণোদিত মোটেই নয়, অথচ আধুনিকধর্মী ও চমৎকারকারী। এই গদ্যকাহিনীব লেখক হইলেন ব্রজনাথ বডজেনা।

ব্রজনাথ বড়জেনার বাডি ছিল উডিষ্যাব ঢেঙ্কানাল বাজ্যে, ঢেঙ্কানাল গড় কটক হইতে প্রায় চব্বিশ মাইল দূবে অবস্থিত। ঢেঙ্কানাল একটি

সামন্তরাজ্য। ব্রজনাথের সময়ে ঢেঙ্কানালের রাজা ছিলেন ত্রিলোচন মহীন্দ্র বাহাদুর। খুর্দ্ধার ভোই বংশীয় রাজা প্রথম বীরকিশোর দেব ও দ্বিতীয় দিব্যসিংহদেবও এই সময়েই রাজত্ব করেন। ব্রজনাথ কয়েকটি গ্রন্থ ঢেঙ্কানাল গড়ে, কয়েকটি কেওঞ্ঝর গড়েও রচনা করেন। তখনকার দিনে উড়িষ্যার মারাঠা সুবেদার ছিলেন রাজারাম পণ্ডিত, তিনি ১৭৭৮ সালে সুবেদার হন। তাহার পরের বৎসরে, ১৭৭৯ সালের অক্টোবরে, নাগপুরের রাজা মাধোজী ভোঁসলা তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয় কিশোরপুত্র চিমনাজী বাপুকে ত্রিশ চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া বাংলাদেশ আক্রমণ করিবার জন্য পাঠান। ইহারা পথে ঢেঙ্কানালের দুরন্ত রাজাকে শাসন করিবার জন্য গড়জাতে প্রবেশ করে, এবং ১৭৮০ ডিসেম্বরে বা ১৭৮১ জানুয়ারিতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ লইয়া কবি ব্রজনাথ সমরতরঙ্গ কাব্য রচনা করেন। সমরতরঙ্গ বীররসপ্রধান কাব্য, তাহা অবশ্য কাব্যের নাম হইতেও অনুমান করা যায়। ইহা সম্ভবত ওড়িয়াতে একমাত্র বীররসাত্মক কাব্য। তখনকার ভারতসাহিত্যে এরূপ কাব্যের সংখ্যাই যে বড় কম ছিল। সমরতরঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দের জয়গান করা হয় নাই, বরং তাহাদের পরাজয়ের কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিন্তু সমরতরঙ্গ কবির একমাত্র রচনা নহে, তাঁহার গ্রন্থতালিকায় অন্তত তেরখানি পুস্তকের নাম রহিয়াছে। কবি সংস্কৃত, প্রাকৃত, খোট্টা বা হিন্দুস্থানী, ও মারাঠী ভাষায়ও গীত রচনা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত, বাংলা ও তেলুগু ভাষাতে তাঁহার গীতরচনার কথাও প্রচারিত আছে। আমরা তো তাঁহার গদ্যরচনা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম। চতুরবিনোদ কতকগুলি গল্পের সমষ্টি— সরল, অনাড়ম্বর, সহজ রচনাশৈলীর নিদর্শন—

ক্রমে ক্রমে দিবা শেষ হুঅন্তে পশ্চিমদিগ অরুণ বর্ণ দিশিলা। মনে হেলা, সন্ধ্যারাণী রঙ্গিনী শাড়ী পরিধান করি ধীরে ধীরে বিবাহ মণ্ডপকু আসুঅছন্তি কি?

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এরূপ গদ্যের নমুনা পাওয়া যায় না।

তাঁহার গুণ্ডিচা বিজে, অম্বিকাবিলাস প্রভৃতি পুস্তকে তাঁহার কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সে কবিতারও নানা দিক আছে সত্য, তথাপি পুনরায় বলিব যে তাঁহার গদ্যরচনা সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর।

৯

কিন্তু ব্রজনাথ বড়জেনা যে সাহিত্য রচনা করিলেন, তাহার অনুবন্ধ পরবর্তী যুগে আসিয়া পৌছে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ খ্রীষ্টান মিশনরীদের ওড়িয়া গদ্য রচনা করিবার ও করাইবার চেষ্টা, এবং সম্ভবত নূতন রাজনৈতিক অবস্থায় খানিকটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় কাটিয়া গেল। মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধির সর্ত হিসাবে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরে কটক ও বালেশ্বর জেলা সর্বপ্রথম ইংরাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশীয় ভাষায় জ্ঞান বিদেশী তরুণ কর্মীদের থাকা উচিত, এই বুদ্ধিতে কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম্-এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়, এবং অন্যান্য ভাষার মত ওড়িয়া শব্দকোষও একখানি প্রকাশিত হয়, ইহা ঘটে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে, এবং মোহনপ্রসাদ ঠাকুর এই শব্দকোষখানি প্রণয়ন করেন। ওদিকে ১৮২২ সালে খ্রীষ্টান মিশনরীরা প্রথম উড়িষ্যার উপকূলে অবতরণ করেন। শ্রীরামপুরে মুদ্রিত বাইবেল বিতরণ অল্পকাল মধ্যেই আরম্ভ হইল। দেশীয় বালকবালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত দশ-পনেরটি বিদ্যালয়ও খোলা হইল। এমন কি, দশ পনের বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, মিশনরীরা ওড়িয়া ছাপাখানা বসাইলেন, এবং তাঁহাদের প্রচারকার্য জোর চালাইতে লাগিলেন। ওড়িয়া বাইবেল তো ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দেই ছাপা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ক্রমে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে নানা নামে নানা-প্রকার সংঘ, সমিতি, পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিল। উৎকলোল্লাসিনী সভা, উৎকল ভাষা পুনরুদ্দীপন সভা প্রভৃতির উৎপত্তি এই সময়ে। জন লাইডেন

ওড়িয়া-বাংলার তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখিবার চেষ্টা করেন, সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ইহা প্রকাশিত হয় নাই। আর ১৮৪৩ সালে রেভারেণ্ড সাটন ও ভুবনানন্দ ন্যায়ালঙ্কার উৎকল-ভাষার্থাভিধান নামে অভিধান রচনা করেন। বিস্তর পাঠ্যপুস্তকও এই সময় প্রকাশিত হয়, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বাংলায় যে সব পুস্তক স্কুলের জন্য প্রকাশিত করেন, তাহার অনেকগুলির— কুড়িটিরও বেশি— অনুবাদ করেন ওড়িয়ায়।

ওড়িয়া সাময়িক পত্রের মধ্যে প্রথম বোধ হয় জ্ঞানারুণ, রেভারেণ্ড লেসি ছিলেন ইহার সম্পাদক, ইহা ১৮৪৯ সালে মাসিক রূপে আরম্ভ হয়, কিন্তু শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬১ সালে আর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়— অরুণোদয়, ইহার পিছনে ছিলেন খ্রীষ্টান ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, এবং ইহার আয়ু ছিল তিন বৎসর। উৎকলদীপিকা ১৮৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৮৬৭ সাল হইতে মুদ্রিতরূপে হয় বাহির পরে ক্রমে ক্রমে উৎকলহিতৈষিণী, উৎকলদর্পণ, উৎকলপুত্র, নবসংবাদ, সাম্যবাদী, উৎকলপ্রভা, উৎকলবন্ধু, মুকুর, উৎকল-সাহিত্য— ওড়িয়া সাময়িক পত্রের মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবযুগের ওড়িয়া সাময়িক পত্রের মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবযুগের ওড়িয়া সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখিতে হইলে ১৮৬৭ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস এই কয়টি পত্রিকার মধ্যে পাওয়া যাইবে। উৎকলদীপিকার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের এবং উৎকলসাহিত্যের সঙ্গে বিশ্বনাথ কর মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে জড়িত, ওড়িয়া সাহিত্যের যে সেবা ইঁহারা অক্লান্তভাবে করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বর্তমান যুগে ওড়িয়া সাহিত্যের গতি নিরূপিত করিয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ওড়িয়া এক সময়ে উৎকল সাহিত্য পাঠ করিতেন। এই পত্রিকার সূচনা হইতে নিম্নলিখিত অংশ হৃদয়গ্রাহী হইবে—

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবরে এ দেশর সকল বিভাগরে যেপরি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হোইঅছি, সাহিত্য সম্বন্ধরে মধ্য সেইপরি ঘটিঅছি। এ পরিবর্ত্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়—মনুষ্য সমাজ এক ভাব, এক অবস্থারে চিরদিন রহি ন পারে। জীবন্ত সমাজ পক্ষরে এহা অসহনীয়।

উৎকলসাহিত্যের এই উদার নীতির ঘোষণার পূর্বেই 'কোন পথে যাই' প্রশ্ন উঠিয়াছিল। ময়ূরভঞ্জাধিপতির আনুকূল্যে ১২৯৮ সনে উৎকলপ্রভা নামে এক মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা বাহির হয়। তাহার মুখপত্রে কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের রচনা এবং সমাজে ও সাহিত্যে তাহার ফল সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য ছিল। খানিকটা উদ্ধৃত না করিয়া পারি না—

ওড়িয়া ভাষারে প্রকৃতত: সাহিত্য নাহিঁ বোইলে অত্যুক্তি হেব নাহিঁ। উৎকল সাহিত্য মধ্যরে উপেন্দ্র ভঞ্জ, দীনকৃষ্ণ দাস, কবি সূর্য ব্রহ্মা, প্রভৃতিঙ্ক খণ্ডদশ কাব্য, জগন্নাথ দাসঙ্ক ভাগবত, এবং সারলা দাসঙ্ক মহাভারত, এহা কি গোটাএ জাতির সাহিত্যকু লক্ষ্য? পুণি যেউঁ সমস্ত গ্রন্থর নাম কলু সেমানঙ্ক মধ্যরে কেবল জগন্নাথ দাসঙ্ক শ্রীমদভাগবতকু ছাড়ি আউসবু দ্বারা সমাজের উন্নতি হেবা দূরে থাউ, বরং অধোগতি হেউছি।

ইহাতে আর কিছু না হউক, কাব্যে ও সাহিত্যের অন্যান্য ভাগে নূতন প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পরবর্তী যুগে যাঁহারা কীর্তি অর্জন করিলেন তাঁহাদের অনেকেই এই উৎকলপ্রভায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কবিবর উপেন্দ্র ভঞ্জের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল, ইন্দ্রধনু নামে আর একটি সাময়িক পত্রিকা বাহির হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে প্রাচীন সাহিত্যরীতির ও বিশেষত ভঞ্জ-কাব্যরীতির সমর্থন করা। ইহার প্রকাশকাল অনির্দিষ্ট ছিল। যখন হাতে লেখার জিনিস জমিবে, তখনই শুধু ইহার আবির্ভাব হইবে, পত্রিকার সঙ্গেসঙ্গে এই কথাটি বুঝাইবার জন্য দুই ছত্র কবিতা দেওয়া হইত—

উদয় উপকরণ সজ হেব যেবে
প্রকাশিব ইন্দ্রধনু তেবে কেবে কেবে।

পরবর্তীকালে সত্যবাদী, সহকার প্রভৃতি পত্রিকা নব নব সাহিত্যসৃষ্টির পথ খুলিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু নবযুগের সূচনা পূর্বলিখিত সাময়িক পত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

১০

নূতন যুগের অগ্রণী হইলেন কবি রাধানাথ রায় (১৮৪৮ - ১৯০৮)। ইঁহার বাড়ি ছিল বালেশ্বরে। বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের ইনি দশ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন, ষাট বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। শিক্ষাবিভাগে কার্য করিয়া ইনি ইন্সপেক্টরের পদে উন্নতি লাভ করেন, কিন্তু তাহার চেয়েও ইঁহার উন্নতি হয় কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদলাভে। রাধানাথ বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিতেন, এডুকেশন গেজেট ও অন্যান্য সাময়িক পত্রে তাঁহার কবিতা মুদ্রিত হইত, লেখাবলী নাম দিয়া তিনি পুস্তকও প্রকাশিত করেন, তাহা তাঁহার রচিত বাংলা কবিতার সংগ্রহ। তাঁহার দুইভাগে প্রকাশিত বাংলা কবিতাবলীর মধ্যে চতুর্দশপদী রূপে ওড়িয়া কবি দীনকৃষ্ণ দাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ এবং অভিমন্যুর প্রশস্তি আছে। তাঁহার লেখাবলী পড়িয়া বাঙ্গালী কবি নবীনচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, এবং লেখেন, 'মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর এরূপ কর্তৃত্ব অন্য কেহ যে দেখাইতে পারিয়াছেন মনে হয় না।' তাঁহার ভাবমাধুরী ও রচনাচাতুর্য বাংলা সাময়িকপত্রে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। রাধানাথের সম্পাদিত কালিদাসের সূক্তিগুলির সংগ্রহ ও বাংলায় অনুবাদও সাময়িক পত্রে প্রশংসিত হয়। কর্মসূত্রে ভূদেববাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, এবং রাধানাথের নানা বিষয়ে, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত, বাংলা ও ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান, ও মৌলিক চিন্তাশক্তি দেখিয়া ভূদেববাবু সাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। তিনি রাধানাথকে উড়িষ্যার প্রকৃতিসৌন্দর্য লইয়া

ওড়িয়ায় কবিতা রচনা করিতে বলেন। তদনুযায়ী রাধানাথ ওড়িয়া কবিতা লেখেন। তাঁহার চিলিকা এইরূপ চিন্তাহ্রদের বর্ণনাত্মক কবিতা; কেদারগৌরী, চন্দ্রভাগা, নন্দিকেশ্বরী, উষা ও পার্বতী, গাথা কবিতা। তাঁহার মহাযাত্রা, মহাকাব্যের আকারে লিখিত অসমাপ্ত গ্রন্থ।

ইহা ভিন্ন তিনি মহাভারতের কথা অবলম্বনে বেণীসংহার কাব্য রচনা করেন, দরবার কাব্যে প্রাচীনকালের রাজসভার সঙ্গে এখনকার দরবারের তুলনা করেন, এবং 'ইতালীয় যুবা' নাম দিয়া একটি গল্পও উৎকলদর্পণে প্রকাশিত করেন। এদিক দিয়া তিনি কথাসাহিত্যে ও নাটকসাহিত্যে উড়িষ্যায় রামশঙ্কর, জগমোহন ও ফকিরমোহন, সকলেরই অগ্রণী। গাথাগুলির মধ্যে কেদারগৌরী হইল কেদার ও গৌরী নামে দুইজন গ্রাম্য কিশোর-কিশোরীর প্রণয়ের কথা। ভুবনেশ্বরে কেদারগৌরী কুণ্ডের নিকটে প্রতিবেশী দুইজন প্রণয়ী সঙ্কেতস্থান স্থির করিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সঙ্কেতস্থানে প্রথমে আসিয়া কেদার দেখিল, কাছাকাছি ভীষণাকার বাঘ ঘুরিতেছে, তাহার মুখ হইতে শিকার করা ছাগলের মাংস পড়িতেছে, তখন কেদার তাহার উত্তরীয় ছাড়িয়া পলাইল। ব্যাঘ্র আসিয়া সেই উত্তরীয় দেখিয়া তাহা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। গৌরী যখন কিছু পরে আসিল, তখন সেই ছিন্ন উত্তরীয় দেখিয়া সে স্থির বুঝিল, কেদার নিশ্চয় ব্যাঘ্রের উদরে গিয়াছে। শোকাবেগে সে আত্মহত্যা করিল। তৎক্ষণে কেদার সঙ্কেতস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া হতাশমনে প্রাণ বিসর্জন দিল। ইহা কৈশোর প্রণয়ের মর্মন্তুদ কাহিনী।

'চন্দ্রভাগা'র নায়িকা সুমন্যু নামে জনৈক মুনির কন্যা। তাঁহার সৌন্দর্য দেখিয়া সূর্যদেব মুগ্ধ হন, কিন্তু কন্যা সূর্যদেবের অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে পলাইয়া যান। সূর্যদেব বেগে তাঁহার অনুসরণ করেন। অবশেষে সমুদ্র কন্যাকে আশ্রয় দেন।

চন্দ্রভাগা নামে এক নদী ছিল, পুরী হইতে কোনারক পার হইয়া গেলে এই নদীটিতে যাওয়া যায়। প্রতি বৎসর মাঘীসপ্তমী দিবসে লোকে পুণ্যকামনায় এখানে স্নান করিবার চেষ্টা করে,—চেষ্টা মাত্র, কারণ নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। কোনারকের মন্দির ভগবান সূর্যদেবের নামে উৎসর্গীকৃত। যে মুহূর্তে সমুদ্র চন্দ্রভাগাকে আশ্রয় দিলেন, সেই মুহূর্তেই কোনারকের সূর্যমন্দির ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল।

এইরূপে পার্বতী, নন্দিকেশ্বরী, উষা ও যযাতিকেশরী—সর্বত্রই উড়িষ্যার কোনও না কোনও স্থানের সহিত কাব্যের ঘটনাবস্তু জড়িত আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় কোনও কথাবস্তুর ছায়াও সুকৌশলে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু রাধানাথের কাব্য প্রতিভা সমধিক বিকশিত হইয়াছে তাঁহার মহাযাত্রায়। এই কাব্য সম্বন্ধে ভূমিকায় রাধানাথের আজীবন বন্ধু কবি মধুসূদন রাও লিখিয়াছিলেন—"উৎকলকাব্যরে অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্তনর এহি প্রথম শুভপ্রয়াস। এথিপূর্বে বঙ্গীয় কবিবর শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গলা পদ্যর প্রকৃতি ও নিয়ম আলোচনা করি এহি ছন্দকু প্রবর্তিত করিথিলে। • কবি রাধানাথঙ্কু ছড়া অন্য কৌণসি উৎকলীয় লেখক এহি ছন্দর যথাযথ প্রয়োগ বিষয়রে দক্ষতা দেখাই পারন্তে নাহিঁ।"

শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দে উড়িষ্যার একমাত্র সম্ভাব্য লেখকের রচনা বলিয়া ইহার সেদিন সমাদর হয় নাই— যদিও সেদিক দিয়াও ইহার যথেষ্ট দাবি ছিল— ইহা নবযুগের কাব্যরচনার সূচনা করিয়া গিয়াছে, তাহার রূপ ও পদ্ধতির কথা বলিয়া দিতেছে, মহাযাত্রার সম্পর্কে তাহাও বিচার করিতে হইবে। এরূপ কাব্যের আরম্ভে আছে নমস্ক্রিয়া ও বস্তুনির্দেশ—দেবী সারলাকে নমস্কার করিয়া কবি অমনি বস্তুনির্দেশ করিয়াছে।

পঙ্কজবাসিনি দেবি, উৎকল ভারতি,
সারলে, কি কলে, কহ, কুরুচূড়ামণি,

শুনিলে যেকালে বীর বার্ত্তাহরমুখে
প্রভাসে যাদবক্ষয়· •

মিলটনও এমনি করিয়া তাঁহার প্যারাডাইস লস্টের তৃতীয় সর্গে Heavenly museএর নিকট প্রেরণা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার পরে আবার নবযুগের কবি নমস্ক্রিয়ার বাহুল্য না করিয়া দ্রুত ঘটনার অবতাবণা কবিয়া দিলেন, দূত আসিয়া প্রভাসে যাদবদের ক্রূর পরিণামের কথা নিবেদন করিলে যুধিষ্ঠির সংসারত্যাগেব কথা স্থির করিলেন। মিলটন এবং আদিকবি হোমরও এইভাবে ঘটনার মাঝখান হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্বিক বর্ণনা করিতেন। কবিতাটিব অন্ত একটি আধুনিক লক্ষণেব কথা বলি—দেশভক্তি। মহাযাত্রাব সর্গে সর্গে রাধানাথের দেশভক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাণ্ডবেরা যখন মহাযাত্রায় বাহির হইলেন, তখন কবি পাণ্ডবদের লইয়া উডিষ্যায় আসিলেন। নীলাচলে আত্ম-গোপন করিয়া আছেন অগ্নিদেব, তিনি তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিবেন; সর ও চিল্কা হ্রদও তো সমুদ্রেবই অংশ বিশেষ—যখন স্থদর্শন চক্র সমুদ্রে ডুবিয়া গেল তখন সমুদ্রের বারিবাশি কূল ভাসাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, আবাব সমুদ্রের আদেশে তাহারা সমুদ্রের মধ্যে ফিরিয়া আসিল বটে, শুধু খানিকটা পডিয়া রহিল সব ও চিল্কায় হ্রদ হইয়া। পুরীতে যে চক্রতীর্থ আছে, তাহাও তো এই স্থদর্শন চক্রের সমুদ্রে আসিয়া পড়ার ব্যাপারেই। এইরূপে উড়িষ্যাব বহুস্থান পৌবাণিক মহিমায় মণ্ডিত হইয়া রাধানাথের কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তাহার পব কলিযুগের কথা, পাণ্ডবেরা তাঁহাদেব সত্ত্বগুণোজ্জ্বলা দৃষ্টিতে আসন্ন কলিযুগের ছবি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে কলিকালে দেবসভার অলঙ্কার ধর্ম, সত্য, ন্যায়, তপস্যা, সাম, দয়া, শৌচ, তিতিক্ষা, আর্জব, পদ্মালয়া, সরস্বতী ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন—আর তাহার স্থানে আসিতেছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দর্প, হত্যা, হিংসা ও মিথ্যা, প্রতারণা, দলাদলি ও

আলস্ত। সেদিন ভারতের অবস্থা কতদূর হীন হইবে তাহার আভাসও কবি দিতেছেন—

সেহি দেশ, সেহি গিরি, সেহি নদনদী,
নগর, নগরী, তীর্থ, আশ্রমাদি করি,
সর্বে থিবে পূর্বপরি। মানবে কেবল
নামকু মানব বহি পশুঠারু হীন
হোই যিবে যুগধর্মে ভারত মণ্ডলে।

যুধিষ্ঠিব ভাবতদুঃখ ভাবনায় কাতব হইয়া জিজ্ঞাসা কবিতেছেন—

প্রভু, ত্রিকাল দরশি
তুম্ভে যো, কহ মোতে কিরূপে ভাবতে
ঘটিব এ মহানর্থ সুজলা সুফলা—
এ শস্যশ্যামলা ধবা পবহাতে দেই
পরপাদানত কি হে হেবে আর্যসুতে ?

অগ্নিদেব ইহাব, যে উত্তর দিলেন তাহা পাশ্চাত্যবচিত ভাবত-ইতিহাসেব পাঠকেব উত্তব, একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাহা সংক্ষেপে এই—

ভারতবর্ষেব সকল অমঙ্গলেব মূলে আছে, তাহাব বাষ্ট্রীয় পবাধীন-তাবও মূলে আছে, তাহাব আধ্যাত্মিক অবনতি , ব্রাহ্মণ্যধর্মেব অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক অবনতিব আবম্ভ, কর্মকাণ্ডেব ভাবে অধ্যাত্ম-শক্তি নিষ্পেষিত হইয়া গেল। অস্পৃশ্যতা অভিসম্পাতেব মত সমাজদেহে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, হিংসা, দ্বেষ, আলস্য ও লোভ দেশকে শত্রুব নিকট সহজলভ্য কবিয়া তুলিল। বাল্যকালে চাণক্য শ্লোক শিখানোর মত দুর্গতি যে দেশেব, হয়, তাহাব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি কোনও সন্দেহ থাকিতে পাবে ? কবির ভাষায়—"শ্লোকরূপে শিখাইবে এহি ভীরু নীতি।" বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক হইয়া থাকিবে—"আখ্যারে পৃথক মাত্র, রক্তে সর্ব একা।"

রাধানাথ রায় যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ছাত্ররূপে পাইলেন মধুসূদন রাও নামে জনৈক মারাঠীবংশজাত ওড়িয়া ছাত্রকে। মধুসূদন গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তত্ত্বান্বেষী দৃষ্টি তাঁহাব ছিল। তিনিও অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষকতা আরম্ভ করিলেন। একে তো বাধানাথের উৎসাহ, তাহাতে আবার তরুণ বযসে তাঁহার সঙ্গে ফকিরমোহন সেনাপতির পরিচয় হইল, সাহিত্যের এই ত্রিবেণী-সংগম উড়িযা সাহিত্যেব পক্ষে বিশেষ মঙ্গলময় হইয়া দাঁড়াইল। বালেশ্বব হইতে তখন উৎকলদর্পণ কাগজ বাহিব হইত, দৈবক্রমে রাধানাথ ও মধুসূদন উভযেবই কর্মক্ষেত্র তখন বালেশ্বরে। মধুসূদন নানা প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে লাগিলেন, উৎকলদর্পণের কলেবব পুষ্ট হইতে থাকিল। এই প্রবন্ধগুলি পরে একত্র হইয়া প্রবন্ধমালা নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ রচনাও ছিল, যেমন সূয, উল্কাপিণ্ড, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি। তাঁহাব প্রথম প্রকাশিত রচনা 'প্রণয়র অদ্ভূত পরিণাম' সিসিলির এক কাহিনী লইয়া বচিত। হেমমালা নামে কাহিনী শুনিয়াছি তেলুগু হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে। গদ্য কাহিনী দিয়া সাহিত্যজীবন আবম্ভ করিলেও তাঁহার প্রকৃত দান হইল কবিতা। ওড়িয়ায় শিশুপাঠ্য কবিতাব অভাব তিনিই প্রথম দূব করিলেন, শোকগাথাও চমৎকাব বচনা করিয়াছেন। ভণ্ড-রসায়নে ভণ্ড লেখকদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কাব্য সাধারণত গম্ভীর, ধর্মভাব ও দেশাত্মবোধে ভাবিত। চতুর্দশপদী কবিতা-বলী এবং শোকগাথা তাঁহার পূর্বে আর কেহ উড়িষ্যায লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না। তাঁহার বসন্তগাথা ও কুসুমাঞ্জলি যথাক্রমে সমসাময়িক বা সমধর্মীদের প্রশস্তিসূচক চতুর্দশপদী, এবং সত্য, বিশ্ব, অতীত প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে ও অধ্যাত্ম প্রেরণায় উদ্বোধিত কল্পনার সুচারু প্রকাশ। তাঁহার 'ঋষিচিত্র' ও 'হিমাচলে উদয়-উৎসব' তখনকার দিনে

নব্যভারত (১২৯৮ অগ্রহায়ণ) ও বঙ্গদর্শনে সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। হিমাচলে উদয়-উৎসবে কবি যেন তাঁহার প্রত্যক্ষ-গোচর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই।

কি অপূর্ব কি রহস্যময পরশরে
ভরঅছি সর্বপ্রাণ মহা হরষরে।• •

হে অনাদি হে অনন্ত রস-প্রস্রবণ,
মোর আদি অন্ত রসে রসে নিমগন।
আজি মোর নেত্রোৎসব, শ্রীনেত্রে তুম্ভর
নিমগন মুগ্ধ দৃষ্টি এ মো নয়নর।

ভারতবর্ষের পূর্ব গৌরব ও বর্তমানে হীনতা স্মরণ করিযা তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিযাছিলেন—

এহি কি সে পুণ্যভূমি ভুবনবিদিত
সুবিস্তীর্ণ বঙ্গভূমি আর গৌরবর ?
এহি কি ভারত, যার মহিমা সঙ্গীত
গম্ভীর-ঝঙ্কারে পূর্ণ দিগ-দিগন্তর ?
এহি কি সে সুমনোজ্ঞ আশা-সরোবর,
যার জ্ঞানামৃত পানে কৃতার্থ ধরণী ?
যার তেজে বিভাসিত দেশ-দেশান্তর ?
এহি কি সে বসুধার সমুজ্জ্বল মণি ?
এহি কি অমৃতময়ী মৃত্যুঞ্জয়-সন্তান-জননী ?

নয় পংক্তির এই স্তবকের সাহায্যে মধুসূদন দেশভক্তিকে অথবা অতীত-গৌরবের স্মৃতিকে আবেগময়, অথচ গম্ভীর ও সংহত এক রূপ দিয়াছেন। তাঁহার ভক্তির আবেগের জন্যই লোকে তাঁহাকে ভক্ত কবি বলিয়া উল্লেখ করিত।

ফকিরমোহন সেনাপতির কথা পূর্বে বলিয়াছি। ফকিরমোহন অতি শৈশবেই পিতা মাতা উভয়কে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালে নাতি প্রায়ই অসুস্থ থাকে বলিয়া ঠাকুরমা ফকিরের নামে মানত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পূর্ব নাম ব্রজমোহন বদলাইয়া নাম রাখা হইয়াছিল ফকিরমোহন। আঠারো বছর বয়সে তাঁহাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে হয়, কারণ বিদ্যালয়ের বেতন তাঁহার পক্ষে নিয়মিত ভাবে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে বেতনের পরিমাণ অবশ্য তখনকার দিনে চারি আনা। অগত্যা তিনি নিজের বিদ্যালয়েই মাসিক আড়াই টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। দুই মাস শিক্ষকতা করার পর তাঁহার বেতন বাড়াইয়া চারি টাকা করা হইল। কিন্তু তখন জিনিসপত্রের দর কি ছিল! টাকায় চাউলের দর দেড় মণ, তেল সাত সের ও ঘি তিন সের। এই দামগুলি কল্পনা হইতে নহে, ফকিরমোহনের আত্মচরিত হইতে লওয়া।

যাহা হউক, ফকিরমোহন গদ্য রচনা দিয়াই আরম্ভ করিলেন, তাঁহার প্রথম পুস্তক, রাজপুত্রের ইতিহাস। ছাপাইবার খরচ দিবার লোক নাই বলিয়া বইখানি ছাপানো হয় নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত ওড়িয়ায় অনুবাদ করেন। রামায়ণ এবং মহাভারতও তিনি অনুবাদ করেন বলিয়া শোনা গিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুবাদের ভার তিনি হাতে লইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সন্তানবিয়োগবিধুরা তাঁহার কিশোরী পত্নীর মনকে অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য তিনি প্রথমে বলরাম দাসের রামায়ণ পড়িয়া শোনাইতে চাহিলেন, কিন্তু তাহা শোককাতর মায়ের হৃদয় স্পর্শ করিল না। তখন তিনি নিজে মূল বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষা হইতে ওড়িয়ায় অনুবাদ করিয়া শোনাইতে লাগিলেন, এবারে তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইল।

রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই সব অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়াই ফকিরমোহনকে 'ব্যাস কবি' বলে কি না ঠিক জানি না, তবে উক্ত আখ্যা এইজন্য দিলে অসঙ্গত হইত না।

অনুবাদ ভিন্ন ফকিরমোহন কবিতার বইও একাধিক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকলভ্রমণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব ভিত্তিতে লিখিত। তিনি কর্মোপলক্ষে উডিয্যার বহুস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, বহু করদরাজ্যে কর্ম লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাব দেশ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ও যথেষ্ট পরিচয় ছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই বইখানি লেখা হয়। দুই বৎসর পরে তাঁহার উপহার। ওড়িয়া সাহিত্যের আধুনিক যুগে তাঁহার উপহার এখনও ম্লান হয় নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রাবম্ভে ফকিরমোহন সাহিত্যের অন্য ধারা বাহিয়া চলিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ছমাণ আটগুণ্ঠ প্রকাশিত হয়। ইহাতে গ্রাম্য জমিদার বামচন্দ্র মঙ্গরাজ কেমন কবিয়া বেচারা বাঘিয়া ও তাহার স্ত্রী সারিয়াকে শোষণ করিয়া তাহাদের ছ মাণ আট গুণ্ঠ পরিমিত জমি কাড়িয়া লইলেন, এবং পরিণামে বাঘিয়া পাগল হইয়া গেল ও সারিয়া মারা পড়িল, সে কথা বর্ণনা কবা হইয়াছে। শেষটায় অবশ্য ধর্মেব কল বাতাসে নডিল। গ্রন্থকার যেরূপ সুকৌশলে পাপীর চিত্তবিকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া আদালতেব বিচাব প্রণালী আঁকিয়াছেন ও পুলিশের তদন্তের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে পাঠককে বহুস্থলে ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের কথা মনে করাইয়া দেয়।

ইহার পর লেখক পুনরায় কবিতায় মন দেন, এবং তাঁহাব অবসর-বাসরে ও বৌদ্ধাবতার কাব্য বচিত হয়। প্রথমটি খণ্ড কবিতার সংগ্রহ, দ্বিতীয়টি বুদ্ধদেবের জীবনী লইয়া বচিত কাব্য। বুদ্ধদেবের ধর্মই জগতে শান্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে, এই দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনী-কাব্যটি লিখিত হয়।

ইহার পরে তাঁহার আরও তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়— মামু, লছমা ও প্রায়শ্চিত্ত। মামুতে মামার কীর্তি প্রকাশিত হইয়াছে, ভগ্নী চাঁদমণি ও ভাগিনেয় নরহরিকে প্রতারিত করিয়া সে কেমন তাহাদের অর্থ আত্মসাৎ করিতেছিল ও বিলাসপঙ্কে ডুবিতেছিল। লছমা ঐতিহাসিক উপন্যাস; মারাঠী দস্যু ও খণ্ডায়েৎ বীরের যুদ্ধ ইহার বিষয়বস্তু। লছমা একজন পশ্চিমা বালিকা, তীর্থ করিবার জন্য স্বামী ও পিতামাতার সঙ্গে পুরী যাইতেছিল। পথে মারাঠা দস্যুরা আক্রমণ করিয়া তাহার পিতামাতাকে হত্যা করে। স্বামী স্ত্রী দুইজনে প্রাণে বাঁচিল, কিন্তু কেহ কাহারও সন্ধান জানিল না। লছমা পলাইয়া নিকটবর্তী রাইবর্ণিয়া গড়ে আশ্রয় লইল, দুর্গাধিপতিব পত্নী তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বর্গীরা এই গড়ও আক্রমণ করিল। যুদ্ধে দুর্গাধিপতি নিহত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী চিতারোহণ করিলেন। লছমা পানওয়ালি সাজিয়া বর্গীদের শিবিরে প্রতিহিংসার আশায় ঘুরিতে লাগিল। এদিকে লছমার স্বামী, নবাব আলিবর্দীখাঁর প্রসাদভাজন হইয়া সৈন্য লইয়া বর্গীদের আক্রমণ করিলেন। লছমাও ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ বৃত্তি চরিতার্থ করিল। অথচ কেহ কাহারও কথা জানিতে পারিল না। এই ঘটনার পর উভয়ে নিজ নিজ পথ ধবিয়া পিতামাতার তর্পণ করিবার জন্য গয়ায় গিয়া উপস্থিত; সেখানে পৃথক পৃথক স্থান হইতে পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া পরস্পরে চেনা হইল। প্রায়শ্চিত্ত উপন্যাসে তথাকথিত উচ্চশিক্ষা ও তাহার আনুষঙ্গিক বিষময় ফলের বর্ণনা ও তাহাব প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইয়াছে।

ফকিরমোহন পাঠককে পাপেব শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার দেখাইবার জন্য এবং নীতিশিক্ষা দিবার জন্য উপন্যাস লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপন্যাস নিছক হিতোপদেশ নহে। মানবচরিত্রের সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; গ্রামের উপেক্ষিত অখ্যাত মানুষের মধ্যেও প্রকৃত

ধর্মানুরাগের, চরিত্রের দৃঢ়ভাব নিদর্শন পাওয়া যায়, উড়িষ্যায় গ্রামের জীবনযাত্রাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পবিচয় তাঁহাকে সেই সত্য বাব বার দেখাইয়াছে। তাঁহাব আত্মজীবনচরিত সমসাময়িক উড়িষ্যার সুন্দর বিবরণ। তাঁহার ভাষা সরল ও স্বচ্ছ, কোথাও বিষয়বস্তুকে আববণ করিয়া বাখে না। ফকিবমোহনের কোনও গ্রন্থে সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন, ইহা সাধাবণ লোকেব ভাষায় লেখা, অথচ ইহাতে রুচির অভাব নাই—গবিমা আছে অথচ গ্রাম্যতা নাই। কথাটা ফকিরমোহনের ভাষা সম্বন্ধে খুবই সত্য।

উপবে বর্তমান যুগে ওড়িয়া সাহিত্যে কাব্য, মহাকাব্য, গদ্য, উপন্যাস সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাব কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু নাট্যসাহিত্যেব সম্বন্ধে কিছু না বলিলে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পৌবাণিক কথাবস্তু আশ্রয় কবিয়া 'লীলা', এবং হাস্যবসের সৃষ্টি কবিয়া 'সুয়াঙ্গ', এই দুইটি মিশাইয়া হইত যাত্রা। সে যাত্রায় অবশ্য 'সুয়াঙ্গে'-ব প্রাধান্য থাকিত, কারণ মানুষ বেশিব ভাগ হাসিতেই চাহে। আবাব সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য চিবকাল মানুষেব চিত্তবিনোদন কবিয়া আসিয়াছে। 'গোটিপুঅ নাট', একজনের নাচ, কন্যাবেশে বালক নাচিতেছে, গাহিতেছে একটি চৌপদী— কখনও বা একজনেব জায়গায় দুইজনেব নাচ। কেলা-কেলুণী নাট, ধোবা-ধোবাণী-নাট, কেউট-কেউটণী-নাট, স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া নৃত্য করিত, মুখে গাহিত পৌরাণিক বা ভঞ্জ-কবির কবিতাব দুই একটা টুকবা।

এই অবস্থায় রামশঙ্কর বায় ওড়িয়ায় নাটক বচনা করিতে আবম্ভ করিলেন। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহাব সাধনা ছিল, তিনি প্রেম-তবী নামে এক কাব্য বচনা করেন, কাব্যের ভিত্তি হইল ইংবাজ কবি গোল্‌ড্‌স্‌মিথেব 'হাবমিট'। ববীন্দ্রনাথের বনফুল বা ঐসময়কার অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে প্রেমতরীব বিষয়েব এবং সুবেব সাদৃশ্য আছে। ঋগ্‌বেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা, ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ ও

ভগবদ্গীতা হইতেও তিনি ওড়িয়ায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান রচনা হইল নাট্যসাহিত্য। ১৮৮০ হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৭ বৎসর ধরিয়া বহু নাটক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কাঞ্চীকাবেরী রচনার তারিখ হইল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা ঐতিহাসিক নাটক। কিন্তু তিনি যুগধর্মের মত সামাজিক নাটকও লিখিয়াছেন, 'বুঢাবরে'র মত প্রহসনও লিখিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক নাটক কাঞ্চনমালি হরিজন-বর্ণহিন্দু বিবাহ লইয়া লিখিত, মুলিয়া কন্যা কাঞ্চনের সঙ্গে করণজাতীয় সুর্যমণির বিবাহ হইল ইহার বিষয়বস্তু। অমিত্রাক্ষর ছন্দও তিনি নাটকে প্রবর্তন করিয়াছেন।

রামশঙ্কর রায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও নবীন ধারা অনুসরণ করিয়া নাটক লিখিয়াছেন, এরূপ আরও কয়েকজনের নাম করিতে হয়। জগমোহন লালা, ভ্রম-ভঞ্জন, বাবাজী ও সতী নাটক লেখেন, ইহাদের মধ্যে একটির উদ্দেশ্য ছিল মাদকদ্রব্য সেবনের প্রতিরোধ। সতীনাটকে কিন্তু গড়জাতের অত্যাচারের কথা বলা হইয়াছে। এইগুলি হইল নবীন ধরণে রচিত নাটক। জগমোহনেরও পূর্বে ওড়িয়া নাটকের কথা শোনা যায়, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কবিচন্দ্র রঘুনাথ পরীক্ষা, গোপীনাথবল্লভ নামে এক নাটক লিখিয়াছিলেন, আর পারলাখেমডীর পদ্মনাভ নারায়ণ দেব, ইনি ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া ও তেলুগু ভাষা জানিতেন, তিনি কয়েক খানি নাটক লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীত-প্রহ্লাদ নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, অহল্যা-শাপ-মোচন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। এছাড়া তাঁহার বাণদর্পদলন নাটক, তারক সংহার, দানপরীক্ষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী লইয়া বাণদর্পদলন, এবং দাতাকর্ণের দানশীলতা লইয়া দান-পরীক্ষা রচিত। পদ্মনাভ নারায়ণ দেবের নাটকে সঙ্গীতের বাহুল্য অবশ্য আছে। এইসব নাটক প্রাচীন রীতিতে লেখা, রামশঙ্কর রায়ের সমসাময়িক।

নূতন রীতিতে লেখা নাটকের মধ্যে নাম করিতে হয় ভিকারীচরণ পট্টনায়কের লঙ্কাদান ও কটক-বিজয়েব কথা। কটক-বিজয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হইয়াছে। তাঁহার অন্য দুইটি নাটকের নাম করি, রত্নমালী ও সুশীলা। গোবিন্দরথ বহু নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নবযুগের পাঠক ও দর্শকের মনকে তেমন আকর্ষণ করিতে পাবে নাই। নাট্যকার হিসাবে কামপাল মিশ্রের নাম ইহার পর অবশ্য করণীয়। তাঁহার সীতা-বিবাহ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। তাহার পর আরও তিনটি নাটক তিনি লেখেন— বসন্তলতিকা, হবিশ্চন্দ্র ও দুর্গাশবরী, একটি উপন্যাসও আবম্ভ করেন, কিন্তু দুর্গাশবরী ও শেষ উপন্যাসটি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পণ্ডিত গোদাববীশ মিশ্র নাট্যবচনায় হাত দিযাছিলেন, এবং তাঁহার পুরুষোত্তম দেব (১৯১৭ সালে প্রকাশিত) পূবা পঞ্চাঙ্ক নাটক, কাঞ্চীকাবেরীর গল্পই উপজীবা, কিন্তু আধুনিক ভাবে রচিত। অশ্বিনীকুমাব ঘোষ কোণার্ক প্রভৃতি বিস্তর ন'টক লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। এই ভাবে ওড়িয়া নাট্যসাহিত্য পুষ্ট হইতেছে।

উপরে রাধানাথ মধুসূদন ফকিবমোহন বামশঙ্কর ইহাঁদেব প্রবর্তিত বর্তমান যুগেব ওডিয়া সাহিত্যেব বিকাশেব কথা বলিলাম। বামশঙ্করের কথা প্রসঙ্গে নাট্যসাহিত্যের জেব আধুনিককাল পর্যন্ত টানিযা আনিয়াছি। কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের ধাবা প্রায় পঞ্চাশ বৎসবের হইবে, ইহার পববর্তী যুগেব কথা এখন কিছু বলা প্রয়োজন।

১১

বাধানাথ, মধুসূদন ও ফকিবমোহন নবধারার উৎস খুলিয়া দিলেন, তাঁহাদেব পথ অনুসরণ কবিয়া চলিলেন আর তিনজন কবি—নন্দকিশোর বল, গঙ্গাধব মেহেব ও চিন্তামণি মহান্তি। নন্দকিশোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত কবি, তাঁহার পাঁচ সর্গে সম্পূর্ণ 'কৃষ্ণকুমারী'তে মধুসূদন দত্তের

নাটক' এবং হেমচন্দ্রের দেশভক্তিমূলক কবিতার স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁহার 'সীতা-বনবাস' চতুর্দশ সর্গে রচিত পৌরাণিক কাব্য, 'নির্ঝরিণী', প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ অবলম্বনে পনেরটি ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ। কিন্তু 'পল্লীচিত্রে'র পরিকল্পনা অভিনব, কবি প্রস্তাবনার পর আটটি চিত্রে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ জীবন আঁকিতে চাহিয়াছেন—গ্রামবাসী, হলধারী কৃষক, গ্রামের পাঠশালা, গ্রাম্য দেবতা, শিবমন্দির, শ্মশান, হাট—এবং সর্বদাই চিত্রশেষে একটু পারমার্থিক ভাব প্রকাশ করিয়া উপসংহার করিয়াছেন।

ইহার পর নাম করিতে হয় গঙ্গাধর মেহেরের। তিনি জাতিতে তন্তুবায় ছিলেন, কিন্তু পড়িতে খুব ভালবাসিতেন, কাব্যরচনা ও করিতে শিখিয়াছিলেন। রাধানাথ তাঁহার লেখার পরিচয় পাইয়া তাহাকে উৎসাহ দান করেন, এবং সেই উৎসাহ পাইয়াই তিনি ইন্দুমতী, কীচকবধ, প্রণয়বল্লরী নামে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনখানি কাব্যে তাঁহার আদর্শ ছিল রঘুবংশ, মহাভারত ও অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কিন্তু রচনার প্রকৃতি গতানুগতিক হয় নাই, স্বাভাবিক ও আধুনিক হইয়া সুসংগত হইয়াছে। যেমন, প্রণয়বল্লরী সপ্তসর্গে বিকশিত হইয়াছে— প্রণয়াঙ্কুর, প্রণয়পল্লব, প্রণয় প্রসূন, প্রণয় সৌরভ, পুষ্পে কীট, প্রণয় ফল, প্রণয় ছায়া। সীতার বনবাস লইয়া তিনি একাদশ সর্গে তপস্বিনী নামে কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা।

চিন্তামণি মহান্তি পর পর অনেক কয়টি কাব্য লিখিয়াছেন— মহেন্দ্র, বিশ্বচিত্র, সুভদ্রা, মহোদধি, বিক্রমাদিত্য। স্বভাবের সৌন্দর্য, পর্বতের গাম্ভীর্য, সমুদ্রের নিত্যচঞ্চলতা— গড়জাতে যেমন যেমন দেখিয়াছেন তেমন তেমন ভাষায় ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন, নবজাগ্রত দেশভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি মুকুন্দদেব সম্বন্ধেও কাব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার চেয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন কুন্তলাকুমারী সাবৎ। কুন্তলাকুমারী বিস্তর খণ্ড-কবিতা লিখিয়াছেন, প্রেম, ধর্ম, মানবের অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া।

তাঁহার কবিপ্রতিভার জন্য পুরীর পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'উৎকলভারতী' উপাধিতে বিভূষিত করেন। তাঁহার কবিতা গীতিধর্মী ও আত্মসচেতন (subjective)। তিনি 'রঘু অরক্ষিত' নামে এক উপাখ্যানও লিখিয়াছেন, অবশ্য ইহা এই নামের প্রসিদ্ধ সাধকের নহে।

কিন্তু ঐ সময়েই, বা উহার কিছু পূর্বে, প্রগতিশীল সাহিত্যিকেরা উড়িষ্যায় তাঁহাদের বিদ্রোহধ্বজা উড়ান। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পরিচালনায় সবুজপত্র যখন বঙ্গসাহিত্যকে নবীনতায় সরস করিয়া তুলিতেছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সবুজপত্রের রং আরও সবুজ করিয়া দিতেছিলেন। উড়িষ্যার সবুজসংঘ বা সবুজসাহিত্য সমিতি, সবুজ পত্রিকা নাম দিয়া নূতন কাব্যধারা দেশে বহাইতে চেষ্টা করিলেন। বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত কবি ও উপন্যাসিক অন্নদাশঙ্কর রায় এই সংঘের একজন সভ্য ছিলেন, তাঁহারও কয়েকটি কবিতা 'সবুজ পত্রিকা'য় স্থান পাইয়াছে। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শচী রাউৎরায়, এই নবীন কাব্য প্রবাহে নিজেদের ঢালিয়া দিয়াছেন।

গদ্যসাহিত্যে কথাসাহিত্য ছাড়া অন্য দিকেও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। গোপালচন্দ্র প্রহরাজ হাস্যরসপূর্ণ রচনা দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহার 'বাই মহান্তি পাঞ্জি' ও 'ভাগবত টুঙ্গিরে সন্ধ্যা' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাত ও সংমিশ্রণ জনিত সমাজের রুচি-বিভ্রাটকে হাস্যদ্বারা সরস করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কবিবর রাধানাথ রায়ের পুত্র শশিভূষণ রায় প্রকৃতি সম্বন্ধে সৌন্দর্য সন্ধানীর আলোচনা দ্বারা প্রবন্ধসাহিত্য পুষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার কবিপ্রাণতা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাহার লেখাকে অপরূপ শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে। তাঁহার 'দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ,' 'উৎকলর ঋতুচিত্র' ও 'উৎকলপ্রকৃতি' বহু বৎসর ধরিয়া তরুণ ওড়িয়া চিত্তকে প্রকৃতি-শোভায় মুগ্ধ হইবার জন্য উন্মুখ হইতে শিখাইয়াছে। ওড়িয়া ভাষা এবং ওড়িয়া সাহিত্য সম্বন্ধে শ্যামসুন্দর

রাজগুরু, মৃত্যুঞ্জয় রথ, গোপীনাথ নন্দশর্মা, আর্তবল্লভ মহান্তি প্রভৃতি বহু সাধক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। গোপালচন্দ্র প্রহরাজের হাস্যরসের সম্পদের কথা পূর্বে বলিয়াছি; তিনি হাস্যরসাশ্রিত প্রবন্ধ ভিন্ন অন্য ভাবেও ওড়িয়াভাষার সেবা করিয়াছিলেন, তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া এক বিরাট ভাষাকোষ সংকলন ও সম্পাদন করিয়া যান, তাহাতে একলক্ষ চুবাশি হাজার শব্দ ধরা হইয়াছে।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য থামিয়া নাই। তাহা অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমগ্র দেশকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, ভারতের বহুদিনলুপ্ত বহুকাল-বাঞ্ছিত স্বাধীনতার আগমনেও সে বিপর্যয় হইতে সাম্যাবস্থা আনা সম্ভব হয় নাই। অন্নবস্ত্রের কথা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। কাহ্নু মহান্তির উপন্যাস পড়িয়া বর্তমান উড়িষ্যা মুগ্ধ হইতেছে, কিন্তু 'ভাত' নাটকের অভিনয়ে সে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে, 'চাষীর লুহ'— চাষীর অশ্রু তাহারও চক্ষে অশ্রু বহাইতেছে। কিন্তু করুণ চিত্র ও ভাবী বিপ্লবের চিত্রই বর্তমান ওড়িয়া সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নহে। এখনও অতীত ইতিহাসের কাঞ্চীবিজয়ের উপাখ্যানে তাহার মন ভরিয়া ওঠে, 'চতুরঙ্গ', 'শঙ্খ', 'বীণা', 'শতাব্দী', 'উদয়'— নানা নামে নানা রসে সাময়িক পত্রিকা বাহির হইতেছে। কাহ্নু মহান্তি, মায়াধর মানসিংহ, নিত্যানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি লেখক বর্তমান ওড়িয়া সাহিত্যের জয়পতাকা বহন করিয়া চলিতেছেন। বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা তো কৃতিত্বের দিক দিয়া আধুনিক পাঠকের পরিমাপ করিবার কথা নয়, কারণ কৃতিত্বের কতটুকু পরিচয় বর্তমানের কষ্টিপাথরে হওয়া সম্ভব? চেষ্টার দিক দিয়াই তাহার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। সমসাময়িক ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে উড়িষ্যা এখানে সমান জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

এই গ্রন্থমালার জন্য বিশ্বভারতী জাতীয় অভিনন্দন লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। —যুগান্তর

প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণেব মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ কবিবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে। বিশ্বভারতী বাংলাদেশে সেই অভাব পূরণ কবিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। —দেশ

সহজ গ্রন্থমালাব যে ক'টি গুণ তার প্রায় সবগুলিই এখানে বর্তমান, চেহারায় আশ্চর্য আকর্ষণ, দাম অত্যন্ত সস্তা, ছাপা ঝকঝকে পরিষ্কার। —সংকেত

অল্প কথায় অনেক কথা ব'লে নীরসকে অমৃত কবা হয়েছে, এমন গ্রন্থ পেতে হলে এই সিবিজেব দিকে তাকাতে হয়। —পূর্বাশা

আমাদেব ইস্কুল-কলেজেব ভ্রমাত্মক শিক্ষার পরিপূরক ও সংশোধকরূপে এ ধবনেব বই যত বেশি প্রকাশিত ও প্রচাবিত হয় ততই ভালো। —কবিতা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-নামক যে গ্রন্থমালাব আযোজন করিয়াছেন তাহা দেশের জনসাধাবণেব মধ্যে শিক্ষাপ্রচাব ও জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিবে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা নিশ্চিতই জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের কল্যাণ সাধন করিবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা বিষয় ও লেখক নির্বাচনে, মুদ্রণের পারিপাট্যে, মলাটের সৌষ্ঠবে যে প্রকাশন-দক্ষতার পবিচয় দেয বাংলাদেশে তা অভূতপূর্ব। —পরিচয়

এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে ৯০ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে

পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে

প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

আমরা সজীব প্রাণী হয়েও বহু যুগ ধরে জড়ভাবাপন্ন হয়ে আছি। বিশ্বভারতী-প্রবর্তিত এই গ্রন্থমালা তরুণদের প্রাণে নবজীবনের সাড়া উদ্বুদ্ধ করুক। —**প্রবাসী**

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নানা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হয়েছে। এ উদ্দেশ্য সাধু; এর প্রয়োজনীয়তাও আমাদের নিকট ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাঠ্যগ্রন্থের অল্পপরিসর গণ্ডির ভিতর সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সরল ভাবে সন্নিবিষ্ট করা দুরূহ সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরিচালনায় মনীষী পণ্ডিতগণের সহায়তায় এই সুমহৎ উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে উঠবে। —**পরিচয়**

Here is conversation without jabber, erudition without pedanticism, the specialist without his brogue, the scientist without his equations and calculuses. The volumes of this series, for which we are indebted to Poet Rabindranath Tagore, are elaborately designed . . . *Lokasiksha* or Folk Education books, look something like a university extension course to the average Bengali-knowing reader whose inability to step inside the halls of rich English libraries or whose lack of mastery of a European language slams the door of modern knowledge against him. Now he need not go hungry and ashamed. —**Hindusthan Standard**

বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য 'শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া'। এই উদ্দেশ্য কল্পনায় নহে, বাস্তবে রূপায়িত করিবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশ্বভারতী দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। —**যুগান্তর**

অসমীয়া সাহিত্য

৭২

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫৮ ॥

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

৯১. ওড়িয়া সাহিত্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

৯২. অসমীয়া সাহিত্য

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

৯৩. জৈনধর্ম

ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

৯৪. ভাইটামিন

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

৯৫. মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৯৬. বাংলার পালপার্বণ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

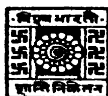
বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতী যুগশিক্ষার সহিত সাধারণমনের যোগসাধনের এই কর্তব্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০-১৩৫৮ সালে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৯৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

অসমীয়া সাহিত্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৯ ফাল্গুন

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা
৩.১

নিবেদন

অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও বক্তব্য এত বিষয় আছে এবং সে সাহিত্য এত বিশাল যে সামান্য পুস্তিকায় তাহার যথোপযুক্ত আলোচনা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া নানা পুঁথির পাঠ কাল ও অর্থ লইয়াও মতান্তর আছে। আমি নিজে অসমীয়াভাষী বা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নই। সাধারণ রসপিপাসু মানুষ হিসাবে অসমীয়া সাহিত্য পড়িয়াছি, তাহার রসগ্রহণ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—অনধিকারীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট লাভ। আমার মধুকরী মন পাঁচ জনের দরজা হইতেই মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়াছে। হয়তো নূতন কিছু বলি নাই, বলিবার ক্ষমতা নাই। শুধু সশ্রদ্ধ চিত্তে সংগ্রহ করিয়াছি, সন্ধান দিয়াছি। প্রতিবেশী সাহিত্যের আলোচনা যেন আমাদের বার্ট্রান্ড রাসেল কথিত সেই স্তরেই লইয়া যায়, যেখানে 'Lessening of fanaticism with an increasing capacity of sympathy and mutual understanding'ই সাহিত্য-পাঠের লাভ হয়।

যাঁহারা আমাকে এইসব আলোচনায় উৎসাহ দেন তাঁহাদের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীসূর্যকুমার ভুইঞা ও দিল্লীর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ই প্রথমে আমাকে অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য শুধু প্রেরণা নয়, নানা পুস্তক ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্তৃপক্ষকেও আমাকে এই সুযোগদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যুগে যুগে দেশে দেশে নবজাগৃতির ছন্দে কবিগুরুর আদর্শ ব্যাপ্ত হোক—

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

১. অসমীয়া সংস্কৃতির রূপ

ঋগ্বেদের ঋষি বলিলেন—অজনয়ৎ সূর্যং বিদদ্‌গা, অক্তুনাহ্নাং বয়ুনানি সাধ্য—ইন্দ্র জন্ম দিলেন সূর্যের, ফিরিয়া পাইলেন জ্যোতির সমষ্টি, রাত্রির মধ্য হইতে দিনের প্রকাশ ঘটাইয়া। সংস্কৃতির একটি মূল সূত্র এই তথ্যের মধ্যে নিহিত। ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে, দানপ্রদানের মধ্যে, সংস্কারের পুনরাবর্তনে ও বিবর্তনে জীবনের রূপান্তর ঘটে—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। সেই রূপান্তরের পথ বাহিয়া সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে জাতীয় সত্তা শুধু প্রকাশিত নয়, বিকশিতও হয়। প্রাণশক্তি সৃষ্টিশীল—সৃষ্টির পথ সে নিজেই খুঁজিয়া লইয়া নিত্যসমৃদ্ধ ও রূপান্তরিত হইয়া উঠে। ব্যষ্টির জীবনে যে ক্রমবর্ধমান ও ক্রমসঞ্চয়ী নিয়ম, সমষ্টির জীবনেও সেই চিরন্তনী প্রাণলীলার প্রকাশ। যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্য সেই চলমান জীবনধারার রসমূর্তি প্রকাশ করিয়া সার্থক হইতেছে। চলিষ্ণু সমাজ ও গতিশীল মানবচিত্তের সহিত সমতা রাখিয়া যে সাহিত্যিক রস রচনা হয়, তাহাই জাতির জীবনে তার স্পর্শ রাখিযা যায়। হঠাৎ যেন একদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, যদিও তার প্রস্তুতি বহুদিনের। দুকূল প্লাবিয়া সেই মননস্রোত চলে।

সাহিত্যের ইতিহাসকেও তাই বলা চলে চলমান জীবনধারার বিভিন্নমুখী প্রকাশের কাহিনী। সাহিত্য শুধু বহিরঙ্গের নয়, অন্তরঙ্গেরও, অন্তর্দ্বন্দ্বেরও। ভাবে, ভাষায়, ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে গদ্যে পদ্যে কাহিনী যখন রসোত্তীর্ণ হয় তখনই তাকে আমরা সাহিত্যের পদমর্যাদা দিই। সাহিত্য বা ইতিহাস শুধু অতীতের কঙ্কাল নয়। প্রকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক জীবনকে উপলব্ধি করেন তার সমগ্রতার মধ্যে। শিল্পে, রাষ্ট্রগঠনে, কর্মপ্রচেষ্টায়, ধর্মসংঘটনে যেমন তার প্রকাশ, তেমনি বিকাশ লিখিতভাবে—ভাষায়, কাব্যে, গল্পে, কাহিনীতে, নাটকে, উপাখ্যানে। শুধু তাম্রশাসন, শিলালিপি, শাসক সম্প্রদায়ের কাহিনী, সাল, অব্দ জীবনের গতিশীল রসের সম্যক পরিচয় দেয় না, সেইজন্য যুগে যুগে রসসমুদ্রে লীন সেই সত্যকে কল্পনার রঙে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো হয়। প্রাচীন ইজিপ্টের সম্রাটকবি ইখনাটোন হইতে আজিকার দিনের কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই রসানুভূতিপ্রবণতাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে কোনো যুগের সত্যকার সাহিত্যকে খুঁজিয়া পাইতে হইলে সাহিত্যের ঐতিহাসিককে ডুব দিতে হইবে গভীরে। যিনি যে যুগের বা জাতির রসসৃষ্টির কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবেন তিনি সেই যুগের মনটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। স্রষ্টার পাশে তিনি দ্রষ্টা। তাঁকে অনুসন্ধান করিতে হইবে সেই যুগের ধ্যানময়, রসময়, ভাবময় মনটিকে—তার অখণ্ড সত্তাকে—যে মন নড়ে, যে মন গড়ে, সৃষ্টি করে, দৃষ্টি দেয়, যে মৃত্যুঞ্জয় মন বাঁচিয়া থাকে ধারাবাহিকতার মধ্যে, যার প্রকাশ শুধু কথার প্যাঁচে প্যাঁচে দাদার চৌপদীতে নয়, নানা ভঙ্গীতে, রূপে ও রূপান্তরে। সাহিত্যের ইতিহাস একটা জাতির প্রবহমান ভাবধারার ইতিহাস, সেটা শুধু একটা সমষ্টিচেতনা বা কৌলিক চেতনা নয়, সহস্র হৃদয়ের রম্য স্পন্দন। প্রাচীন সাহিত্য শুধু অতীতের কাহিনী নয়, বর্তমানের পটভূমি, ভবিষ্যতের ভিত্তিভূমি—একটা অসমাপ্ত ধারা। তাই

অনাগতদিনের রূপও উপ্ত ও প্রচ্ছন্ন আছে তার প্রতি পত্রে ও ছত্রে। সাহিত্য মানুষের নিজেরই অন্তরতম পরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো। তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল তার ভাবীকালের গৃহের দীপ।" ভারতের এই প্রাত্যন্তিক প্রদেশের চলোর্মি ইতিহাস ও কৃষ্টিসংঘর্ষের বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন আর্য-সভ্যতা এখানে আগন্তুক হইলেও আত্মপ্রতিষ্ঠিত। তাহার পূর্বে অবশ্য অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, কিরাত, বোড়ো, ভোটচীনরা আসিয়াছে। আলোহিত্য ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে নাগা, মিকির, খাসি, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি পার্বত্য জাতিরা, প্রাগ্জ্যোতিষ কাম-রূপে আর্যসভ্যতার প্রাচুর্য, পরে তন্ত্রমতের প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, শৈববাদ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, মনিপুর হেরম্বদেশে মগধগৌড় সভ্যতার প্রসার, পববর্তীকালে শান জাতির অহম শাখার অভিযান অসমীয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক বিচিত্র রূপায়নে পরিণত করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম প্রবণতা কবির ভাষায় এইখানে সম্পূর্ণ ভাবে প্রযুজ্য, মহাভাবতের বীজ এইখানে প্রচ্ছন্ন। মহামানবের সাগরতীরে সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের মণিমেখলায় কত কথা ও কাহিনী, কত কিম্বদন্তী, কত গাথা যে গ্রথিত আছে তার ইয়ত্তা নাই। তার সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, নিক্তির ওজনে সমালোচকের নিরিখে তাহাব বিচার হউক আপত্তি নাই, কিন্তু মানবমনের চিরন্তনী বেদনার ইতিহাসে, রসবেত্তার মর্মকোযেও তাহার একটা নিজস্ব মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার কবিবাব উপায় নাই। নরক ভগদত্ত, বাণ ঊষা অনিরুদ্ধ, অর্জুন চিত্রাঙ্গদা, উলূপী বভ্রুবাহন, ভীম হিড়িম্বা, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সত্যভামা, ভাস্করবর্মা, হিউয়েনচাঙ, শীলভদ্র, মৎস্যেন্দ্রনাথ, অভিনবগুপ্ত, কামেশ্বর মহা-গৌরীব উপাসকরা, শালস্তম্ভবংশীয় নৃপতিগণ, কুচিয়া জাতির আদি পূরুষ কুন্তী ও আদি জননী মামা, ব্রা বি, আইগোসানী, তাম্রেশ্ববী, কমতাধিপতি পৃথুরাজ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক দুর্লভনারাযণ, মূলাগাভবু, হেড়ম্বপতি তাম্রধ্বজ, জৈন্তাধিপতি রামসিংহ, স্বর্গদেবগণ, বড়গোহাই বুঢ়াগোহাই, ভাম্বুলি বববরুয়া, লাচিত বড়ফুকন, নিত্যপাল, তুলারাম, রাজা শিবসিংহ, রানী ফুলেশ্বরী, অম্বিকা-দেবী কনকলতা, নিরঞ্জনবাপু, সর্বোপরি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্কর দেব, মাধব দেব, দামোদর দেব, রামায়ণকার কন্দলী ও তাঁদের শিষ্যগণ আসামেব ইতিহাস, সাহিত্য ও মন জুড়িয়া বসিয়া আছেন।

এই প্রসঙ্গে 'আহোম' ও 'অসমীয়া' এই দুইটি শব্দের পার্থক্যেব কথা বলা যাইতে পারে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Robinson -এর *Descriptive Accounts of Assam*-এ দেখি, আসামকে বলা হইয়াছে অ সম, unequalled বা unrivalled। স্যার এডোয়ার্ড গেট্ও peerless অর্থে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাইশাখার শানেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন এই প্রদেশে আসে, তখন তাহাদের আ সাম, অ সম, আ চাম, অ হম বলা হইত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে বিজেতাবা দেশটিকে 'মিউং ডুন চুনখাম' বা সোনার দেশ বলিয়া বর্ণনা করিত, কিন্তু শান দেশ হইতে আগত বলিযা তাহাদের আ সাম বা আ হম বলা হইত। তাহার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাবে, ভাষায়, রক্তে কামরূপীয় আর্য সংস্কৃতির বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ বাদের সহিত ক্রমাগত সংমিশ্রণের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ফলে বিজেতারা পুরাদস্তুর হিন্দুভাবাপন্ন হইযা তাহাদের ধর্ম, ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য বিজেতাদের বংশধরেরা, নানা সংমিশ্রণ সত্ত্বেও তাহাদের নিজস্ব ভাষা কিছুটা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন এবং তাহারই বর্তমান রূপকে প্রাচীন আ হোম ভাষার সঙ্গে সংশিলষ্ট করিলে বিশেষ ভুল হইবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই আহোম ভাষা বর্তমান বা প্রাচীন অসমীয়া ভাষা নয়। কিছু সংমিশ্রণ হইয়াছে যেমন বুরঞ্জীর ভাষায়, কিন্তু 'অসমীয়া' বলিতে প্রাচীন কামরূপীয় অর্ধমাগধীর অপভ্রংশকেই বুঝায়। কারণ এই শানজাতীয় অহমদের আসিবার বহু পূর্বেই, অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আর্য সভ্যতা ও কৃষ্টি কামরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং আর্ষ ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি অনার্য আদিবাসী ও আগন্তুকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। আর্যরা আসিবার পূর্বে যে অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, ভোটচীনরা আসামে ছিল বা পরে আসিয়াছিল তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে আর্যীকৃত আজও হয় নাই একথা সত্য, কিন্তু সমীকরণের চেষ্টা যে চলিতেছিল, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অহমদের সম্বন্ধেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। অহম রাজা চুংখাপা ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গদেবে পরিণত হইলেন। ষোড়শ শতাব্দীর সূর্য দৈবজ্ঞ লিখিত দরংরাজবংশাবলীতে আছে যে, অসম বলিতে ঐ বিজয়ী শানেদেরই বুঝাইত। সপ্তদশ শতাব্দীর দৈত্যারি ঠাকুরের শঙ্করচরিতে শান বা আহোমদের নানাভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিছু পরে রচিত কামরূপ বুরঞ্জীতে 'আছাম' এই কথাটি পাওয়া যায়। অসম বুরঞ্জীতে উদ্ধৃত (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) মীরজুমলা (মজুম খাঁ) ও অহমরাজের সন্ধিপত্রের যে বিবরণ আছে তাহার বর্ণনা এইরূপ: "লিখিতং শ্রীজয়ধ্বজ সিংহ রাজা আচাম . ."।

ঐতিহাসিকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, আসাম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। গ্রিয়ারসন ব্রহ্মদেশীয় শান কথার সঙ্গেই আসামকে জড়িত করিয়াছেন। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী শানকে মনখমের শিলালিপির শিনশ্যামের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাই ভাষায় চাম বলিতে পরাজয় বুঝাইত। আ চাম বলিলে অপরাজেয় বুঝায়। আসামের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ বাণীকণ্ঠ কাকতি আসমের নামকরণকে phonetic vagary বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার মতই মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ এবং বর্তমানে অসমীয়া সাহিত্য বলিতে আমরা ঐ ভাষায় লিখিত সাহিত্যকেই বুঝি। অবশ্য অহম ভাষায় নিজস্ব কিছু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে, বুরঞ্জীতেও ও অন্যত্র তাহার নিদর্শনও আছে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাহিরে পার্বত্যজাতিদেরও নিজ নিজ ভাষায় কিছু সাহিত্যিক প্রকাশ আছে। এবিষয়ে খাসিরাই অগ্রণী।

আসামের স্বাধীন নরপতিদের শাসনছায়ায় এবং তাহার সামাজিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় অসমীয়া ভাষা একটি স্বাধীন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, যদিও তাহার সগোত্রা উত্তরবঙ্গীয় কথ্যভাষা ক্রমশঃই লিখিত ও সাহিত্যিক বঙ্গ ভাষার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

মোটকথা, শান জাতির অহম শাখার লোকেদের আগমনের বহু পূর্বেই এখানে অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, বোডো, তিব্বতীয় দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় এবং আর্যেরা আসিয়াছেন এবং আর্যেরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু মগধ গৌড় হইতেই লোক আসে নাই, মিথিলা কনৌজ কাশ্মীর গুর্জর দাক্ষিণাত্য হইতে বৌদ্ধ শ্রমণ আসিয়াছে, তান্ত্রিক কাপালিক আসিয়াছে, সহজিয়ার দল, নাথসম্প্রদায়ীরা আসিয়াছে। তাহার পরেও শিল্পীভাস্করচিত্রকররা আসিয়াছে, গায়কবাদক আসিয়াছে, হাটকেশ্বরের পূজারীরা

আসিয়াছে, নদীয়ার ব্রাহ্মণবৈষ্ণবগুরুরা আসিয়াছে। তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম সত্তাকে এইখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কামরূপ প্রাগজ্যোতিষকে অহমদের ও আদিবাসী ও অন্য আগন্তুকদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশাইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতির বীজ বপন করিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আসাম পুরাতত্ত্ব ও অনুসন্ধান বিভাগের কর্মকর্তা ডাঃ সূর্যকুমার ভুইঞার দুই নম্বর বুলেটিন হইতে কিছু মন্তব্যের মর্মার্থ দিতেছি—

আসামের কথ্যভাষা প্রায় এক শ কুড়িটি। অস্ট্রিক, ভোটচীন, দ্রাবিড় ও আর্য-শাখার ভাষা। প্রত্যেকটিই জীবন্ত। অনার্য বিজেতারা ক্রমশই বিজিতদের সংস্কৃতির প্রভাবে আসিয়াছিল এবং তাহারই ফলে একটি মিশ্র সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহাকে আর্য রক্ষণশীলতা ও অনার্য অগোঁড়ামীর মিশ্রণ বলা যাইতে পারে—আর্য ও অনার্য ধারা রক্তবাহিকা দুই নাড়ীর কাজ করিতেছিল।.. ফলে এইখানে নূতন স্মৃতিবিধির উৎপত্তি হইয়াছিল, নূতন জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞান, নূতন ধর্মসাহিত্য, যদিও ইহাব গোড়ায ছিল বৌদ্ধ চিন্তার প্রভাব।

২. অসমীয়া সাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের কালবিভাগ বিচাব করিলে দেখা যায যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত 'অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী'তে যে বিভাগ নির্দেশ করা হইয়াছিল তাহা আজও গ্রহণযোগ্য। এই বিভাগ অনুসারে অসমীয়া সাহিত্যকে ছয়টি যুগে ভাগ করা যায়—

অসমীয়া সাহিত্যের প্রথমযুগ 'গীতিযুগ'—আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময়কার সাহিত্য প্রায়ই অলিখিত। ডাকের বচন, বিহুগান, শিশুদের ঘুমপাড়ানী ছড়া, এই শিশুযুগের নিদর্শন।

অসমীয়া সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ 'মন্ত্র আরু ভনিতার যুগ'—এই সময়েই লিখিত সাহিত্যের জন্ম। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার কাল নির্দেশ করা যায়।

তৃতীয় যুগের আরম্ভ হইল রামায়ণ পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদে—কবি হেমসরস্বতী, মাধব কন্দলী, পীতাম্বর দ্বিজ প্রভৃতি এই যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। ইহাকে বলা হইয়াছে—প্রাক্‌বৈষ্ণবীযুগ।

মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে বৈষ্ণবী যুগের আরম্ভ। ইহাকে শুধু বৈষ্ণবীযুগ বলিলে ঠিক পরিচয দেওয়া হয় না, ইহা হইল নবজাগৃতির যুগ।

তাহার পরের যুগের নামকরণ হইযাছে বিস্তারের যুগ। এই যুগের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে গভীরতা কমিয়া গিয়া বিস্তৃতি বৃদ্ধি। এই যুগই রাজা শিবসিংহ, রানী ফুলেশ্বরীর যুগ, মাওমোরিয়া বিদ্রোহের যুগ, বর্মীদের সহিত যুদ্ধ, পতন, গৃহবিবাদের যুগ।

ব্রিটিশ যুগের আরম্ভ হইতে বর্তমান যুগের আরম্ভ। এই যুগের সাহিত্যে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রভাব প্রচুর।

এই যুগবিভাগকে মোটামুটি মানিয়া লইলেও সুষ্ঠু ইতিহাসসম্মত ও ভাষা-তত্ত্বানুমোদিত বিভাগ অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয যুগ, ও চতুর্থ ও পঞ্চম যুগকে

একত্র বিচার করাই সমীচীন। প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের ডাকের বচন, বিহুনাম, কন্যা বারমাহী, গ্রাম্য গীত, আইনাম প্রভৃতি যে নিদর্শনগুলি আমাদের যুগে আসিয়া পেঁৗছিয়াছে সেইগুলি ভাষাতাত্ত্বিকের দিক হইতে দেখিলে ইহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন যে সেইগুলি আদিম যুগেরই রচনা। প্রধানতঃ এই সব গীতি কবিতা লোকের মুখে মুখে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেইসঙ্গে সমসাময়িক ভাষার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী। তবে এইগুলি অপেক্ষাকৃত পরের যুগের হইলেও প্রাচীন যুগের রূপ বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য এইগুলির সাহিত্যিক বিচার আদিম যুগেই নির্ণয় করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিকদের মতে আসামে প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয় অস্ট্রিকদের আগমনে। তাহারই উত্তরাধিকারী হিসাবে অনেকে খাসি, জয়ন্তীয়া ও মোরানদের দেখাইয়া দেন। মাতৃতন্ত্রপ্রধান কৃষিগ্রামীণ সভ্যতা অস্ট্রিকদের দান। মাদ্রাজের ডাঃ এরহেনফেলস দক্ষিণ ভারতীয় মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার সহিত আসামের খাসিদের সাংস্কৃতিক ঐক্য আছে প্রমাণ করিয়াছেন। বিহুনাচ ও গান, বৃহৎ প্রস্তর স্তম্ভ (megaliths), প্রস্তর কুঠার প্রভৃতি যন্ত্র এক প্রাচীন মাতৃতন্ত্রবাদের ঐতিহ্যের পরিচায়ক। বিহুনাচ প্রভৃতি উৎসব (বোহাগবিহু, কাতিবিহু, মাঘবিহু) আসামের অতি জনপ্রিয় ও পুরাতন উৎসব। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজমোহননাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই উৎসবগুলিকে অস্ট্রিক যুগের স্মারক বলিয়া মনে করেন। খাসিদের মধ্যে নংক্রিম নাচ আজও বিশেষভাবে প্রচলিত। তাঁহার মতে গ্রামীণ ও কৃষি সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ ভূমাতার শস্যদান মানবীয় মিলন, গর্ভধারণ, জন্মদান ইত্যাদি রূপকরূপে কল্পিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে বোহাগবিহু উৎসবে মিলনেচ্ছু যুবক যুবতীরা উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শস্যারোপণের পূর্বে কামোদ্দীপক নৃত্যগীতাদি করিত। মাতা বসুন্ধরাকে তাহারা শস্যদানের উপযুক্তা করিয়া তুলিত—অশোকবৃক্ষ রোপিত হইত। অম্বুবাচী বা 'আমাতি' মাতার রজস্বলা হইবার দিন এবং চারিদিন পরে শস্য বপনের দিন। কাতিবিহুতে ভূমাতা শস্যবতী হইয়াছেন, তাহাকে নানারূপ মন্ত্রপূত করিয়া গর্ভস্থ সেই শস্যসন্তানকে নিয়মিত সময়ে গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্রহায়ণে শস্য উৎপাদন ও কর্তন শেষ হইলে পৌষের শেষে উত্তরায়ণের প্রথমে মাঘবিহু—মাতা প্রচুর শস্য দিয়াছেন—দীয়তাং ভুজ্যতাং—অগ্নি সংযোগ দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ ও সবল রাখা কর্তব্য। তাই দিকে দিকে বহ্ন্যুৎসবের ব্যবস্থা। কিন্তু আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে ঋগ্বেদেও অতিরাত্র, মহাব্রত ও বিষুবাহু প্রভৃতি যজ্ঞের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞকুণ্ডের পাশেপাশে রাত্রির তিন যামে উপাসকরা সোমপাত্র হাতে ঘুরিতেছেন ও মন্ত্রপাঠ করিতেছেন ইহা দেখা যায়—

তুলসীর গোরে গোরে মৃগপাহু ঘুরে।

কালো বড় খর্বাকার কোঁকড়ানো চুল, নাক চ্যাপটা, ঠোঁটপুরু, নিগ্রোবটুর রক্ত আসামের নাগাদের মধ্যে কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। নাংগা বলিতে স্বর্গ হইতে আগত বোঝায়। বর্শা, দা, শাঁখ, কড়ি, চিত্রবিচিত্র শিরোভূষণ নাগাদের বৈশিষ্ট্য। আঙগামীরা হাতির দাঁতের কাজে সুপটু। ইহারা আদিম প্রস্তরাস্ত্র যুগের (eolithic) মানুষ। শিকার ও কন্দমূল খুঁড়িয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহাদের ভাষার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। প্রাগৈতিহাসিক কালে তাহার পর আসামে প্রবেশ করিয়াছিল প্রটোঅস্ট্রেলয়েডরা। ইহারা ব্রহ্মপুত্রের গতি ধরিয়া

আসামে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহারা পূর্ব হইতে আসিয়াছিল কি পশ্চিম হইতে, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের উপরই বিচারের ভার রহিল। এক শাখা মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় এবং প্রটোস্‌মেরীয়ান সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট। আর একদল ব্রহ্ম-দেশের মন্ বা তালৈংগদের সমগোত্রীয়। অস্ট্রিক গোষ্ঠী ভাষার মধ্যে আসামে খাসিয়াই প্রধান। আজও মুখে মুখে লৌকিক সাহিত্য হিসাবে খাসিয়া ভাষার প্রসার ও প্রচার আছে। কিন্তু অস্ট্রিকভাষা ভারতের সর্বত্রই আর্যীকরণের প্রভাবে পড়িয়াছিল। তাহার পর আসিয়াছিল দ্রাবিড়ভাষাভাষীরা—দীর্ঘকপাল ভূমধ্যসাগরীয় ও হ্রস্বকপাল আর্মেনিয়েডরা। মহেঞ্জদড়ো ও সিন্ধু সভ্যতার ধারক ও বাহকরূপেই ইহারা ভারতবর্ষে সুপরিচিত। পরবর্তীযুগে ভোটচীনরাও আসামে প্রবেশ করিয়াছিল। আসামের গারো, লুশাই ও বোডো জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। তাহাদের ভাষা ক্রমশই বাংলা ও অসমীয়ায় মিশিয়া যাইতেছে। সাহিত্য নাই বলিলেই হয়। মহাভারতে আমরা শিবোপাসক কিরাত জাতির কথা পড়িয়াছি। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে ও তান্ত্রিক উপাসনার বিকাশে শিবশক্তি পূজার স্থান কোথায়, সাহিত্যের পরিচয়ে তার বিচার গৌণ। প্রাক্-অহোম যুগের কাছাড়ি, চুতিয়া, বারভুঞাই প্রভৃতি ঘোর শাক্ত ছিলেন। কাছাড়ির ব্রা বি, চুতিয়ার কেছাইখাতীর তাম্রেশ্বরী, আর বারভূইঞার আইগোসানী প্রাচীন মাতৃতন্ত্রাবাদ, শৈববাদ ও আধুনিক তন্ত্রবাদের সংগে মিশিয়া এক সংকর ধর্মের উৎপত্তি করিয়াছিল। দেবী কামাখ্যার অভ্যুদয়ও এই সমীকরণের প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় রাজমোহননাথের মতে ইনি অস্ট্রিক ভূমাতা 'কা মাই খা'।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভাষার দিক হইতে দেখিলে অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার মত প্রাচীন মুণ্ডাকোল মনখমের ভোটব্রহ্ম নরগোষ্ঠী(কিরাত)র ভাষা প্রভাবিত প্রাচীন আর্যভাষার অপভ্রংশ ও জটিল সংমিশ্রণ। মধ্যভারতীয় সংস্কৃত "উদীচ্যখণ্ডে"র ভাষা এবং এই ভাষার সংগে কিছু পার্থক্য ছিল। পতঞ্জলিও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, যেমন র-এর স্থানে ল-এর ব্যবহার। আচার্য লেভির মতে এই বৈশিষ্ট্য মুণ্ডা মনখমের ভাষা-পরিবারের। একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে সাহিত্যে ভাষায় যে গৌড়ী-রীতির কথা পড়ি, যাহা ভামহ ও দণ্ডী স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, যাহাকে বৈদর্ভী রীতির বিদ্রোহ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে এবং যাহাকে বাণভট্ট মাত্রার আড়ম্বর (অক্ষরডম্বর) বলিয়া শ্লেষ করিয়াছেন তাহা কামরূপেও প্রচলিত ছিল। ভাস্করবর্মার নিধানপুর তাম্র-শাসন সেই অলংকৃত রীতির প্রথম পরিচয়। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে কামরূপ-বিজয়ের কথা আছে। কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়েও কামরূপের নাম পাই। মহাভারতে নরক ও ভগদত্তের বিবরণ আছে। রুক্মিণী-হরণের কাহিনী সাহিত্যে পাইলেও ইতিহাসে পাইনা। গুপ্তদের সময়ে প্র্যাগ্‌জ্যোতিষভুক্তি সম্রাটের শাসনাধীন একটি প্রদেশ। 'মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং' গোপাল যখন প্রকৃতিপুঞ্জের অনুমোদনে সিংহাসন আরোহণ করেন তখন ও তাঁর পুত্র ধর্মপালদেবের সময়ও কামরূপ গৌড়-সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। কথিত আছে যে, কুমারপালদেবের মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূপ বিজয় করিয়া সেখানে রাজা হইয়াছিলেন। কবি শরণের কবিতায় লক্ষ্মণসেনদেবের কীর্তিবর্ণনায়ও কামরূপের উল্লেখ পাই—

ভ্রূক্ষেপাদ্ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি
কৌলিমাত্রাৎ কলিংগান্
বিনয়তে কামরূপাভিমানং

মান্দাসরে বর্ণিত রাজা যশোধর্মের সাম্রাজ্যও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যমতীর পিতা হর্ষদেব ভগদত্তবংশজাত বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহার স্বামী লিচ্ছবী রাজ দ্বিতীয় জয়দেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশলাধিপতি ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কুমারিলের তন্ত্রবার্তিককে ৮০০ শত খ্রীষ্টাব্দের গ্রন্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ ধরেন। ইহার তৃতীয় পটলে তন্ত্রবিদ্বেষক বর্জনীয় ব্যক্তির বর্ণনায় কামরূপ ও কলিঙ্গের নাম আছে। তন্ত্রসারেও কামরূপের উল্লেখ আছে—মূলাধারে কামরূপং আবার নবরত্নেশ্বরে কামগির্যালয়ে মিত্রীশনাতাত্মকের পূজা আছে। যেমন জালন্ধর পীঠের নায়কের নাম ষষ্ঠীশনাথাত্মক। এই প্রসঙ্গে নাথ নামটি প্রণিধানযোগ্য।

কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে যে নরক বিদেহরাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং প্র্যাগ্‌জ্যোতিষপুর জয় করিয়া কিরাতরাজ ঘোটককে নিধন করেন। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের মতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস ছিল। কামরূপের এক একটি গ্রামে প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণ বাস করিত। হিউয়েনচাঙ শতশত দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন এবং মিথিলায় কথিত ভাষার সহিত কামরূপের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন। নিধানপুর তাম্র-শাসনে ভাস্করবর্মাকে প্রকৃষ্ট আর্যধর্মের রক্ষক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

হেমকোষে আসামকে বলা হইয়াছে কলিতা বা কুললুপ্তের দেশ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে পরশুরাম যখন ক্ষাত্রিয়নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করেন তখন জামদগ্নিরোষ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক ক্ষত্রিয় নিজেদের কলিত বা কুললুপ্ত বলিত।

হিউয়েনচাঙএর ভ্রমণকাহিনী, বাণভট্টের হর্ষচরিত, তৎকালীন শাসনমালা কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করে। ভাস্করবর্মা 'শশিশেখরপ্রিয়পিনাকিন'এর ভক্ত, অর্থাৎ শৈব ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। বরাহরূপী নারায়ণের কথাও তাঁর লিপিতে পাওয়া যায়, এবং তিনি যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে। হর্ষবর্ধনকে তিনি যেসমস্ত দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন তাহা হইতে তৎকালীন কামরূপের একটা সুসংগত চিত্র পাওয়া যায়– হালালি সিল্কের জামা, অতি মোলায়েম চামড়া, একটি মণিমাণিক্যখচিত ছত্র, অতি সুন্দর বৃক্ষত্বকের উপর লিখিত ও খোদিত পুস্তক, অগুরু চন্দন মৃগনাভি চিত্রিত ও মসৃণ মাদুর, স্বর্ণপিঞ্জরে হংসমিথুন, অতি মিহি সূতা ও মুগার পট্ট বস্ত্র, পনস, নারিকেল ও এক কলসী তরল গুড়।

বর্মণ-বংশের ভাস্করবর্মাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বর্মণবংশ, ম্লেচ্ছবংশ, পালবংশ চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন এবং ইঁহারা সকলেই নরক ভগদত্ত হইতে অর্থাৎ অসুর বংশ হইতে উৎপত্তি গণনা করিতেন। শালস্তম্ভ বংশের রাজারা কামেশ্বর মহাগৌরীর উপাসক ছিলেন। কামাখ্যা ও হাটকেশ্বরের মন্দির তাঁহারাই নির্মাণ করেন। ঐসব মন্দিরে দেব-দাসীদের উৎসর্গ করা হইত। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে শঙ্করাচার্য কামরূপ আসিলে অভিনবগুপ্ত তাঁহাকে তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা অসুস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মীননাথ প্রভৃতি কাপালিক সিদ্ধদের কথাও কামরূপে শোনা যায়। সহজিয়া সাধনও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। নিধানপুর তাম্রশাসনের তিন শত বৎসর পরে ধর্মপাল বর্মদেবের তাম্রশাসনে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা দেখি। তাঁর গলার একদিকে দোলে লীলাপদ্ম, অন্যদিকে উদ্যতফণা ফণী, তাঁর বরবপুর একদিক স্তনভারনম্র আর একদিক ভস্মাচ্ছাদিত, যিনি শৃঙ্গার ও রৌদ্ররসের প্রতীক।

এই যুগের সাহিত্য মৌখিক জনসাহিত্যেই পর্যবসিত ছিল। অবশ্য কিছু কিছু গান লোকপরম্পরায় গীত হইয়া আজিকার যুগে নামিয়া আসিয়াছে, যেমন—

ও কনি সখী মরি গল বগে বরত করে;
লুইত ফেনা, মহ ফেনা, গছ নিপাতী
কপৌ কণা..

বা মণিকোঁরর ফুলকোঁরর গীত
শঙ্কলদেব রজারে পুতেক মণিকোরর,
কোলাতে খতিখুন নাই..

শংকরদেবের উল্লেখে অনেকে ইহাকে বৈষ্ণবীয় যুগের বলিয়াই মনে করেন।

বৌদ্ধচর্যাপদ, ডাকের বচন প্রভৃতি অনেকে অসমীয়া ভাষার ও সাহিত্যের পূর্ব-রূপ বলিয়া দাবী করেন।

সরহপা, লুইপা, মীনপা, গোরক্ষপা, কানপা, তিল্লপা, তান্ত্রিপা, কক্কুরী, ভুসুকু, ডোম্বী প্রভৃতি চৌরাশী সিদ্ধাইদের বচনকে অসমীয়ার পূর্বরূপ বলিব কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মগধগৌড় দেশ হইতে বিতাড়িত অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পূর্বাঞ্চলে কুকীদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারাই যে ঐদেশের ভাষা ও সাহিত্যের কিয়দংশ সঙ্গে লইয়া আসে নাই তাহা কে বলিতে পারে? ভেণ্ডগুর নামে তিব্বতীয় গ্রন্থে একটি বচন পাওয়া যায়—

গঙ্গা যমুনার মাঝে যে বহই নাই
তঁহি চড়িলি মাতঙ্গ

গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখে মনে করিবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষার জন্ম কামরূপের বহির্ভাগে। সরহ ও কাহ্নের দোহা বা ডাকার্ণব শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। এই শৌরসেনী আধুনিক কালের বাংলা ও অসমীয়া দুইয়েরই জন্মদাত্রী। লিপি হিসাবে অসমীয়া ও বাংলার ভিতর মোটেই প্রভেদ নাই। শুধু কুটিলা রীতি। সমাচারদেবের কোটালিপাড়া তাম্রশাসন, মহীপালের বাণগড় লিপি ও বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি বাংলা অক্ষরের প্রথম চিহ্ন। আর্য মঞ্জু শ্রীমূলকল্পের মতে বঙ্গসমতট হরিকেল গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা "অসুর" ভাষাভাষী। নরক ও ভগদত্ত অসুরবংশজাত। ইরানীয় "আহুরে"র সহিত কোনো সংস্কৃতিগত সম্পর্ক বাংলা ও কামরূপের ছিল কিনা জানা নাই।

গ্রিয়ারসন সংগৃহীত মানিকচন্দ্রের গান, ফয়জল্লাকৃত গোরক্ষবিজয়, শুকুর মামুদের গোপীচন্দ্রের গীত, শ্যামাদাসের মীনচেতন, ভবানীদাসের ময়নামতীর গান, তৎকালীন নাথধর্মের জয়পতাকা বহন করিয়া সাহিত্যে অভিব্যক্ত। ডাঃ শহীদুল্লাহের মতে হিন্দী মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় নাথ-গীতিকা পাওয়া যায়। তিব্বতীয় ভাষায়ও আছে। সেইজন্য অসমীয়াতেও নাথ-সাহিত্য বিদ্যমান্ থাকিবে তাহা আশ্চর্য নয়। কিন্তু বাংলা লিপিতে লিখিত সব নাথ-সাহিত্যই অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইহাই অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন রূপ, এই দাবী কতটা যুক্তি-সংগত তাহার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বৃহত্তর কামরূপের সাংস্কৃতিক পরিধির মধ্যে ময়মনসিংহ, রংপুর ও উত্তরবঙ্গের অনেকটা যুক্ত ছিল এবং ভাব ও

ভাষার দিক দিয়া একই মূল উৎস হইতে তাহারা রসপান করিত। অসমীয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যে ঐক্য ও সাহিত্যে বিষয়বস্তুর একতা প্রধানতঃ এই কারণে। অসমীয়া গীতের নায়কও গোপীচন্দ্র—

মএনামতির বিআও হইল মাণিকচন্দ্রের ঘরে
সিন্দুরমতির বিআও হইল নিলমণি রাজার ঘরে।
মএনাক বিআও করি পঞ্চাশ বিআও করে
বুঢ়া দেখি মওনামতির ব্যালগ করি দিলে।

অসমীয়া সাহিত্যের আদিম নিদর্শন গান, বচন, দোহা, মন্ত্র ভণিতাগুলি। জনসাধারণের মুখে মুখে এইগুলি গীত হইত এবং পরে লিপিবন্ধ হয়। ইহাতে তখনকার দিনের পারিবারিক সামাজিক রীতিনীতি ব্যবস্থাবিধানের একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। মানুষের মনে সীমাবন্ধ যে ভাবগুলি ঘোরাফেরা করে সেইগুলির স্বচ্ছ সরল সহজ প্রকাশ এইসব গ্রাম্যকবির প্রাচীন পদগুলিতে। 'ধাইনামে' দেখি—

আমাকে মইনা শুব এ

আমায় ময়না শুইবে,

আমারে মইনা হালিছে জালিছে
কালি দুপুরের ভাতে।
ভাত খাই মইনা দোলত উঠিলে
পানি খাই মইনা শোবে।
তামোল খাই মইনা সেলেংগ লাগিলে
দোলা কাতি হৈ পবে।

সেই যে গ্রাম্য কবির ময়না, যে 'এতিয়াই গরু লই যাব এ' সে দ্বিপ্রহরে ভাত খাইল, জল খাইল, শুইল, দোলার উপর কাত হইয়া পড়িল—এই যে সহজ জীবনের সরল অভিব্যক্তি সামান্য কথায় সেগুলি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

'লবা শুওবানাম'এ দেখি আবার সেই প্রাণের প্রিয় ময়না—

ধেনু চারি মইনা মোর গুচাইলেক আঁত
বদ পাই জিলিকিছে মুকুতার দাঁত।
দৈ থৈছো দুগ্ধ থৈছো থৈছো আরু লারু
শুবের শয্যা পারি থৈছো তাতে থৈছো গারু॥

মুকুতার মত দন্তপাটি চিরকালই রসিক সাহিত্যের মনোরঞ্জন করিয়াছে। দধি দুগ্ধ লাড়ু তাহার ভোজনবিলাসকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। শুইবার শয্যা তাহার আরামকে ঘনীভূত করিয়াছে।

কবি রসিক, বলিতেছেন—

ফুলি আছে গোলাপফুল,
নে ভাংগবা দাল।
আমার মইনা বহি আছে
দেখিবলৈ ভাল।

গোলাপফুলের সঙ্গে আমার ময়না তুলনীয়, গোলাপফুলের মতই সে দেখিতে ভালো।

ধুলে ধুলে ধুলা লাগি পরে,
ধুলা লাগিল গাটি
আইকন হল কাতি

গায়ে ধুলা লেগে আমার ময়না ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য কি—প্রিয় খাদ্য হইতেছে নোনামাছ ও ভাত—

চৈ চৈ এ চিচৈ পোবালী
লোনে মাছ ভাতখাই কি কৈ খিনালি

নৃত্য তাহাদের অতি প্রিয়—

নাচ বাই জেতুকী এ
ভরি মেলি মেলি নাচ

'গরখীয়া নামে' দেখি কবি তার প্রিয়াকে বলিতেছেন—

ধানো খামো, চাউলো খামো,
তোক বিয়া করাই ঘর লৈ যাম

শুধু ধান খাব, চাউল খাব নয়, বিবাহ কবিয়া ঘবে লইয়া যাইব।

তেলীয়ে দিব তেল, খারনী মালীয়ে দিব ফুল

তেল ও ফুল সংগ্রহ হইবে আর বসিবার জন্য বড় পিঁড়িও তাতে বসিযা বসিয়া রথ দেখা যাইবে—

আলি কাটি জালি দিম
বড় পিড়া পারি দিম
তাতে বহি বহি রদ দে॥

চন্দ্রাবলীর উপাখ্যান অতি মনোরম। চন্দ্রাবলী ধনী বণিকের কন্যা, অর্থ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতা। কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহার কপালে লিখিত ছিল যে, তাহার স্বামী হইবে এক অতি সাধারণ গ্রাম্যযুবক। কাথিয়া নামে এক দরিদ্র যুবক চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়ে এবং তাহাকে জানায় চন্দ্রাবতীর ইহাই ললাটলিপি। চন্দ্রাবলী তাহার স্পর্ধা দেখিয়া তাহাকে কঙ্কণ ছুড়িয়া মারে। কিন্তু মনে মনে সে শঙ্কিত হয় যে সত্যই যদি ইহা বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে দৈবকে সে প্রতিরোধ করিবে কিসে। সেই জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি নির্জনে সে বসবাস আরম্ভ করে। কাথিয়াও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বহুবর্ষ পরে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সেই যুবক না জানিয়া চন্দ্রাবলীর প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হয়। চন্দ্রাবলী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে না, কিন্তু পরে ললাটে

কঙ্কণাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া ইহাই নিজের ললাটলিপি ও নিয়তির খেলা বুঝিয়া আত্মপরিচয় দেয় ও আত্মসমর্পণ করে। তারপর

ঘষিবাকা দিলা আনি গন্ধপুষ্পতেল
গাধুবাকা দিলা আনি উত্তম গঙ্গার জল।
বসিবাকা দিলা আনি গামেরির পিড়া
ভোজনাত দিলা আনি মালভোগ ধানের চিড়া॥

খাইয়া দাইয়া অতিথি বাপু শয়ন করিল।

গাত্রমার্জনের জন্য গন্ধপুষ্পতৈল, স্নানের জন্য উত্তম গঙ্গাজল, খাইবার জন্য উৎকৃষ্ট মালভোগ ধানের চিড়া, সমাজবিন্যাসের উচ্চস্তরেরই পরিচয় দেয়।

গহনার তালিকায় দেখি, শুধু হার টার বা সাতসরী নয়, দেবতাদের অঙ্গের যেসব ভূষণ আছে তাহাও—

হার পিন্ধে, টার পিন্ধে, পিন্ধে সাতসরী
দেবাঙ্গভূষণ পিন্ধে ইন্দ্রে দিছে আনি।

আবার ফুলের সাজও আছে—

সেউতী পিন্ধিছে, মালতী পিন্ধিছে,
পিন্ধিছে খড়িকা জাই
সেউতীর এচাকি, মালতীর এচাকি,
আরু চম্পাকলির চাকি।

এই বিয়ানাম কবিতাগুলিতে আমরা 'হরগৌরীর বিয়া', 'রামসীতার বিয়া', 'কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিয়া', 'ঊষা-অনিরুদ্ধর বিয়া'র কাহিনী পাই।

হরগৌরীর বিবাহে কিন্তু দেখি যে লক্ষ্মী-সরস্বতীও আসিয়াছেন—

লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ভনী আহিছে
হররে অলঙ্কার লৈ।

কিন্তু বর মহাদেব—তাঁর কি দুরবস্থা, বারো বছর তিনি গা ধোন নাই, গন্ধে প্রাণ যায় আর কি—

কৈলাসরে পরা মহাদেউ আহিছে
বৃষভ বাহনত উঠি।
আজি বারো বছর বাহি গা ধোবা নাই
গন্ধে প্রাণ যায় ফুটি॥
শিব আহি পালেহি হেমবন্তর ঘর
ভাঙ্গ খুন্দা সজুলিরে জুলিরে নগর।

কৃষ্ণরুক্মিণীর বিবাহ, ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী অসমীয়া সাহিত্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে স্থায়ী স্থান করিয়া লইয়াছে। রুক্মিণীহরণ, কুমরহরণ প্রভৃতি কাব্য ও নাটকের বহু পূর্বে বিয়ানাম প্রভৃতি গ্রাম্য কথা ও কাহিনীতে এই আখ্যান-গুলি অমর হইয়া জনচেতনায় ভাস্বর হইয়া আছে।

বিয়ানামের পরবর্তী যুগের কবিরা বাণকন্যা ঊষাকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক 'কুমরহরণ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রভারতী রচিত একটি 'কুমরহরণ' কাব্য পাওয়া যায়। অনেকের মতে কবি অনন্ত কন্দলীই ইহার রচয়িতা, ইঁহার অপর নাম ভাগবত ভট্টাচার্য। শোণিতপুরে (বর্তমান তেজপুর) বাণরাজার রাজত্ব ছিল বলিয়া জনশ্রুতি। তিনি পরম শিবভক্ত ও ভক্ত প্রহ্লাদের বংশীয়। তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম ঊষা—

ঊষার রূপের উপমার ঠাঁই নাই
যোঁহি অংগে দৃষ্টি পরে তাকে থাকে চাই।

ঊষার সখি ছিল চিত্রলেখা, সে শিবের কাছে বর পাইয়াছিল—

সুরাসর নর যত আছে চৈদ্য ভুবনত
রূপগুণ জানিবো সবার।
চিত্রতে লিখিবো যত বর্ণভেদ স্বরূপত
যতেক ব্রহ্মাণ্ড চরাচর॥

বিয়ানামের কবি যে কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'কুমরহরণের' কবি আরো রসসিঞ্চিত করিয়া সেই কথা বর্ণনা করিলেন—

বৈশাখ মাসত আসি তিথি শুক্লা দোয়াদশী
সোঁহিদিন দেখিবা সপন।
সুন্দর পুরুষে আসি আলিঙ্গিবে হাসি হাসি
তোর স্বামী হৈবে সোঁহিজন॥

অসমীয়া কবি হরিবংশ হইতে এই আখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গল্প হিসাবে ইহাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই। আঙ্গিক ও রচনাশৈলীও মূল হইতে পৃথক। গল্পের বিষয়বস্তু হইতেছে যে, হরপার্বতীর বিহার দেখিয়া সদ্যযুবতী সুন্দরী ঊষার কামপীড়া হয়। মহাদেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দেন যে সে স্বপ্নেই মনোমত পতির দেখা পাইবে ও পরে তাহাকে লাভ করিবে—

নিদ্রাং ন ভজতে রাত্রৌ ন দিবা ভোজনং তথা
সা বালা মোহিতা রাজন্ কামেন পরিপীড়িতা।
সপোনত কামে ধরে শরীর বিকল করে
ধরিবারে চাবই আঙ্কোরালি।

কামমোহিতা যুবতী প্রিয়জনকে স্বপ্নে আঁকড়াইয়া ধরিতে যায়। অসমীয়া কাব্যের ঊষা পরিপূর্ণযৌবনা হইলেও সদ্যমুকুলিকা। কবির বর্ণনা কামায়নপ্রচুর হইলেও সুন্দর ও রসসিঞ্চিত—

ঊষা বোলে প্রাণসখী স্বপ্নত আছিলো দেখি
পুরুষেক ত্রৈলোক্য মোহন।
চারু শ্যামকলেবর দিব্য পীত বস্ত্রধর
রুচিকর কমললোচন॥..

পিয়াই অধরমধু মনক হরিয়া মোর
নজানো লুকাই কোথা যাই।
তাংক মই স্বামী বুলি বিচাবহোঁ বিয়াকুলি
সখি মোক দিয়োক্ দেখাই॥
পেলাই কামসমুদ্রত কিবা দোষ দেখি মোত
ত্যাজি গৈলা সিটো প্রাণনাথ।
না পাও যেবে তাংক স্বামী নিশ্চয় মরিবো আমি
সখি সত্য কহিলা তোমাত॥

যখন চিত্রলেখা সুর গন্ধর্ব বিদ্যাধর সকলের পট আঁকিয়া বৃষ্ণিবংশের অনিরুদ্ধের পট আঁকিতে লাগিল তখন 'লাজে মুখ বস্ত্রে ঢাকি' ঊষা বলিল—

মোর প্রাণনাথ এহি জন
দেখা কেনে মূর্তিমন্ত ভুবনমোহন কান্ত
কোন নারী ধরিবেক মন।

তারপর ঊষা-অনিরুদ্ধের মিলন, তাহাদের নিত্য বিহার, গোপন আলাপ আপ্যায়ন প্রভৃতি কবি জয়দেবের শৃংগার বর্ণনাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

পীতাম্বরের 'ঊষা পরিণয়'ও এই শ্রেণীর একটি কাব্য। কিন্তু স্থানে স্থানে উৎকট মাত্রায় লৌকিক হইয়া পড়িয়াছে—

দেখিয়া কুমারী ঊষা গুণে মনে মনে
ধন্য নারী পুরুষ বিলাস করে বনে।
হেনয় সময়ে যার কোলে নাহি পতি
অকারণে প্রাণ ধরে সেহি সে যুবতি॥
বসন্ত সময়ে যার কোলে নাহি পতি
কলসি বান্ধিয়া জলে মরোক যুবতি।

কন্দলীর রামায়ণও বহুস্থানে কামায়নপ্রচুর—

স্বভাবে বরিষা কাল কাম অতিরেক
একগোটা দিন যাই এক বরিষেক
বাখেরে বোলন্ত লখাই নমহে পরাণ
শরীরক দহে মদনের পঞ্চবাণ।

চিত্রকূট-বর্ণনার সময় মদনের পঞ্চবাণ স্ত্রীপুরুষকে কিরূপে ব্যাকুল করিয়াছে তাহার চিত্র আছে।

সমসাময়িক মহাভারতের অসমীয়া কবিও তার বর্ণনাকে কামায়নপ্রচুর করিয়াছেন। ইহা ছিল সহজ জীবনের সরল অভিব্যক্তি—দোষের কিছু ছিল না।

স্বভাবে শোভন অপেস্বরাগণ
মদনচকিত ভার
উন্নত কঠিন ঘনপীনস্তন
তার অবনত গাব

সহজে চণ্ডালি মদনে বিকলি
নির্ভয়ে তরুণীজন
কামভার পাশে রতিরঙ্গ বসে
করে প্রভু স্মরণ
তান নখে ক্ষত সুরত রেকত
নাগর প্রভুর সঙ্গে
খোপা সুলকিল কুসুম খসিল
নির্ভর সুরতি রঙ্গে।

শুধু তাই নয়—

তিনি চারি নারি হাতে হাতে ধরি
পথতরঙ্গে লবরে..
মান পরিহরি কেহো বরনারী
চলিগৈলা প্রভু থানে
ঘোর কামবাণে দুঃসহ সন্ধানে
সহিব কার পরাণে।

নরনারীর মিলনকে কেন্দ্র করিয়া যুগে-যুগান্তরে দেশে-বিদেশে পূর্বরাগ মিলন বিরহ বেদনা লইয়া রসোজ্জ্বল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কবির মন সেখানে একান্তমুখী সৃষ্টিতেই ব্যস্ত। সেখানে সেইসব চিত্র সমাজের নীতির পরিচায়ক এই কথা শুধু আংশিকভাবে সত্য। তাই সাহিত্যের বা শিল্পের ঐ কামায়নপ্রচুর নিদর্শনগুলি লইয়াই জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডের মান বিচার করা চলে না। অসমীয়া সাহিত্যেও স্থানে স্থানে রসসমৃদ্ধ গাঢ় দেহজ প্রেমের বর্ণনা পাই। পড়িয়াই যেন না সিদ্ধান্ত করি যে সেই সাহিত্যে কামগন্ধ আছে এবং তৎকালীন সমাজে ইহার প্রাচুর্য ছিল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় অসমীয়া সাহিত্য এ বিষয়ে বেশীরকমের নির্দোষ। তখনকার দিনের কবিরা নরনারীর মিলনকে সহজভাবেই গ্রহণ করিতেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিরা কাব্য রচনা করিতেন রসসৃষ্টির জন্য নয়, ধর্মপ্রচারের জন্য ও ভগবদ্ভক্তি প্রাণোদিত হইয়া। তাই দেহাতীত sublimation-এর চেষ্টা ছিল। শেষপর্যন্ত 'চক্রীকৃত চারুচাপ' বিফলই হইত। বীরাসন শিথিল করিয়া ভগবানের তৃতীয় নেত্র 'ভস্মাবশেষং মদনং' করিত।

বিহুগীতও বেশী ভাগই আদিরসাত্মক। পূর্বেই বলিয়াছি, কোনো কোনো ঐতিহাসিক বোহাগবিহু, কাতিবিহু, মাঘবিহু উৎসবকে অস্ট্রিক ভূমাতার উৎসব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহার মধ্যে ঐতরেয় মহাব্রত বিষুবাহু প্রভৃতি যজ্ঞের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান, যেমন কাতিবিহু অশ্বিনদ্বয়ের উপাসনা ও ত্রিযামা রাত্রের এক এক যামে সোমপানের উৎসব, মাঘবিহুতে অগ্নির সংবর্ধনা ও পিষ্টক উৎসবের অনুষ্ঠান।

বিহুসাহিত্যের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দিতেছি—

ওপর উড়ি যায় কালিন্দী ভোমোরা
ঠিয় হৈ আছিলো চাই।
তোমারে আমারে পিরীতি লাগিলে
চকুরে চকুরে চাই।

প্রথম প্রণয়ের রীতিই হইতেছে চক্ষুতে চক্ষুতে চাওয়া—চারি চক্ষের সলজ্জ মিলন। কালিদাসের উপমায় বলিতে গেলে—

পপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপংক্তি
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্—

দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি নাই—নয়ন ন তিরপিত ভেল—চক্ষু উপবাসী।

সজাত বন্দী হল, সজারে মইনা
শালত বন্দী হল হাতী।
মকরা জালতে মোর ধন বন্দী হল
টোপনি নাহে মোর বাতি॥

সবাই বন্দী হয়, হাতীশালে হাতিও, কিন্তু কোন্ জালে আমার হৃদয়ধন বন্দী হইল।

ধন যেন দেখোঁ মই তোমাকে বহনা,
প্রাণ যেন দেখোঁ মই তোমাক।
কেচা ঘুমতিত হেবাই যেন দেখিলো
কাক পাই তেজিল আমাক॥

কাহাকে পাইয়া প্রিয় আমাকে ত্যাগ করিল। চিরবিরহিণীর এই বিয়োগব্যথা বিহুলোকসাহিত্যকে রসলোকে পেঁছাইয়া দিয়াছে।

পূর্ববঙ্গে ও আসামে নৌগীতি প্রসিদ্ধ। এর ঐতিহ্যও বহুদিনের। আসামে ইহাকে বলা হয় 'নাওখেলোবা' গীত। পূর্ববঙ্গে বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ ও আসামে মলুয়ার গীত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে নিরক্ষর গ্রামাজনকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে, বেদনাচঞ্চল প্রেমহিল্লোলে রোমাঞ্চিত করিয়াছে। মলুয়া গীতির অসমীয়া ও বাংলা দুইরূপই আছে এবং বিশেষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে ভাষাগত, বিষয়গত, প্রকৃতিগত বিভেদ খুবই অল্প। অসমীয়া সাহিত্যের এই যুগের বহু কবিতা, গান, ডাকের বচন সমসাময়িক বাংলার ঐরূপ কবিতা, গান ও ভণিতার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কাব্যসম্পদ ও মনের বৈচিত্র্যের চিত্র হিসাবে এই কবিতাগুলি অনবদ্য, যেমন

মোর মলুবাক কেনে মারিলে
অ মোর মলুবা রে
অ মোর মলুবা রে।
নেঠা নেঠা করে তাই নেঠা আনি দিলোঁ মই
নেঠাত ধরি ধরি কান্দে অ মোর মলুবা রে।

শতাব্দী পার হইয়া কালের সীমানা অতিক্রম করিয়া পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ বাহিয়া বন্ধুর রথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—অ মোর মলুয়া রে। গ্রাম্যকবির এই আক্ষেপ ও আকুতি আজও বাঙ্ময় হইয়া আমাদের হৃদয়কে বিচিত্রভাবে স্পর্শ

করে। কোথায় আমার মলুয়া, তোমার জন্য সব আনিয়া দিতেছি—

শাল শাল করে তাই শাল আনি দিলোঁ মই
শালত ধরি ধরি কান্দে অ মোর মলুবা রে।
সুতা সুতা করি কান্দে তাই সুতা আনি দিলোঁ মই
সুতাত ধরি ধরি কান্দে অ মোর মলুবা রে।

আবার কোনো বণিকপ্রিয়া লীলাবতী প্রিয়বিরহিত হইবার ভয়ে প্রিয়তমকে বাণিজ্যে যাইতে দিবেনা—

মাঝিক দিব টকাটকা গুবিয়াল ক দিব সোণা
আমার সাউদ বণিজে যায় সবে দিও মানা।

তার প্রিয়তম বাঁশীটি বাঁধা দিয়া যাইবে কিন্তু প্রতিটি সকালে ঘুম ভাঙিলে কার মুখ দেখিবে।

এই যুগের অসমীয়া সাহিত্যে 'বারমাহী' গীতের প্রভাবও প্রচুর। এই 'বারমাহী' গানে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয়—

১. কন্যার মুখ দিয়া সমাজজীবনের বারো মাসের একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইতেছে।

২. প্রিয় ব্যক্তি বাণিজ্য করে—বাণিজ্যবৃত্তি খুবই সাধারণ বৃত্তি। দেশে সুখ-সমৃদ্ধি পর্যাপ্ত ছিল—অন্নং বহু কুর্বীত।

৩. মাসগণনার আরম্ভ হইতেছে অগ্রহায়ণ হইতে। নতুন ধান্য উঠিয়াছে, ঘরে ঘরে নবান্ন—কৃষিসুলভ গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশ।

মধুমতীর গীত ও কন্যা বারমাহী গীতে দেখি অগ্রহায়ণ—

অঘোনের মাহতে কন্যা সংসারে নবান্ ধান্
কতেক খাইতে মধু কতেক পুরাণ।
যার সঙ্গে প্রিয়া আছে রান্ধি ভাত খায়
আমার সঙ্গে প্রিযা নাই (থাকিম) পরের মুখ চাই॥

অগ্রহায়ণে নবীন ধান্যের মধ্যে কতক খাইতে স্বাদু। কবি বলিতেছেন যেন মধু। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িতেছে যার সঙ্গে ঘরণী গৃহিণী আছে সে সদ্যতপ্ত উষ্ণ অন্ন পূর্ণানন্দে খায়, আর যার সঙ্গে প্রিয়া নাই (যেমন তার প্রিয়র) সে পরের মুখে চাহিয়া থাকে। প্রিযজন বিদেশে থাকিলে তার আহার রন্ধন কিরূপ হয় ইহার জন্য উৎকণ্ঠা যুগে যুগে নারীচিত্ত মথিত করিয়াছে। সেইজন্য মধুমতীর গানেও সেই আকুলতা—

খাবলৈ না পালা প্রভু নবান ধানের ভাত।

নতুন ধানের চালের ভাত তুমি খেতে পেলে না প্রভু, এদুঃখ নারী ও গৃহিণী হৃদয়ে বাজিবেই।

তারপর গানও শুনিতে পাইলে না—

হাতত তম্বুরা লৈ নামিল সরস্বতী।

পৌষ মাসে দেখি—

পৌষর মাসতে কন্যা পুষ্পে অধিকারী
স্বামীত ভকতি করে ভাগ্যবতী নারী।

মাঘ মাসে কিন্তু মধুমতী ক্রন্দন জুড়িয়া দিল—

তুলি পারে গারু পারে সোণর সিংহাসন
তাতে বহি মধুমতী জুরিলা ক্রন্দন।

কন্যা-বারমাহীতেও ঐ কথা—ভিন্নদেশের সওদাগর আসিয়া দোহি দোহি লাগাইয়া দিল।—

ভিনি দেশের সাউদ আহি লাগাইলা মাত
চাউল দেও পাতিল দেঁও রান্ধি খোবা ভাত।
ভাল ভাল দাসী দেঁও চুরা ফেলাইবাক্
টৌ দেঁও জান্তি দেঁও বালুত মাজিয়া
ভোগ ধানর চাউল দেঁও দুধত পখালিয়া।
ভাত কঙগালী ন হওঁ কন্যা ভাত রান্ধি খাম
ধনর কঙগালী ন হওঁ কন্যা ধন লৈয়া যাম।

ফাল্গুন মাসে বসন্তাগমে যৌবনের ব্যথা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে—

মই নারী অভাগিনী থাকো পরর মুখ চাই
বনর বনুবা পখী সিও থাকে জোরে।..
বনর বনু পক্ষী সিও বান্ধে বাহা ঘর।

বনের যে বন্য পাখী সেও যুগলে থাকে, বাসা ঘর বান্ধে আর আমি অভাগিনী নারী—

জাঁই যুতি ফুটে ফুল তপত নয়ান,
জাঁই যুতি ফুলে ফুল খোপাতে ফুলাম।

চৈত্র মাসে কিন্তু অবস্থা আরও সঙগীন—

চৈতর মাসতে কন্যা চতুর দিশে মন,
বিলাওরে বিলাওরে কন্যা নবান্ যৌবন।
খাওরে কন্যা কর্পূর তাম্বুল বাঢ়োক পিরীতি
গুচাও মনের কৈটব মাঁগিছো সুরতি।

কিন্তু তাই বলিয়া কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী নয়—

পরপুরুষক দেখোঁ বাপভাই সমান..
ধরমক চিন্তি তুমি যোবা রাজপথে।

বৈশাখ মাস আসিয়াছে—'দীর্ঘদগ্ধদিন রজনী নিদ্রাবিহীন'। ডাহুকী ডাকিতেছে, বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, মধুমতী বলিতেছে—

বৈহাগর মাহত ডাউকী কান্দয়
ডাউকীর কান্দন শুনি হৃদয় ন সহয়

বাংলা মৈথিল বৈষ্ণব সাহিত্যের এই ডাহুকীর প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যেও দেখিতে পাই।

বৈশাখ মাসে অতিথি সৎকারের জন্য 'ডাক ডালিম শ্রীফল' শুধু নয়—

চন্দনে চিটিকা দিয়া ভৃঙ্গারর পাণী
ভৃঙ্গারর পাণী নহে উত্তম গঙ্গাজল।
বাড়ি ভরি আছে আমার ডাব নারিকল
গোহাল ভরি আছে আমার সাতপাঞ্চ গাই॥
দৈ দধি ঘৃত মধু..

প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে কিন্তু কন্যা আবার চঞ্চলা হইয়া ওঠে। নিদাঘতপ্ত দিনে বিরহ দারুণ, সে সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করে—

কোন দেশে থাকা সাউদ, কোন দেশে ঘর
কিনাম তোমার মার কিনাম বাপর।

মধুমতী তাই খেদের সঙ্গে বলিতেছে—

যাকে বোলো আপোন আপোন সেয়ে হয় পর।

আষাঢ় মাসে বর্ষাগমে মধুমতীকে দেখি অন্যথাবৃত্তিচেতঃ, বিরহীযক্ষের মত সে বলিতেছে—হে স্বামী, হে প্রিয়তম, তুমি এসো—

আমার জনমের দুঃখ ঘুচুক্ তোমার চাঁদমুখ দেখি।

'কন্যাবারমাহী'তে কন্যাকে যখন বলা হইল

তোমার স্বামী কাটা গৈছে কাঞ্চনপুরর ভাথি।

তৎক্ষণাৎ সে চীৎকার করিয়া বলিল

না যাইছে না যাইছে কাটা আমার টিকর পতি।

শ্রাবণের বর্ষণমুখর তিমিরনিবিড় সন্ধ্যায় তার বিরহবেদনা আরো জাগিয়া ওঠে

শাওনর মাহত বোরনর দিন
থাব না পালে পুরুষর রস হয় হীন

তখন মনে হয় গলায় কাটারি দিয়া প্রাণত্যাগ করি

গলত কটারি দি তেজিম পরাণে

পরিস্থিতি এমনই জটিল যে মুখরিত শ্রাবণের রাত্রিতে পুরুষ আসিয়া প্রেম নিবেদন করে—

শাওণর মাসতে কন্যা শাওনীয়া রাতি
আজি রাতি কন্যা মই ভুঞ্জিবো সুরাতি

কিন্তু কন্যাও চতুরা, সেও চোর ধরিবার আয়োজন করিয়াছে—

আজি রাতি চোর মই থাকে লাগল পাঁও
হাতে গলে বান্ধে তাকে রাজঘরে পঠাঁও
চারি কালে রাখি থম প্রহর চারিটি
দুয়ার মুখত বান্ধি থম মত্ত গজহাতি
শিথানে পৈথানে লগাম ঘৃতর পাণ্ড বাতি
তীক্ষ্ম খান্ডা হাতে ধরি জাগিম চৌপর রাতি।

ভাদ্র মাসে

হাসি খেলি বিদায় দিয়া যাঁও নিজদেশ
তুমি হলা ভিন পুরুষ আমি ভিন নারী
বাপর শকতি নাই বিদায় দিতে পারি।

কিন্তু ধর্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত প্রবল

ধরমক্ চিন্তি তুমি যোবা বাজপথে

কবি কিন্তু শেষপর্যন্ত সমস্যা অন্যরকমে মিটাইয়া ফেলিলেন। তার মস্তিষ্ক ও হৃদয় অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ হইল—এই পরপুরুষ, পরপুরুষ নয়, শিশুকালে বিবাহিত তাহারই পতি

আহিনর মাহতে কন্যা নিরমল রাতি
পরপুরুষ নোহোঁ কন্যা তোর টিকর পতি।

কে সে

শিশুকালত বিয়া করাইছো মাণিক সদাগর
নানা আড়ম্বরে আসিছিলো তোমার ঘর

তখন প্রদীপ হাতে কন্যা নদীর ঘাটে চলিল, বারো মাস শেষ হইয়া গিয়াছে, মিলনের শেষ পর্ব।

এই যুগের গাবলীযাঁ গীতের নমুনা এইরূপ—ফুলকোঁওর গীত—

মনেকৈ উজালে চিতেকৈ ভটিয়াই
দুখরে বাতরি কথা
কিনো কৈয়ে থাম কিনো শুনি যাবি
মনতে লাগিবে বেথা

কিন্তু এই যে ফুলকুমার যার দুঃখের কথা বলা হইতেছে যাহাতে মনে ব্যথা লাগে, তিনি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন

কাঠর পখী ঘোঁড়া পাই ফুল কোঙর
বিজুলী সঞ্চারে চলে

পক্ষীরাজের কৃপায় এক মালিনীর মালঞ্চে ফুলকুমার উদয় হইলেন, সেখানে সেঁউতি, মালতী, টগর গুটিমালী কোনো ফুলের অপ্রতুল নাই—

ফুলকে গুঁথিলে ফুলতে লিখিলে
ফুলতে বাতরি দিলে।

শেষকালে

পাঁচতুলীর নগর সোমাল ফুলে কোঙর
কালিন্দী ভোমরা হৈ

মণিকোঙর গীতও রূপকথারই সন্ধান দেয়—

শঙ্কল দেব রজারে পুতেক মণি কোঙর
কিছুত খাঁত খনে নাই।

শঙ্কর দেব রাজার পুত্র মণিকুমার। মন্ত্রীর কন্যা কাঞ্চনকুমারী তার মন হরণ করিয়াছেন এই মূল তথ্য লইয়া রূপকাব্যটি রচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। শুধু ঐতিহাসিকতার দিক হইতে ভাষাগত ও অন্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিসংশয়িত চিত্তে বলা যায় না যে এইসব গীতিকবিতার সবগুলিই প্রাক্‌বৈষ্ণব যুগের। অনেক সময় মনে হয়, এই পুরাতন গাথাগুলির উপর সমসাময়িক ভাব ও ভাষার যথেষ্ট প্রলেপ পড়িয়াছে। সেইজন্য তাহাদের বর্তমান রূপ কোন শতাব্দীর সে কথা ঐতিহাসিকরা গবেষণা করুন, কিন্তু সাহিত্যিক রসবিচারে তাহাদের মূল রূপ যে প্রাক্‌বৈষ্ণবীয় যুগের সহিত সংশিলষ্ট এইটুকুই যথেষ্ট এবং সেইজন্যই ইহাদিগকে অসমীয়া সাহিত্যের আদিমযুগের অধ্যায়েই বিচার করা হইয়াছে। আর একটি কথা, যে কথাটি আমি পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি যে, প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ধীর ভাবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব, উদার স্বাদেশিকতা ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বহুস্থলে উদ্ধৃত ভাব ও ভাষা সমানভাবেই বাংলা ও অসমীয়া দাবী করিতে পারে। ইহাতে দুইপক্ষেরই অগৌরবের কিছু নাই এবং তার কারণ ঐতিহাসিক। প্রাচীন কামরূপীয় সংস্কৃতির বিকাশ মিথিলা হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর অবধি। এই প্রসঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর নিওগের মত প্রণিধানযোগ্য—

"পূব ভারতত অসমীয়া আরু বাঙলা ভাষায়ো এই যুগের শেষ ভাগতহে নিজর সুকীয়া গঢ় লবলৈ ধরে। সেই কারণে অল্পলৈকে বাঙলা সাহিত্যের ভিতরুবা বুলি ধরা বৌদ্ধগান আরু দোহার দরে, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণকীর্তন আরু গোপীচন্দ্রর গানকো আমি অসমীয়া সাহিত্যর অন্তর্গত বুলি ধরিছো; কিয়নো সেই বোরত বঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেতিয়া ফুটিয়া উঠা নাই, কিন্তু পূব-ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপীয় ভাষার প্রাধান্য ভালদরে রক্ষিত হৈচে। সরহ নালাগে কবীন্দ্র সঞ্জয় আরু অনন্ত কন্দলীর দরে ষোড়শ শতিকার অসমীয়া কবি-সকলক বঙালীয়ে বঙলা বোলা কথাই ইয়াকোহ প্রমাণ করে যে অসম বঙ্গ আদি বর্তমান ভৌগলিক প্রদেশ বোধ জন্ম হোবার আগলৈকে অন্ততঃ অসম, বঙ্গ আদি সদৌ পূব ভারতর ভাষা-মূলক আরু সাংস্কৃতিক ঐক্য অটুট ছিল।"

এই বক্তব্যের প্রধান যুক্তি হইতেছে যে বৌদ্ধগান ও দোহা, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণকীর্তন, গোপীচন্দ্রের গান অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে, কেননা তাহাদের ভিতর তখনও বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। বরং তাহাদের মধ্যে পূর্ব-ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপ ভাষার প্রাধান্য ভাল ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আর একটি কথা, আসাম বাংলা প্রভৃতি বর্তমান ভৌগোলিক

প্রদেশবোধ জন্ম হইবার পূর্বেই এইসব অঞ্চলে এক সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐক্য অটুট ছিল।

সমস্ত কামরূপে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপারে (যেমন ফুলবাড়ী) বহু অঞ্চল জুড়িয়া আই পূজার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। সাহিত্যেও ইহার অবদান আছে। কছাড়ীর বুঢ়াড় বুঢ়ী (হরপার্বতী) পূজা, কেচাইখাতির তাম্রেশ্বরী পূজা, দেবী কামাখ্যার রূপান্তর, জল্পেশ্বরের উপাখ্যান, বশিষ্ঠের কাহিনী, বার-ভূঞার আই পূজা, তান্ত্রিক শক্তি উপাসনারই এক রূপ। ইহার সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে বৈদিক রুদ্র, অস্ট্রিক ভূমাতা, ও কিরাতদের শিব, এমন কি নাগাদের নরখাদিনী দেবী। আই পূজার ইতিহাস অনুধাবন করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখা চাই যে, সারা কামরূপে অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং তাহার পরও আজ পর্যন্ত তাহার একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কামরূপের সীমানা ছিল—

ত্রিংশদ্ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শত যোজনং
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্
নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রি ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী

আবার বলা হইতেছে—

উত্তরস্যাং কঞ্জগিরি করতোয়াতু পশ্চিমে
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী . .

কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে শৈবশাক্ত আসামের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর ধর্মপালের তাম্রশাসনে শিব আর পার্বতীর বন্দনা আছে। নবরত্নেশ্বর তন্ত্রে বলা হইয়াছে 'বৌদ্ধং ব্রাহ্মং তথা সৌরং শৈবং বৈষ্ণবং চ শাক্তং' সকলেই তন্ত্রোপাসক হইতে পারিত। বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযোগিনী সাধনায় অর্ঘ্যদানের পদ্ধতিতে ওড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি, সিরিহট্টের সঙ্গে কামাখ্যার উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য। তন্ত্রসারেও বলা হইতেছে, মূলাধারে কামরূপ। সাধনমালা গাইকোয়াড় সিরিজ দ্বিতীয় ভাগে সাধন সংখ্যা 'ওঁ কামরূপ বজ্রপুষ্পে স্বাহা' এই মন্ত্রের সঙ্গে 'ওঁ নমঃ সর্বগুরু বুদ্ধবোধিসত্ত্ব বজ্রপুষ্পে স্বাহা' উল্লেখও আছে।

'আইরনাম' কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয় দেবী এখানে একেবারে গাঁয়ের মানুষ হইয়া সকলের একান্ত আপন হইয়া গিয়াছেন।

আই ভগবতী আই, তোমার মান সুন্দরী নাই
অম্বিকা চণ্ডীকা ভবানী কালিকা এইরূপে ফুরা বেড়াই।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 'আইদেবী' অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকারই অন্যরূপ। প্রাচীন অনার্যদেবতা তাম্রেশ্বরী, বেদোক্ত অম্বিকা, পুরাণোক্ত ভবানী, চণ্ডিকা, কালিকা সকলেই আইদেবীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, এমন কি লক্ষ্মী সরস্বতীও।

দিনের শেষ, সূর্য পাটে বসিয়াছেন, ঈষৎরক্ত আকাশের নীলিমায় আসন্ন সন্ধ্যার আনত ছায়া, মহামায়া নামিতেছেন। তাঁর হাতে সোনার বাঁশী, আর কমলের ফুল।

দুখীয়ালৈ পেলাই দিছে সুখিল ফুলের মালা

গজেন্দ্রগামিনী দুর্গতিনাশিনী আইদেবী কৈলাস হইতে এমনি এক মায়ামন্থর সান্ধ্যক্ষণে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে নামিলেন ঘাটের পরে।—

পিচলারে ঘাটে আইয়ে স্নান করে
লাহর কেশ টারি মেলি

কেশবতী কন্যা তিনি—দীঘল চুল। 'আই' হচ্ছেন গরীবের দেবতা 'দুখীয়ার পুতলা'। তাঁর নাম 'শীতলা' 'দি যোঁরা বুক জুরাই'—তাঁহাকে পাইলে বুক জুড়াইয়া যায়, প্রাণটা শীতল হয়।

ভক্ত গোসানী জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি দিয়া তোমায় পূজা করিব, ফল, দুধ, ধন, জল, অন্ন, বস্ত্র, মন, চিত্ত—

যেই বস্তু দিওঁ মাতৃ সেই বস্তু চুবা
আপোনার নামে মাতৃ সন্তুষ্ট হোবা।

নবম ও দশম শতাব্দী হইতে শ্রীহট্ট কামরূপ ও আসামের অন্যত্র বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রসারের যুগ বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। লামা তারানাথের উক্তি এই যুক্তি সমর্থন করে। এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক মতে জয়ন্তীয়া রাজা কামদেব, ভোজবর্মা নামে পূর্ববঙ্গের এক রাজার নিকট হইতে কবিরাজ পণ্ডিত নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ কবিকে (একাদশ শতাব্দীতে) লইয়া আসেন। তিনি বিজয় রাঘবীয় নামে এক মহাকাব্যের রচয়িতা।

মধ্যযুগীয় আসামে বহু তন্ত্রমন্ত্রের প্রচার ছিল এবং এইসব তন্ত্রমন্ত্র, তাহাদের ব্যাখ্যা, প্রকরণ নানা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ফলে এক বিরাট মন্ত্রসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখনকার দিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে লোকমত, ক্রিয়াকলাপ ও বিশ্বাসের মানদণ্ড হিসাবে এই মন্ত্রগুলির বিশেষ মূল্য আছে। সাহিত্যের দরবারে দেওয়ান-ই-খাসে স্থান না পাইলেও দেওয়ান-ই-আমে ইহার স্থান আছে। ঠিক কোন শতাব্দীতে এই মন্ত্রসাহিত্যের উৎপত্তি তাহার সঠিক নির্ণয় অসম্ভব। তবে ভাষাগত বিচার, ইতিহাসের ধারা, বৌদ্ধতান্ত্রিকতার অপভ্রংশ-যুগের কাহিনীর মূল্য সব দিয়া বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, বাংলার কিছু অংশ ও কামরূপ জুড়িয়া এইসব মন্ত্রের ও ডাকের বচনের উৎপত্তি অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে। তাহার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী বাহিয়া এইসমস্ত প্রাচীন বচন ও মন্ত্র জনসাধারণের স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে অক্ষয় হইয়া আছে, কখনও কখনও লিপিবদ্ধ হইয়া পুঁথিতে আশ্রয় লইয়াছে। অথর্ব বেদই এইসব মন্ত্রপুঁথির আদি, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মকরতী পুঁথিতে পড়ি—

"অনন্ত শয্যাত গোঁসাই শুতি আছিলন্তে। রাজ ভৈলা চারি বেদ নিঃশ্বাস কাঢ়ন্তে। অথর্ব বেদর অরণ্য করতী কহে। করতী মন্ত্র জগততে রহে।"

অন্য করতী মন্ত্রেও এইরূপ সমর্থন আছে—"ওঙ্কার শবদে অথর্ব বেদ ভৈলা। অথর্ব বেদ আছে করতি কহে। করতির হন্তে জগত বহে। ওঙ্কার শবদে গোসাই জপিবার টললা। ওঙ্কার শবদে চারি বেদ বান্ধ।"

আঙ্গিরসী অথর্ববেদ জনসাধারণের বেদ। আথর্বন, শক্তির, পূর্ণতার, ভোগের স্বপ্ন দেখেন। তাই এত ক্রিয়াকান্ড, এত মন্ত্রতন্ত্র।

অসমীয়া মন্ত্রসাহিত্য গদ্য ও পদ্য দুই মিশাইয়া। গদ্যের মধ্যে করতী পুঁথি, বীরাজরা পুঁথি, সাপর ধারণী পুঁথি ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া অসমীয়া মন্ত্রগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়াছেন: (১) মহাপ্রতিসরা—পাপ রোগ ব্যাধি দূরের জন্য (২) মহাসহস্র প্রমর্দিনী—ভূতপ্রেত পিশাচ তাড়াইবার মন্ত্র (৩) মহামায়ূরী—সর্ববিষ নিবারণের মন্ত্র (৪) মহাশীতবতী—গ্রহদোষ ও জীব-জন্তুর ভয় দূরের জন্য এবং (৫) মহামন্ত্রানুসারী—অন্যান্য নানা কর্মের জন্য।

ইহা ছাড়াও জন্ম মৃত্যু বিবাহ প্রেম বিষয়ক নানা মন্ত্র আছে। এইসব মন্ত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যের বীজ লুক্কায়িত। মন্ত্রগুলির পরিচয়েই তাহাদের বিষয়বস্তু পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন বৃক্ষআরোপণ, গৃহকম্পন, তাম্বুলঝরা, পুষ্পঝারা, কদলীপত্রঝরা, সরিষাঝরা, দিশবন্দি ধনুবাটলি, বিড়াবন্ধ ইত্যাদি। পুষ্পঝাড়া মন্ত্রটি এইরূপ—

ডাহিন হাতে মালতী বাম হাতে পুষ্প চয়
আচোক মনুষ্য দেবতা কাম্পয়
কম্পো অস্তাগিরি করে টলবল
পাতালর পরা আসি নিকালিল জল
লং ইতি পুষ্প ঝারণং—

সুদর্শনচক্র করতীতে সুরসভার সুন্দর সাহিত্যিক বর্ণনা আছে। সুদর্শনের রোষে—

প্রিথিবি লরিলা মেরুগিরি টলিলেক
সাগর টলিলা মন্দার লরিলা
কম্পিলা স্বর্গ মন্ডল।

মন্ত্রের নাগপাশ জড়াইয়া ধরে সাতপাকে। মুক্ত হয় আবার সেই মন্ত্রের জোরেই। 'মহাভীম পাতালী রাগিনী জেগে ওঠে মায়াকালী নাগিনী'। সাগর দোলে, পৃথিবী নড়ে, মেরু গিরি টলে, মানুষ দেবতা সবাই কাঁপে।

ডাক-ভণিতার মধ্যে আমরা জন্মপ্রকরণ, ধর্মপ্রকরণ, নীতিপ্রকরণ, রাজনীতি-প্রকরণ, বন্ধনপ্রকরণ, জ্যোতিষপ্রকরণ, গৃহিণীলক্ষণ, কৃষিলক্ষণ প্রভৃতি সমাজের নানাদিকের পরিচয় পাই।

ধর্মপ্রকরণে দেখি—

ব্রাহ্মণের পিতৃদেব অর্চন
ক্ষেত্রিয় সবর পূজাপালন।
বৈশ্যর বাণিজ্য ধন আর্জন
শূদ্রর স্বধর্ম নীতি সেবন॥

কি কি কর্তব্য—

তেরেসে ধর্মক করিব জানি
পুখুরী খানিয়া রাখিব পাণি।
বৃক্ষরোপণত অধিক ধর্ম
মঠমণ্ডপ গুরুকর কর্ম॥

পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপন, মঠমণ্ডপের চেয়ে গুরুকার্য আর নাই-

অন্নজল জানা অধিক দান
তাত করি নাহি শ্রেষ্ঠ যে আন
ভাল দ্রব্যকে যেখেনে পাইব
দেবতা৽দ্বিজক তেখেনে দিব..
ঔষধ দানত নাহিক তুল।

সুগৃহিণীর লক্ষণ কি—

পতিপদ বিনে আনত নাই মতি—
গৃহে বাতি দেই সন্ধ্যাবেলাত—
রন্ধন করয় বচন মিঠ
সেই গৃহিণীক বোলয় ইষ্ট।

আর কি—

শাশুরীত পুছি করে আয়ব্যয়
সে নারীক সদা লক্ষ্মী নেরয়।

এবং সেই নারী সঞ্চয়ী—

রৌদ্রত কাটিকুটি যবে শুকাই
বর্ষা চারি মাসে বসিয়া খাই।

এবং—

যি নারী প্রভাতে নিদ্রাক যায়
বাসি শয্যাত সূর্যক পাই।
উদয় কালত নিলিপে ঘর
ডাক বলে তাইক ছারিয়ো নর॥

আবার যে মেয়ে—

অল্প খায় ফেলে প্রচুর
ডাক বোলে তাইক করিও দূর।

সরু সূতা কাটা ও তাঁত চালানোও সুগৃহিণীর এক বড় লক্ষণ, আজও যাহা আসামে দেখা যায়।

তৎকালীন গ্রামীণ সভ্যতার বড় পরিচয় পাওয়া যায় ডাকভণিতার কৃষিলক্ষণ বৃষ-লক্ষণ প্রভৃতি বচনগুলিতে—

গরু কিনিবা চিকণ জালি
দুই চারি ছয় দন্তীয়া ভালি
হরিণর সমান জিহ্বা কাণ
হেন বলদ বিচারি আন।

জ্যোতিষপ্রকরণে দেখি—

দধি মধু ঘৃত শুক্র তণ্ডুল
শুকুলা চামর শুকুলা ফুল।
হংসদৈবজ্ঞ সুন্দরী কন্যা
যাত্রার কালত সকলো ধন্যা।

এইসব ডাক ভণিতায় সমাজবিন্যাসের নানা স্তরের কথাও পাওয়া যায়—

কামারর চিকন অস্ত্র
ধোবার চিকন বস্ত্র

আবার ব্যঞ্জনের চিকন কি না হালধি অর্থাৎ হলুদ।

আজও চিকিৎসাশাস্ত্র ও ঔষধ সম্বন্ধীয় নানা পুঁথি আসামের বহুস্থানে ছড়াইয়া আছে। শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধী একটি ওঝা চিকিৎসকের কাছে ঐরূপ ১১০ খানি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ছায়াজ্বরবাণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ুরোগনিবারণী বায়ুর মন্ত্র পর্যন্ত ঐসব চিকিৎসাশাস্ত্রসাহিত্যে পাওয়া যাইত।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভাব ভাষা বিষয়বস্তুর বিচার করিয়া দেখিলে এইসব পদগুলির কিছু কিছু বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবোত্তর যুগের হইলেও ইহারা যে প্রাচীন কিম্বদন্তী ও প্রাক্‌বৈষ্ণবযুগের মৌখিক লৌকিক সাহিত্যের লিখিত পরিণত রূপ, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। অবশ্য অনেক ভণিতাতে আরবী ও পারসিক শব্দের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অসমীয়া কিম্বদন্তী অনুসারে ডাক বরাহমিহিরের পুত্র। মিহিরমুনি কামরূপ পরিভ্রমণে আসিয়া যে বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন সেই বাড়ীর কনিষ্ঠা বধূর পুত্র হয় নাই। মিহির মুনির পরিচর্যা করিয়া ও আশীর্বাদের ফলে সে পুত্রবতী হয়, এবং সেই পুত্রই ডাক।

শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধী অসমীয়া ভাষার কয়েকটি আদিরূপ কামরূপশাসনাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'অসমীয়া ব্যাকরণ আরু ভাষাতত্ত্ব' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন 'আম্ভ' অর্থাৎ 'আম' (দশম শতাব্দীর বলবর্মা নওগাং তাম্রশাসন ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর রত্নপালের সুয়ালকুচি পট্টোলি) বা কোম্পা অর্থাৎ কূপ বা কুয়া (বলবর্মার তাম্রশাসন) বা বেক্কা অর্থাৎ বাঁকা বা বক্র (ধর্মপালের পুষ্পভদ্র পট্টোলি)। এই পট্টোলিতে হাড়ি, সুবর্ণদারু প্রভৃতি আরও বহু কথা পাওয়া যায়।

অসমীয়া সাহিত্যের উৎপত্তি ও প্রসারের মূলে রাজনৈতিক সাহায্য ও ধর্ম-প্রভাব প্রবল ছিল। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় রাজা, ভূস্বামী ও রাজপুরুষেরাই সাহিত্যিকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৩. প্রাক্‌বৈষ্ণবী 'কন্দলী' যুগ

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পালবর্মারাজাদের পতনের পর কামরূপের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। গৌড়াধিপতি রামপালের সময় বাঙালী সৈন্য কামরূপ আক্রমণ করে এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক নানা আচারবিচার কামরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আজ পর্যন্ত বিজেতাদের দ্বারা স্থাপিত ময়নাগড় জাদুবিদ্যার প্রধান স্থান। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব পুনরায় কামরূপবিজয় করেন, এবং তিঙ্গদেবকে পরাজিত করিয়া নিজ রাজত্ব স্থাপন করেন। এই রাজাই কামতারাজের স্থাপয়িতা বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে দিনাজপুর হইতে দরং পর্যন্ত এই কামতা ভূখণ্ড বিস্তৃত ছিল। তেজপুরে ও গোয়ালপাড়ায় প্রাপ্ত বহু তাম্রশাসন, প্রস্তর মূর্তি (যেমন ব্রহ্মা, শিব, গণেশ) ও প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ ফলক হইতে জানা যায় তদানীন্তন সেনসম্রাটদের বাংলাদেশের সঙ্গে কামতাধিপতিদের বিশেষ সংযোগ ছিল। এই সময়েই বখ্‌তীয়ার খিলিজী কামরূপ অভিযানে আসেন এবং পরাজিত হন। কানাইবরশী শিলালিপিতে আছে 'শাকে তুরগে যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে কামরূপং সমাগত্য তুরস্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ।'

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামতাপুরাধিপতি দুর্লভ নারায়ণের নাম সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে জ্বলজ্বল করে। তাঁহাকে ঠিক অসমীয়া রাজা বলা যায় কি না, এ বিচার ঐতিহাসিকের, সাহিত্যিকের নয়। তাঁহার রাজসভায় হেমসরস্বতী ও হরিহরবিপ্র নামে দুইজন কবি ছিলেন। হেম সরস্বতীর প্রহ্লাদচরিত্র বিখ্যাত।

পরবর্তীকালের দৈত্যারি ঠাকুরের গুরুচরিতে ও দ্বিজভূষণের লেখায় রাজা দুর্লভনারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কবিরত্ন-সরস্বতী মহাভারতের দ্রোণপর্ব অনুবাদ করেন। মহামাণিক্য বারাহীরাজের পৃষ্ঠ-পোষকতায় মাধব কন্দলী রামায়ণ অনুবাদ করেন। "মহামাণিক্য" উপাধি থাকায় অনেকে মনে করেন এই বারাহী রাজারা ত্রিপুরাধিপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামে দুই অসমীয়া কবি ত্রিপুরারাজের সভাকবি ছিলেন। ইহা রাজমালা হইতে জানা যায়।

এই সময়ের পদ্মপুরাণ নামে একটি আখ্যায়িকায় হাসেনহুসেনের সহিত দেবী পদ্মাবতীর ভক্তদের ঘোর যুদ্ধের বিবরণ লিখিত আছে। হাসেনহুসেন বাংলার রাজা হুসেন শাহ হওয়াই সম্ভব। রাজা দুর্লভনারায়ণ ও তাঁহার তনয় ইন্দ্র-নারায়ণদেব চিরঞ্জীব 'পাণ্ডগৌড়েশ্বর' বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

অসমীয়া সাহিত্যের কবি হিসাবে হেম সরস্বতীর নামই সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রহ্লাদচরিত্র আরম্ভ করিলেন নারায়ণকে নমস্কার করিয়া—

জয় নমো নারায়ণ বৈকুণ্ঠর পোতি।
তোমার চরণে লৈলৈ সরণ সম্প্রতি॥

প্রহ্লাদের উপর হিরণ্যকশিপু নানা অত্যাচার আরম্ভ করেন। ভগবানের বরে ভক্তের কিছুই হয় না। অযুতহস্তী, উদ্যতফণা সর্প, তপ্ততৈল, প্রজ্বলিত অগ্নি, সমুদ্রের তুফান কিছুই প্রহ্লাদকে 'জমকরণে পঠাইবু' না পারে, 'অচেদ অভেদ দেহা অজর অমর'।

হরির প্রভাবে ন জলয় বৈশ্বানল
প্রহ্লাদের গাবে জেন চন্দন সিতল।

ভক্ত প্রহ্লাদ নারায়ণের স্তব করিতেছেন—

চরণোত পরিয়া প্রহ্লাদ করে স্তুতি।
জন্মে জন্মে হোক মোর তোমাত ভকতি॥
নমো নারায়ণ প্রভু জগতকারণ।
নাহি আদি অন্ত প্রভু তুমি নিরঞ্জন॥
অনাদি পুরুষ তুমি নাহি অন্ত ভেদ।
তুমি চৈধ সাস্ত্র প্রভু তুমি চারি বেদ॥

কিন্তু এই কাহিনীতে কবি হিরণ্যকশিপুর চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাইয়া তাঁহাকে নারায়ণের ভক্তরূপেই দেখাইয়াছেন—

দেখিআ হিরণ্য অতি ভৈলা ভয়ে ভিত।
কাম্পিলা হৃদয় অতি দেহা জর্জরিত॥
আথে বেথে সাবাতিয়া বুলে ধন্যপুত্র।
এহিখানি কথা বাপু সিখিলিহ কৈত॥
নমো নারায়ণ প্রভু দেব যদুপতি।
তোমার চরণে মোর থাকোক ভকতি॥

কবি অতি চমৎকার ভাষায় নৃসিংহরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

অদ্ধ কলেবর সিংহোর সদৃখ
অদ্ধেক মনিস্য কাই
হাতর নখ জে তৃসুল সদৃখ
বুলন্ত হিয়া বিদারু
দিনোত রাতৃত একোতে নমরে
সন্ধ্যা সময়ত মারু॥
অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধরিলান্ত
দেখন্তে লাগে তরাস
সোরির যৈবার ন পরান্ত ঠাই
জুরিলা দিস আকাস।

হিরণ্যকশিপু ও নৃসিংহের যুদ্ধের বর্ণনা প্রায় সিংহব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধেরই সমতুল্য—কবি তাহা সেই পর্যায়েই নামাইয়া আনিয়াছেন—

এক লাম্ফ দিয়া হরি হিরণ্যকে ধরি
মালবান্ধে ধরি পেলাইলন্ত চিত করি।

পিতার মৃত্যুতে প্রহ্লাদকে কবি শোকার্ত করিয়াই দেখাইয়া কাব্যের মানবীয় সুর বজায় রাখিয়াছেন, সেইটাই তাঁহার কৃতিত্ব —

পিতৃর মরণ পাচে প্রহ্লাদ দেখিলা
হৃদয়ত তান মহা সন্তাপ লাগিলা
হা প্রাণ পিতা মণি কি কাম করিলো

ভক্তের ভগবান তাহাকে অবশ্য আশ্বাস দিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তিনি 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' এসব কথা না বলিয়া একেবারে বেদান্তের চরমে উঠিয়া বলিলেন 'কে কার স্ত্রী, কে কার পুত্র, কে কার পিতা মাতা', যেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন—

না কান্দা না কান্দা বাপু ন কর সন্তাপ
কৈব ভার্যাপুত্র দেখা কৈর মার বাপ।

অসমীয়া জনমনে রামায়ণের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। রাম ও সীতার চিরন্তনী বিরহমিলন-কাহিনী, লোকচিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করিত। শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ কাকতির মতে দেওপর্বতে দশম একাদশ শতাব্দীর ভগ্ন মন্দিরের স্তূপে রাম লক্ষ্মণের ও হনুমান সুগ্রীব প্রভৃতি ভক্তদের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। অসম প্রাদেশিক মিউজিয়ামে একটি রামমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর রাজা ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে পালসাম্রাজ্যের শেষ সূর্য সম্রাট রামপালদেবের জীবনী অবলম্বনে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জীবনীর দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গীতে লিখিত। কিন্তু কাকতি মহাশয় যে 'রাম নৌ হত্তেই রামায়ণ', 'রামে মারিলেও মরা, রাবণে মারিলেও মরা', 'কালনেমির লঙ্কাভাগ' ইত্যাদি যেসব প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার উপায় নাই, কারণ ঠিক ঐসব প্রবাদই বাংলাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু তাঁহার অসমীয়া রামায়ণী সাহিত্য আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রামের উল্লেখের নানা দৃষ্টান্তের বিচার করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ ও কথাকাহিনীতে রাম-চন্দ্রের বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ভারতে রামায়ণী কথা অতি প্রাচীনকালেই সুপ্রচলিত ছিল। জৈন পদ্মচরিত, বৌদ্ধ দশরথজাতক, সমজাতক, সম্বুলজাতক, বেসসন্তর জাতক, চীনদেশে হোরাজাতক প্রভৃতিতে রাম লক্ষ্মণ দশরথের কথা পাওয়া যায়। দশরথজাতকে সীতাকে দশরথের কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সমজাতকে বারাণসীর রাজা অন্ধমুনির পুত্রকে শব্দসন্ধানী বাণদ্বারা নিহত করিয়াছেন এই কাহিনী আছে। এইগুলি ঠিক কোন শতাব্দীতে রচিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে রামায়ণী কথা প্রকাণ্ড বনস্পতিরূপে শিকড় গাড়িয়াছিল ইহা ইতিহাসসম্মত।

মাধবকন্দলীই রামায়ণী কবিদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। অসমীয়া সাহিত্যিকদের মতে অসমীয়া ভাষায় চারি প্রকার রামায়ণ পাওয়া যায় : (১) পদ রামায়ণ (২) কথা রামায়ণ (৩) গীতি রামায়ণ (৪) কীর্তনীয়া রামায়ণ।

মাধবকন্দলী, অনন্তকন্দলী, শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রভৃতি কবিগণ বহু রামায়ণী পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবি দুর্গাবর গীতিরামায়ণকার ও অনন্তঠাকুর আতা কীর্তনীয়া রামায়ণকার বলিয়া পরিচিত। ইহা ব্যতীত শঙ্করদেব রামবিজয় বা সীতাস্বয়ম্বর, মাধবদেব রামভাওনা, অনন্তকন্দলী, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। মন্ত্রগীতি পুঁথিতে বিয়াগীত প্রভৃতিতেও বহু রামকাহিনী স্থান পাইয়াছে।

মাধবকন্দলী নিজের আত্মপরিচয় এইরূপ দিতেছেন—

কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কয়
মাধব কন্দলী আরো নাম।
সপোনে সবিতে মঞি জ্ঞান কায়বাক্যে মনে
অহর্নিশে চিন্তো রাম রাম॥
শেলাকে সংস্কৃতে আমি, গাঢ়িবাক পারিছয়
করিল হো সর্বজন বোধে।
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিক্য যে
বরাহী রাজার অনুরোধে॥

এই বরাহী রাজা কে, এবং মহামাণিক্য কাহার উপাধি, এই লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কামরূপের পালরাজাদের সময় আমরা ভৌমপাল ও বরাহী পালেদের নাম শুনিয়াছি। বাঙালী বৈদ্যদেব কর্তৃক কামরূপ রাজ্য অধিকৃত হইবার পর কামতা রাজ্য স্থাপন এবং পরে কাপিলি উপত্যকায় কামেশ্বর নামে ঐরাজ্যেরই পূর্বভাগ শাসনের জন্য একটি উপরাজ্য স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথ প্রাচীন কামরূপের বরাহী-পালবংশের সহিত এই রাজ্যকে সংযুক্ত করেন। ডাঃ বাণীকান্তের মতে জয়ন্তাপুরের কাছারী রাজা মহামাণিক্যের অনুরোধে 'প্রাগ্‌বৈষ্ণব যুগত মাধব কন্দলীয়ে সম্পূর্ণ রামায়ণ অসমীয়ালৈ ভাঙে। মাধব কন্দলী মধ্য অসমর অর্থাৎ বর্তমান নগাওঁর আছিল'। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কপিলী-উপত্যকাতেই ত্রিপুরারাজবংশের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় এবং আজ পর্যন্ত এই মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরাধিপতিদের ভূষণ হইয়া আছে।

মহামাণিক্যর বোলে কাব্যরস কিছু দিলোঁ
দুগ্ধক মথিলে যেন ঘৃত।

মাধবকন্দলীর নিজের উক্তি যে তিনি বাল্মীকির মূল রামায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন—

বাল্মীকি যে মহাঋষি রামায়ণ প্রকাশিল
সংসারত সৃজিল অমৃত।
আকশুনি নরলোক কলিত সদগতি হোক
আকশুনি হোবে কৃত্যকৃত॥
মাধবকন্দলী বিপ্রে, তাহার চরণ স্মরি
করিলন্ত শেলাকক উদ্ধার॥

কন্দলী উপাধি কোথা হইতে আসিল, ইহা লইয়াও বহু গবেষণা হইয়াছে। কন্দলী উপাধিধারী বহু কবির নাম পাওয়া যায়, যেমন মহেন্দ্রকন্দলী, মাধবকন্দলী, অনন্তকন্দলী, শ্রীধরকন্দলী, রত্নাকরকন্দলী, রুচিনাথ কন্দলী ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন, কন্দলে অর্থাৎ তর্কে যিনি পারদর্শী তাঁহাকে কন্দলী বলা হইত— 'তর্কত লভিলা নাম অনন্ত কন্দলী'।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের দ্বারা উত্থাপিত একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন উত্থাপিত

করিয়াছেন—রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইল কবে? রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার বায়ুপুরাণেই প্রথম। বাল্মীকির রাম একজন উন্নতমনা বীর, ভবভূতির রাম আরো মহীয়ান। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড ও বৃদ্ধ হারিতের স্মৃতিগ্রন্থে রাম অবতার বলিয়া গণ্য। রামানন্দই চতুর্দশ শতাব্দীতে রামসীতা-ভক্তি প্রচার করেন। কন্দলী রামায়ণও প্রায় এই সময়ের।

শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' হইয়া উঠেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে বাসুদেব কৃষ্ণের সর্বপ্রথম উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদে (খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী)। মথুরা নগরীতে যাদব জাতির অন্তর্গত সাত্বত বৃষ্ণিকুলে তাঁর জন্ম। ঘোর আঙ্গিরস তাঁর গুরু—পুরুষ যজ্ঞবিদ্যা তিনি দান করিতেছেন। জৈন উত্তরাধ্যায়ন সূত্র, মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে তাঁর পিতার নাম বাসুদেব। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একজন মানুষ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) তিনি ভক্তির পাত্র ক্ষত্রিয়প্রধান। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তিনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। বেসনগর গরুড়স্তম্ভে তিনি 'দেবদেব'। ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্তেই আমরা প্রথম বিষ্ণুর উল্লেখ পাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী বিষ্ণুও আমাদের কল্যাণকারী হউন। 'শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ' এই প্রার্থনা আছে প্রথম অনুবাকে। প্রাচীনকাল হইতেই বিষ্ণু ও কৃষ্ণ ও পরে রামকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব দর্শন, সাহিত্য ও চিন্তা গড়িয়া উঠিয়া বিশাল বটদ্রুমে পরিণত হইয়াছে। এই ধারা আজও সক্রিয় ও চলমান। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকে, মহাকবি অশ্বঘোষের রচনাতে, নাগার্জুনের লেখায়, কালিদাসের কাব্যে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে, ভবভূতির উত্তররাম বীরচরিতে, রামকণ্ঠের সর্বতোভদ্রে, আনন্দ-বর্ধনাচার্যের ধ্বন্যালোকে, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে, রামানুজাচার্য, নিম্বাকাচার্য, মধ্বাচার্য, জ্ঞানেশ্বর, বল্লভাচার্য, আলবার সম্প্রদায়ের লেখায়, নারদীয় পঞ্চরাত্রে, সাত্বত আগমনের ব্যাখ্যায়, চতুর্ব্যূহবাদে, এবং সর্বশেষ ভারতের দিকে দিকে—বিশেষ করিয়া বাংলায়, আসামে, মিথিলায়, মহারাষ্ট্রে এই বৈষ্ণবী চিন্তার ধারা সাহিত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মহাভারতের সৃষ্টি করে। আসামের বৈষ্ণব কবিগণ ভারতীয় সেই ধারার সহিত যুক্ত এবং বৈষ্ণব সাধনার ও সাহিত্যের ইতিহাসে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কবি ও সাধকগণের দান অতুলনীয়।

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পূর্বকবিদের মধ্যে কন্দলীদেবকে প্রধান ও প্রথম স্থান দেন—

পূর্ব কবি অপ্রমাদী মাধব কন্দলী আদি
বিরচিল পদে রামকথা।

কথিত আছে যে, মাধবদেব আদিকাণ্ড ও শংকরদেব উত্তরকাণ্ড রচনা করিয়া মাধব কন্দলীর রামায়ণ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। মাধবদেবের ভণিতাতেও পাওয়া যায় 'রামের চরিত্র বিরচি আছন্ত মহা মহা কবি জনে, তা সম্বাক দেখি পদকরিবাক্ স্বাদ ভৈল মোর মনে'। মাধব কন্দলীর রামায়ণের প্রতি অধ্যায়ের পূর্বে ও পরে মূল ভণিতা স্বরূপ 'শুভশুভ' ও 'ডাকি বোলা রাম রাম' প্রভৃতি 'আঁচুকুল' যোগ হইত। মাধব কন্দলীর 'দেবজিত্' বলিয়াও বৈষ্ণব ধর্মদ্যোতক আর-একটি কাব্য ছিল বলিয়া পণ্ডিতদের মত। কিন্তু এই পুস্তকের কিছু পদ যে প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কি কন্দলীর রামায়ণেও বহু পরবর্তী কবির পদ

স্থান পাইয়াছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও মাধবদেব কন্দলী রামায়ণের যে প্রচুর সম্পাদনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। কারণ কন্দলীর ভণিতায় দেখি—

সাতকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলোঁ।..
সাতকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকির কৃত।
তার সার উদ্ধারিয়া বিচারি সম্মত॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, সাংস্কৃতিক চেতনায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে স্থান, অসমীয়া সাহিত্যে ও সামাজিক জীবনে কন্দলী রামায়ণের তদ্রূপ স্থান একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এইটুকু বলা দরকার যে অসমীয়া সাহিত্য বলিতে প্রাচীন কামরূপীয় বিভাগকে স্মরণ করিলেও রামায়ণী কথার প্রভাব, রামসীতার কাহিনী, আসামের অন্যত্র গিরিউপত্যকাবাসী, অহম কছারি, চুটিয়া ও অন্যান্য পার্বত্য জাতির মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

মাধব কন্দলীর প্রধান দান হইতেছে যে রামায়ণকে সম্পূর্ণ নূতন ভাব ও ভাষায় ঢালিয়া জনচিত্তের সহিত সমতা রাখিয়া তিনি সাজাইয়াছেন। মূলের সহিত প্রধান প্রধান ঘটনার বিভেদ নাই। কিন্তু লৌকিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক চেতনা থাকিতে বাধ্য। ফুল ও ফলের বর্ণনায় দেখি—

খাজুরি, হারিঠা, আমলিখি ডহাফল।
ছাতিয়ান্, গুরা, নারিকেল যে শ্রীফল॥
সলঙগা, মহরি আরু কমলা টেঙগারা।
কর্দে পিছু মার্দক যে সোলঙগা আমরা॥
কদম্ব গুলাল পারিজাত আশেষ।
সেউতী মালতী গুটিমালি যে বিষেশ॥

পক্ষীর বর্ণনায় দেখি ঢোণ্ডাকাক, 'ময়না ঘরুবা ভাটৌশালিক . .কোকিলর বার পেচা ফিঙ্গা শুকসারী'।

বসন্ত-বর্ণনায় কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফুলের বর্ণনায়—

দেখা দেখা জানকি! হরিষ করি মন।
ফলফুল যুকুত বিবিধ তরুবন॥
জাইযুতি বকুল বন্দুলি কর্ণিকার।
কাঞ্চন তগর কন্দ সেবালি মন্দার॥
অশোক পলাশ ফুলি গৈল হিসাহিসি।
নাগেশ্বর চম্পক ফুলিল অহর্নিশ॥

রামের প্রাসাদের যে বর্ণনা আছে তাহাকে অসমীয়া ঘরসজ্জার বর্ণনা বলিয়া অসমীয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন, কিন্তু এই দাবী কিছুটা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য যে নয়—সেখানে কল্পনার যে আশ্রয় আছে, তাহাও দেখা যায়—

রামর প্রাসাদ শোভে কৈলাস সমান।
বিদ্যুতের কান্তি যেন জ্বলে থানে থান॥
সুবর্ণর মাণ্ডলি চালত বলিয়াইল।
বৈদূর্য রুবলি শুদ্ধ রজতেহি ছাইল॥

সুবর্ণের মাণ্ডল, বৈদূর্যের স্তম্ভ, রজতের চাল, সবদেশের কবির কল্পনাতেই স্থান পাইত—

হস্তীদন্তে বার দিলা হিঙ্গুলের কাম।
কুন্দরূখ জালা থৈলা দেখি অনুপাম॥
হির্মানি মাণিক জ্বলে মরকতমোতি। . .
প্রাসাদ উপরে দিল মাণিকর কান্তি॥
ইন্দ্রনীল মণি দিল থানে থানে জান্তি॥

তারপর প্রাসাদের চিত্রাঙ্কণের বর্ণনাও অনুপম ও অসমীয়া সংস্কৃতির একটি মূল্যবান দলিল, যদিও হিন্দুর সাহিত্যে ইহা নূতন নয়, আমরা সেখানে দেখি—

বৃষযানে শঙ্কর, সিংহবাহনে পার্বতী।
মূষিকপৃষ্ঠে গণপতি ময়ূর'পরে সেনাপতি॥
কার্তিক বামন অবতার, পাতালে বন্দীবলি।
গরুড় স্কন্ধবাহী বিষ্ণু তাহার পাশে লক্ষ্মী।
সরস্বতী বায়ু বরুণ ব্রহ্মা কুবের দেবরাজ॥

লোকাচারের অনেক তথ্য এই কাব্যে পাওয়া যায়—

আমি ভৈলো কৈকেয়ীর অষ্টমীর ছাগ।

অষ্টমীর ছাগের উল্লেখে শক্তিপূজার একটি বিশিষ্ট প্রথার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হইল—

হাড়ী জাতি হুয়া পাঢ়িবাক চাহ বেদ।

সমাজে অন্ত্যজ হিসাবে হাড়ীজাতির স্থান যে উচ্চে ছিল না সে কথা সুবিদিত। সেই হাড়ীজাতি যদি ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের সমান হইয়া 'বেদ পাড়িবারে চাহে', তাহা যে সমাজসম্মত হইবে না তাহা কবির বক্তব্যেই প্রকাশ। চোদ্দ বৎসরের জন্য রাম সীতাকে লইয়া বনে যাইতেছেন, অতএব বাক্সপেণ্টরা গোছাও—ইহাও সাধারণ লৌকিকতার প্রভাব—

চৌধ বরিষক লাগিয়া সীতাক
বস্ত্র অলঙ্কার লৈয়া।
পেটারিত ভরি লৈয়া ঝাণ্ট করি
সুমন্ত্র চড়িলা গৈয়া॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে 'বালীবধে' কবি কাব্যের বিস্তারে, বর্ণনার চাতুর্যে যে সৌন্দর্যজ্ঞান সূক্ষ্মরসবোধ ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বিশেষতঃ তারা পটেশ্বরীর চরিত্র অঙ্কনের, তাহাতে তাঁহাকে ভারতীয় কবিদলের মধ্যে স্থান দিতেই হয়—অবশ্য মাঝে মাঝে গ্রাম্যতাদোষ যে আসে নাই তাহা নয়। যেমন বানর-রাজ সুগ্রীব রামের আশ্বাস পাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে বলিল—

নির্চিন্তি আছহ দাদা বার্তাক নপাইলা।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই কাল হুয়া আইলা॥

সত্য করি জানা দাদা বচন আমার।
পরিছেদা করি দেখা পুত্র পরিবার॥
পটেশ্বরী লোক দেখা আরো যত তিরী।
আজ ধরি তোমার খণ্ডাইবোঁ রাজশিরী॥

ইহাতে সুগ্রীবের চরিত্রকে ভীরু ও ক্ষুদ্র করিয়া আঁকা হইয়াছে। অবশ্য কবির ইচ্ছাও হয়তো সেইরূপ ছিল। কিন্তু বীর স্বামীর প্রতি তারার উক্তি তারা চরিত্রকে বীর্যবতী স্বামীসোহাগিনী নারীরূপেই ফুটাইয়া তোলে—

আপোনার বাহুবলে বৈর সব জিনি লাহা
বর যশরাশি তুমি পাইলা।
সুদুর্জয় রাবণক কায়ত টিপিয়া লইয়া
চারিয়ো সাগর ফুরি আইলা॥

বালীর পতনে তাহার বিলাপ ও পতিপ্রাণা নারীর বিরহবেদনার সঙ্গে স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবরের আশ্রয় লইতে হইবে, এই একটা অস্বাভাবিক অসমাজিক চেতনাও রহিয়া গিয়াছে—

শুনিয়ো সুগ্রীব বীর স্বামীর সোদর ভাই,
তুমি শ্রেষ্ঠ দেবর আমার।
আপনোর সুখ হেতু স্বামীক মরাইয়া মোর
কুলর আনাইল খিলিংকার।
এবে বর যশ পাইলা শ্রেষ্ঠ ভাইক ন চাইলা
আমাক চাহিবা কিবা আর॥

বালী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন স্ত্রীপুত্রকে সান্ত্বনা দিবার ভঙ্গীটি সত্যই অতি মনোরম করিয়া কবি আঁকিয়াছেন—

দেখত অঙ্গদ চরণত পরি আছে।
সব বন্ধু জনে বেঢ়ি কান্দে আগে পাছে॥
ডাইন হাতে অঙ্গদকো আলিঙ্গ ধরিলা।
বাম হাতে ধরিয়া তারাক বোধ দিলা॥

এবং বালীর সব চেয়ে মহত্ত্বের পরিচয় কবি দিলেন, যখন বালী নিজের গলার মালা সুগ্রীবকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন

শ্রেষ্ঠ ভাইক্ লাগি ন করিবা শোক

কিন্তু সবাই কাঁদে—

স্বামীক্ বেঢ়িয়া কান্দে পটেশ্বরী লোকে।
সুগ্রীব কান্দত অতি জ্যেষ্ঠ ভাইএর শোকে॥
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ কান্দন্ত হনুমন্ত।
সৈন্যে সমে চারিপাত্র আর জাম্ববন্ত॥

অসমীয়া সাহিত্যের চানেকীতে প্রাক্‌বৈষ্ণব যুগের কবিতা হিসাবে রুদ্রকন্দলী লিখিত মহাভারতের দ্রোণপর্বের 'সাত্যকিপ্রবেশ' উল্লেখযোগ্য। 'বিষ্ণুর ভকত মহামায়ার সেবক' 'শ্রীমন্ততাম্রধ্বজ অনুজে সহিতে, বৃদ্ধর সমানধর্ম শিশু বয়সেতে'।

কবিরত্ন সরস্বতীও আর একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তিনিও মহাভারতের দ্রোণপর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন। এখানেও বিষ্ণুর প্রাধান্য—

বেদান্ত কাহিনী ব্যাসকে প্রণামি
করন্ত তুতি বিচার।
যতেক প্রত্যেক সকলে ততেক
একে বিষ্ণুমন্ত্র সার॥

তাঁর কৈলাসবর্ণনা অতি মনোরম। অসমীয়া কবিরা ফুলের বর্ণনায় 'কেতকী প্রচুর কনক ধুত্তর' শুধু নয়, 'ফুলিল শেফালী, পরে হালিহোলি', মন্দার, পারিজাত সেউতি, কুন্দ, কুরুবক, তগর, জয়ন্ত, বকুল, অগুরু, লবঙ্গ, মালতী, চম্পা, নাগেশ্বর আরো কত কী।

নিছক কাব্য হিসাবে মাধব কন্দলীর উপমা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকেই অনুসরণ করে, যেমন তিলফুল জিনি নাসা, ত্রিবলিত উদর, মুকুতার পান্তি সদৃশ দন্ত, চম্পককলিকার মত আঙুল, কম্বুতুল্য কণ্ঠ, কমলসদৃশ নয়ন ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে অন্য রামায়ণী কবিদের নামও করা যাইতে পারে যদিও তাঁহারা পরবর্তী যুগের। গীতিরামায়ণ ও বেহুলা-আখ্যান রচয়িতা কবি দুর্গাবর কুচবিহারাধিপতি রাজা বিশ্বসিংহের সমসাময়িক—

কমতা ঈশ্বর বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবর
আটচল্লিশ মহিষী বন্দো ওঠর কোঙর

নিজের বিবরণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, 'শ্রীকায়স্থচন্দ্রধর তান পুত্র দুর্গাবর বিরচিত গীত বিতপোন'।

গীতি রামায়ণে পদ ও গানের মধ্য দিয়া রামায়ণের পুণ্যকথাকে লোকরঞ্জন হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। নানা রাগরাগিণীর সুষ্ঠু ব্যবহারে তখনকার দিনে নৃত্যগীতের যে যথেষ্ট আদর ছিল এইসকল গীতিগুলিই তাহার প্রমাণ। অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ কাকতির মতে দুর্গাবরের গীতিরামায়ণ মূল রামায়ণের ভাষা বা ভাবানুবাদ নয়। এই মত সম্পূর্ণভাবে প্রমাণসহ না হইলেও লৌকিক ভাবের দ্বারা এইসব গীতি যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ তাহারা নিজেই—

রাগ—অহিব

অ কি লখ্‌মন,
গৈল সীতা মোক্ উপেক্ষিয়া
তৃণত শয়ন মোর বল্ক পরিধান হে . .

সহজে অঞ্চল তিরি জাতি
সম্পদে সুন্দরী নারী
আপদে পলাইলা এরি

সীতা, রামকে উপেক্ষা করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন এরূপ গ্রাম্য কল্পনাও কবির মনে স্থান পাইয়াছে। নানা রাগরাগিণীর সাহায্যে এইসব গান গীত হইত। গুজ্জরী, ধনশ্রী, পটমঞ্জরি, সুহাই, মালশ্রী, গান্ধার, মেঘমণ্ডল ইত্যাদি বহু সুরের নিদর্শন পাওয়া যায় এই গীতগুলিতে। ওজা পালী গীত আজ পর্যন্ত আসামে আদরণীয়। অনন্ত কন্দলী শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রবর্তিত ভাগবত ধর্ম প্রচারের জন্য রামায়ণ পদ

রচনা করেন। মাধব কন্দলী ছিলেন কবি, অনন্ত কন্দলী ছিলেন ধর্মপ্রচারক। পরবর্তীকালে শঙ্করদেব মাধবদেব, অনন্তঠাকুর আতা, রঘুনাথ মহন্ত, কবি শত্রুঞ্জয় ('শ্রীরামদাসর চেষ্টা শত্রুঞ্জয় নাম'), কবি গঙ্গারাম ('গঙ্গারামদাসে সীতার বনবাস রচে'), কবি ভবদেববিপ্র (শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞ), কবি শ্রীচন্দ্রভারতী (মহীরাবণ বধ), কবি ধনঞ্জয় (গণকবেশী হনুমানের মাহাত্মকীর্তন-গণকচরিত্র), প্রভৃতি কবিগণ রামায়ণ সম্বন্ধে পদরচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। গদ্যেও রামায়ণের গল্প সংযুক্ত রামকরতী নামে মন্দ্রপুঁথি এখনও পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া 'বায়ুকরতী' পুঁথি হইতে রামায়ণী কথা উদ্ধার করিয়াছেন—

"রামচন্দ্রে দেখে হনুমন্ত বন্ধ গৈলা। দেখি রামচন্দ্র অমৃত হাতে পরিশিল। রাম্র হাতে হনুমন্ত বীর উঠিলা। উঠি হনুমন্তে রামের চরণ পরশিলা.."

পরবর্তী যুগে কথারামায়ণ বিশেষ প্রচলিত ছিল। তাহার গদ্যের একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে বনে গিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—

"জলবুদবুদসম অথির শরীর তার প্রিতিসাধি পিতৃবাক্য ছারিবো..যে শরীর কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম হৈব হেন শরীরত মোহ করি কোন দুর্জনে পিতৃরবাক্য ছাড়িব.. বনতে মোর বৈকুণ্ঠ সুখ মোক লাগি কেহ আর শোক না করিবা..ইতি শ্রীবাল্মীকি মহাঋষিকৃত অযোধ্যা কান্ডকথায়াং শ্রীরঘুনাথ কৃতয়মষ্টমোহধ্যায়।"

৪. শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের গৌরবময় যুগ বৈষ্ণবযুগ এবং এই যুগের মধ্যমণি হইতেছেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, মাধবদেব ও তাঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ। বাংলাদেশে যখন 'প্রেমবন্যা নিতাই হইতে অদ্বৈত-তরঙ্গ তাতে, চৈতন্য বাতাসে উথলিল, আকাশে লাগিল ঢেউ' প্রায় ঠিক সেই সময়ে আসামে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। মহাপুরুষীয় সাহিত্য ও বৈষ্ণববাদ আলোচনা করিবার পূর্বে এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মহাপুরুষ শঙ
তখনকার দিনের বিকৃত তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান। প্রধানতঃ
বৈষ্ণববাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের কথা যে, এই মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ না হইয়াও নিজের চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভগবদ্ভক্তির প্রেরণায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সব জাতির গুরু হইলেন। শ্রীশঙ্কর-দেবের চরিতকার দ্বিজ রামানন্দ বলেন যে সেই সময়ে সারা কামরূপ বিকৃত তন্ত্রাচার ও ধর্মের নামে ব্যভিচারে পূর্ণ ছিল। 'রাতিখোয়া' ও 'ভোগী' দলের কথা ও কাহিনী সেদিনও শোনা যাইত। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি এইসব কাহিনীর উদ্ধার করিয়াছেন। এই পরিবেশের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। শঙ্করদেব শিরোমণি ভূঁইয়া চন্ডীবর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভুইঞারা সামন্ততান্ত্রিক নরপতি ছিলেন এবং দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে রাজত্ব করিতেন। শঙ্করদেব প্রথম জীবনে অন্যান্য সকলের মত সংসারধর্ম ও গার্হস্থ্যজীবন যাপন করেন। সন্তপ্রধান ভক্ত কবীরের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ক্রমশঃ তিনি আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ছিলেন ও তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যায়ন করিতেন, পরে মতভেদ হওয়ায় চলিয়া

আসেন। ইহা প্রমাণিত হয় নাই। তিনি গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, এই দুই গ্রন্থকেই প্রাধান্য দিতেন। আত্মিক উন্নতির জন্য সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসগ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন তিনি মনে করিতেন না। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ না হইয়াও ভগবদ্‌প্রেম লাভ করা যায়, এই ছিল তাঁহার মত। তিনি ভাগবতের শুকদেবের মত বলিতেন 'গৃহে দারাসুতৈষণাং' স্ত্রীপুত্র নিয়া বাসনা দূর করিয়া 'তত্ত্বৈষণা সর্বে' তার পূর্বে নয়। সংসার মায়া নয়, মোহ নয়, মতিবিভ্রমের কারণ নয়, নিরাসক্ত ভাবে গার্হস্থ্যজীবন পালন দোষের নয়, ভারতবর্ষের সন্ন্যাসবাদ অধ্যুষিত মনে এই শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়া প্রায় বিদ্রোহেরই সমান। ভারতবর্ষ বলিয়া আসিয়াছে, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অয়মহংভোঃ; কিন্তু মহাবাক্যগুলির সংগে তার অখণ্ড অন্বয়ের সম্বন্ধকে হয়তো পূর্ণ মর্যাদা দেয় নাই। অসীম বিশাল সত্যকে সীমার রেখায় 'মিত' করিয়া নাম ও রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই হইতেছে 'মায়া'। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনে নচিকেতার অভীপ্সা এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন অনির্বাণ। শ্রীশঙ্কর-দেবও এই কথাই নিজের জীবনে কর্মের মধ্য দিয়া প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

মহাপুরুষ শঙ্করদেব রামানুজের মত ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সীমা টানিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁর মধ্যে দাস্যভাবই প্রবল—কৃষ্ণের কিঙ্কর তিনি। শঙ্করদেব কিন্তু মূর্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামে গ্রামে 'নামঘর' ও 'নামঘোষার' কীর্তন প্রবর্তন হইল। প্রধান প্রধান সত্র ও পাটবাটীতে 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থসাহেবের ন্যায় পূজিত হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বনে অনুবাদ করেন। বেদান্ত, গীতা ও ভাগবতকে ভিত্তি করিয়া তিনি একশরণ নামধর্ম প্রচলন করেন। ভগবান ব্রহ্মরূপী সনাতন, পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতলীলার উপর তিনি মাধব। নাম, দেব, গুরু আর ভক্তি এই চারি বস্তুই মুক্তি আনিয়া দেয়। তাঁর সাধনা কিন্তু রাগানুরাগ মার্গের সাধনা নয়, উদ্ধবের সাধনা। 'সব সমর্পিয়া একমন হইয়া' নিষ্কিন্তু পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদন আছে, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ মধুর রসসিঞ্চিত রাধার মহাভাবের সাধনা নয়। সেখানে 'আমার মাঝে তোমার লীলা হবে' ঠিক সেই ভাব নাই। গতির ছন্দ নাই, পাওয়ার আবেগ নাই, চাওয়ার বেগ নাই। মন বাক চিত্ত নির্বাপিত, 'শান্তম্' স্থির অচঞ্চল উপাধিবিহীন। নারদের মতে ভক্তিই পরম প্রেম। শাণ্ডিল্য একে বলিলেন পরাভক্তি। টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ব্যাখ্যা করিলেন ভগবানের প্রতি ভক্তিই পরাভক্তি—

উপরিবা * শাস্ত্রর নীতি   হইব ক্ষমাবন্ত অতি
সমস্ত প্রাণীক কর দয়া।
সত্যশৌচ ধর্ম ধরি   মনত জপবা হরি
তেবে না বান্ধিবে বিষ্ণুমায়া॥

ইহা ছিল তাঁহার শিষ্য দামোদরদেবের বাণী। গুরুর অনুবৃত্তি করিয়া তিনি আরো বলিয়াছিলেন—

"তেওঁ পরমবৈষ্ণবী দুর্গাদেবীর পূজা করাতো কাকো বাধা না দিচ্ছিল, কিন্তু জীবহিংসা করি তেওঁক পূজা করিব খুজিলে বর আপত্তি করিছিল।"

---

* উপেক্ষা করিবেনা

মোটকথা সাহিত্যে, সংগীতে, দার্শনিক বিচারে, সামাজিক উদারতায়, শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব ও তাঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায়রা এক প্লাবন আনিয়াছিলেন, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সমস্ত দিক দিয়া তাঁহারা আসামকে পুনর্গঠিত করেন। ভক্তিরত্নাবলী, ভক্তিরত্নাকর, কান্তিমালা টীকা, কালীয়দমন প্রভৃতি নাটক, বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ, সংগীতপারিজাত, ব্রজবুলি ভাষায় বড়গীত, চারি অঙ্গ, ষড়রয়বের ব্যাখ্যা, একেশ্বরবাদ, নামকীর্তন, ব্রাহ্মণশূদ্র সব নির্বিশেষে একত্র নামগান—তখনকার বিকৃত তন্ত্রাচারের বিরুদ্ধে শুধু বিপ্লব আনিয়াছিল তাহা নয়, সমাজে একটা সুসংহত দার্শনিক মতবাদেরও সৃষ্টি করিয়াছিল, সমাজে সকলের স্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যে কেউ 'শরণ' লইত তাহাকে শরণীয়া বলা হইত। অবশ্য তখনকার দিনে এইরূপ উদার মতবাদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য লোকের অভাব ছিলনা। রাজসভাতেও শঙ্করদেব লাঞ্ছিত হন ও তিনি দেশত্যাগ করিয়া কোচ নৃপতি নরনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভক্ত, সাধক, যুগ-আলোড়নকারী মহাপুরুষ না হইয়াও শঙ্করদেব যদি শুধু সাহিত্যিক হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। তাঁহার নানা নাটক, ব্রজবুলির গীত, ভটিমা, ভাগবতের অনুবাদ অবিস্মরণীয় ভাবে তাঁহাকে কবিদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ আসন দান করে। অনবদ্য ভাব, ভাষা, পদলালিত্য, ছন্দ, রাগরাগিণীর যোজনা তাঁহাকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসিক মহাজনদের সমপর্যায়ে ফেলে। সংস্কৃত কবি হিসাবেও তাঁর স্থান অতি উচ্চে। কানাড়া, কেদারা, গৌরি, বেলওয়াল, সুহাই, শ্যাম, আশোবারি, গান্ধার, তালজোতিমান প্রভৃতি সুর সংযোজন তাঁহাকে প্রসিদ্ধ সুরকারও করিয়াছে।

কালীয়দমন নাটকের ভটিমা, অনুপ্রাস, ছন্দ ও বচনবিন্যাসে কবি জয়দেবকেই স্মরণ করাইয়া দেয়—

জয় জয় যদুকুল কমল প্রকাসক নাসক কংসক প্রাণ।
জয় জয় জগতক্ ভকতক ভিতি নিতি কুরু নিরজান॥
জয় জগ নায়ক মুকুতিদায়ক সায়ক সারঙ্গধারী।
দুষ্ট অরিষ্টক মুষ্টিক মোড়ন চোড়ন বন্ধ মুরারী॥
ধরু গোবর্ধন বারণ বরিষণ ভেলি ইন্দ্রমদদুর।
ত্রিভুবন কম্পন কালি সর্পক দর্প কয়লি চুর॥

'পত্নীপ্রসাদ' নাটেও এই ভটিমা দেখি। 'কেলিগোপাল' নাটকে প্রথম রাধার নাম পাওয়া যায়—'রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজঘোষিতঃ'। এই রাধার কথা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধীর তাহাই মত।

নাটকটি আরম্ভ হইয়াছে অতি চমৎকার রসপূর্ণ একটি সংস্কৃত শ্লোক দিয়া—

শরৎশশাঙ্ককর কোমলাসু
নিশাসু শশ্বৎ সহগোপিকাভিঃ॥
চকার কেলিং কলগীত নৃত্যৈঃ
স গোপমূর্তির্জয়তীহ কৃষ্ণঃ॥

রীক্ষোন্দুমণ্ডলমখণ্ডমকুণ্ঠ রোধো
বৃন্দাবনে সুকলবেণুমবাদয়ৎ যঃ॥
সম্মোহনায় মধুরং ব্রজসুন্দরীণাং
তং গোপবেশ মণিশং প্রণতোঽস্মি কৃষ্ণং॥

আবার দেখি—

এ সখি কতনু কয়ালো হাম দুখ রুখ চোর
দেহ দহে কাম আগি আলিঙ্গন কোর।

বিদ্যাপতিদেবের—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর—

এই বিখ্যাত পদ মনে পড়ে।

অসমীয়া কবির শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একেবারে ঘরের মানুষ—পীতবস্ত্র দ্বারা সখীদের চোখের জল মুছাইয়া দিতেছেন। বলিতেছেন—হে সখি তোমাদের 'প্রেমভকতিত হামু পরম আকুল . . বিলাপ চোড়হ'। তাহাদের শিশুকৃষ্ণ চিরকালের সাহিত্যে অনুপম।

রুক্মিণীহরণ নাট্যের প্রথমেই দেখি কবি বলিতেছেন, ভো ভো সভাসদ তোমরা সব শ্রদ্ধান্বিত হয়ে শোনো 'রুক্মিণীহরণং নাটকং মুক্তিসাধকম্'। সূত্রধার সমস্ত নাটকের মূল কথাটি এই কয়েকটি কথার মধ্যে অতি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করিয়া দিলেন—'সে গোসানি রুক্মিণী মিলল মিলল'। দেববাদ্য বাজিল, রুক্মিণীমঞ্চে প্রবেশ করিলেন —

রুক্মিণীং কারয়ামাস প্রবেশং সখিসংযুতাম।
মোহয়ন্ হর্ষয়ন্ চারু রূপলাবণ্য কান্তিভিঃ॥

রুক্মিণী-রূপ-বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন—

ইসত হসিত মুখ চান্দ উজোর।
দশন মোতিম জচ নয়ন চকোর॥
মাণিক মুকুট কুণ্ডল গণ্ড ডোল।
কনক পুতলি তনু নিল নিচোল॥
করকঙ্কণ কেজুর ঝণকার।
মাণিক কাণ্ডি রচিত হেমহার॥
চলাইতে চরণ মঞ্জির করু রোল।
রূপে ভুবন ভোলে শঙ্কর বোল॥

'পারিজাতহরণ' নাটকটিও নাট্যভঙ্গীতে ও রচনাশৈলীতে মনোরম। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ও গণচেতনায় ঢেঁকি-বাহন নারদই সর্ব অনিষ্টের কোলাহলের ও কোন্দলের মূল। এই ঐতিহ্যটি নাট্যকার তাহাঁর কাজে লাগাইয়াছেন। সূত্রধর বলিতেছেন—

"আশীর্বাদ কর কৃষ্ণক হাতে পারিজাত দিয়ে নারদ তাহেক মহিমা কহল।

নারদ॥ হে কৃষ্ণ ওহি পারিজাতক গন্ধ তিনি পহরক পথ যাই। ওহি পারিজাত যাহেক গৃহে রহে ধন জন বিভব তাহেক ছাড়ায়ে নোহি। ওহি দেবদুর্লভ পারিজাত যে নারী পরিধান করে সে পুষ্পক মহিমায়ে পরম সৌভাগিনী হয়। তাহাকে ছাড়ি স্বামী কথাব যাইতে নাহি। ওঃ ওহি কুসুমক মহিমা কি কহব?.. (মৌনে বঠল)।"

নারদের কার্যসিদ্ধ—নাটকীয় গতিও দ্রুত। ষোড়শ সহস্র গোপিকারমণ শ্রীকৃষ্ণকে এই পুষ্পের পুণ্যশক্তিদ্বারা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা যাইবে, এই সুযোগ কোন্ রমণী হেলায় ছাড়িতে পারে!

শ্রুত্বা কুসুমমাহাত্ম্যং রুক্মিণী কেশবপ্রিয়া
প্রণম্য স্বামীচরণং পারিজাতমযাচত।
কৌতুকে রুক্মিণী নমিয়ে স্বামীক পায়ে
মাগে আঞ্জুরি যুরি হাত
অব প্রাণনাথ মাথে মিলাবয় মোহি
ওহি কুসুম পারিজাত।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকেই পারিজাত দিলেন। এমন সময় নরকাসুর-বধে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য-লাভের জন্য সভার্যাপুরন্দর সভায় প্রবেশ করিলেন। নারদও সুযোগ বুঝিয়া সত্যভামার কাছে গিয়া রুক্মিণীকে পারিজাতদানের সরস বর্ণনা করিলেন—

"সতিনীক অভ্যুদয় দেখি কি নিমিত্ত প্রাণ ধরহ—
মুনের্বচনমাকর্ন্য শোক কোপ পরিপ্লুতা
মূর্ছিতা পতিতা ভূমৌ যথা বাতাহতা লতা।"

কলহপ্রিয় নারদ শ্রীকৃষ্ণকে আবার সেই কথা নিবেদন করিলেন—

সতিনীক উদয়ে হৃদয়ে দহে আগি
অধিক মিলাল মনতাপ।
ধিক অব জীবন যৌবন মোহে
অভাগিনী করত বিলাপ॥

সত্যভামা বলিতেছেন—কেশব, তোমার সব চাতুরী বুঝিয়াছি।

জানলোহো তুহো ব্যবহারা।
অত যে চাতুরী চোডি চলহু বহুরী হরি
যাহা প্রিয়া রমণী তোহারা॥

তার পর বিশ্বের চিরপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জনের পালা—

শ্রীকৃষ্ণ তাহে পেখি আলিঙ্গি
কোলে তুলি বৈঠায়ল, পীতবস্ত্রে শরীরক্
ধূলি ঝারল। কেশ বান্ধল।

এবং শুধু আদর সোহাগ নয়—পারিজাত আনিবার প্রতিজ্ঞা করাইল।

হে স্বামি আমার বহুত সতিনী
ইবার পারিজাত আনি কোন স্ত্রীক
দেব, তাহা বুঝয়ে নাহি—হামি
কদাচিৎ তোহারি সঙ্গ নাহি চাড়ব।

সাহিত্য হিসাবে ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বারিষা-বর্ণন' অতি মনোরম—

বহে খর্ববায়ু নুশুনয় মাত বোল।
গগনক ঢাকি মহা মেঘর আন্দোল॥
ঘনে ঘনে দেই অতি বিজুলী চমক।
লাগে তিরিমিরি আসি চক্ষুত জমক॥

কবির উপমা কি না 'বিদ্যুৎ সঞ্চারে চণ্ড বতাস চঞ্চল'। কিন্তু কবি উপলব্ধি করিতেছেন যে প্রকৃতির রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, পৃথিবী শীতলা হয়—

প্রকাশে বারিষা নানা বর্ণে বসুমতী।
জলয় রাজ্যশ্রী যেন পরম সম্পত্তি॥

কিন্তু বিজুলী চঞ্চল—সে ধীর স্থির নয়। মহাগুণবন্ত পুরুষ পাইলেও রমণীর যেমন স্থৈর্য আসে না। আবার রমণীর রূপবর্ণনায় তিনি বাংলা, মিথিলা, আসামের কোনো কবির ন্যূন নন—

কি কহব রূপ কুমারীক রাম।
কনক পুতলি তনু অনুপাম্॥
রতন তিলক লেলি অলক কপোলে।
হেরিয়ে ভ্রূভঙ্গ ত্রিভুবন ভুলে॥..
হেরিয়ে ভুজযুগ মিললউ শঙ্ক।
ললিত মৃণাল মজল জলপঙ্ক॥
আরকত করতল মুনি মন মোহা।
কনক শলকা অঙ্গুলি করু শোহা॥

এইরূপ বহু মনোরম চিত্র অসমীয়া বৈষ্ণব কবিদের লেখায় পাওয়া যায়।

শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব। ১১৮ বৎসর বয়সে শঙ্করদেবের মৃত্যু হয়। মাধবদেবের নামঘোষা বিখ্যাত—

মুক্তিত নিস্পৃহ থিঠো, সেহি ভকতক নমো
রসময়ী মাগোহা ভকতি।
সমস্ত মস্তকমণি নিজ ভকতর বশ্য
ভজো হেন দেব যদুপতি॥

মুক্তি কাহাকে বলিয়াছেন তাঁহারা—'সকল প্রকার বন্ধনের পরা এরাই বিমল আনন্দত থাকাই হৈচে মুক্তি। আর নিস্পৃহকি—হেপাঁহন থকা—অর্থাৎ বাধা এরাই—হেঁপাই না করি কর্তব্য কামত আবন্ধ থাকা' নিরাসক্ত গৃহীর আদর্শ।

মাধবদেব সাহিত্যিক হিসাবে গুরুর অনুসরণ করেন। তিনিও অসমীয়া, ব্রজবুলি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। অর্জুনভঞ্জন, চোরধরা ঝুমুর, ভূমিলুটিয়া ঝুমুর, গোবর্ধনযাত্রা, জন্মরহস্য, আদিকাণ্ড রামায়ণ, নামমালিকা পোপরা গুচুরা, দধিমন্থন প্রভৃতি অসমীয়া সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

চোরধরা ঝুমুরায় দেখি—শূন্যগোপীগৃহ শ্রীকৃষ্ণ নবনী চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন—

আজু কাঁহা য়াসি বোলয়ে গোবালি।
পেখিয়ে আঁখি তরল বনমালী॥
দ্বার বেঢল গোপী বাহু প্রসারি।
লবণু চোরি কৈচে কর্যাস মুরারি॥

কবি চমৎকার ভাবে মানবীয় ভাবটি ফুটাইয়াছেন—

ধরহ সবহি মিলি হরিক চোর।
মাধব কহ গতি গোবিন্দ মোর॥

তার পর শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করিলেন—'হামাকু মারি চোর পলাই' বলিয়া গোপীরা চীৎকার করিয়া উঠিল।

বালগোপালের এক একটি অপূর্ব রূপ অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই সাহিত্য বাৎসল্যভাবে নিবিড়ঘন। শ্রীধর কন্দলীর 'কাণখোবা' কবিতা শিশুকৃষ্ণ সাহিত্যের একটি চমৎকার ছবি—ওরে কানাই কান খাওয়া আসিতেছে—

সকল শিশুর কান খাই খাই
আসয় তোমার পাশে।

মাধবদেবের পিপরা-গুচুরা নাটকে তস্করচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের দধিদুগ্ধ-ভক্ষণ অপবাদের উত্তর গ্রাম্যদোষদুষ্ট হইলেও চাতুর্যে ভরা—

"আহে গোবালি, তোহে বড়ি নিদারুণ হৃদয়, আপুন জিহ্বা রাখিতে না পারি আপুন গৃহে দধিদুগ্ধ লবনু খালি আর ভাতারের ভয়ে হামাক অপযশ দেবস। আমাক ঘরে লবনু কে পুছত? খাইবার না পাই তোহারি ঘরে চুরি করিয়া লবনু খাবলো"—

ওরে গোয়ালিনী তোদের হৃদয় বড়ই নিদারুণ। নিজেদের জিহ্বা সংযত রাখিতে না পারিয়া নিজের ঘরে দধিদুগ্ধ ননী খাইয়া ফেলিলি, আর স্বামীদের ভয়ে আমার নামে অপযশ! আমার ঘরে কিসের অভাব যে তোদের ঘরে চুরি করিব?

মাধবদেব সুগায়ক ছিলেন। তিনিও বহু বরগীত রচনা করিয়াছিলেন। মাধবদেবের বরগীতের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনেরই ছায়া। শঙ্করদেব মাধবদেবের বরগীত কবীর, মীরাবাই, দাদু, রজ্জবের দোঁহার সহিত তুলনীয়।

কানাইএর রূপ কিরকম—পুঞ্জীভূত গোপিনীর প্রেমে যেন একস্থানে রূপ লইয়াছে 'কালা নোহে শ্যামরূপ ধরিছে অমিয়া'। যেন তুলি দিয়া একটি রেখায় টানে ছবিটি জীবন্ত ও মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিল। এযেন ঠিক বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি পদ—

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নবজলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পশারি গেলি।

শঙ্করদেবের রচনাতে যে দার্শনিক গভীরতা, বিরাট্ শাস্ত্রজ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক রসবিচার পাওয়া যায় মাধবদেবের কাব্যে নাট্যে কীর্তনে বরগীতে তাহা হয়তো নাই, কিন্তু বিষয়-নির্বাচনে সহজবোধ্য ভাষায় ও জনগণের মন হরণে এই লোকসাহিত্য অমূল্য।

কৃষ্ণ বা রামের (দুইই এক) নামকীর্তন এই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্য বা রূপ সৃষ্টি সেখানে গৌণ। ভগবদ্ভক্তি প্রচারের বাহন রূপেই ইহাদের স্বীকৃতি, তবু যে সেই পর্যায় ছাড়িয়া কাব্য ও নাটকগুলি সত্যকার সাহিত্যের স্তরে উঠিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের কৃতিত্ব। নাম-মালিকায় শিবনাম মহিমাও কিছু পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কাকতি মহাশয় বলেন—নামঘোষায় ত্রিধারা বর্তমান; শঙ্করস্মৃতি,

মাধবদেবের আত্মলাঘিমা আর কৃষ্ণভক্তিমাহাত্ম্য। এই ত্রিধারা ছাড়া আত্মতত্ত্ব ও দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও নামঘোষায় আমরা পাই—

যে হেতু চৈতন্যপূর্ণ পরমাত্মা রূপে হরি
হৃদয়ত আছন্ত প্রকাশি।
তাতেসে ইন্দ্রিয়গণ ভূতপ্রাণ বুদ্ধিমন
প্রবর্তে যতেক জড়রাশি॥

'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'—এই তথ্যই ভারী সুন্দর উপমায় মাধবদেব তাঁহার নামঘোষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

'উপনিষদধেনু' ধরি খায়—কিন্তু ভাগবত-বনে হরিনামরূপ সিংহ থাকায় এই তর্কব্যাঘ্রী ভয়ে পলাইয়া যায়। তাই—

ভজ ভাই মাধবক স্মর ভাই মাধবক
গাব ভাই মাধবর গুণ

সেই অমৃতরস পান কর—

পিয়ু পিয়ু ভাই হরিনাম রস সার।

সাহিত্যহিসাবে বৈষ্ণব কবিদের সেই চিরপরিচিত তন্ময়তা আকুলতাই ইহাকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে।

শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুবর্তীগণ শ্রীধর স্বামীর টীকামতে শ্রীমদ্ভাগবত ধর্মের প্রবর্তনকারী। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য প্রভৃতি সব ভাবেরই বিকাশ দেখি। কত ভক্ত কতদিক দিয়া সেখানে প্রকাশ পাইয়াছেন—সূত, নারদ, ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ঋষভ, পৃথু, কপিল, বিদুর, উদ্ধব, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শুকদেব, রন্তীদেব, অম্বরীষ, ভরত, অক্রূর, অবধূত, গোপীরা, ব্রাহ্মণপত্নীরা, দ্রৌপদী, কুন্তী, দেবহূতি, যশোদা, দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা। বাঙালী বৈষ্ণব কবি এর মধ্যে প্রাধান্য দিলেন সেই আগন্তুক নিত্যরসকে—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা।

তাই নররপু তাহার সহায়। তাই শ্রীরাধার প্রতিটি গতি, প্রতিটি ভঙ্গী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্যে এমন বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অসমীয়া কবি যখন বর্ণনা করিলেন—

বন্দুলি নিন্দি অধর করু কান্তি
দাড়িম্ব বীজ নিবিড় দন্ত পান্তি
নখচয় চারু চান্দ পরকাশ
লহু লহু মত্ত গজগমন বিলাস।

তখন আমাদের চোখে একটা রূপবিদগ্ধ ছবি ফুটিল বটে কিন্তু তাহাতে রসবিদগ্ধ তন্ময়তা নাই। এইরূপ বহু বর্ণনা শঙ্করদেব, মাধবদেব ও তৎসাময়িক কবিদের লেখায় আছে যাহা কাব্যরসে টলমল করিতেছে এবং আমাদের মনের ঘোর তামসী ঘুচাইতেছে। অসমীয়া কবি এই প্রেমকে মানবীয় প্রেমরূপে চিত্রিত করেন নাই। এমনকি মানবরূপের মধ্য দিয়া রূপাতীতের সন্ধানও এ নয়। অসমীয়া কবি ভগবানকে মানুষে নামাইয়া মধুরের উপাসনা করেন নাই। তাঁর প্রিয় দেবতা হন নাই, দেবতাই প্রিয় হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের কিঙ্কর শঙ্কর।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুরূপ ভারতের নানা স্থানে গীতমাধব গীতবাসব প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়। দক্ষিণেও ভক্ত তীর্থনারায়ণ কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী, কবি ও সাধক ক্ষেত্রজ্ঞ বহু পদাবলী, কবি জ্ঞানেশ্বর গীতার ব্যাখ্যা, কবি তুকারাম, কবি একনাথ নানা অভঙ্গ পদ রচনা করেন। ত্যাগরাজ, মুথুস্বামী দীক্ষিত, শ্যামশাস্ত্রী প্রভৃতি পরবর্তীযুগের। সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৈষ্ণব সংস্কৃতির এক উদাররূপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং মহাপুরুষ শঙ্করদেব তাহাকে আসামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্যামশাস্ত্রী ছিলেন কাঞ্চীর কামাক্ষীদেবীর ভক্ত। ঐতিহাসিকেরা বলিতে পারিবেন এই কামাক্ষীর সহিত নীলাচল-বাসিনী কামাখ্যার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। নৃত্য সহযোগে এইসব ভগবদ্ভক্তিমূলক গীত হইত। দেবদাসীরা প্রতি মন্দিরে এইসব পদ সুললিত স্বরে গাহিতেন। দক্ষিণে আমরা পার্বতীকে 'বীণাবাদিনী মাতঙ্গী' রূপেও দেখিয়াছি—অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা দেখিয়াছি রাগ ও রাগিণীর যুক্ত মিলনে। মহালক্ষ্মীকেও দেখিয়াছি 'বরবীণা মৃদুপাণি'রূপে।

আসামের বরগীতগুলি সুর ও সাহিত্যের সম্মিলন।

লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী অনুসারে শুদ্ধ-সপ্ত স্বরে কোমলধৈবত হইলে মূল রাগ হয়। কিন্তু শঙ্করদেব বহু সঙ্কররাগের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, যেমন রাগ মধুমাধবী, তুরবসন্ত ইত্যাদি। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই অসমীয়া ওজাপালির অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। বেহুলা লখিন্দরের গান, মনসা ভাসান, মনসামঙ্গল প্রভৃতি গ্রাম্য অঞ্চলে গীত হইত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ কাকতি মহাশয় বলেন, 'সাহিত্য আরু ধর্মজগত সেই বোরে নূতন যুগর আগমন সূচনা করিছিল। একালে লোকরঞ্জন আরু আন কালে অতর্কিতভাবে আধ্যাত্মিকতার ওখ আদর্শলৈ জনসমাজর মন আকর্ষণ—এয়ে অসমীয়া গীতসাহিত্যত বরগীতর ঐতিহাসিক বিশেষত্ব।' কথিত আছে যে কুচবিহারের বীর চিলারায় তাঁহার ভার্যা কমলাপ্রিয়াদেবীর মুখে 'পামর মন রামচরণে মন দেহু' এই গীতটি শুনিয়া শঙ্করদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় নেন।

প্রত্যেক সমাজের ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই কোনো ভাবপ্লাবন আসিয়াছে তখনি নানা দিকে সমাজে তাহা স্ফূর্তি পাইয়াছে। বকুল কায়স্থের 'কিতাবত-মঞ্জরী' নামক গণিতের পুস্তক, কবিরত্ন দ্বিজের জ্যোতিষচূড়ামণি, পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রযোগরত্নমালা ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। অনন্ত কন্দলী ও রাম সরস্বতীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

প্রসিদ্ধ পদ্মপুরাণের কবি মনকর, দুর্গাবর, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি বহু কবির নাম পাওয়া যায়। কবীন্দ্র সঞ্জয় রচিত পরাগল খাঁর অনুরোধে লিখিত পরাগলী মহাভারত চট্টগ্রামে লিখিত মহাভারত বলিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দাবী করিয়াছিলেন। কোনো কোনো অসমীয়া সাহিত্যিক ইহাকে অসমীয়া ভাষায় পদমহাভারত বলিয়া পালটা দাবী করেন। তখনকার দিনের বাংলা ও অসমীয়া প্রধানতঃ লৌকিক সাহিত্য এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন, এবং এখনকার দিনের ভৌগোলিক সীমার কঠিন বিচারও ছিলনা।

অনন্ত কন্দলীর কুমরহরণ, মহীরাবণ বধ, জন্মরহস্য কথাসূত্র, বৃত্রাসুর বধ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে। রাম সরস্বতীও ভীমচরিত, লক্ষ্মীচরিত, কুলাচল বধ, বখাসুর বধ, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন, শঙ্করদেবের আদেশে মহাভারতেরও কিছু অনুবাদ করেন। ইঁহার উপাধি ছিল ভারতচন্দ্র, ভারতভূষণ ও কবিচন্দ্র।

লক্ষ্মীচরিতে সুলক্ষণা নারীর মধ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, এই কথা বলিতে গিয়া নারীর বর্ণনা যা করিয়াছেন তাহাতে কাব্যরসের বেশ আস্বাদন আছে—

ললিত বলিত অংগ কোমল লোচনা।
ঈষত হসিত মুখ মরাল গমনা॥
গৌরবর্ণা মৃদুস্মিত ভাষিণী বিমলা।
মধ্যক্ষীণা দয়াবতী সর্বত্র সুশীলা॥

'ভীমচরিতে' দেখি পার্বতী শিবকে বলিতেছেন—

ভিক্ষার চাউলে জানা পেট নুপুরয়।

অতএব কৃষিকর্ম কর। এবং কি ভাবে কৃষিকর্ম করিতে হইবে তাহার মন্ত্রণা দিতেছেন।

মহাপুরুষ শংকরদেব মাধবদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের নানা আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া জনচিত্তোপযোগী কাব্যে গাথায় নাট্যে রূপায়িত হইয়া উঠে।

বখাসুর বধ, কুলাচল বধ, প্রভৃতি বধ কাব্যগুলিকে নিছক মধ্যযুগীয় allegoryর সংগে তুলনা করিলে ইহার সাহিত্যরস বিচার হইবেনা। এইসব পৌরাণিক কাহিনী হিন্দু সংস্কৃতির সংগে অংগাংগীভাবে বিজড়িত। ইহার মধ্যে কামক্রোধ-লোভমোহমদমাৎসর্যের রূপক থাকিলেও কাহিনীগুলির সাধারণ অর্থ করাই সমীচীন—

ফান্দিলো মায়ার পাশে কাল ব্যাধে ধায়া আসে
কাম ক্রোধ কুক্তা খেদি যায়।

রত্নাকর কন্দলী, শ্রীধর কন্দলী, সার্বভৌম, গোবিন্দমিশ্র, বিদ্যা পঞ্চানন, কংসারি প্রভৃতি কবিগণ এই যুগের শংকরদেব মাধবদেবের সমসাময়িক। ভবানীপুরিয়া গোপাল আতা, গোপাল মিশ্র, দামোদর বিপ্র, দামোদর দাসও প্রসিদ্ধ। গোপাল আতার ঘোষারত্ন, শংখচূড়বধ মহিষাসুর বধ প্রভৃতি পুঁথি আছে। পরের যুগে কবিরাজ চক্রবর্তীর লিখিত ধর্মধ্বজ কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীর উপাখ্যান অবলম্বনে আর-একটি শংখচূড়বধ কাব্য পাওয়া যায়।

চরিতকারদের মধ্যে রামচরণ, রামানন্দ ও দৈত্যারি ঠাকুর প্রধান। শংকর চরিত, গুরু চরিত প্রভৃতি শংকরদেবের জীবনী অবলম্বনে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের সমতুল্য। শংকরদেব মাধবদেবের তিরোধানের পর তাঁহাদের পূত চরিত্র ও জীবনী কাব্যে লিপিবদ্ধ করিবার একটি প্রথা দেখা যায় ও ইহা হইতেই চরিত-সাহিত্যের উদ্ভব। কৃষ্ণ ভারতীর সন্তনির্ণয়, ভট্টদেবের সৎসম্প্রদায়ের কথা, রামনাথের সন্ত মুক্তাবলী চরিতসাহিত্যকে বুরঞ্জী ও পৌরাণিক সাহিত্য ও রাজলেখমালার মধ্যবর্তী এক সাহিত্যবিভাগে পৌঁছাইয়া দেয়। এই যুগের শেষ প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ছিলেন ভট্টদেব—তিনি দামোদর-দেবের শিষ্য। এঁর কথা-ভাগবত ও কথা-গীতা তৎকালীন অসমীয়া গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। স্মাত্বতন্ত্র, ভক্তিসার, শরণসংগ্রহ ইত্যাদি সংস্কৃত পুস্তকেরও রচয়িতা ইনি। চরিতকথাগুলিই অসমীয়া জীবনী-সাহিত্যের আদি, ইহা অস্বীকার করা

চলে না। কথাগুরুচরিতের গদ্যরীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সুসাহিত্যিক বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলিতেছেন—

"চরিত পুথির সর্বত্রতে অপূর্ব সাহিত্যিক নিপুণতারে বর্ণনার লগত কথোপকথনর সংযোগ সধা হৈছে। ভাব আরু ভাষার সমতা রক্ষার্থে আর রীতি সৌষ্ঠবর হেতু দীঘল আরু চুটি বাক্যের প্রয়োগ ঘটিছে। কথ্য ভাষার স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গীর হেতু একেখিনি বর্ণনাতে অথবা একটি ছেদতে নির্দেশক আজ্ঞাসূচক, প্রশ্নসূচক আদি বিবিধ বাক্যরীতির ব্যবহার হৈছে।"

কথ্য ভাষায় গল্পের স্বাভাবিক স্রোত কি রকম সুন্দরভাবে বহিয়া যায় তাহার একটি উদাহরণ তিনি দিয়াছেন—

"কলিঙ্গ রাজার মুখত বেথা রোগ হল। পাছে দুখত রাজা এনে অঙ্গীকার করিলে বোলে মোর ব্যাধি যে এ চার পাবে তাকে মোর অর্ধরাজ্য দিম। তাকে শুনি অনেক দেশের অনেক বৈদ্য ধন্বন্তরী, অর্থর্ববেদী, আহি অনেক টকা বাখর রজত সুবর্ণ ভাণ্ডি জাবণ করি খুবাই দিএ। ফোত মিছা।"

কলিঙ্গ দেশের রাজার মুখে ব্যথা রোগ হইল। দুঃখে ও কষ্টে রাজা অঙ্গীকার করিলেন যে আমার ব্যাধি সারাইয়া দিতে পারিবে তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব দিবেন। এই কথা শুনিয়া অনেক বৈদ্য, ধন্বন্তরী ও অথর্ববেদী আসিয়া অনেক টাকা রৌপ্য লইযা গেল। সবই মিথ্যা।

ইহার পরবর্তী শতাব্দীতেও বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তৃতির যুগে বহু কবির নাম পাওয়া যায়। রামচন্দ্র বড়পাত্র গোহাঞির হয়গ্রীবমাধব, রঙ্গনাথ দ্বিজের চণ্ডী, নীলকণ্ঠ দাসের দামোদরচরিত্র, কেশব দাসের ভাগবত, অনন্ত আচার্যের আনন্দলহরী, লক্ষ্মীনাথদ্বিজের শান্তিপর্ব, পিথুরাজদ্বিজের মুষলপর্ব, রামদ্বিজের মৃগাবতী চরিত্র, বিষ্ণুরাম দ্বিজের দাতাকর্ণ, জয়নারায়ণের লক্ষ্মীপতিচরিত্র, কামদেবের অশোকচরিত্র, রামানন্দের শঙ্করচরিত, রামানন্দদ্বিজের মহামোহ, রামমিশ্রের হিতোপদেশ, দীনদ্বিজবরের মাধবসুলোচনা, রুদ্ররাম কবির নীতিরত্ন, গঙ্গারামদাসের সীতার বনবাস, রঘুনাথদাসের কথা-রামায়ণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রত্যেক পুস্তক ও তার সাহিত্যিক অবদান সম্বন্ধে আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু এই বিশাল সাহিত্য অবহেলার বস্তু নয়। এই বৈষ্ণব প্লাবিত যুগেও দেখি অনন্ত আচার্যের আনন্দলহরী তন্ত্রসম্মত সাধনার কাব্যে ইঙ্গিত—

নাভির মূলত মণি পূরক কমল
নীল জীমুতর বর্ণ সম দশদল . .
অনাহত কমলর শুনা অতি বাজে।

অনাহত কমলের ধ্বনি সাধক শুনিতেছেন—কিন্তু এই তন্ত্র-মতে সাধনা কেন?—'বৈদিক দীক্ষাত বহুশ্রম'।

কৃষ্ণানন্দ দ্বিজের পূর্ণভাগবতে 'পঞ্চ মহাভূতর আসন কহোঁ শুনা . . ইড়া ও পিঙ্গলা—নাড়ীর বিন্দু বহিছে—এহি স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সৎসঙ্গত আছে।'

দীনদ্বিজবরের মাধব-সুলোচনা নামক পাঁচালী কাব্যটি অতি মনোরম। কবির বর্ণনাশক্তি, উপমাপ্রয়োগ ও রসসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁহার রচনাকে সার্থক করিয়াছে। নারীর বাম অঙ্গে কৃষ্ণতিল অতি সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কবি উপমা দিলেন—

বাম অঙ্গে আছে কৃষ্ণ তিল এক গোট।
সুবর্ণ পর্বত যেন অঞ্জনের ফোট॥

বা যেখানে বিক্রম রাজার পুত্র মাধব সুলোচনার রূপখ্যাতি শুনিয়া উচ্চৈঃশ্রবার বংশজাত ঘোটকে চড়িয়া সাগর পারে উপস্থিত মালিনীর কুঞ্জে আশ্রয় লইলেন, তখন বিদ্যাসুন্দরকেই মনে পড়ে। মালিনী সুলোচনাকে স্নানের ছলে নিদ্রিত মাধবের কাছে লইয়া গেল। গানের ধুয়ায় কবি দর্শকদের মনে কাব্যের ভাবী আভাস দিলেন—

ছার শয়নসুখ, দেখো প্রিয়ার মুখ
উঠ উঠ দেব যুবরাজ।

কিন্তু সেইদিনই সুলোচনার বিবাহের অধিবাসের দিন। কবি অতি সুকৌশলে, ঘটনার বিন্যাসে, ভাষার আবেগে গল্পটিকে যেরূপে বহুদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রশংসারই যোগ্য। কিন্তু কবি যে মহাশ্বেতা, যে তপস্বিনী 'বিছাল অঞ্চল স্তব্ধ অবগুল' তার প্রতি কাব্যিক সুবিচার করেন নাই। কারণ তাঁর মতে—

পুরুষর অনুরাগ যিমত ভার্যাত।
নারীর নাহিক তেনে প্রীতি পুরুষত॥

অসমীয়া সাহিত্যের বৃহত্তর ইতিহাসে অঙ্কিয়া নাট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাব্যের, নাট্যের, কীর্তনের উপজীব্য বস্তু ও মূল কথা কৃষ্ণকথা প্রচার। নানা রূপে, নানা ছন্দে, নানা প্রথায় এই অমৃতনিষ্যন্দিনী কাব্যকথা পরিবেশিত হইয়াছে তৃষিত তপ্ত ক্লিষ্ট পৃথিবীর মানুষের জন্য—

ভাওনা করিবে কৃষ্ণ পূজিবে লাগিয়া।

রূপকের মধ্যে 'ব্যভিচারীভাব' থাকিবে না। ধুলিয়া নাচ, পুতুলনাচ, ঢাকঢোল জগঝম্প সহিত গান, নানা ক্রীড়া কৌতুকের সহিত নৃত্যগীত ও মুখোশ পরিয়া কথাকলি ধরনের নৃত্যগীতও প্রচলিত ছিল। ওজাপালীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পার্বত্য জাতিদের মধ্যেও নৃত্যগীতের বিশেষ আদর ছিল ও আজও আছে। মনসা-পূজায় দেওধানী নাচের রেওয়াজ ছিল। শুভঙ্কর কবির শ্রীহস্তমুক্তাবলীতে এইসব নৃত্যগীতাদির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ে বিজয়বৈজয়ন্তীর যুগ, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী। দশম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরী প্রাকৃতে রচনা করেন। অধ্যাপক যাজ্ঞিকের মতে মধ্যযুগীয় মহানাটক অভিনয়ে প্রাচীন প্রাকৃতী রীতির কিছুটা বর্তমান ছিল। অসমীয়া নাটক এই প্রাচীন রীতি ও ওজাপালীর মিশ্রণ। অসমীয়া নাটকে আমরা সূত্রধার গায়ন ও বায়ন অর্থাৎ রীতি ও বাদ্যকার দেখি। এখানেও কিন্তু বিদূষকের অভাব। ভবভূতির নাটকেও বিদূষকের বিশেষ স্থান নাই।

অসমীয়া নাটকের ত্রিমূর্তি হইতেছে, নাট, যাত্রা ও ঝুমুর।

শিল্পশাস্ত্রমতে কলা চৌষট্টি। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, চিত্রকরণ, সূত্রক্রিয়ায় পুতুলনাচ, নাটকাদি দর্শন, মাল্যরচন, পুষ্পবিন্যাস, নেপথ্য বা বেশ রচনা, কেশবিন্যাস, তিলক, রচনা, কৌচুমার অর্থাৎ কুরূপকে সুরূপ করিবার সাজসজ্জা, মানসী কাব্যক্রিয়া, বৈতালিকী বিদ্যা প্রভৃতি প্রধান। স্বয়ং শঙ্করদেব নিজে চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। চিহ্নযাত্রায়—

তুলি হাতে লৈয়া বৈকুণ্ঠের পট আঁকিলা।

আবার দেখি—

হিঙ্গুলে হারিতাল তেতিক্ষণে আনিলন্ত।
যত্ন করি পটে বৈকুণ্ঠক লিখিলন্ত॥

বৃন্দাবন-মথুরার যত লীলা—

করিলন্ত পটতাত চিত্রক তুলিলা।

অসমীয়া নাটকে সূত্রধার মধ্যস্থ পুরুষ—গ্রীক কোরাসের মত নাটকের বিষয়বস্তু দর্শকদের বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবোত্তর যুগের অসমীয়া সাহিত্যকে কাব্য-নাটক, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, নীতি ও লোকাচার এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের বহুলাংশই পদ্যে এবং এই পদ্যগ্রন্থের বেশীর ভাগই ধর্ম ও পুরাণ কথা অবলম্বনে। শঙ্করদেব, মাধবদেব, অনন্ত কন্দলী, রামসরস্বতী, ভট্টদেব, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পুরুষোত্তম গজপতি, কবি অনিরুদ্ধ, পীতাম্বর দ্বিজ, বিদ্যাপঞ্চানন, কংসারি, গোপালমিশ্র প্রভৃতি ৬১ জন কবির ও তাঁহাদের কাব্যের নাম পাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই 'নানাগ্রন্থ সংগ্রহ করিল এক ঠাঁই'। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব, রামায়ণের সপ্তকাণ্ড, হরিবংশ, ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, স্বাতত তন্ত্র, পুরাণের উপাখ্যানই এইসব কাব্যের উপজীব্য বিষয়। প্রাচীন ওজাপালীই অসমীয়া নাটকের পূর্বরূপ। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাটকের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কালীয়দমন, পারিজাতহরণ, পত্নীপ্রসাদ, রুক্মিণীহরণ, যে কোনো সাহিত্যের নাটকের সহিত তুলনীয়। দৈত্যারি ঠাকুরের স্যমন্তহরণ, রামচরণ ঠাকুরের কংসবধ, গোপাল আটার বলিছলন, মাধবদেবের ভূমি লুটুয়া, পিপরাগুচুয়া, অনন্ত কন্দলীর সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি নাটক আজও জনমনকে আনন্দ দেয়। নিধিরামের নীতিরত্ন, পরশুরামের ধর্মপুরাণ, রামসরস্বতীর ব্যাধচরিত, দ্বিজ-গোস্বামীর হিতোপদেশ, বড়পাত্রের হয়গ্রীবমাধব, রামদ্বিজের মৃগাবতীচরিত শিব-শর্মার প্রভাসবর্ণনা কবিতায় রোমান্সের স্থান অধিকার করিয়া আছে।

জীবনী-সাহিত্য বা চরিত-সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যের আর-একটি বৈশিষ্ট্য। গুরুচরিত, গুরুলীলা, গুরুবংশাবলী, শঙ্করচরিত, গোবিন্দচরিত, সন্তমুক্তাবলী প্রভৃতি ২৩টি গ্রন্থের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি নিজস্ব ভঙ্গী ও কবিত্বরসে পূর্ণ।

রামসরস্বতীর গীতা, শঙ্করদেবের অনাদি পাতন ও ভট্টদেবের গদ্যগীতা, দর্শন ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রধান পুস্তক।

জ্যোতিষশাস্ত্রে কবিরাজ সরস্বতীর ভাস্বতীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। স্বপ্নাধ্যায় ও কর্মফল বলিয়া আরো দুটি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিষ সম্বন্ধে অহমদের 'দিনচোয়া' পুঁথিকে Ahom book of Divination বলা হইত। কবিরাজ চক্রবর্তীর সূর্যসিদ্ধান্তের অনুকরণে ভাস্বতী অন্যতম। অহম রাজাদের সময় দৈবজ্ঞদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল! প্রত্যেক সেনাবাহিনীর সঙ্গে দৈবজ্ঞ গণক থাকিতেন। তাঁহারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার সঠিক সময় নির্দেশ করিয়া কালাকাল বিচার করিতেন। অসম বুরঞ্জীতে দেখিতে পাই, মুঘল আসাম সংঘর্ষের সময় রাজা রামসিংহের সহিত যুদ্ধকালে বিখ্যাত অসমীয়া বীর লাচিত ঃ বাহিনীতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ দলই লাচিতবাহিনীর আচার্যগণক ছিলেন।

সম্বন্ধে শ্রীহস্তমুক্তাবলী একটি প্রামাণ্য পুস্তক। হোরা মুদ্রার ব্যবহার ইহাতে লিপিবন্ধ।

এই যুগের অসমীয়া সাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ বুরঞ্জী সাহিত্য। অসমীয়া বুরঞ্জীদের কথা ভারতপ্রসিদ্ধ এবং ইহার সম্বন্ধে পরে সবিশেষ আলোচনা আছে। সূর্যখরি দৈবজ্ঞের দরং রাজবংশাবলী, রতিকান্ত দ্বিজ ও সূর্য দেবদ্বিজের ও মাধবদ্বিজের রাজবংশাবলী ও রাণীরাজা এই ঐতিহাসিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

সঙ্গীত সাহিত্যেও অসমীয়া কৃষ্টি সমুজ্জ্বল। শঙ্করদেবের কীর্তন, মাধবদেবের নামঘোষা, বড়গীত-গীতিরামায়ণ, হৃদয়ানন্দের শ্রীরামকীর্তন এই কৃষ্টির পরিচয়। কাশীনাথের অঙ্কের আর্যা ও চাং কং ফুকনের বুরঞ্জীতে পূর্তবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্য হিসাবে ডাক-ভণিতাগুলি পূর্বযুগের ঐতিহ্য বহন করিলেও অনেক বচন এই যুগে পুনর্লিখিত ও লিপিবন্ধ হয়; এইগুলি সমাজবিন্যাস রীতি-নীতির পরিচায়ক।

অসমীয়া কথাসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের বেশী প্রসার না থাকিলেও ইহার ক্রমোন্নতি ও ভাষা চিত্তাকর্ষক। ভট্টদেবের কথাগীতাই অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যিক গদ্য। মন্ত্রপুঁথি হইতেও গদ্যের একটু আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গনারায়ণদেব মহারাজের জন্মচরিত হইতে অসমীয়া গদ্যের একটু নমুনা দিতেছি—

"পূর্বে বশিষ্ঠ মুনি দিখৌ নদীর অগ্রত বারাণসীতুল্য পবিত্র ক্ষেত্রত নির্বাস করি পুরশ্চরণ করিবকা ইচ্ছা করিলে, নদীকো বশিষ্ঠ নাম দিবলৈ ইৎসা করিলে।"

অসমীয়া ইতিহাসে Vasishta Cult বা বশিষ্ঠবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রত্যেক বুরঞ্জীতেই বশিষ্ঠের আগমন, তপ জপ ও তীর্থবাসের কথা আছে। মহারাজ কমলেশ্বর সিংহের রাজত্বকালে হরগৌরী-সম্বাদ নামে একটি পুস্তক রচিত হয়। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টার্লিতে ইহার সম্যক্ সমালোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকটি প্রাচীন অসমীয়া কথাসাহিত্যের একটি সুচারু নমুনা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে অসমীয়া সাহিত্যে বারে বারে মাংসপেশল গদ্যের পিছনে কলাবতী কবিতাবধূ ছায়াবৃত কটাক্ষ সহযোগে দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়া উঁকি মারিতেছেন। বাক্ ও অবাক্ বাঁধা পড়িয়াছে কাব্যের ছন্দে।

অনেকে বলেন যে অসমীয়া বৈষ্ণব কাব্যে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দের পরকীয়া রস নাই এবং এই মধুর তত্ত্ব তাঁহারা পরিবেশন করিতে পারেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীশঙ্করদেবের দাস্যভাবই এই মনোবৃত্তির প্রধান কারণ। আর একটি কারণ বিবৃত করিতেছি। অনাসক্ত প্রেম যে স্তরে উঠিলে 'রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ' 'কামগন্ধনাহি তায়' হইয়া প্রেমের আধারকে ভূর্ভুবস্ব ত্রিভুবন-ব্যাপী বেদমাতা গায়িত্রীর বরণীয় তেজের বিশ্বব্যাপকতার উপলব্ধিতে পৌঁছাইয়া দেয় সেই প্রেমের কল্পনা অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে স্ফুট হয় নাই এ তথ্য স্বীকার করিলেও এই বৈষ্ণব সাহিত্যকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা হয় না। এই মধুর রসতত্ত্ব ও সাধন অর্বাচীন অনভিজ্ঞ ও অনধিকারীর হাতে দুর্বোধ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া ভালোর চেয়ে মন্দই করিয়াছে, এর অভিজ্ঞতা কামরূপেই সহজসাধনের মধ্যেই ছিল। সহজিয়াবাদই কালে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক দুই মতে বিভক্ত হইয়া যায়। শক্তিবাদীর উপাস্য হইলেন শিব ও পার্বতী, ভৈরব ও ভৈরবী—সেখানেও পন্থা হইল পশ্বাচার

বীরাচারের মধ্য দিয়া দিব্যাচারে পেঁাছনো—কামময় জীবনের পরিসমাপ্তি আপ্তকাম, পূর্ণকাম হইয়া। বৈষ্ণববাদীর কাছেও তাহা মূর্ত হইল রাধাকৃষ্ণরূপে। পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্তী জয়দেবই এই বৈষ্ণবসাধনার নূতন উদ্গাতা। ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরের মধ্য দিয়াই—দেহের প্রত্যেক অনুভূতিই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীতকে পাইবার জন্য কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা।

মনে হয় মহাপুরুষদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এই সত্যকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বরং তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে পরকীয়া ভাবের মধ্য দিয়া যে রসসাধনা, জনসাধারণকে তাহার উপযুক্ত হইতে হইলে প্রেম, ত্যাগ ও তপস্যার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের পক্ষে অতিমানুষী ভাব প্রায় অসম্ভব। লরার প্রতি পেট্রার্ক, বিয়াট্রিচের প্রতি ডান্টে বা ভিটোরিয়া কলোনার প্রতি মাইকেল এঞ্জেলোর প্রেমকে আমরা platonic বা অহেতুকী বলি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের প্রেম শুধু অহেতুকী নয়, দেহবর্জিতও নয়—সম্পূর্ণভাবে কারণপূর্ণ—তাই অসমীয়া বৈষ্ণব কবিরা সাধনার অন্য পন্থা ধরিলেন—কৃষ্ণের কিঙ্কর তাঁরা।

অবশ্য গোপীভাব তাঁহাদের সাহিত্যে নাই, একথা বলিলে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেখানে অতিমানবীয় দার্শনিক আরোপ নাই। উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন গোবিন্দের বার্তা কি, তিনি কুশলে আছেন কিনা জানিবার জন্য গোপিনীরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যোগমায়া উপাশ্রিত হইয়া শারদোৎফুল্ল রজনীতে কেলিগোপাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন। 'রেমে রমেশঃ' এই মানবীয় ভাবই প্রত্যেক গোপী স্মরণ করিতে লাগিলেন সজলচক্ষে।—

> কেহো গোপী বলে কহো বান্ধব উদ্ধব
> ব্রজক আসিব আর প্রাণর বান্ধব

আর একজন বলেন—

> অনেক রাজার কন্যা বিহাইল মাধব
> এখন আর আমাত কোন কাজ

আবার অন্যজনের স্মৃতি উথলিয়া উঠিল, এইখানেই রাসকেলি করিয়াছিলেন—

> আমার কণ্ঠত কৃষ্ণ ধরি বাহুমেলি

সাধারণ প্রেমিক নরনারীর সাধারণ সম্পর্ককে মানুষী করিয়া কবি চোখের সামনে ধরিয়াছেন। দোষ-ত্রুটি নীতিজ্ঞান সব লোপ পাইয়াছে একটি গুণে—তাঁদের প্রীতিবিমুগ্ধতায়—

> ভকতর বশ্য হরি জানিবা নিশ্চয়

এবং

> তাঙ্ক লাগি তুমি যি যত আকুল
> তোমাসাক লাগে কৃষ্ণ তেনয় ব্যাকুল

গোপীভাব যে তাঁরা জানিতেন না তাহা নয়—কিন্তু ব্রহ্মার দুর্লভ ভাব—লক্ষ্মীদেবীও নারায়ণের বক্ষে থাকিয়াও যে রস পান না সে রসের সাধনা সাধারণের জন্য নয়

এই তথ্যও তাঁহারা জানিতেন। সেই জন্যই শ্রীরাধার বিশেষ আবির্ভাব তাঁহাদের সাহিত্যে নাই। অবশ্য মাধবদেবের গীতকবিতায়, রামসরস্বতীর গীতগোবিন্দে ও কলাপচন্দ্রের রাধাবিজয়ে শ্রীরাধার একটি পূর্ণচিত্র অসমীয়া সাহিত্যে আছে, একথা সাহিত্যিকরা বলেন। অসমীয়া সাহিত্যের রাধার মধ্যে শিশুসুলভ দুষ্টামিই আছে, আদিরসাত্মক তীব্রতা নাই। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে চোর অপবাদ দিতেছেন, ভর্ৎসনা করিতেছেন, আবার আলাপ করিতেছেন এই পর্যন্ত। যদিও উদ্ভব গিয়া দেখিলেন যে অস্থিচর্মসার হইয়া 'রাধিকা গোসানী কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন'।

৫. বুরঞ্জী সাহিত্য

পূর্বপুরুষের প্রণাম আমাদের সংস্কৃতির একটা পুণ্য অঙ্গ। কিন্তু আমাদের দুর্নাম যে ভারতবর্ষে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় না। পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধা তর্পণ করি, বলি 'তৃপ্যন্তু', কিন্তু তাঁহাদের শৌর্য বীর্য, ক্ষয় ক্ষতি, কথা ও কাহিনীর খবর রাখিনা। এ দুর্নাম সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিতে পারে। আসামে বুরঞ্জীকার অতি কৃতিত্ব, শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বুরঞ্জীগুলি বহু প্রাচীন নয়, ও তাহাদের ঐতিহাসিকতাকে নানাভাবে কষ্টিপাথরে বিচার করিতে হয়, ইহাও সত্য; তবে কয়েকটি বুরঞ্জীতে সাহিত্যিক সম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুরঞ্জীর মধ্য দিয়া অসমীয়া গদ্যও সম্পূর্ণ রূপ পাইয়াছে। ডাঃ গ্রিয়ারসন্ লিখিতেছেন—

The Assamese are justly proud of their national literature. In no department have they been more successful than in a branch of study in which India as a rule is curiously deficient. The historical works of Buranjis are numerous and voluminous.

আসামে বুরঞ্জীগুলি প্রধানতঃ কৌলিবিবরণী হিসাবে অহমরাজগণ ও তাঁহাদের পাত্রমিত্র অমাত্যদের কাহিনী। ঐতিহাসিকেরা এই কাহিনীগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সাময়িক ঘটনাপুঞ্জের এক আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্যিক ও রসবেত্তার বিচারেও এই বুরঞ্জীগুলি মূল্যবান। এই প্রসঙ্গে আসাম গভর্নমেন্টের Department of History ও Antiquarian Studies বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার ভূঞার দান সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বুরঞ্জী সাহিত্যের কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই মনীষী প্রায় একক আসাম বুরঞ্জী-সাহিত্যের সংগ্রহ সম্পাদনা ও আলোচনা করিয়া শুধু আসাম নয় সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষ্টিবিচারের এক নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় অনেকেই জানেন না। তিনি শুধু ঐতিহাসিক নন, কবি, গল্প-লেখক, প্রবন্ধকার এবং শুধু অসমীয়া নয়, ইংরেজী ও বাংলাতেও লিখিয়া থাকেন। তাঁহার বড়ফুকনর গীত (বদনচন্দ্র বড়ফুকন্, যিনি ব্রহ্মবাসীদের আসামে লইয়া আসেন), তাঁহার আসাম জীয়রী (রানী জয়মতী ও অন্য নারীদের পুণ্যকাহিনী), পঞ্চমী, আমিনা, উষা, বিজুলী, শিলা না হই ফুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রসসৃষ্টি।

তাঁহার কবিতাপুস্তক নির্মালি (নির্মাল্য) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-দ্বারা 'অসমীয়া ভাষার মধ্যে আধুনিক কালের বাধামুক্ত গীতোচ্ছ্বাসের প্রবাহ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

মোটামুটি অসমীয়া বুরঞ্জীদের পরিচয় এইরূপ—

১. আসাম বুরঞ্জী—কাশীনাথ তামুলী ফুকন ও রাধানাথ বরবরুয়া ও হরকান্ত বরুয়া কর্তৃক ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বর্গদেব অহমরাজদের কাহিনী লিপিবন্ধ আছে।
২. কামরূপ বুরঞ্জী—অসম মুঘল যুদ্ধের এক প্রাচীন কাহিনী।
৩. তুংগখুংগিয়া বুরঞ্জী—১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত তুংগখুলিয়া অহম রাজাদের কাহিনী।
৪. দেওধাই অসম বুরঞ্জী—প্রাচীনকাল হইতে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ রাজা জয়ধ্বজ সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিবরণী। ইহাতে রাজাদের বিবাহ, জ্যোতিষতত্ত্ব, দৈবজ্ঞদেব ক্রিয়াকলাপ, অন্য রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক, আতা বুঢ়াগোঁহাইয়ের ইতিহাস লিপিবন্ধ আছে।
৫. আসামের পদাবুরঞ্জী—দুতিরাম হাজারিকা ও বিশ্বেশ্বর বিদ্যাধিপ কর্তৃক ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পদ্যে ইতিহাস।
৬. কাচারী বুরঞ্জী—প্রাচীন কাচারের ইতিহাস অবলম্বনে প্রাচীনকাল হইতে কাচারী রাজা তাম্রধ্বজনারায়ণ ও অসমীয়া নৃপতি স্বর্গদেব রুদ্র সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত একটি প্রাচীন কাহিনী।
৭. জয়ন্তিয়া বুরঞ্জী—প্রাচীন জয়ন্তিয়ার ইতিহাস অবলম্বনে প্রাচীনকাল হইতে জয়ন্তিয়ারাজ রাজা লক্ষ্মীসিংহ ও অসমীয়া নৃপতি স্বর্গদেব শিবসিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক কাহিনী।
৮. ত্রিপুরা বুরঞ্জী—রত্নকন্দলী ও অর্জুন বৈরাগী নামক ত্রিপুরা রাজসভায় রাজা রুদ্রসিংহের দুই দূতের দ্বারা লিখিত ত্রিপুরারাজ্যের সমসাময়িক ঘটনার কাহিনী।
৯. অসম বুরঞ্জী—গৌহাটির সুকুমার মহান্তির নিকটে প্রাপ্ত 'অসম বুরঞ্জী' অহমরাজ্যের একটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস। ডাঃ ভূঞার মতে লাচিত বড়ফুকনের দৈবজ্ঞপ্রধান সমুদ্রচূড়ামণিই ইহার রচয়িতা। ডাঃ ভূঞা বলেন "The book is a historical classic and a literary masterpiece of the first order, parallel to which very few vernacular literatures of India possess".
১০. পাদশাহ বুরঞ্জী—সপ্তদশ শতাব্দীর একটি অসমীয়া বুরঞ্জী। ইহাতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ ও পিথোর রাজা হইতে মুঘলবংশের সুলতান আজম তারা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসংগক্রমে বলা যায় যে, 'বহরীস্তানই ঘয়বী' বা গৌহাটির মুঘল ফৌজদার মীর্জানথান, মুঘলদের বংগ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা বিজয়ের পারসিক ভাষায় লিখিত পুস্তকে এই সময়ের বংগ ও আসামের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

ডাঃ ভূঞার মতে এইসব গ্রন্থ ছাড়াও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত বহু বুরঞ্জী পাওয়া যায়—যাহার সাহিত্যিক মূল্য ও ঐতিহাসিক তথ্য দুইই আছে। যেমন

ভবানীপুর গোপালদেব বিরচিত নরনারায়ণ চিলারায়ের অসম আক্রমণের কাহিনী, ভদ্র চারুদাস প্রণীত গদাধর সিংহের বৈষ্ণবনির্যাতন, রুদ্রসিংহের মোহন্তদের পৃষ্ঠপোষকতা, মোয়ামরীয়া বিদ্রোহের কাহিনী হিসাবে 'ধর্মোদয়' নামে নাটক, সতী জয়মতীর গীত, রাধারুক্মিণীর গীত, মনিরাম দেওয়ানের গীত। তাহা ছাড়া 'দরংরাজবংশাবলী'তে কোচ রাজাদের আদিকথা ও দরং রাজাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। দরংরাজবংশাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড সূর্যদেবদ্বিজ কর্তৃক রাজা গৌরীসিংহের সমসাময়িক দরংরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র গন্ধর্বনারায়ণের আদেশে রচিত হইয়াছিল।

প্রত্যেক বুরঞ্জী ও তাহাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ এখানে সম্ভব নয়। দু'একটি বুরঞ্জীর সামান্য আলোচনা করা যাক। অসম বুরঞ্জীর প্রথমেই প্রথম অধ্যায়ে অহম স্বর্গদেবেদের উৎপত্তির কথা লিখিত আছে। কিম্বদন্তী যে, বশিষ্ঠের অভিশাপে শ্যামাবিদ্যাধরীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে প্রথম স্বর্গনারায়ণ-দেবের উৎপত্তি। অন্য এক বুরঞ্জীতে দেখি ইন্দ্র বলিতেছেন—

"আমি সকলো দেবতার মধ্যে রাজা তথাপি আমার সন্তানর পৃথিবীত রাজত্ব নাই। অতএব মোর সন্তানকো প্রিথিবত রজা হবলৈ পঠাও। এই বলি লাউখে অর্থাৎ বিশ্বকর্মাক আজ্ঞা দিলে। পাচে বিশ্বকর্মাই চোমদেও নামে ইন্দ্রর মনোগত-রূপে জন্ত্র তৈয়ার করি দিলে..খুনলুংগ খুনলাই দুইকে পঠাবলৈ জনালত ইন্দ্রে স্বিকার করি এই আজ্ঞা করিলে বোলে খুনলুংগ তুই বর, রজা হবি, খুনলাই সরু তোর লাগত জুবরাজ রূপে থাকিব।"

অন্য একটি কিম্বদন্তী এইরূপ (ইন্দ্রবংশীয় রাজার বিবরণ, আসাম বুরঞ্জী)—

"শোণিতপুর বা ইদানীক তেজপুর জিলার অন্তর্গত ভৈরবী নদীর পরা দিক্করবাসিনী অথচ উজান সদিয়া কেচাইখাতী পর্যন্ত সোমার পীঠ বোলে..এক সময় শচি ও ইন্দ্র উভয়েই কামোন্মত্ত হৈ আনন্দে ক্রীড়া করি ফুরিছিল। সেই পর্বতর গুহাতে বশিষ্ঠ মুনি থাকে। তারে পরা স্নান করিবলৈ যাঁওতে তেওঁর পুষ্পবাটিকাতে ক্রীড়া করা দেখি কুপিত হৈ ইন্দ্রদেবতাক অন্ত্যজ ও অন্ত্যজস্ত্রীত পতিত হওক্ বুলি শাপ দি.."

কথাসাহিত্য হিসাবে ও ভাষার মিশ্রণ ও বিকাশের পদ্ধতি হিসাবে এই বুরঞ্জী-গুলি মূল্যবান।

প্রায় ছয় শত বৎসর ধরিয়া অহমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ও তন্নিকটবর্তী রাজ্য-উপরাজ্যগুলিতে আধিপত্য করিয়াছিল। প্রাচীন কামরূপীয় ভাষার উপর তাহাদের আনীত মনখমের টাই ভাষার কিছুটা প্রলেপ পড়িয়াছিল। কিন্তু বিজেতারাই ক্রমশঃ বিজিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব বিষয়ে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া নিজেদের নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অহমরাজ স্বর্গদেব প্রতাপ সিংহের (১৬০৩-১৬৪১ খৃষ্টাব্দ) সময় অহম মুঘল সংঘর্ষ বাধে। মীরজুমলা অহমদের পরাজিত করিয়া সন্ধিপত্র করেন। সেই দলিলটির যে রূপ অসম বুরঞ্জীতে পাওয়া যায় সেটি হিন্দুস্থানী অসমীয়া সংস্কৃত, ফারসির এক সংকর ভাষা। 'লিখিতং শ্রীরাজা জয়ধ্বজ সিংহ রাজা আচাম সুলতান সুজাকে খলমকে উক্ত' ইত্যাদি। এই বুরঞ্জীতে কয়েকটি কূটনৈতিক পত্রের সারমর্মও উদ্ধৃত আছে। সেইগুলির সাহিত্যিক মূল্য কম নয়—যেমন কোচ নৃপতি প্রাণনারায়ণ লিখিলেন—আপনিও রাজ্য হারাইয়াছেন, আমিও তদ্রূপ আমরা দুইজনেই রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছি। রামচন্দ্র, সুরথ, যুধিষ্ঠিরও একদিন রাজ্য হারাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের

মহাগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই—আমাদের দুই রাজ্যের মধ্যে যেন বন্ধুত্বের সূত্র ছিন্ন না হয়। অহম রাজও তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন—বন্ধু, সূর্য একবার অস্ত গেলেও পুনরায় প্রাতে উদিত হয়, আমি পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতেছি, আপনিও করুন।

সন্ধির শর্তানুযায়ী আওরঙ্গজেব প্রদত্ত 'খেলাত' যখন দিল্লীশ্বরের দূতেরা মহারাজ চক্রধর সিংহকে উপহার দিয়া দরবারে পরিবার জন্য অনুরোধ করেন তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলেন—স্বাধীনতার চেয়ে এক প্রস্থ কাপড়ই কি বেশী মূল্যবান—এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

দ্যুতিরাম হাজারিকা বিরচিত 'কলিভারত বুরঞ্জী' ও বিশ্বেশ্বর বৈদ্যাধিপ বিরচিত 'বেলিমারব বুরঞ্জী' এই দুইটি পুস্তক 'অসমর পদ্য বুরঞ্জী' নামে সম্পাদিত হইয়াছে।

"প্রাচীন অসমীয়া পদপুঁথি কীর্তন, বারস্কন্ধ ভাগবত, রামায়ণ মহাভারত আদি বৈষ্ণব সাহিত্যত যি ভাষা ব্যবহার করা হৈছিল এই বুরঞ্জীতো সেই ভাষা ব্যবহার করা হৈচে।

পূর্বে রণ ভৈল যেন বলী বাসবর
বিষয় অনিত্য জানি ভজিয়োক চক্রপাণি
ঘুচিবে সংসার দুঃখ ভয়।"

চন্দ্রকান্তর জগন্নাথমূর্তি দর্শন সম্পর্কে কবির বর্ণনা যে কোনো প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির সমতুল্য—

মেঘসম শ্যাম তনু গায়ে পীতবাস
সজ্জল মেঘত যেন বিদ্যুৎ প্রকাশ।

পাদশাহ বুরঞ্জী একটি বিশিষ্ট ধরনের বুরঞ্জী। মুসলমান রাজত্বের প্রথম হইতে মুঘলবংশের আওরঙ্গজেব, আজমতারা পর্যন্ত অসমীয়ার দৃষ্টিতে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত এক কাহিনী। পিথোর রাজা, তৈমুর, হুমায়ন, শের শা, জাহাংগীর, মানসিংহ, শাহজাহান, মমতাজমহল, মীর্জারাজা জয়সিংহ, দারাশিকো, সুলতান সুজা, শায়েস্তাখাঁন, শিবাজী, গুরু তেগবাহাদুর, রামসিংহ, মীরজুমলা, আজমতারা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নানা কাহিনী অতি সুন্দর ভাবে ও ভাষায় বর্ণিত হইয়া ইহাকে কথাসাহিত্যে পরিণত করিয়াছে।

ত্রিপুরা বুরঞ্জীও এইরূপ একটি বিশিষ্ট ধরনের বুরঞ্জী। 'এই বুরঞ্জীর ভাষা সহজ, গতিময় ও উচ্চাঙ্গের। কাহিনীগুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত, প্রত্যেক কাহিনীর পূর্বে কয়েকটি বাক্যে এমন করিয়া ভূমিকা জুড়িয়া দেওয়া আছে যে, আখ্যায়িকাকে অনুসরণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। আসামের বাহিরে বহু দেশের পণ্যদ্রব্য ও আচার-বিচারের বর্ণনা করিতে গিয়া লেখকদ্বয় (কটকী রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী—মহারাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের ত্রিপুরারাজ্যে দূতদ্বয়) অনেক বৈদেশিক কথা ব্যবহার করিয়াছেন যাহা ভবিষ্যৎ ভাষাতত্ত্ববিদের পক্ষে শিক্ষণীয় ও বিচারের বস্তু হইবে। মোটের উপর সমস্ত ত্রিপুরা বুরঞ্জী তৎকালীন অসমীয়া গদ্য ও ঐতিহাসিক সাহিত্যের নমুনাহিসাবে সাধারণ বুরঞ্জীর উপরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।'

এই বুরঞ্জীতে তৎকালীন ত্রিপুরার ও বাংলা সমাজের একটি অতি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়, যেমন 'ত্রিপুরা কটকীর রংপুরত দুর্গোৎসব দর্শন' 'ত্রিপুরাত মদনপূজার আড়ম্বর', ত্রিপুরা রাজার পূর্বপুরুষের কথা। এই বুরঞ্জীতে সংস্কৃত-বহুল দীর্ঘলিপিগুলি স্থান পাইয়া পত্রসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই সংস্কৃত লিপিগুলির সমাসের গতি থামিতে চাহেনা, বিশেষণের পর বিশেষণ বসিয়া আপ্যায়নের চূড়ান্ত হইতে থাকে। সমাসবিন্যাসের প্রবল ধারায় ইহা কাদম্বরীকেও হার মানাইয়াছে। যেমন—

"স্বস্তি শ্রীমদ্ভবানী-পদ-পঙ্কজ-ধূলিপটল-রঞ্জিত-মনোমত্ত-মধুব্রতানবরত বিস্রাবণ দূরীকৃতি দুর্গত দারিদ্র, করকলিত-নিস্ত্রিংশধারা-জর্জরীকৃতাশেষ-রিপুকুল নয়-বিনয়-নৈপুণ্য-বশীকৃতাশেষ-দ্বিজ-সজ্জন, কর্পূর-পান্ডুর যশঃপুর-পরিপূরিত-সমস্তাশামণ্ডল, বিবিধগুণসম্পন্ন-জন-মণ্ডিত-নিজাবাসস্থল, সকল শাস্ত্রবিশারদ-বুধমণ্ডলী-পরিমণ্ডিত গোষ্ঠিকেষু শ্রী শ্রীযুত রুদ্রসিংহ-মহারাজাধিরাজ-মহামহোগ্র-প্রতাপেষু। প্রবৃত্তি-নিবেদয়িত্রী পত্রীয়মুজ্জৃম্ভতে।"

৬. বর্তমান যুগ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসময় হইতে অসমীয়া সাহিত্যের বর্তমান যুগের সূচনা বলা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু বর্তমান সাহিত্যের ধারা ও প্রগতির রূপ মহাকালের ইতিহাসে ভবিষ্যতের কি ইঙ্গিত বহন করিতেছে সেইটুকুই বক্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কয়েকটি প্রসিদ্ধ লেখকের সামান্য সাহিত্যিক পরিচয়ও দিতেছি।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে অসমীয়া ভাষা বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার কয়েকটি প্রধান কারণ হইতেছে—

১. বাংলা ভাষা ও অসমীয়া ভাষা আপাতঃদৃষ্টিতে সমধর্মী ও এক গোত্রজ। তাহাদের মধ্যে বিচারান্তে বিভেদ পণ্ডিতদের দৃষ্ট হইলেও সামাজিক সাধারণ মানুষের কাছে তাহা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।
২. বাংলা ও অসমীয়ার দুই-এর এক কুটিলা লিপি (script) ব্যবহার।
৩. মহাপুরুষ শঙ্করদেবের যুগে বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন হিসাবে মগধগৌড়কামরূপে এক ব্রজবুলি ব্যবহার তাহাদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র গ্রথিত করিয়াছিল।
৪. অসমীয়া ভাষা কামরূপীয় ভাষার (অর্ধমাগধীর অপভ্রংশ) সহিত যুক্ত হওয়ায় ও প্রধানতঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিবদ্ধ থাকায় অন্য উপজাতিদের মধ্যে তাহার প্রসার হয় নাই।
৫. বহু প্রাচীন যুগ হইতেই গৌড় মগধ মিথিলা হইতে দলে দলে আর্যভাষা-ভাষী লোকেরা কামরূপে প্রবেশ করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমেও সেই ধারার পুনরাবৃত্তি দেখি বিশেষ করিয়া বাঙালীদের মধ্যে। তাহারও পূর্বে অহমরাজ রুদ্রসিংহ, রানী ফুলেশ্বরী, রাজা শিবসিংহ প্রভৃতির

রাজত্বকালে পদ্মনাভ শর্মা (মুকুলমোরিয়া গোস্বামী) কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য আগমবাগীশ (পর্বতীয়া গোস্বামী) প্রভৃতি বাঙালীগণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আসামে লইয়া আসিয়াছিলেন।

৬. ইহা ব্যতিরেকে তখনকার দিনে কলিকাতাই ছিল সমস্ত পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনভূমি এবং বাঙালী মনীষীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

৭. ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে আসাম বাঙলার সহিত যুক্ত ও বাঙালীরাই রাজকার্যে নিযুক্ত।

ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভের চারি বৎসরের মধ্যেই দেখি হোলিরাম ঢেকিয়ল ফুকন বাংলা ভাষায় আসামের ইতিহাস লিখিতেছেন। ১৮৩০ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত এশিয়াটিক জার্নাল মে-আগস্টে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বুরঞ্জী সম্বন্ধে শ্রীতারাচাঁদ চক্রবর্তীর (ইণ্ডিয়া গেজেটের) এক সুদীর্ঘ সমালোচনা দেখি। এই প্রথম যুগে আনন্দরাম ঢেকিয়ল ফুকন, কাশীনাথ তামুলী ফুকন ও রাধানাথ বরবরুয়া বিশিষ্ট লেখক। মণিরাম দেওয়ানের বিদ্রোহ ও তাঁহার লিখিত বুরঞ্জী বিবেকরত্ন ইহাতে ইন্ধন জোগাইয়াছিল এবং ব্রাউন ও ব্র্যানসন প্রভৃতি ব্যাপটিস্ট মিশনরীদের আপ্রাণ চেষ্টা অসমীয়া ভাষাকে নিজবাসভূমে পরবাসী না করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে সুযোগ দিয়াছিল। এই বুরঞ্জী বিবেকরত্ন অসমীয়া ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে লিখিত ও পুরাতত্ত্ব বিভাগে রক্ষিত।

আধুনিক অসমীযা সাহিত্যের প্রধান দিগ্‌দর্শন ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অরুণোদয় প্রকাশ। এই বৎসরে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের জন্ম বলা যাইতে পারে এবং এর বিকাশের ইতিহাস তাহার পরের একশত বৎসরের ইতিহাস। তাহার পর আসাম-বিলাসিনী, আসাম-মিহির, আসাম-দর্পণ, আসাম-দীপক, আসাম-নিউচ, জোনাকী, আবাহন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় কবিতা গল্প প্রবন্ধের প্রাচুর্য অসমীয়া সাহিত্যকে তাহার অদ্যকার স্থানে লইয়া আসিয়াছে। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া ও হেমচন্দ্র বরুয়া বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বল্পায়ু ঢেকিয়াল ফুকনের নিবন্ধাবলী, হেমচন্দ্রের 'হেমকোষ' অভিধান ও অসমীয়া ব্যাকরণ ও গুণাভিরামের সন্দর্ভনিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্যকে নব-জীবন দান করিয়াছিল। অভিমন্যুবধ-কাব্য প্রণেতা রমাকান্ত চৌধুরী, পদ্যবুরঞ্জী লেখক দ্যুতিরাম, ভোলানাথ দাস, লম্বোদর বরা, রত্নেশ্বর মহান্ত, সত্যনাথ বরা, সাহিত্য-সম্রাট লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, চন্দ্রকুমার ও আনন্দ আগরওয়ালা, রজনীকান্ত বরদলৈ, হেমচন্দ্র গোস্বামী, বেণুধর রাজখোওয়া, পদ্মনাথ বরুয়া, হলিরাম মহন্ত, পূর্ণকান্ত দেবশর্মা, দুর্গাপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

অরুণোদয়ই অসমীয়া ভাষায় প্রথম পত্রিকা ও সমালোচনী। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস পুরাতনী কথা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দানকে অসমীয়াদের গোচর করাইবার জনাই এই পত্রিকা মিশনরীদের দান। এই পত্রিকা সর্বশ্রেণীর মনে এমন আলোড়ন জাগাইয়াছিল যে ধনী নির্ধন অভিজাত ও সাধারণ সকলেই আগ্রহের সহিত এই পত্রিকা পাঠ করিত। এমন কি অজ্ঞ জনসাধারণ সব পত্রিকারই নামকরণ করিয়াছিল 'অরুণোদয়'।

এই যুগের সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ না করিলেও দু'একটি নিদর্শনে ইহার পুরোগামিনী গতি ও চিন্তার ধারা, আঙ্গিকের পরিবর্তন ও রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য, কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

ভোলানাথ দাসের 'সীতাহরণ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবিকুলমণি'কে অনুসরণ করিয়াছে—

সে হি রামায়ণ গীত
গাইবে বাঞ্ছিছো আমি মূঢ় অকিঞ্চন
অমিত্র অক্ষর ছন্দে হে মাতঃ বাগদেবি
যে ছন্দে গাইলা—বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে—অতি প্রিয় পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবিকুলমণি।

এই কবি অত্যন্ত স্বদেশপ্রাণ ছিলেন। বঙ্গকবি হেমচন্দ্রের মত

আসাম কেবল আজিও নিদ্রিত
আসাম কেবল আজিও ঘৃণিত

হে আসামবাসি

বোপা ককা মরি গল এইমতে
এনে কথা আরু নানিবা মুখতে..
নাই বিদ্যাগুণ শিল্পে অনিপুণ
নামমাত্র কৃষি বাণিজ্য নাই
নাই উদারতা নাই সহিষ্ণুতা
নাহিক মমতা পরোপকারিতা..
আছে অহিফেন চির দরিদ্রতা
ছি ছি অসমীয়া, উঠা উঠা উঠা
চির নিদ্রা এড়ি মেলা চকু দুটা।

তাঁর 'মধুহাসি' নামক কবিতা শিশুকাকলীর মাধুর্যে ভরা, মেঘকে বলিতেছেন—'অমৃতেরে দেহ ধুই'।

কবি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার কবিতায়ও এই স্বদেশপ্রীতির ঝঙ্কার বেদনায় মূর্ত হইয়াছে। তিনিও বলিতেছেন—

কি আছে তোমার অসমীয়া ভাই
ধন মান জ্ঞান পেলালা কত
কি দি পূজিবা জগতীচরণ
নিচিন্তা উপায় শ্রী হল হত।

তাঁর 'তেজিমলা' কাব্যে সেই চিরন্তন সত্য ব্যক্ত হইয়াছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—জয় হোক মানুষের :

মানুহর নাও মানুহর ভাও

তাঁহার 'জলকুঁবরী' কাব্য রোমাণ্টিক নিসর্গ বর্ণনা। আবার—

গলত হীরক খোপাত মাণিক হাঁহিত মুকুতাপান্তি
নীলোৎপল হাতে, চরণর পাশে শঙ্কর ধরল কান্তি

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের পদে পদে স্মরণ করাইয়া দেয়।

আবার 'সপোন' কবিতাতে কানে কানে কথা কওয়া বিরহবেদনার বাণীটি কাব্যে মূর্তি লইয়াছে, কুমারী মনের একটি স্নিগ্ধ ছবিতে রসে ভরপুর—

আছিলো একদিন ধেমালি মগন
কুমলীয়া বয়সত
নাচি নাচি উরি পখিলাটি আহি
কলোহি মোর কাণত—

যেন 'বসন্তরাগেন যতিতালাভ্যাং' একটি যৌবনস্পন্দনের ছবি।

আর একজন সাহিত্যিক আগরওয়ালা ছিলেন। তাঁর ব্রহ্মযাত্রীর ডায়েরী, Mrs. Hemans এর Better Land নামে কবিতার ভাঙনি, সুখর ঠাই, দেবকন্যা মানবী বেশেরে, জীবনসঙ্গীত প্রভৃতি কবিতা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের মত এই যুগেও নাটকের আদর ছিল। বিষয়বস্তু কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী। লম্বোদর বরার শকুন্তলা ও দুর্গাপ্রসাদ দত্তের বৃষকেতু এই দুইটি নাটক সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে বলা যায়। রাজদর্শনে শকুন্তলার মনের তপোবন-বিরোধী ভাবের আভাস 'বনজ্যোৎস্নাই নতুন ফুলরূপ যৌবন পাইছে' এবং শকুন্তলার বর্ণনা 'তলওঠিটি লতার কুঁড়ি পাতর দরে রঙ্গা (ওষ্ঠরঞ্জনী)', হাত দুটি কোমল শখা তুল্য, আরু সর্বাঙ্গত ফুলর নিচিনা মনোহর যৌবন বিকশিত—মাটির ভিতর পরা চিকমিকীয়া বিজুলী ওলায় নে'—কবির রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়; কিন্তু দুষ্মন্তের প্রায় নিক্ষিপ্ত শর 'নেমারির নেমারিব' সত্ত্বেও আশ্রমকন্যার বুকে মীনকেতনের শরেই পর্যবসিত হইল—মহাকবি কালিদাসের এই যে অপূর্ব ভঙ্গী ও নাটকীয় গতি তাহা এই নাটকে পাইনা সত্য কিন্তু মোটের উপর কবির নাট্যজ্ঞান ক্ষীণ নয়। বৃষকেতুও পৌরাণিক নাটক। কিন্তু বৃষকেতুকে নাট্যকার শুধু কথার আতিশয্যে পূর্ণ জ্ঞানী করিয়া তুলিয়া ও কিসের জন্য, দেহ ক্ষণস্থায়ী মাংসপিণ্ড, মরিলে ছাই হইবে না হয় পিপীলিকায় খাইবে ও ব্রহ্মশাপে কার কি হইয়াছিল তাহার সুদীর্ঘ তালিকা দিয়া নাটকীয় রসবোধ ব্যাহত করিয়াছেন। কর্ণ শুধু ভাবিতেছেন—'আহা মোর বোপাই কেনে জ্ঞানবান।'

আবার রসসাহিত্য ও প্রবন্ধগৌরবে 'সদানন্দর কলাঘুমটি', 'সদানন্দর নতুন অভিধান', শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'কৃপাবর বরুবার কাকতর টোপোলো—পুরণি-তত্ত্ব', 'অসমীয়া জাতি ডাঙগর জাতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

সদানন্দ বলিতেছেন—'হে বিলাতী সরস্বতী আই, তুমি মোক favour (অনুগ্রহ) করা'। বিলাতী দেবীসরস্বতীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি যদি ড্যাম নিগার নেটিভ বলিয়া তেড়ে উঠেন তাহা হইলে জ্বরে পড়িবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধকার রসিক, তিনি চিঠির শেষে সাক্ষর করিতেছেন—

Now good bye
ময় পাঁও ঐ সম্ভ্রম হবলৈ
মহাশয়
আপোনর অধিকতম বাধ্য চাকর
স্যাডানন্দ

সদানন্দের নতুন অভিধানেও বিদ্রূপের কশাঘাত—

বাবু মানে হইতেছে বাব+উ যার বাব আছে। যার মুখত সদাই ইংরাজী কথা, ককালত অতি পাতলা মলমলর ধুতি, মুখত মধু, পেটত বিহ। ভণ্ডামী, শপথ ডাঙ্গর প্রতিজ্ঞা, মিছাকথা আরু রসিকালি। স্বাধীন ব্যবসার এড়া, আপোন জাতিক ঘিনোবা, যার আকাংখা চাকরী আরু উপাধিলাভ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অসমীয়া সাহিত্যের এই যুগের মুকুটমণি হইতেছেন শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। তিনি একাধারে কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, রসসাহিত্যিক, স্বদেশহিতপ্রাণ। তাহার উপর তিনি নূতন করিয়া শঙ্করী কৃষ্টি ও শঙ্করদেব-মাধবদেবকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে অসমীয়াদের মনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ডিকেন্সের পিকউইক পেপারের অনুকরণ করেন 'কৃপাবর বরুয়ার ওভতনি'তে। আবার দেখি জৈমিনি ধর্মপক্ষীকে প্রশ্ন করিতেছেন, চুলি দাঁড়ি আর গোঁফের উৎপত্তি কিরূপ। কোকিল মৎসস্য লক্ষণং বিদ্যতে অত্র ইতি দাড়ি। চলতি বায়ুভরণে ইতি চুলি। গো কলত্যত্রঃ গোফঃ ইতি দুগ্ধবোধঃ। লেখক প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণায় বোস্টন্ শহরে অষ্টম বক্তৃতায় দাড়ি নিবারণী সভার স্থাপনায় 'তে'ও বিলাকর ভিতরত যার দড়ীয়া গিরিয়েক আছে, তে'ও তে'ওর স্বামীক হয় নিদড়ীয়া করিব না হয় তে'ওক পরিত্যাগ করিব'।

তাঁহার 'অসমীয়া জাতি ডাঙ্গর জাতি' আর একটি রস রচনা। কবি সখেদে বলিতেছেন--

"আমার নাই কি? উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয় সাগরের দল আছে, শিবসাগরের দল আছে, ব্রহ্মপুত্র আছে, দীখো আছে, অসমীয়া শেক্সপিয়ের আছে, অসমীয়া শেলী আছে, অসমীয়া পপ্ অব বম আছে, অসমীয়া মার্টিন লুথার আছে। অসমীয়ার কলকারখানা বা নাই? কু'হিয়ার পেরা কলর পরা এন্দুর মরা কললৈকে, বাড়ীয়ে ধাপে অসমীয়ার কলর অন্ত নাই। বিলাতত টেমচ্ আমার দিখো, বিলাতত জাহাজ আমার খেলনাও..

> মোমাই তামুলী বরবরুয়া, নরকাসুর ভগদত্ত, নরনারায়ণ রজা..অনন্ত কান্দলী, মণিরাম দেবান, শঙ্কর দেব..
> এই এটাইবোর অসমীয়া তেন্তে 'আউর ক্যা ম্যাংতা হেয়' অসমত পকা ঘর নাই—
> সেই বারে পাহরে যে অসমত ভূ'ইকপ আছে। আকৌ কয় অসমীয়ার টকা নাই—
> অসমীয়া মানুহ মৌন মূর্খ হোবা নাই যে টকা উপার্জন করি চিন্তচর্চা বঢ়াই অনর্থর গুটি সিঁচিলব কারণ অর্থমথনর্থং ভাবয় নিত্যং।"

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে কবি এই চিত্র আঁকিয়াছেন। আবার অতি উচ্চাঙ্গের লিরিক কবি হিসাবেও সাহিত্যসম্রাট বেজবরুয়া খ্যাত। তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি—

সন্ধ্যার এক বিচিত্র ছবি কবি আমাদের চোখের সামনে ধরিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা' আমরা পড়িয়াছি। যেন তার পরের কথা কবির মনে উদয় হইতেছে—সন্ধ্যা আসিতেছে, দূরে তার নূপুরধ্বনি 'ঝিলি

নূপুরর রূপ ধরি বাজে পায় রুণু জুনু করি' 'জোনাকি পরুবা সাতসরি জ্বলিছে ডিঙিগত শারীশারী জিলিকিনি ধরয় চকুত' চক্ষুতে ঝিলিক লাগাইয়া দিতেছে— আকাশে ধ্রুবমণ্ডল সপ্তর্ষি উদয় হইতেছেন, দেবালয়ে আরতি হইতেছে, হরিধ্বনিতে মন পবিত্র, মৃদঙ্গ গোমুখ করতাল বাজিতেছে। আবার 'মরমে মরমে মরম নিগড় বান্ধনী বোলে মিছাই', 'সুগোল সুঠাম সবলি বলিত বাহু জঙ্ঘা উরু কর' রস-স্নিগ্ধতায় বৈষ্ণব কবিকেও হার মানাইয়া দেয়—

> কি কাম দীঘল মেঘ বরণীয়া সাগরর ঢৌ চুলি
> প্রেম পগলার হৃদয় তরণী বুরি পায় গই তলি
> মৃণাল দুবাহু কি কাম সাধিব মত্ত প্রণয়ীর ডোল
> মিহি মউমাত বিয়াধর বাঁহী বাখি করি মুঠভোল।

'পদ্মকুমারী' উপন্যাস হিসাবে সার্থক না হইলেও তখনকার দিনের বাংলা উপন্যাসের অনুকরণ।—

> "পাঠক সেই ছোয়ালীজনী কোন আপুনি চিনি পাইছেন? পাঠক অলপ থির হওক লাহে লাহে সকল প্রশ্নের উত্তর পাব.."

কিন্তু বেজবরুয়া গৌহাটির এমন সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন যে অন্যত্র কোথাও তেমনটি পাওয়া যায় না।

"প্রকৃতির কাম্যকানন, গগনভেদী পর্বতমালারে পরিবেষ্টিত পবিত্র সলিল ব্রহ্ম-পুত্র নদর পবিত্র জলেরে বিধৌত, অসংখ্য তীর্থস্থানের সমাকীর্ণ..যার প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম ভুবনবিদিত, যার রজা ষোল হাজার কন্যার অধিপতি পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর আরু মহাভারতর যুদ্ধর বিখ্যাত হস্তী রথারোহী মহাবীর বৃদ্ধ ভগদত্ত, যি গুবাহাটির নিলাচল পর্বতত মহামায়া ভগবতীর প্রধান পীঠস্থান কামাখ্যা বতমান,.. যি গুবাহাটির অগ্নিকোণের সন্ধ্যাচল পর্বতত ত্রিসন্ধা পরিপূত হৃদয় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম...... যি গুবাহাটির বেলতলা নামেরে স্থান ষষ্টিসহস্র শিষ্য পরিবেষ্টিত মহামুনি গাল্ববর অমৃত নিষ্যন্দিনী বেদধ্বনিরে প্রতি-ধ্বনিত হৈছিল, পূজণীয় গোকর্ণ ঋষির সামবেদ গীতত যে গুবাহাটি হাজো নামক হয়গ্রীব মাধবর পুণ্যভূমির কর্ণ আপ্লুত।"

তাঁহার "দান্ডিনাথের ফুল", "সাধনা", "চিন্তাহরণের সংসার চিত্র", "বুঢ়ি আইর সাধু", "পাচনি", "কদমকলি", ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। "তেওঁর এই হাঁহি, এই রস খলখলাই ছলছলাই বৈ আহিছে নানারূপে নানা ভঙ্গি মারে"।

'অ মোর আপোনর দেশ' জাতীয় সংগীত তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

রজনীকান্ত বরদলৈর 'মনোমতী', 'মিরিজিয়রী', 'নির্মল ভকত', 'রাধারুক্মিণীর রণ' ও 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' সমধিক প্রসিদ্ধ। মনোমতী বা ময়নামতীতে সখী প্রমীলা রসিকা, সে বলে প্রাণ নেওয়া বা দেওয়া ওসব যাক 'সখি মই পিশাচক্ বান্দরের দরে নচুরাম্'। বেণুধর রাজখোয়ার 'সেউতি কিরণ' একটি সামাজিক নাটক। পদ্মনাথ বড়ুয়ার 'ভানুমতী' গল্প হিসাবে আজিকার পরিপ্রেক্ষিতে খুব সচল না হইলেও একটা সূক্ষ্ম বেদনার ধারা ইহাকে কিছুটা রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। তাঁহার 'লীলা' নামক কবিতাটি আর একটু উঁচু স্তরের। প্রকৃতি ও পুরুষের

মিলনকে অর্ধনারীশ্বরের লীলা কল্পনা করিয়া ইহাকে কবি দার্শনিক উচ্চ তথ্যে লইয়া গিয়াছেন। এইরূপ মানবলীলা আরম্ভ হইল—

> প্রবাহিল প্রেমনদী প্রতি শিরেশিরে
> উর্তালি ভিতরি এক আবেগ হিয়ার..
> অর্ধাঙ্গ মিলনে হায় অর্ধাঙ্গিণী সতে

রবীন্দ্রনাথের 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ তরে' ও সমধর্মী অপূর্ব রসবিদগ্ধ কবিতাগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

তাঁহাদের পরবর্তী সাহিত্যিকেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনেকেই জীবিত। তাঁহারা অসমীয়া রসিকজনের রসপিপাসা মিটাইতেছেন। গল্পের আসর জুড়িয়া বসিয়া আছেন দণ্ডীনাথ কলিতা, দৈবচন্দ্র তালুকদার, বীণা বড়ুয়া, আব্দুল মালিক, ত্রৈলোক্য গোস্বামী প্রভৃতি। জাতীয়তামূলক কবিতা লিখিয়া লক্ষ্মীনাথ অমর কীর্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যুগের প্রথম শ্রেণীর অসমীয়া কবিগণের মধ্যে বিহগী কবি রঘুনাথ চৌধুরীকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। রঘুনাথ প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি। তাঁহার মধ্যে pagan abandon আছে—তাঁহার কাছে প্রকৃতি ধরা দিয়াছে নব নব রূপে নব নব উন্মেষে। 'সাদরী' 'কেতেকী', 'দহিকতরা', অনবদ্য রসের উৎস। নলিনীবালা দেবী ও ধর্মেশ্বরী দেবী দুইজন প্রখ্যাতা মহিলা কবি, দুইজনেই অতীন্দ্রিয়বাদী (mystic)। নলিনীবালার 'সপোনর সুর', 'সন্ধিয়ার সুর' ও ধর্মেশ্বরীর 'ফুলর শবাই' গ্রন্থ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যতীন দুয়ারা 'ওমর খৈয়ামে'র কবি। তাঁহার 'আপোন সুর' ও 'কথা কবিতা'ও প্রসিদ্ধ। বিনন্দ বড়ুয়া (প্রতিধ্বনি), নীলমণি ফুকন (জ্যোতিকণা), অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী (তুমি), দুর্গেশ্বর শর্মা (অঞ্জলি), রত্নকান্ত বরকাকতি (জেবালি), ডিম্বেশ্বর নিওগ (বিচিত্রা), অতুল হাজারিকা (দীপালি), দেবকান্ত বরুয়া (সাগর দেখিছা), গণেশ গগৈ (পাপরী) প্রভৃতি কবিগণ কবিতা রচনা করিয়া অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

আধুনিক যুগের অসমীয়া নাটকগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) মৌলিক রচনা ও (২) অনুবাদ। ভারতীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন ভাষা হইতে বহু নাটক অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে শকুন্তলা, কুমার-সম্ভব, ম্যাকবেথ, মার্চেণ্ট অব ভেনিস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই যুগের প্রধান নাট্যকারগণের মধ্যে আছেন হেমচন্দ্র বরুয়া (কানিয়ার কীর্তন), গুণাভিরাম (রামনবমী), পদ্মনাথ গোহাই বড়ুয়া (গাঁওবুঢ়া), নকুলচন্দ্র ভূঞা (বদন বড় ফুকন), কমলানন্দ ভট্টাচার্য (নগা কোঁয়র), অতুলচন্দ্র হাজারিকা (কুরুক্ষেত্র), প্রবীণ ফুকন (মণিরাম দেওয়ান)।

অনুবাদ সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দেবদাস, হ্যামসুনের *Growth of the Soil* মাটি আরু মানুহ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ অসমীয়া জন-সাধারণের দৃষ্টি পথে লইয়া আসিয়াছেন শিলংএর চপলা বুকস্টল। হেমচন্দ্র গোস্বামী, সর্বেশ্বর বরকটকী ও রাজমোহন নাথ, সূর্যকুমার ভূঞা, বেণুধর শর্মা, কালীরাম মেধি, বিরিঞ্চি বরুয়া, বাণীকণ্ঠ কাকতি, উপেন লেখারু, ডিম্বেশ্বর নিওগ সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্যে অসমীয়া কৃষ্টিকে

উজ্জ্বল করিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধকারগণের মধ্যে ত্রৈলোক্য গোস্বামী, উমাকান্ত শর্মা, তীর্থনাথ শর্মা, মহেশ্বর নিওগ, প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নলিনীবালা দেবীর 'স্মৃতিতীর্থ' ও কাশীনাথ বর্মণের 'নারীরত্ন' আধুনিক অসমীয়া জীবনী-সাহিত্যের দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিশু সাহিত্যে গ্রীচ দেশর সাধু, ডেভিড্ কোপারফিল্ড, মাণিকী-মধুরীর নাম করা যাইতে পারে।

রসসাহিত্যে শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বরুয়া ও শ্রীপীতাম্বররাজ মেধির নামও উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীযুক্ত কেশবনারায়ণ দত্ত ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত সামাজিক প্রবন্ধে অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

এই একশো বছরের ইতিহাসে অসমীয়া সাহিত্যে তিনটি বিশিষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। প্রথমতঃ ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া মিশনরীদের কল্যাণে ও সাহায্যে। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এক নব জাগৃতির সূচনা করে। বাঙালীরা মহাভারতের কথাই শুনাইয়াছিলেন—ভারতবর্ষের দিকে দিকে সামাজিক প্রয়োজন ও সমসাময়িক উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া। অপরের লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞা হইতে, ক্ষুধার নির্মমতা হইতে, কুশিক্ষার অন্ধকার হইতে ভারত-ইতিহাসের চিরলক্ষ্মীকে তাঁহারা বরণ করিয়াছিলেন শুধু নিজের গোষ্ঠে ও গৃহে নয়, প্রতিবেশী প্রদেশেও। ভুল ভ্রান্তি অহমিকা তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা হয়তো ছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিক এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্ঘ্য ভারতমাতার পাদপদ্মে। রাজা রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ বঙ্কিম শরৎ ভারতের অন্য প্রদেশকে সাহিত্যে দর্শনে চিন্তায় মৌলিক গবেষণায়, সামাজিক সংস্কারে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার তরঙ্গ আসামে প্রবেশ করিবে, ইহা যেমন অস্বাভাবিক নয় তেমনি অযৌক্তিকও নয়।

তৃতীয়তঃ ইংরেজি শিক্ষা ও প্রসারের সঙ্গেসঙ্গে গবেষণা-বিচার-বিতর্কের মধ্য দিয়া নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি একটা গভীর মমত্ববোধ জাগিয়া উঠিল। নূতন করিয়া বৈষ্ণব মহাপুরুষদের কথা ও কাহিনী, সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষিত মনে নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা সৃষ্টি করিল, সাহিত্যে তাহার প্রকাশ পাইল।

বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যের গতি এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গমে, এ কথা বলিলে হয় না। ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পরবর্তী বারো বছরের যুগান্তকারী ইতিহাসের আলোড়ন সমস্ত জগতের সব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিলেও মোটামুটি তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন আজও তাহা প্রযুজ্য—

"পশ্চিমীয়া লিখা আমার দেশলৈ নিজরি আহে ঘাই কৈ ইংরাজী ভাষায় জরিয়তে। কাজেই নতুন ধরণর এই লিখাই প্রতিভাবান বাঙ্গালী লিখক সকলকো উদ্বুদ্ধ করিলে। আমার দেশত প্রভাব আছে বঙলারো, ইংরাজীরো।"

অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই পশ্চিম দেশীয় লেখার সহিত আমার দেশের পরিচয়। প্রতিভাবান বাঙালী লেখকরাই এই নতুন ধরনের লেখায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনি একটি উদাহরণ দেন—গল্প নামটি লওয়া হইয়াছে বাংলা দেশ হইতে, কিন্তু সকলের সমন্বয়ে ইহার সৃষ্টি 'কিছু মান গল্পর ধরণ অবশ্যে অল্প পুরণি'। অন্য

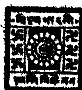
একজন সমালোচক বলিয়াছেন 'সব গল্পেরই ঘটনা যেন বাংলা দেশের—অসমীয়া বিশেষত্বের ছাপ পড়ে না'। এইরূপ সমালোচনার মূল্য নাই একথা নিরপেক্ষ সমালোচক বলিতে পারেন না। আরো আধুনিক যুগের সাহিত্যের কথা এখানে বিচার হইতেছে না। অসমীয়া সাহিত্যেও কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের ছাপ পড়িতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ন্যুট হ্যামসুন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের পুস্তকের অনুবাদও প্রকাশিত হইতেছে। মনে হয়, ভবিষ্যতে অসমীয়া সাহিত্য বাংলা, ইংরেজি ও প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব কাটাইয়া বিশ্বসাহিত্যের সহিত যোগ রাখিয়া, স্বয়ম্পূর্ণ সাহিত্যে পরিণত হইবে, আজ তাহারই প্রস্তুতি চলিতেছে।

বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা

113

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিভার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্ত ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্ত যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১১২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা

[illegible]



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১১৩
প্রকাশ ১৩৬১ চৈত্র

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা

৩'১

বাংলা লিরিক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে গোড়াতেই তুলতে হয় চর্যাপদ বা চর্যাগানের কথা। তবে সেই প্রসঙ্গে এও বলে নিতে হয় যে, চর্যাগানের বাংলা এখন আর বাংলা নেই। অর্থাৎ, এগুলোকে আধুনিক বাংলায় খানিকটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে এদের বিন্দুবিসর্গ কারোর বোঝবার জো নেই।

তবে শুধু অনুবাদ করে দিলেও যে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাবে, তা নয়। কারণ, এই পদগুলি একরকম সাংকেতিক ভাষায় রচিত। তার নাম হচ্ছে সন্ধ্যা-ভাষা। সে এক ধূপছায়া-রঙের আবছায়াগোছের আলো-আঁধারে-মেশানো প্রহেলিকাময় ভাষা। তার যে-মানেটা বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে, সেটাই তার আসল মানে নয়। হেঁয়ালির মতো তার এক গুপ্ত অর্থ আছে। সেটা হচ্ছে সাধনতত্ত্বের কথা। যাঁরা ও-পথের পথিক নন, তাঁদের কাছে এর আসল মানে সহজে ধরা-ছোঁয়া দেয় না। কিছু অবশ্য আভাসে ধরা পড়ে, কিন্তু বেশির ভাগেরই নাগাল পাওয়া দায়।

চর্যাগানের ভিতরকার সাধনতত্ত্বের নাম হচ্ছে বজ্রযান বা সহজযান। এটা বাঙালী বৌদ্ধ আচার্যদের মত। তবে এর বিশেষ সংস্করণ হয়েছিল নেপালে তিব্বতে ও চীনদেশে। এই সম্প্রদায়ের আচার্যদের নাম সিদ্ধাচার্য। সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভ করার দরুনই বোধ হয় তাঁদের এই নাম। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য লুইপাদ। পণ্ডিতদের মতে তিনি রাঢ়দেশের লোক। এঁরই নাম অনুসারে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যেরা নিজেদের নামের সঙ্গে 'পাদ' কথাটি যোগ করে নিতেন। যেমন, কিলপাদ, কাহ্নুপাদ, শান্তিপাদ, ভুসুকুপাদ, ডোম্বীপাদ ইত্যাদি। এঁরা সকলেই চর্যাগান বেঁধে গিয়েছেন।

নিজেরা এক-একজন মহা মহা জ্ঞানী পণ্ডিত হলেও প্রচলিত শাস্ত্রে এঁদের বিশ্বাস ছিল অতি অল্প, আর শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের উপর আস্থা ছিল তার চেয়ে আরো অনেক কম। এঁদের মুখে সর্বদাই ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকল্পের নিন্দা। ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানকে এঁরা বলতেন লোক ঠকাবার মস্ত এক কৌশল। ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে বাহ্যিক ভেখধারণ, ধর্মের নামে বাহ্যানুষ্ঠানের আড়ম্বর— এসব এঁদের দু চোখের বিষ।

তাহলে দেখা যাক এঁরা কি বলে গেছেন। এই সম্প্রদায়ের প্রমাণ-গ্রন্থ শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা দোহাকোষ। তার থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি :

বম্হণেহি ম জাণন্ত হি ভেউ।
এবই পঢ়িঅউ এ চচউ বেউ।
মট্টী পাণী কুস লই পঢ়ন্ত।
ঘরহিঁ বইসী অগ্‌গি হুণন্ত।
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্‌খি উহাবিঅ কড়ুএঁ ধুমেঁ।

ব্রাহ্মণেরা আসল ভেদের কথা তো জানেন না। তাঁরা এমনি এমনিই চার বেদ পড়ে যান। মাটি জল কুশ ইত্যাদি নিয়ে মন্ত্র পড়েন; আর ঘরে বসে বসে অগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে লাভ কিছুই হয় না। কেবল হোমের কড়া ধুঁয়োয় চোখজ্বালাই সার।

সাধু-সন্ন্যাসীর উপরও সিদ্ধাচার্যেরা বিশেষ সদয় নন :

এক দণ্ডি ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসেঁ।
বিনুআ হোইঅই হংস উএসেঁ।
মিচ্ছেহিঁ জগ বাহিঅ ভুল্লেঁ।
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুল্লেঁ।

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ইত্যাদি হয়ে অনেকে সাধুর ভেখ নিয়ে ঘুরে বেড়ান। পরমহংসের উপদেশে বিজ্ঞ হতে চান। ভুল করে মিছেই ঘর ছেড়ে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য-জ্ঞান দুইই সমান।

অনেকে :

অইরিএহিঁ উদ্দ্‌লিঅ চ্ছারেঁ।
সীসহু বাহিঅ এ জড়ভারেঁ।
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোনহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী।
অক্‌খি ণিবেসী আসণ বন্ধী।
কন্নেহিঁ খুসুখুসাই জণ ধন্ধী॥

গায়ে ভস্ম মাখেন। মাথায় জটাভার ধারণ করেন। অনেকে আবার ঘরে বসে দীপ জালিয়ে ঘণ্টা চালাতে থাকেন। কেউ কেউ চোখ বুঁজে আসনবন্দী হয়ে যোগাসনে বসেন। তাই দেখে মূঢ় ব্যক্তিরা ফিসফিস করে কানাকানি করতে করতে আরো বিভ্রমে পড়ে।

কেউ-বা আবার :

দীহণক্‌খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্‌গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ।
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্‌পণ বাহিঅ মোক্‌খ উবেসেঁ॥

লম্বা লম্বা নখ রাখেন। মলিন বেশ ধারণ করেন। উলঙ্গ হয়ে মাথার চুল ওপড়ান। ক্ষপণকেরা অতি ক্লেশকর বেশ ধারণ করে আপন আপন মোক্ষলাভের আশায় সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

কিন্তু :

> জই নগ্গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
> লোমউপাড়ণেঁ অত্থি সিদ্ধি তা জুবই ণিঅম্বহ॥
> পিচ্ছীগহণে দিঠ্ঠ মোক্ষ তা মোরহ চমরহ।
> উচ্ছেঁ ভোঅণে হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গহ॥

উলঙ্গ থাকলেই যদি মুক্তি হত, তা হলে শিয়াল-কুকুরও তো মুক্তপুরুষ। লোম ওপড়ালেই যদি সিদ্ধিলাভ ঘটত, তা হলে তো বলতে হয়, যুবতীর নিতম্বও সিদ্ধিলাভ করেছে। পুচ্ছধারণে যদি মোক্ষ হয় তা হলে তো মউরের চামরও মোক্ষপ্রাপ্ত। আর উচ্ছিষ্ট-ভোজনে যদি জ্ঞানের উদয় হয়, তা হলে হাতি-ঘোড়াও জ্ঞানীপুরুষ।

ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকর্মের নিন্দা কিন্তু এই প্রথম নয়। এইসব আচার্যের জন্মাবার দু হাজার বছর পূর্বে চার্বাক যে-নিন্দা করে গেছেন, সে আর কহতব্য নয়। সিদ্ধাচার্যেরা তবু তো খানিক রয়ে-বসে-সয়ে আকারে-ইঙ্গিতে সংকেতে-কৌশলে নিন্দা করেছেন, কিন্তু চার্বাকের নিন্দা একেবারে খোলাখুলি। খুবই স্পষ্ট রকমের। সে এতই স্পষ্ট যে, তখনকার ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাণ্ডারা সে-নিন্দা সহ্য করতে না পেরে চার্বাককে জাতে তুলে নিয়ে তাঁকে একেবারে মুনিঋষির পর্যায়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

চার্বাক বলছেন, ভণ্ড ধূর্ত ও নিশাচর এই তিনে মিলে বেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের ধূর্তোমির আর অন্ত নেই। তারা বলে, যজ্ঞে পশুবলি দিলে নাকি সে-পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। তা হলে নিজের বাপকে ধরে যজ্ঞে কোতল করে দিলে তো অতি সহজেই তাঁকে স্বর্গে পাঠানো যায়। আর, মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধশান্তি করলেই যদি তার তৃপ্তি হয়, তাহলে নিবে-যাওয়া প্রদীপে খানিক তেল ঢাললে সে-দীপ আবার জ্বলে ওঠে

না কেন? এসব ব্যবস্থা ব্রাহ্মণরা লোক ঠকিয়ে নিজেদের জীবিকা-অর্জনের সোজা উপায় করার জন্যে নিরীহ নির্বোধ লোকসমাজে প্রচার করেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। চার্বাকের দৌড় কিন্তু ঐ পর্যন্ত। খাও-দাও মজাসে আরাম কর— এই স্থূল পথ ছাড়া চার্বাক আর কোনো পথ দেখাতে পারেন নি। সহজপন্থীরা কিন্তু সাধনমার্গে এমন-এক পন্থা দেখিয়েছিলেন যার জের বাঙালী সমাজ থেকে এখনো মেটে নি।

সিদ্ধাচার্যদের ধর্মমত ব্যাখ্যা করে বোঝানো আমার সাধ্য নয়। তার জন্যে পণ্ডিতদের ডাকতে হয়। তবে পণ্ডিতেরাও যে এ-বিষয়ে একমত, সেটা মনে করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। কিন্তু তত্ত্বকথা শোনাতে গেলে গভীর জলে নামতে হয়, তখন আর থই পাওয়া ভার। তা ছাড়া, আমি তো কোনো ধর্ম-আলোচনা করতে বসি নি। কাব্য নিয়েই আমার কথা। সুতরাং সেই দোহার পুঁথি থেকেই আমি দুটো দোহা তুলে ধরছি। হয়তো এর থেকে সহজধর্মের মর্ম খানিকটা ভেদ করতে পারা যাবে।

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জেঁ।
কিন্তহ কিজ্জেই মন্তহ সেব্বেঁ॥
কিন্তহ তিত্থ তপোবন জাই।
মোক্খ কিং লব্ভই পাণী হ্নাই॥

এসো জপহোমে মণ্ডল কম্মে।
অণুদিন অচ্ছসি বাহিউ ধম্মে॥
তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহেঁ।
বোধি কি লব্ভই প্রণ বিণ দেহেঁ॥

আন্দাজে-আন্দাজে এর যা মানে বোঝা গেল, সেটা হচ্ছে এই:

দীপ জ্বালিয়েই তোর কি হবে, আর নৈবেদ্য সাজিয়েই-বা তোর কি হবে? মন্ত্রজপ করে আর তীর্থ-তপোবনে গিয়েই-বা তোর কি লাভ?

স্নানাদি করেই কি তুই মুক্তিলাভ করবি ভেবেছিস? ওরে তরুণি, তুই তোর এইসব জপ হোম ইত্যাদি মঙ্গলকর্ম নিয়ে বাহ্যিক ধর্মেই দিন কাটালি। জানিস নে কি তুই, প্রেম ছাড়া মুক্তি নেই। এই দেহে প্রেম বিনে কি জ্ঞানলাভ ঘটে?

কথাটা যখন একবার পাড়লুম তখন আরো একটু খোলসা করে বলি। সিদ্ধাচার্যদের মতে তীর্থ-তপোবন কোথাও যাবার দরকার নেই। কারণ, এই দেহেতেই সব-কিছু আছে। দেহের মধ্যেই সব-কিছু পাওয়া যায় কায়াসাধনের ফলে।

দোহাকোষ বলছেন:

এথ্ সে সুরসরি জমুণা এথ্ সে গঙ্গাসাঅরু।
এথ্ পআগ বণারসি এথ্ সে চন্দ দিবাঅরু।

এই দেহেরই মধ্যে সরস্বতী যমুনা। গঙ্গাসাগরও এই দেহের মধ্যে। এইখানেই প্রয়াগ বারাণসী। চন্দ্রসূর্যও এই দেহের মধ্যে।

ঘরেঁ আছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়িবেসী পুচ্ছই।

ঘরে যে আছে তাকে বাইরে কি খোঁজ কর? আগে ঘর না দেখেই প্রতিবেশীদের কি জিজ্ঞেস কর?

মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ।
সব্ববি রে বঢ় বিব্ভমকারণ।

মন্ত্র তন্ত্র ধ্যান ধারণা, সবই বড় বিভ্রমের কারণ। কেননা:

পণ্ডিঅ সঅল সত্ত বক্খাণই
দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জানই।

পণ্ডিতেরা বাইরের থেকেই সত্যের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। দেহের মধ্যেই যে পরম জ্ঞান বিরাজ করছে, তার খবর তো তাঁরা জানেন না।

এই দোহাগুলির ভিতর গভীর তত্ত্বকথা যাই থাক্‌-না কেন, সুরে ও ভাবে দুয়েই যে এরা এক-একটা কবিতা, সে-সম্বন্ধে অন্য কারোর মনে কোনো সন্দেহ থাকলেও আমার মনে তো একেবারেই নেই। কারণ, যে-রসের ছোঁয়াচ লাগলে বাক্য রসাত্মক হয়ে উঠে কাব্যের ধাপে পৌঁছয়, সেই রস এইসব দোহাতে আছে। শুধু তত্ত্বকথা হলে কবিতা হত না।

কোনো দেশেই নির্জলা তত্ত্বকথা কি ধর্মসঙ্গীত এমনকি বিশুদ্ধ স্বদেশীমার্কা গানও কখনো বড় কবিতা হয়ে ওঠে নি। কেননা, তাতে সর্বদাই একটা বিশেষ বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। কিন্তু তত্ত্বকথা শোনানো বা কোনো-কিছু প্রতিপন্ন করতে যাওয়া লিরিকের কাজ নয়। তার কাজ হচ্ছে নিছক আনন্দ প্রকাশ করা, আর সেই আনন্দের ধ্বনির দ্বারা অপরের মনের ভিতর আনন্দ জাগিয়ে তোলা।

তাই তো, প্রবোধচন্দ্রোদয় বলে সংস্কৃতে লেখা এক আধ্যাত্মিক নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে এক প্রাচীন আচার্য বলেছিলেন, অদ্বৈততত্ত্বের দ্বারা আর-যা কিছু করা যাক-না কেন, ভালো নাটক কখনো লেখা যায় না। শুনতে পাওয়া যায়, ইংরেজ মহাকবি মিল্‌টন তাঁর লেখা প্যারাডাইস লস্টের একখণ্ড তাঁর পুরনো বন্ধু বাট্‌লারকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। বাট্‌লার-সাহেব কেম্‌ব্রিজে গণিতের মস্ত বড় অধ্যাপক; অঙ্কে তাঁর পাকা মাথা। তিনি বইখানি পেয়ে মিল্‌টনকে লিখে পাঠালেন, তোমার লেখাটা তো একরকম ভালোই বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু ওটা কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে। বাট্‌লার-সাহেবের বোধ হয় জানা ছিল না, কাব্য যদি তেড়েফুঁড়ে উঠে কিছু প্রমাণ করতে বসে যায়, তা হলে সেটা তখন আর কাব্য থাকে না, শাস্ত্র হয়ে ওঠে।

হাজার বছর আগেকার লেখা চর্যাগানের ভাষা যে বাংলা, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। কিছুদিন পূর্বেও এই ভাষাকে কেউ প্রাচীন মাগধী, কেউ মৈথিল, কেউ-বা আবার ওড়িয়া ভাষাও বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন একেবারে স্থির হয়ে গেছে, এই ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষা। তবে, এই বাংলা ভাষার সঙ্গে তার দু তিন শো বছরের পরবর্তী বাংলা ভাষার একেবারে আকাশপাতাল তফাত। সগোত্র বলেও চেনা যায় না।

বৌদ্ধ আচার্যেরা বরাবরই সর্বসাধারণের নিমিত্ত ধর্মপ্রচার করে গেছেন। সেই কারণে তাঁদের ভাষা ছিল সামান্য লোকের ভাষা। পুরাকালে তাঁরা সংস্কৃতের বদলে তাই প্রাকৃতকেই বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন। সাধারণ লোকের কাছে সহজে সহজধর্ম প্রচারকল্পে বাংলাদেশের সিদ্ধাচার্যেরাও সংস্কৃত ছেড়ে তাই বাংলা ভাষাতেই তাঁদের গান বেঁধেছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে বাংলাদেশে ক্রমশ আবার পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হতে থাকল। বৌদ্ধ আচার্যেরা বিদায় নিলেন কিংবা হিন্দু-সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গুপ্তভাবে রইলেন। চর্যাগানও এদেশ থেকে অন্তর্ধান করল। এ-তল্লাটে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত কারোর জানা রইল না।

এই তো সেদিন অর্থাৎ ১৯০৭ সালে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় নেপাল থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে ছাপিয়ে দেন। শাস্ত্রীমশায়ের পুঁথিতে এই চর্যাগানের সংগ্রহের নাম দেওয়া আছে— চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। এই নাম ঠিক কি না, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্কবিবাদ আছে। কেউ বলেন, এর নাম হবে আশ্চর্যচর্যাশ্চয়; কেউ বলেন, চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়। চর্যাগীতিকোষবৃত্তি নামও পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের সে-বিতর্কে কাজ কি? গানগুলো যে কি তাই দেখা যাক-না কেন?

সবসুদ্ধ পঞ্চাশটি গান নিয়ে এই সংগ্রহ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কিন্তু শাস্ত্রীমশায় আড়াইটা পদের সন্ধান পান নি। পরে, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাগীতির এক তিব্বতী অনুবাদ থেকে শেষ তিনটি পদ উদ্ধার করেন; এবং শাস্ত্রীমশায়ের পুঁথির অনেক অশুদ্ধ পাঠকে শুদ্ধ করে দেন। শাস্ত্রী-মশায়ের পুঁথিতে গানগুলোর এক সংস্কৃত টীকাও দেওয়া আছে; কিন্তু সে-টীকা আসলের চেয়ে এত বেশি ভারী যে, তার আবার এক সরল ভাষ্য না দিলে তার মানে বোঝা মুশকিল। কথাতেই আছে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। সহজ জিনিসকে কঠিন করা তো টীকাভাষ্যের চিরকালের রীতি।

লিরিকের একটা মস্ত গুণ এই যে, সম্পদে-বিপদে সুখে-দুঃখে তা মনে মনে গুন্‌গুনিয়ে কিংবা মুখে মুখে আউড়িয়ে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আর সেইসঙ্গে এই মর্তলোকেই এক স্বর্গলোক রচনা করে দু দণ্ড পার্থিব ব্যাপারের হাত এড়ানো যায়। কিন্তু চর্যাগানগুলো নিয়ে ঠিক তা করার জো নেই। কারণ, সচরাচর এগুলো ছন্দে উচ্চারণ করা যেমনি শক্ত, টীকাভাষ্য করে বুঝিয়ে না দিলে এর মানে বের করাও তেমনি দুরূহ। কিন্তু এ-সত্ত্বেও একটু ধৈর্য ধরে চর্যাগান নিয়ে চর্চা করলে তার মধ্যে লিরিকের স্বাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে সেটা হয়তো অনেকের কাছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো একটা বেরসিক কাণ্ড বলে মনে হতেও পারে।

চর্যাগানের দু-চারটে পদের নমুনা দিই। আধুনিক বাংলা ভাষায় কিছু কিছু ব্যাখ্যাও দেওয়া গেল। কিন্তু সে-ব্যাখ্যা বোধ হয় অনেকেরই মনঃপূত হবে না। কিন্তু উপায় নেই। গানগুলি নামে সহজ হলেও তাদের ভাব বের করতে হলে বিস্তর মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়। তবে অক্ষরে অক্ষরে প্রতি শব্দের অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলেও তো অনর্থ

বড় কম নয়। যেমন অনর্থ ঘটিয়েছিলেন এক ইংরেজ সাহেব। ইনি ভালো বাংলা শিখেছেন বলে বড্ড বড়াই করে বেড়াতেন। তাই 'গোপাল-উড়ের যাত্রা'র ইংরেজি পোশাক দিয়েছিলেন— 'the journey of the flying cowherd'।

চর্যাগানগুলি আকারে-প্রকারে অনেকটা পরবর্তীকালের পদাবলীরই মতো। বাঙালীরা সেই আদ্যিকাল থেকেই চুট্‌কি ছড়ার গান লিখতে সিদ্ধহস্ত। কি সংস্কৃতে, কি অপভ্রংশে, কি ভাষায়— সবেতেই এ-ব্যাপারে বাঙালীদের যেমন হাত খুলেছিল ভারতবর্ষের অন্যত্র আর-কারোর হাতে ঠিক তেমনটি খোলে নি। সুতরাং চর্যাগানকে পদাবলীরই অগ্রদূত বলতে কোনোই বাধা নেই।

তখন মুখে মুখে যাঁরা এই বাংলা বলতেন তাঁরা নিশ্চয়ই লিরিকের মতো চর্যাগানের রস অনুভব করতেন। কারণ দেখা যাচ্ছে, সেকালে এই পদগুলিতে সুর লাগিয়ে গান গাওয়া হত। পুঁথিতে প্রত্যেক পদের উপর তা কি সুরে যে গেয়, তার রাগরাগিণীর নাম পর্যন্তও দেওয়া আছে। তবে সেসব রাগরাগিণীর অনেকগুলোই এখন অপ্রচলিত ব'লে শুধু নাম ধরে তাদের সবাইকে আর চেনবার উপায় নেই।

চর্যাগানের নমুনা :

তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী।
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।
তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ়হিঅহি ন পইসই।

কখন যে ব্যাধের শর এসে গায়ে বেঁধে এই ভয়ে হরিণ ঘাস ছোঁয়

না, জলও খায় না। হরিণ-হরিণীতে কাছ-ছাড়াছাড়ি, কেউ কারুর সন্ধান পায় না। তাই হরিণী একদিন হরিণকে দেখতে পেয়ে বললে, শুনছ হরিণ, এ-বন ছেড়ে সরে পড়। সেই শুনে, তীরের মত ছুটল সেই হরিণ। ত্রস্ত হরিণের খুরটুকুও আর দেখা গেল না। ভুসুকুপাদ বলেন, এততেও মূর্খদের মনে কোনো দাগই পড়ল না।

আবার :

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গীপোইআ লীলে পার করেই।
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা॥

গঙ্গা-যমুনার মাঝ দিয়ে নৌকা বেয়ে নিয়ে চলেছে ডোমকন্যা। প্রেমরসে মত্ত সেই কন্যা নায়ে চড়িয়ে অবলীলাক্রমে পার করে দেয়। ডোমকন্যে, দিন তো বেড়ে চলল। বেয়ে নিয়ে চল ডোম্বীপাদকে সেই পরমানন্দে-ভরা জিনপুরে, যেখানে সে সদ্‌গুরুর পাদপদ্মের দর্শন পাবে।

আর একটি :

কুলেঁ কুলেঁ মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা।
মাআমোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ণ পুচ্ছসি নাহা॥
বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আঁখি বুজ্ঝিঅ বাট জাইউ॥

কুলে-কুলে আর ঘুরে মরিস নে মিছে। চেয়ে দেখ, এই সংসারের মাঝখানেই তো এক সহজ পথ আছে। শিশুর মতো ভুলে তুই ঐ

সোনাবাঁধানো রাজপথ দিয়ে যাস নে। সে-পথ যেখানে গেছে সেখান থেকে যে আর বেরোবার রাস্তা নেই। মায়ামোহ-ভরা সমুদ্রের তো অন্ত নেই। তার থই পাওয়া ভার। আগে যদি কোনো নৌকা দেখতে পাস তা হলে সন্ধানী লোককে পথ জিজ্ঞেস করে নে। শান্তিপাদ বলেন, ডাইনে-বাঁয়ের দু পথ ছেড়ে তুই মাঝখানের সহজপথ দিয়ে চল। এ-পথে ঝোপঝাপ নেই। চোখ বুঁজেই তুই চলে যেতে পারবি।

আরো কয়েকটা চর্যাগান :

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ণ জানহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো॥

মানুষ আপনার মনে আপনিই জন্মমরণের কথা রচনা করে মিছিমিছি নিজেকে বন্ধনে জড়ায়। অচিন্ত্য যা, তাকে আমি জানব কি করে? কেমন করে এই ভবে জন্মমৃত্যু ঘটে, জানি নে। শুধু জানি, জন্ম মরণ দুইই এক। জন্মও যেমন করে হয়, মৃত্যুও তেমনি করে হয়। প্রভেদ বড় কিছু নেই।

উচা উচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥

উঁচু উঁচু পর্বতের উপর শবরদের বাস। সেখানে আছে শবরকন্যা।

তার পরিধানে ময়ূরপুচ্ছের কটিবাস, গলায় কুঁচের মালা। মত্ত শবর পাগলপারা উন্মুখ হয়ে বেড়ায়। শবরী বলে, দোহাই তোমার শবর, গোল কোরো না। চেয়ে দেখ, আমি তো তোমারই ঘরণী আছি। নাম আমার সহজসুন্দরী।

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু।
তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই।

তুলো ধুনতে ধুনতে আঁশে গিয়ে দাঁড়ায়। আবার আঁশ ধুনতে ধুনতে আঁশ অদৃশ্য হয়ে যায়। কেন যে এরকমটা হ তার কারণ পাওয়া ভার। শান্তিপাদ বলেন, কিসের থেকে যে কি হয়, তা তো ভেবেই পাই নে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।
বেঙ্গস সাপ বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সমাঅ।

টিলার উপর আমার ঘর। প্রতিবেশী কেউ নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই। নিত্য অভাবের সংসার। ঘরে যে ব্যাঙ আর সাপ বেড়ে উঠল। ভাগ্যহত হলে আর কি কপাল ফেরে? দুধটুকু দুহে নিলে আর কি তা গোরুর বাঁটে ফিরে যায়?

চর্যাগানের পর প্রায় দু শো আড়াই শো বছর ধরে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র একেবারে ফাঁকা। পালরাজারা ছিলেন এ-দেশেরই লোক। তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তাঁদের আশ্রয়ে একদিকে যেমন বাঙালী সংস্করণের

বৌদ্ধধর্ম, ওদিকে তেমন বাঙালী সংস্করণের ব্রাহ্মণ্যধর্ম পাশাপাশি চলেছিল। আর তাদেরই সঙ্গে একাধারে প্রচার ছিল দেশজ হিন্দুধর্ম। কিন্তু সেনবংশীয়েরা অন্যত্র থেকে এসে শেষে বাংলাদেশের রাজা বনে গেলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মও বুঝতেন না, এ-দেশের লৌকিক ধর্মেও তাঁদের আস্থা ছিল না। তাঁরা রপ্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মে। ঝোঁকও তাঁদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর।

সেনরাজাদের দরবারে তাই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আদর বেশি হল। চারদিক থেকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য আচারের প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ চেষ্টা চলতে লাগল। নতুন করে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র রচনা হল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাহন যে সংস্কৃত ভাষা, তারও প্রচার বাড়ল। দেশের প্রাকৃত ভাষা অনেক পিছনে পড়ে রইল। তখনকার জ্ঞানীগুণী ভদ্রলোকেরা লিখতেন পড়তেন সংস্কৃতে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথাবার্তা তর্কবিবাদ চলত বোধ হয় ঐ সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা হয়ে গেল অসাধু গ্রাম্য ভাষা, সাধারণ ইতর লোকদের ব্যবহারের নিমিত্ত। লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তিরা সে-ভাষাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতে লাগলেন।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের সহজধর্মকে এ-দেশ থেকে তাড়ানো সহজ হয় নি। সেটা শুধু ভদ্রজনের হাত ফিরে নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘাড়ে চেপে বসে গেল। তার পর বাংলাদেশে নবাগত ব্রাহ্মণ্যধর্মকে এই অশাস্ত্রীয় সহজধর্ম বারবার ঘা দিতে দিতে তার চেহারাটা ক্রমশই বদলিয়ে দিতে লাগল। দেখা গেল, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম আস্তে আস্তে প্রচলিত ভক্তিধর্মে কিংবা শাক্তধর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সিদ্ধাচার্যদের সহজধর্ম এ-দেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কতদূর প্রবেশ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ নিম্নশ্রেণীরই সাধুসন্তদের মুখে রূপক অলংকারে রচিত গানে। আউল বাউল সাঁই দরবেশ ইত্যাদির গানে

এই সহজধর্মকেই তো আমরা স্পষ্ট করেই দেখতে পাই। সহজধর্মের প্রভাব তো প্রতিভাত হচ্ছে বাংলা লিরিকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। আর তারই দৌলতে তো বাংলাদেশে দোল-দুর্গোৎসব পাশাপাশি চলেছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব মনের সুখে একত্র বাস করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলমানী আমল আসতেই ধরা পড়ে গেল, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশের লোকদের কাঁধে স্থায়ীভাবে ভর করতে পারে নি। কি ভদ্রলোকদের আর কি নিম্নস্তরের লোকদের কারোরই নয়। অবশ্য গোড়াতেই তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের প্রথম ধাক্কার ঝড়ঝাপটা থেমে যাওয়ার পর, অরাজকতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে লোকে একটু থিতিয়ে বসতেই যেখানে যত লৌকিক গ্রাম্য দেবদেবী ছিলেন তাঁরা সবাই গা-ঝাড়া দিয়ে একে একে বাইরে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁদের স্তবস্তুতি করে বিস্তর খণ্ডকাব্য রচনা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাও চলতে লাগল এইসব গ্রাম্য দেবদেবীকে জাতে তুলে নিয়ে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে এক-আসনে বসানোর। এ-চেষ্টা এখনও চলেছে, থামে নি।

মুসলমানী আমলেই আবার বাংলা লিরিকের প্রসার ঘটল। যদিও ব্রাহ্মণ্য ইতিহাস-পুরাণে এর কোনো হদিশ পাওয়া যায় না, তবুও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়রহস্যের কথা বাংলাদেশের লোকসমাজে অনেকদিন ধরেই প্রচলিত ছিল। এ-দেশের লোকের কাছে এই প্রণয়কেলির কথা যেমন সহজে বোধগম্য তেমনি সহজেই উপভোগ্যও বটে। সুতরাং এই সময়ের কবিরা যেসব গান বাঁধতে লাগলেন তার বিষয়বস্তু যে এই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকেই নিয়ে হল, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে যেসব বাংলা লিরিকের সৃষ্টি হল তার আমরা নাম দিই পদাবলী। পুরনো বাংলায় লেখা চর্যাপদ তো ছিলই, তা ছাড়া অপভ্রংশে লেখা অনেক রকমের প্রাচীন লৌকিক ছড়াগানও ছিল। আবার সেনরাজাদের আমলে সংস্কৃতে লেখা লিরিক রসে ভরা ছোট ছোট চূর্ণ কবিতাও চোখের সামনে ছিল। সুতরাং বাংলা লিরিক যে পদাবলীর আকার ধারণ করবে তাতে আর বিচিত্র কি ?

এই সময়কার বাঙালী কবিদের সামনে কাব্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একটা আদর্শ মজুত ছিল। সেটি শ্রীজয়দেব-কবির বিরচিত সংস্কৃতে লেখা একটি খণ্ডকাব্য, গীতগোবিন্দ। এটি রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গের একটি পালাগান। কবি জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন। লক্ষ্মণসেন বাহ্যিকে ব্রাহ্মণ্য আচার রক্ষা করে চললেও মনে মনে পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁকে খুশি করার জন্যে বোধ হয় জয়দেব এই পালাগান রচনা করেছিলেন। কিন্তু বলার মধ্যে না-বলা, কিংবা না-বলার মধ্যে বলার আর্টটুকু জানা না থাকার দরুন জয়দেব-কবির গীতগোবিন্দ-কাব্য বড়-গোছের ধর্মগ্রন্থই হয়ে আছে, উঁচুদরের কাব্যগ্রন্থ হয়ে উঠতে পারে নি।

গীতগোবিন্দে সুরের প্রচুর ঝংকার আছে বটে, কিন্তু তাতে লিরিকের ধ্বনি নেই। শব্দ কেবল শব্দই হয়ে রয়ে গেছে, তাতে শব্দের ব্যঞ্জনা নেই। তবে স্থানে স্থানে নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই যেন একটু-আধটু ধ্বনি ফুটে বেরোচ্ছে।

যেমন গোড়াতেই :

> মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।
> নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

ছোট্ট দুটি লাইনে তমালবৃক্ষরাজিঘন শ্যামল বনভূমির যে মনোহর চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল, সেটা অনুপ্রাসের গুণে কিংবা

আর-কোনো অলংকারের বাহারে নয়। শুধু বাক্যসংযমের ফলে। তাই তো একজন ফরাসিস্ কবি বলে গেছেন, 'তুমি যা বললে তা তো আমি দু কান দিয়েই শুনলুম। কিন্তু তুমি যা বলতে গিয়েও বলতে পারলে না, সেটা যে কি, তাই ভাবতে ভাবতে আমার দিন কাবার হয়ে এল।' আসলে সেইটেই তো হল কাব্য।

কিন্তু ফাঁকা শব্দের ঝংকারও যে মানুষের মনকে কতখানি আকৃষ্ট করতে পারে তারও নিদর্শন গীতগোবিন্দে অনেক আছে।

যেমন :

> ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
> মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে মনকে আকৃষ্ট করলেও এটা বেশিক্ষণ মনে বসে না। বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এটার শেষ হয়ে আসে। এতে এমন কোনো ব্যঞ্জনা নেই যে, বলার পরও সেটা মনে জেগে থাকবে। তবে মানুষের শিশুর মতো মন ছন্দের ঝংকারের কাছে চিরকালই পরাভব মেনে এসেছে। তাই, বাংলার গীতগোবিন্দ-কাব্যের আদর ভারতবর্ষের সর্বত্র।

এই কাব্যে একটি লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, এটি যদিও সংস্কৃত ভাষায় লেখা, কিন্তু সে-সংস্কৃত প্রায় ভাষায় এসে ঠেকেছে। আর সেই সঙ্গে এও দেখা যাচ্ছে, গানের যা স্বাভাবিক ছন্দ, সেই শব্দমিলের ছন্দই এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে। শুধু তালের ছন্দের উপর এর নির্ভর নয়।

যেমন :

> পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শংকিত ভবদুপয়ানম্।
> রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
> মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
> চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥

কিংবা :

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং
মধুরকোমলকান্তপদাবলীম্
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ।

অথবা :

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল এ ।
কলিতললিতবনমাল জয় জয় দেব হরে ।

অনুস্বর বিসর্গগুলো বাদ দিলে এ তো বাংলা! আর, বাংলা লিরিকেরও তো এই সুর এই রূপ। এই কারণেই বোধ হয় অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে, জয়দেব-কবি গীতগোবিন্দ-কাব্য প্রথম বাংলাতেই রচনা করেছিলেন, তার পর ভদ্রসমাজে প্রচারের উদ্দেশে অনুস্বর বিসর্গ জুড়ে তাকে সংস্কৃত করে তোলেন। হবেও বা! পণ্ডিতদের কথা অবশ্যই মান্য করতে হয়।

গীতগোবিন্দকে আদর্শ বলে ধরলেও আর তার ভাবরসে মগ্ন থাকলেও এবং তার ছন্দকে আঁকড়ে ধরে রইলেও বাংলা ভাষায় কিন্তু যেসব লিরিক সৃষ্টি হল, তাদের প্রাণবস্তু ছিল আরো ঢের বেশি গভীর। মানুষের খোলা মনের ঠিক মাঝখান থেকেই যেন সেগুলো ছন্দের ফুল্কি হয়ে বেরিয়ে আসছে। অতি সহজ, অতি সুন্দর, অতি মিষ্টি।

বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত রচনার আদর কমে আসতে লাগল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রাজদরবারে আর তেমন খাতির রইল না। বাধ্য হয়েই লোকদের শেষে ভাষার আশ্রয় নিতে হল। আশ্চর্য এই যে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই প্রায় এই একই সময়ে ভাষায় রচিত কাব্যসাহিত্য শুরু হয়।

সবদেশেই গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয় কাব্যসাহিত্যের অনেক পরে। গদ্য হচ্ছে প্রধানত কারবারের ভাষা। যে-গদ্য সাহিত্যের বাহন, বাংলাদেশে সে-গদ্য তৈরি হতে আরো পাঁচ শো বছর সময় লেগেছিল। আর-এক বিদেশী রাজত্বের সংস্পর্শে এসে এই গদ্যের আরম্ভ হয় ও কালে কালে তার উন্নতি ঘটে। ইংরেজদেরই চেষ্টায় আর সাহায্যেই যে বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা, এ-কথা এক উৎকট স্বদেশাভিমানী ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করবেন। তা ছাড়া, সাহিত্যের গদ্য যুক্তিমার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর জীবনে ভক্তিমার্গ ছেড়ে যুক্তিমার্গের ধারা আরম্ভ হয় সেই উনিশ শো শতাব্দীর শুরু থেকে।

মুসলমান রাজত্বকালে বাংলাদেশের কারবারী ভাষা ছিল ফার্সী। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষের তো কেবল কারবার নিয়েই কাজ চলে না। মনের কথা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে না-পারলে মানুষের দিন কাটে না। এরই তাড়নায় তো মানুষ পদ্য লেখে। কারণ, পদ্য এক-মানুষের মনের কথা অন্য-মানুষের মনের কাছে পৌঁছে দিতে একেবারে পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। তাই, মনের কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে বাংলাদেশের লোকেরা বাংলা ভাষাতেই পদ্য-রচনা শুরু করে দিলেন।

সংস্কৃতের আঁটসাঁট পোশাকী ভাষা ছেড়ে বেশ ঢিলেঢালা আটপৌরে বাংলা ভাষাতে মনের কথা ব্যক্ত করতে পারায় লাভ হল এই যে, ভাষায় লেখা পদ্যগুলো এক-একটা আদত লিরিক হয়ে উঠল। আর সেইসঙ্গে বাংলা ভাষাও পেল বাংলাদেশেরই একটা নিজস্ব রূপ। এই সময় থেকেই বাংলা ভাষা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল।

ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে যাঁরা মশগুল তাঁরা জানেন, ইংরেজ কবি চসারের ইংরেজির সঙ্গে ইংরেজি বাইবেলের আর মহাকবি শেক্সপীয়রের

ইংরেজির তফাত কতখানি। আর, তার সঙ্গে এও জানেন যে, আজকালকার ইংরেজির সঙ্গে বাইবেল আর শেক্সপীয়রের ইংরেজির বৈষম্য কত কম। সেইরকম, বাংলা ভাষা এই সময়কার কবিদের হাতে পড়ে যে-চেহারা নিল, তার সঙ্গে আজকালকার ভাষার আকৃতি- ও প্রকৃতি-গত বৈষম্য ঠিক ততখানি কম। আর, ঠিক ততখানি বেশি প্রভেদ চর্যাগানের পদের সঙ্গে আজকালকার পদ্যের।

ভাব ও কথার বৈচিত্র্য ও প্রসার এখন অনেক বেড়ে গেলেও, পনেরো শো থেকে সতেরো শো শতাব্দীর বাংলা কবিতার রূপ তখনো যা ছিল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত প্রায় সেই একই রকম ছিল। আমার কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে আমি সেকালের কতক প্রসিদ্ধ পদকর্তার পদ উদ্ধার করে উপস্থিত করছি। তবে সমভাব রক্ষা করার জন্যে স্থানে স্থানে পদগুলি সামান্য একটু কাট-ছাঁট করে নিয়েছি। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখবেন যে, টীকা-টিপ্পনী ছাড়াও সেগুলো বেশ বুঝতে পারছেন, রসাস্বাদনে কোনো বাধা পাচ্ছেন না।

বাঙালী পদকর্তাদের আদিগুরু চণ্ডীদাস। তিনি যে খাঁটি বাঙালী ছিলেন, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ নেই। তবে, আমরা যে-পদকর্তা চণ্ডীদাসকে জানি, পণ্ডিতদের মতে তিনিই যে ঠিক এই চণ্ডীদাস, তা নাও হতে পারেন। বস্তুত পণ্ডিতেরা অনেকগুলি চণ্ডীদাসের খবর পেয়েছেন, একটি আধটি নয়। শুধু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ইত্যাদি হরেক রকমের চণ্ডীদাস। সুতরাং কোন্‌টি যে কে, তা আমরা সঠিক বলি কি করে? চণ্ডীদাসের দেশ সম্বন্ধেও অনেক তর্কবিতর্ক আছে। কেউ বলেন, তাঁর বাস ছিল বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে; আবার কেউ বলেন, বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। বড়

গোলমেলে কথা। তা আমাদের অত গোলমালের ভিতর ঢুকে কি লাভ? নাম-ধাম গাঁইগোত্র সঠিক জানা না থাকলেও ভালো কবিতা পড়ার আনন্দ থেকে কে আমাদের ঠেকাতে পারে? আমাদের কাছে পণ্ডিতদের বারদুয়ার বন্ধ থাকলেও আমাদের মনের ভিতরদুয়ার যে খোলা। আর, সেইখান থেকেই তো নন্দনকাননের পারিজাতপুষ্পের গন্ধ ভেসে আসে।

কিন্তু একটা কথা আছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এঁরা সব বড় বড় কবি বলে তাঁদের পরবর্তী অনেক পদকর্তা নিজেদের লেখা পদ ঐ দুই মহাকবির নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এতদিন পরে কোন্‌টি যে সত্যিকার চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদ, আর কোন্‌টি যে নয়, তা স্থির করতে গিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

চণ্ডীদাসের পরেই আসেন বিদ্যাপতি ঠাকুর। বিদ্যাপতি কিন্তু মৈথিল। তা হলে কি হয়? আমরা অনেকদিন আগের থেকেই তাঁকে বাঙালী কবি বলে মেনে নিয়েছি এবং সেই সম্মানই তাঁকে দিয়ে এসেছি। আর দেবই-বা না কেন?

চণ্ডীদাসের পদ:

বসিয়া অবন্তীপুরে পড়ুয়া পড়ন পড়ে।
হেনকালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে।
সে যে চাহিল আমার পানে হানিল মদনবাণে।
সেই হতে মন করে উচাটন ধৈরজ না মানে প্রাণে।
সে যে রসের পুতলী বালা তার মদনমোহন লীলা।
চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে করয়ে বিবিধ খেলা।
তার পর দিনে দেবী আরাধনে বসিলাম যতন করি।
ওই শুভক্ষণে দেবীর আঙ্গিনে পেখলু সেই গৌরী।
হায় মন চলি গেলা কেন?
দেখিয়া সেরূপ নবীন পীরিতি স্মরণ লইলা যেন।

শুন শুন দেবি কহি তোমা আমি সবই বিফল মোর।
পুণ্য ধর্ম গেল মোক্ষাদি সকল চরণ না পেলাম তোর॥
চণ্ডীদাস কয় সত্য এই হয় স্বভাব স্বরূপ দেহা।
বাশুলী বচনে সত্য জানি মনে ধোবিনী সঙ্গতি লেহা॥

বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
জাতি কুল শীল মান॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
পরিতে গলায় সুখ॥
সতী কি অসতী তোমারি বিদিতি
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম
তোমারি চরণখানি॥

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
খাইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয়না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিতে হিয়ায় লইতে দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে দুখ উপজিল ফিরা॥
পরশপাথর শীতল বড়ই বলয়ে সকল লোকে।
মুই অভাগিনী লাগিল আগুনি পাইলুঁ এতেক শোকে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি এমতি না হয় কারে।
এ পাপ পড়সী ডাকিনী সদৃশী সকলি দোষয়ে মোরে॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায় পরাণ সহিবে কত॥
নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে সুখ সে পাইবে কোথা॥

শুন হে রসিকরায়।
তোমা উপেখিয়া যে সুখে আছিলুঁ নিবেদিয়া তুয়া পায়॥
কি জানি কি খেনে কুমতি হইল গরবে ভরিয়া গেলুঁ।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারাইয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥

জনম অবধি মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখিগণ দেখে প্রাণসম পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখিগণ কহে শ্যামসোহাগিনী গরবে ভরল দে।
হামারি গরব তুঁহু বঢ়ায়লি অব টুটায়ব কে॥
তোমারি গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমারি রূপে।
কুলশীল লাজে জলাঞ্জলি দিয়ে মজেছি রসের কূপে॥
তোমারি গরবে গরবিনী আমি গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কয় এমতি নইলে পিরীতি কিসের সুখ॥

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেড়ল মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম সাগর বাঁধলেম মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস কানুর পিরীতি মরণ অধিক শেল॥

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥

কোন বিধি সিরিজিল সোঁতের সেহালি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলে অখলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

এর পর বিদ্যাপতি :

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন জৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা ॥
আজ মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা ।
পাঁচ বান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অবহুন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা ।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা ॥

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয় ।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল ।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
না বুঝিনু কৈসন কেল ।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে না মিলিল এক ॥

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুহু জানি॥
তুহু কইসে মাধব কহ তুহু মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয়॥

এ ধনি কমলিনি স্তন হিত বানি।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইত কনক দ্বিগুণ হোয় মূল॥
টুটইত নহি টুট প্রেম অদভূত।
জৈসন বাঢ়এ মৃণালক সুত॥
সবহু মতঙ্গজ মোতি নহি মানি।
সকল কণ্ঠ নহি কোইল বানি॥
সকল সময় নহি ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহি গুণবন্ত॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান॥

তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানএ ভার॥
কর সয়ঁ কঙ্কন মুদরি।
পথ হি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জির পায়।
দুরহি তেজি চলি যায়॥
জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমনি সমাজে।
তোহে বিসারি মন তাহে সমাপলু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হম পরিণাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গ রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহর সমানা ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমন ভয়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহায়সি
ভবতারন ভার তোহারা ॥

আর-একটু বিস্তৃতভাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদগুলো নিয়ে আলোচনা করে দেখলে ধরা পড়ে যাবে, চণ্ডীদাসের প্রেম স্থির ধীর শান্ত স্নিগ্ধ। তাতে বিরহের দহন আছে, কিন্তু যৌবনের দপ্দানি নেই। বিদ্যাপতির প্রেম সদাই সচকিত, আপনাতে আপনি বিভোর। যেন নবযৌবনের জোয়ারে হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়।

চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি দু জনে মিলে যে-পথ দেখিয়ে গেলেন, সে-পথ বেয়ে প্রায় তিন শো বছর ধরে অনেক বাঙালী কবি তাঁদের গান গেয়ে গেছেন। পনেরো শো শতাব্দীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বাংলা কাব্যসাহিত্য এক নতুন শক্তি পেল। নৈয়ায়িক আর স্মার্ত পণ্ডিতেরা যাই বলুন-না কেন, চৈতন্যদেবের সহজ প্রেমধর্ম বাংলাদেশের মরা গাঙে এমন এক বাণ ডেকে আনল যে, তার বেগ বাংলা লিরিককে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর শিষ্য-প্রশিষ্য ও তাঁদের শিষ্যানুশিষ্যরা গৌরাঙ্গের মর্তলীলায় বাংলা লিরিকের আর-এক উৎস খুঁজে পেলেন, এবং তাতে উৎসাহিত হয়ে কবিতা লিখে ফেললেনও বড় কম নয়।

তবে সব পদকর্তাই যে ভালো কবিতা লিখতে পেরেছেন, তা নয়। পরবর্তীকালের অনেকেই একটা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই কবিতা রচনা করে গেছেন। কবিতা দিয়ে আনন্দ বিতরণ করার চেয়ে তাই

নিয়ে ধর্মপ্রচার করার দিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছিলেন। যাঁরা কবিতা লিখে থাকেন বা যত্ন নিয়ে কবিতা পড়ে থাকেন তাঁরা সকলেই জানেন, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কবিতা লিখতে বসলে সেটা আর যাই হোক, কখনো কবিতা হয়ে ওঠে না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের পরবর্তী যেসব পদকর্তা কবিতা লিখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস ও লোচনদাস প্রসিদ্ধ। এঁরা ইংরেজি পনেরো থেকে ষোলো শতকের মানুষ।

গোবিন্দদাস বাঙালী হয়েও ব্রজবুলির বিষম পক্ষপাতী। তাই তো বিহারীরা এঁকে মৈথিল বলে সন্দেহ করেন। তখনকার দিনের অনেক বাঙালী কবি মনে করতেন বিশুদ্ধ বাংলায় বুঝি কবিতা ভালো খোলে না। কিছু ব্রজবুলির চাট্ ছাড়লে, অর্থাৎ বাংলার সঙ্গে খানিক মৈথিল ও অপভ্রংশের খাদ মিশাল দিলে, কবিতা যেন জমে ভালো। যেমন, এখনো অনেকের ধারণা উর্দু কি হিন্দিতে লেখা গান বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতে যেমন খোলতাই হয়, বাংলায় লেখা গানে ঠিক তেমনি ধারা জুতসই হয় না।

গোবিন্দদাসের যে কবিতাটি তুলছি সেটা কাব্য হিসেবে খুব উঁচুদরের না হলেও, অনুপ্রাসের ছটায় এটি গীতগোবিন্দকেও হার মানিয়ে দেয়।—

সুন্দরি রাধে আওএ বণি
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি।
কুঞ্চিতকেশিনী নিরুপমবেশিনী
রসআবেশিনী ভঙ্গিনীরে।
অধরসুরঙ্গিনী অঙ্গতরঙ্গিনী
সঙ্গিনী নবনব রঙ্গিনীরে।

কুঞ্জরগামিনী মোতিমদশনী
দামিনীচমকনেহারিণী রে।
আভরণধারিণী অখিলসোহাগিনী
পঞ্চমরাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনী হাসবিকাশিনী
গোবিন্দদাসচিতসোহিনী রে॥

গোবিন্দদাসের আর-একটি পদ :

একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু চিরদুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশিল ছোড়ল গৃহসুখ আশ।
পন্থহুঁ দুখ তৃণ করি না গনলু কহতহি গোবিন্দদাস॥

জ্ঞানদাসের পদের সঙ্গে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েরই পদের আশ্চর্য মিল আছে। পদের শেষ লাইনে ভণিতাকারের নাম দেওয়া না থাকলে, চণ্ডীদাসের কি বিদ্যাপতির পদ বলে চালিয়ে দিতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না।

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমারি রূপে।
হেন মনে করি ও-দুটি চরণ
সদা লয়ে রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥

নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি যে কলিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
ঘরের সকল লোক করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাব আগুনি॥

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণসৌরভ যখন যেদিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখনি সেদিকে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিনি যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী পিরীতে বান্ধিল তায়॥

মেঘ যামিনী অতি ঘন আঁধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী কর অভিসার॥
ঝলকত যামিনী দশদিশ ব্যাপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গ হি মেল।
নব অনুরাগভরে পথ চলি গেল॥

বরিখত ঝরঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ॥
না হেরিএ নাথ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলুঁ যাঁহা নাগর-রাজ॥

বলরামদাসের একটি পদ :

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমেষ আঁখি।
কোটিকল্প যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
হিয়ার ভিতর থুতে না হয় পরতীত।
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হতে কে কৈল বাহির।
তেঁই বলরামের পঁহু চিত নহে স্থির॥

এখন লোচনদাস :

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস।
আমি নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি॥
আমার অনেক দিবসে মনের মানসে।
তোমাধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মাণিক নও হার করি গলায় পরি।
ফুল নও যে কেশের করি বেশ॥
আমায় নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি।
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে।
আমি চাই বৃন্দাবন পানে॥
এলাইয়া কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালেতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পারি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নুপুর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচনদাসের এই সাধ॥

এখন একটি অখ্যাত কবির একটা পদ দিচ্ছি। কবি অন্যদের মতো বিখ্যাত না হলেও যে দু-একটা কবিতা লিখে রেখে গেছেন তা পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতো।

শুন লো পরাণ সই
মরম কথা তোরে কই
আমি গিয়েছিলাম যমুনারি কূলে।
(সাঁঝের বেলা)
দেখলাম নন্দের নন্দন কানু
করেতে মোহন বেণু
ব্যাধছলে কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্যসুধা চার
আধ ছটা আটা তার
আঁখিপাখী তাহাতে মজিল।
আমার মনমৃগী সেই কালে
পড়িল ব্যাধের জালে
বদ্ধ হয়ে সেখানে রহিল॥

(আমার কি না ছিল সই)

আমার ধৈর্যশালা হেমাগার

গুরুগৌরব সিংহদ্বার

সতীত্ব ধরম কপাট ছিল তায়।

বংশীরব বজ্রাঘাত

পড়ে গেল অকস্মাৎ

সমভূম করিল আমায়।

দন্তশালে মত্ত হাতী

বাঁধা ছিল দিবারাতি

ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষঅঙ্কুশে।

দন্তের শিকল কাটি

আবেশে লুকাল ছুটি

পলাইয়া গেল কোন দেশে।

আছে শুধু প্রাণ বাকি

তাও বুঝি যায় সখি

কি করব কহবি উপায়।

শ্যামানন্দ দাসে কয়

শ্যাম তো ছাড়িবার নয়

পার যদি ধর গিয়া পায়।

এ তো গেল সামান্য দু-চারটে পদ। এরকম কতশত ভালো ভালো পদ পদ-সংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া যায় তার আর ইয়ত্তা নেই। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির হাজার হাজার করে দু হাজার পদ বাদ দিলেও সংগ্রহগ্রন্থে আরো প্রায় দু শো পদকর্তার পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, শাক্ত আছে, বৈষ্ণব আছে। এমনকি দু-চারজন স্ত্রী-কবিও যে নেই, তা নয়। প্রতি বছরেই আবার নতুন নতুন পদকর্তাদের পদ আবিষ্কার হচ্ছে। বিশ্বভারতীর পুঁথিখানায় এক নতুন

পদসংগ্রহ পুঁথি আনানো হয়েছে। এর নাম পদমেরুগ্রন্থ। উপর থেকে ভাসা ভাসা যা দেখা গেছে তাতে মনে হয়, কোনো ব্যক্তি এই পুঁথি ভালো করে যত্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অনেক নতুন নতুন পদাবলীর সন্ধান পাবেন।

সে যাই হোক, এখন একালের লেখা আপনাদের যেসব সাধের কবিতা আছে, সেগুলোর সঙ্গে সেকালের লেখা এইসব পদের একবার তুলনা করে দেখুন, উভয়েই সজাতি সগোত্র কি না।

বাংলাদেশের জলহাওয়া আর মাটির গুণে বাংলাদেশের কাব্য হয়ে ওঠে গান। সঙ্গীতপ্রাণ এই কবিতারই নাম লিরিক। সুরের বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে হয় বলে, লিরিকে বলার চেয়ে না-বলাটাই হয় বেশি। যেটা বলা হল, সেটা তো খুবই অল্প। অতিশয় ক্ষীণ তার প্রাণ। ছুঁতে-না-ছুঁতেই তা নুয়ে পড়ে। আর তাকে ধরা যায় না। কিন্তু যেটা বলা হল না, তারই ধ্বনি তো মনের মধ্যে অহরহ গুঞ্জন করতে করতে মনের ভিতর এমন-এক অপূর্ব সুরলোকের সৃষ্টি করে যে, তাকে আর যাই হোক, মর্তলোকের কোনো পদার্থ বলে তো কিছুতেই চালানো যায় না।

বাংলার মাটিতে এই গানের আবেগ এতই প্রবল যে, বাংলা এপিক কাব্যেরও প্রাণবস্তুটি হচ্ছে আসলে লিরিক। দেবদেবীদের স্তুতিমূলক মঙ্গলকাব্যে, কাশীরাম দাসের মহাভারতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে তো পদে পদে এই লিরিক প্রাণবস্তুটিই ধরা পড়ে। এমনকি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এপিক কবি মাইকেলের কাব্যও প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো বড় বড় লিরিকের সমষ্টিমাত্র।

বাংলাদেশের খাঁটি নিজস্ব ধন যে ছেলেভুলানো ছড়া, তাতেও দেখি, লিরিক রসের ছড়াছড়ি। তবে খাঁটি স্বদেশী মালে আজকাল কারোরই

মনস্তুষ্টি হয় না। এ-ছড়া দিয়ে আজকালকার ছেলেদের মন ভুলানো শক্ত। কারণ আজকালকার ছেলেদের সবাই তো আর বাঙালী মায়ের দুধে মানুষ নয়। তারা কেউ মেলিন্স ফুড বেবী, কেউ-বা গ্ল্যাক্সো বেবী, আর কেউ-বা ল্যাক্টোজেন কি কাউ অ্যাণ্ড গেট বেবী।

তবু পরখ করে দেখুন, কেমন এইসব ছড়া:

আষাঢ়ে শ্রাবণে কন্যে, গাঙে নতুন পানি।
আর ডম্বুরের শব্দ শুনে ফুকারে বাঘিনী॥

ওপারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম॥
এপারেতে লঙ্কাগাছ রাঙা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥

আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে॥

রাত পোহালো ফরসা হলো কোকিল করে রা।
দুধু খেয়ে যাদুমণি পড়নেতে যা॥

বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদেয় এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ি যান॥

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে।

আর-একটা একটু মজার রকমের :

বড়বউ গো ছোটবউ গো জলকে যাবি গো।
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি গো॥
কেষ্ট বেড়ান কূলে কূলে তাঁত নিবি গো।
তারি জন্যে মার খেয়েছি পিঠ দেখ গো॥
বড়বউ গো ছোটবউ গো আরেক কথা শুন্‌সে।
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়োবাঁধা মিনসে॥
ঘটি নেয় না বাটি নেয় না নেয় না সোনার ঝারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি॥

ঢঙে এবং সুরে এটি ছেলেভুলানো ছড়ার পর্যায়ে পড়লেও এ-ছড়া দিয়ে ছেলেভুলানোর চেষ্টা না করাই ভালো। এর রস একটু বুড়ো ছেলেদের কাছেই জমবে ভালো।

এইসব ছড়ার থেকে কত রকমের যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা আর কি বলব?

দেখুন তো এগুলো কি রকম :

নদী নদী কোথা যাও।
বাপ ভায়ের বার্তা দাও॥
নদীর জল বৃষ্টির জল যে জলই হও।
আমার বাপ ভায়ের সম্বাদ এনে কও॥

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মউ।
কথা কও না কেন বউ?
কথা কইব কি ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে॥

তাল গাছ কাটন
বিষের বাটন
গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বরটা
আমি করব কি॥

এবার একটা আস্ত ড্রামাটিক লিরিক :

এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥
কাক কালো কোকিল কালো কালো ফিঙের বেশ।
তার অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ॥
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥
বক ধলো বস্ত্র ধলো ধলো রাজহংস।
তার চেয়েও অধিক ধলো তোমার হাতের শঙ্খ॥
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥
জবা রাঙা করবী রাঙা রাঙা কুসুম ফুল।
তার চেয়েও রাঙা কন্যে তোমার মাথার সিঁদুর॥
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥
নিম তিতো নিসুন্দে তিতো আর তিতো মাকাল ফল।
তার চেয়ে অধিক তিতো বোন-সতীনের ঘর॥
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল হিম স্থল আর হিম শীতলপাটি।
তার চেয়ে হিম কন্যে তোমার বুকের ছাতি॥

ভরসা করি, জাহ্নমণি আমাদের ফুল্ মার্কস্ পেয়েই পরীক্ষা পাস করেছিল। আর এর পর, কন্যাও জাহুর ঐ প্রচ্ছন্ন স্তবে তুষ্ট হয়ে তার সঙ্গে তার ঘরে যেতে আর কোনো আপত্তি ওঠায় নি।

এ ছাড়া, বাংলার লোকসঙ্গীতে বাউলের গানে পূর্বাঞ্চলের ভাটিয়ালি কি সারি-জারি গানে বাংলার মেয়েলি ব্রতকথার মাঝে মাঝে ধৃত ছড়ায় যে লিরিক রস আছে, তার ব্যাখ্যা দিতে বসলে পুঁথি বেড়ে যাবে। সুতরাং ক্ষান্ত দিলুম।

তবে বাউলগানের একটু পরিচয় দিতেই হয়। বিস্তারে না হোক সংক্ষেপে। কিন্তু তার আগে একটা ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। রেলের গোলমালে গাড়ি বিকেলে না পৌছে একটু সন্ধ্যে করেই বোলপুর স্টেশনে পৌছল। শুক্লপক্ষের রাত্রি। চারিদিক জোছনায় ভরে গেছে। তখন বাস্-ট্যাক্‌সির রেওয়াজ ছিল না। গোরুর গাড়িই সম্বল। তারই একটাতে চড়ে বসলুম। শান্তিনিকেতনের মেঠো রাস্তা বেয়ে যেতে যেতে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান গান ধরল। তার একটি লাইন আজ চল্লিশ বছরের উপর ধরেও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে :

বন পোড়া যায় সবাই দেখে
আমার মন পোড়ে তা কেউ দেখে না।

বাউলগানকে চর্যাগানের একেবারে সোজাসুজি বংশধর বলে উক্তি করলে সে-উক্তি অত্যুক্তি হবে না। তবে মুশকিল এই যে, বাউলগানের প্রাচীন রূপ আমাদের তত চোখে পড়ে না। বাউলরা ভদ্রসমাজে যেমন অবজ্ঞাত, তাঁদের গানও তেমনি এতদিন সমাজে অনাদৃত ছিল। বাউলরা নিজেই তো নিজেদের বাতুল পাগল ক্ষ্যাপা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে মাটি

করেছেন, অন্যের কি দোষ? কাজে কাজেই পদাবলী গানের মতো বাউলগান কেউ সংগ্রহ করে পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করে যান নি।

বাউলগান এই তো সেদিন মাত্র ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাই আমরা এখন যেসব বাউলগান শুনতে পাই তাদের সবই প্রায় অর্বাচীন। অনেক জায়গায় আবার দেখে-শুনে সন্দেহ হয়, ভদ্রজনেরা সংগ্রহ করার পর তাতে নিজেদের হাতও যেন কিছু কিছু বুলিয়েছেন। তবে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করতে পারেন নি। কারণ ভাষার দিক থেকে খানিকটা আধুনিক মনে হলেও ভাবে আর ইডিয়মে বাউলগান চর্যাগানেরই অনুরূপ। বাউলগানেও তো দেখতে পাচ্ছি সহজধর্মের পুরনো সেই কায়সাধনার অর্থাৎ কায়যোগের সুর। তাই তাঁদের মুখে উঠতে-বসতে এই বচন, যা নেই ভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। এবং ঠিক এই কারণেই তাঁদেরও বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানের কোনো বালাই নেই, তাতে ভক্তিশ্রদ্ধাও কিছুমাত্র নেই।

পদাবলী গান গাইবার জন্যে যেমন নতুন ঢঙের কীর্তনের সুর সৃষ্টি হল, বাউলগান গাইবার জন্যেও তেমনি এক বিশিষ্ট বাউল সুরের আমদানি হল। দুইই বাংলাদেশের নিজস্ব সুর। এবং এই দুই সুরই কালক্রমে অন্য শ্রেণীর অনেক গানেও বেশ মানানসই হয়েই চলে গেছে।

নানা জায়গার থেকে উদ্ধার করা খানকয়েক টুক্‌রো টুক্‌রো বাউল-গানের নমুনা দিচ্ছি। এদের পাঠান্তরও অনেক আছে।

তাই তো বাউল হইনু ভাই।
এখন চারবেদের ভেদবিভেদের
আর দাবি-দাওয়া নাই॥
তাই আর তত্ত্বে ফত্তে মন মানে না।
মনের মানুষ চাই-ই চাই॥

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি তাই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥

প্রেমদুয়ারে নানান্ তালা
পুরাণ-কুরাণ তসবী মালা।
হায় হায় এই বিষম জ্বালা
কাঁইন্দা মদন মরে খেদে ॥

মন্ত্রতন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ
দেবে কি সে ধরা।
উপায় দিয়ে কে পায় তারে
শুধু আপন ফাঁদে মরা ॥

ও তোর কিসের ঠাকুরঘর।
যাকে ফাটকে তুই রাখলি আটক
আগে তারে খালাস কর ॥

নদনদী হাতড়ে বেড়াও অবোধ আমার মন।
তোমার ঘরের মাঝে বিরাজ করে বিশ্বরূপী সনাতন ॥
যদুনাথ বাউল বলে, শুন শুন সাধুজন।
কেন আত্মতীর্থ ত্যাজ্য করে মিছে তীর্থ-পর্যটন ॥

আসলে মনের মানুষ না পেলে বেদ-পুরাণ তীর্থ-তপোবন মন্ত্রতন্ত্র মন্দির-মসজিদ বাউলের কাছে সবই বৃথা। তাইতেই তো তাঁরা খোঁজেন :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার হদিসে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥

তবু না পেলেম তারে
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে
তাইতে মোরে দেখা দেয় না সে রে ॥

কিন্তু নিজের দেহের মধ্যে চিরদিন আসীন মনের মানুষের একবার সন্ধান পেলে বাউল বলেন :

ধন্য আমি বাঁশিতে তোর
আপন মুখের ফুঁক।
একবাজনে ফুরায় যদি
নাইরে কোনো দুখ ॥
একবারেই ফুরায় যদি
কোনো দুখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজ্যা
আর কি আমি চাই ॥

তখন মনে চলতে থাকে এক অপূর্ব রসের তরঙ্গ :

আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজলো কি সে
আনন্দে কি মরণে ॥
এখন আমায় ডাকা মিছে
আমার নাইকো হিসাব আগে পিছে ॥
এ তরঙ্গ দেখবি যদি মিলা নয়ন হৃদয়সনে।
এ রঙ্গ দেখবি যদি মন মিলা হৃদ্-নয়নে।

এ-তরঙ্গে কোনো বিক্ষোভ নেই, চাঞ্চল্য নেই, অস্থিরতা নেই। এ যে সেই

অপার মহারসের তরঙ্গ। এখানে সুখ-দুঃখ ক্ষোভ-বিক্ষোভ উত্থান-পতন সবই একাকার।

তুমি সুখ পেলে হও সুখভোলা।
(ও মন) দুখ পেলে হও দুখ-উতলা॥
লালন কয় সাধন খেলা।
মহারস যার হৃদ্‌কমলে॥

এই মহারস কিংবা সমরস হৃদ্‌কমলে সত্যি উদয় হলে চিরকালের মতো তো বাঁধা পড়া গেল। আর মুক্তি নেই। কিন্তু সে-বন্ধন কষ্টবন্ধন নয়, মহাসুখের বন্ধন। সেখানে সামান্য মুক্তিমোক্ষের ঠাঁই কোথায়?

হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি॥
ফুটে ফুটে ফুটে কমল ফোটার নাইকো শেষ।
এই কমলের যে-এক মধু রস যে তার বিশেষ॥
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই।
তাই তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই।

বাউলগানের পদের মধ্যে লিরিক রসের আস্বাদ পাওয়া গেলেও বাউলগান অনেক জায়গায় কবিতা হতে হতে যেন একটু রয়ে গেছে। সমগ্র বাংলা সমাজের উপর এই গান তেমন কোনো ছাপ দিতে পারে নি, যেমন দিতে পেরেছে পদাবলী গান। তার কারণ আছে। পদাবলী গানের ভিত্তি আসলে নিরেট লিরিক, কোনো সাধনতন্ত্রের উপর তা তো প্রতিষ্ঠিত নয়। এর ভাষাও তাই সাধনমার্গের রূপক ভাষা থেকে মুক্ত। সুতরাং লোকের মনে এর প্রভাব একটু বিস্তৃত হবে বৈকি।

প্রাচীন পদাবলী-গানগুলোকে আমরা সাধারণত বৈষ্ণব-কবিতা

বা বৈষ্ণব-পদাবলী বলে আখ্যা দিয়ে থাকলেও এটা তাদের সঠিক আখ্যা নয়।

চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলাদেশে যে-ধর্মের প্রবর্তন করলেন, তার সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল নামকীর্তন। মহাপ্রভুর ভক্ত শিষ্যেরা বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীন কবিতাগুলো হাতের কাছে পেয়ে তাতে কীর্তনের সুর জুড়ে দিয়ে, তাদের নামকীর্তনের কাজে লাগিয়ে নিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু যে ছেলেবয়েস থেকে শেষপর্যন্ত চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গানের অনুরাগী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবন-চরিতে। গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে :

> বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
> আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত॥
>
> —আদিলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ, ৪২ শ্লোক

> চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
> কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
> স্বরূপ-রামামন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
> গায় শুনে পরম আনন্দ॥
>
> —মধ্যলীলা, ২ পরিচ্ছেদ, ৭৭ শ্লোক

> একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ সঙ্গে।
> অর্ধরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
> যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
> ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
> বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
> ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায় রামানন্দ॥
>
> —অন্ত্যলীলা; ১৭ পরিচ্ছেদ, ৪,৫,৬ শ্লোক

এই কারণেই বোধ হয় এইসব গানের বৈষ্ণব-পদাবলী বলে খ্যাতি। নতুবা দেখা যায়, পদকর্তাদের অধিকাংশই শাক্তধর্মাবলম্বী। অন্তত চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি তো বটেনই। তবে, কাব্যে শাক্ত বৈষ্ণব বলে তো কিছুই নেই। একটা লেবেল এঁটে কবিতার আখ্যা-ব্যাখ্যা দিতে যাওয়াটা অত্যন্ত মূঢ়তার কাজ। আর তা যদি নাই হত, তা হলে ইয়োরোপীয়ন ক্রীশ্চানদের লেখা কাব্য আমাদের তো একেবারেই ভালো-লাগত না। আমরা বিধর্মীর রচনা বলে তাকে দূরেই ঠেলে রাখতুম।

ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে ব্যবহার হয়েছিল বলেই এইসব কবিতারও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়াটা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এরকম শুধু এদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও অনেক ঘটেছে, দেখা যায়। ইহুদীদের রচিত খ্রীস্টানদের মাননীয় বাইবেলের পুরোনো অংশে রাজা সলোমনের লেখা বলে প্রসিদ্ধ The Song of Solomon নামে এক অতি অপূর্ব প্রেমসংগীত আছে। এই গানের একটা লাইন এইরকম :

A bunch of myrrh is my well-beloved unto me;
he shall lie all night betwixt my breasts.

ধর্মপুস্তকে লেখা আছে বলে ধর্মযাজকদের কৃপায় এই ব্রেস্‌ট্‌স আর ব্রেস্‌ট্‌স রইল না। গির্জের দু-দুটো চূড়ো বলেই তাদের ব্যাখ্যা চলে গেল।

পদাবলীরও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া রীতি হয়ে দাঁড়ালেও, এটা তাদের আসল ব্যাখ্যা নয়। কাব্যরস অনির্বচনীয়। আখ্যা-ব্যাখ্যা দিয়ে তার কূল-কিনারা পাওয়া শক্ত। পদ্য হয় কবিতা হল, না হয় হল না। যেটা কবিতা হল, সেটা নিয়ে নানাপ্রকার টীকা-টিপ্পনী করা যদিও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তার স্বরূপ শুধু কথা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব।

এসব কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের নাম আছে বটে, কিন্তু তাঁরা কাব্যজগতে ঠিক স্বর্গের দেবতা নন, অনেকটা মর্তলোকের মানুষেরই মতো। তাঁদেরও সুখ-দুঃখ আছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, মান-অভিমান আছে, এমনকি লজ্জা ভয় ঈর্ষাও আছে। পৃথিবীর সব দেশেরই কাব্যে দেবতারা মানুষেরই মতো, এবং ঠিক এই কারণেই তাঁরা আমাদের এত আপনার জন। শুধু আধ্যাত্মিকতাই যদি তাঁদের একমাত্র সম্বল হত তা হলে তাঁরা আমাদের এত প্রিয় হতেন কি না সন্দেহ।

ভাষায় লেখা এইসব প্রাচীন কবিতা পড়ে যদি কারোর মনে ধর্মভাবের উদয় হয়, তা হলে তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই কবিতাগুলিকে নিছক কবিতা বলেই মেনে নিলে বোধ হয় তাদের প্রতি সদ্বিচার করা হবে। কেবল দেখার বিষয় এইটুকু যে, এগুলোর ভিতর কাব্যের ধ্বনি আছে কি না, আর সেই ধ্বনি মানুষকে এই দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে কি না, তা সে যতই ক্ষণিকের তরে হোক না কেন।

মুসলমানী আমলের থেকে বাংলা ভাষায় সঙ্গীতপ্রাণ লিরিকের যে-ধারা একবার শুরু হয়ে গেল, আজ প্রায় ছ শো বছর ধরে সে-ধারা অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। সে-ধারা কখনো ক্ষীণভাবে কখনো স্ফীত অবস্থায় প্রবাহিত হয়ে আমাদেরই সময়ের কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পৌছল। তাঁর হাতে পড়ে বাংলা লিরিক এমন-এক ছাপ পেয়ে গেল যে, সে-ধারা আর কখনো লুপ্ত হয়ে যাবে সে-আশঙ্কা এখন নেই। যতদিন বঙ্গদেশ থাকবে, যতদিন বাংলা ভাষা জীবিত আছে, ততদিন বাংলা লিরিকও প্রাণবন্ত হয়ে থাকবে। তবে আমাদের স্বদেশী আমলে বাংলা লিরিক যে ঠিক কী রূপ নেবে, তার বিচারের সময় এখনো উপস্থিত হয় নি। সে-বিচারের ভার আমার পরবর্তীদের উপরই রইল।

উপসংহারে বহুদিনগত সেই অতীতকালের দুটি অপূর্ব বর্ষার গানের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার এই নিবন্ধ শেষ করছি। বর্ষাঘন রাত্রে মানুষের চিরন্তন বিরহী মনের ছবি এই দুটি কবিতায় কথা দিয়ে আঁকা। এর একটি জ্ঞানদাসের, অপরটি বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে॥
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরি বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝাঁ ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে॥

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর সর হন্তিয়া॥
কুলিস কত শত পাত মোদিত
মউর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি জায়ত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর জামিনি
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

কত শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল। কত রাজা-বাদশা এল গেল। কত রাজ্য-মসনদ উঠল পড়ল। কত গড়-ইমারত ভাঙল গড়ল। কত মন্ত্রী-উজির, শেঠ-সওদাগর, লোকলস্কর, ধনদৌলত কালের স্রোতে ভেসে চলে গেল। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে বাংলার এই নিজস্ব লিরিকগুলি আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের মনে কি যে অসীম আনন্দের সৃষ্টি করে এসেছে, এবং এর পরে যে কতদিন ধরে সেই একই আনন্দ সঞ্চার করে চলবে, তা কে বলতে পারে।

—

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

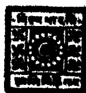
৮৮। নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক
৮৯। সরল স্থায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৯০। খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
৯১। ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৫। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৯৯। ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০১। ধনুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
*১০২। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
১০৩। তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*১০৫। কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
১০৮। সৌন্দর্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
১০৯। পোর্সিলেন ॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
১১০। কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার
*১১১। পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

* সচিত্র

প্রাকৃত সাহিত্য

শ্রীমনমোহন ঘোষ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১২৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

প্রাকৃত সাহিত্য

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ

শ্রাবণ ১৮৭৯ শক : সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১২৬

মূল্য 0·50 টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর শ্রীশশধর চক্রবর্তী

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লি.। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

২'১

একাধারে বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং
সাহিত্য ও অধ্যাত্মতত্ত্বের রসজ্ঞ
ডক্টর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের
করকমলে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত সমর্পিত।

প্রাচীন ব্যাকরণ-লেখকেরা এ সম্বন্ধে যাই বলুন-না কেন, প্রাকৃত হচ্ছে 'প্রকৃতি'র বা জনগণের ভাষা। সেই হিসাবে বলতে হয়, প্রাকৃতের সংস্কার করেই গড়ে উঠেছে সংস্কৃত-ভাষা। আর এই 'সংস্কৃত' নামটিও খুব প্রাচীন নয়। এমনকি পাণিনি-মুনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের কোথাও আলোচনা প্রসঙ্গে সংস্কৃতকে আমাদের অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি মাঝে মাঝে যে 'ভাষা' কথাটি ব্যবহার করেছেন তাতেই কাজ চলেছে। এতে বোঝা যায়, পাণিনির কালে যে বাগ্‌ধারা লোকের মুখে মুখে চলত, সংস্কৃত হচ্ছে তারই শিষ্টজন-সম্মত রূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালের কথ্যভাষা স্বাভাবিক কারণে এই সংস্কৃতের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আমাদের আলোচনা ক্রম-বিকশিত কথ্যভাষা অথবা প্রাকৃত ভাষা নিয়ে। পালি, বৌদ্ধসংস্কৃত, অর্ধমাগধী এবং নাটকের প্রাকৃত, এই সবই হচ্ছে প্রাকৃত ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার কথঞ্চিৎ মাজা-ঘষা রূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাকৃত ভাষা এবং প্রাকৃত সাহিত্যের কথায় সাধারণত কেউ পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতের কথা ভাবে না। আমরাও সেই রীতি অনুসরণ করব, বর্তমান প্রসঙ্গে।

প্রাকৃত মূলত জনগণের ভাষা হলেও এ ভাষার যে-সাহিত্য আমরা পাচ্ছি তা মোটেই খাঁটি গণসাহিত্য (folk-literature) নয়। এ সাহিত্যের যে নানা রূপ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাতে সংস্কৃতের (অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের) প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। অথচ এতে সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরতা বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য সব কিছুই স্বল্পতর। তবু যে এর মূল্য নেই, তা নয়। খাঁটি জনগণের সাহিত্য না হলেও এর

থেকে আমরা প্রাচীন ভারতীয় গণসাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধির সম্পর্কে যে কিছু কিছু ইঙ্গিত মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি, তা একেবারে নগণ্য নয়।

সেকালকার সাধারণ লেখাপড়ার ব্যাপারে প্রাকৃত কখন থেকে চলেছিল, তা ঠিক জানা যায় না। যতদূর মনে হয় মৌর্যরাজ সুবিখ্যাত অশোকই হয়তো জনসাধারণের কাছে তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ প্রচারের জন্যে, এ বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা বানিয়ে ছিলেন; কারণ, 'অর্থ-শাস্ত্রে'ও দেখা যায় যে, রাজকীয় চিঠিপত্র এবং অনুশাসন আদির কথা আলোচনা করতে গিয়ে কৌটিল্য কেবল সংস্কৃতের কথাই বলেছেন। তবু জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত ভাষা যে নিজ জীবনীশক্তির পরিচয় দিতে দিতে অব্যাহত ভাবে এগিয়ে চলেছিল তার মুখ্য প্রমাণ, প্রাকৃতের মূল্য সম্পর্কে অশোকের পূর্বোল্লিখিত স্বীকৃতি। তবে হয়তো অশোক এ বিষয়ের আদি পথিকৃৎ নন। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোক এবং নিচুস্তরের লোকদের মুখে প্রাকৃত ভাষা দেওয়া হত এবং এই নাটক যে অন্তত পাণিনির সময়ে বর্তমান ছিল তার সম্বন্ধে কোনো গুরুতর সন্দেহের অবকাশ নেই। তাতেই মনে হয়, নাটকের ভিতর দিয়েই প্রাকৃত ভাষা সর্বপ্রথমে শিষ্ট-সাহিত্যে প্রবেশ করার রাস্তা খুঁজে পেয়েছিল।

নাট্যশাস্ত্রে প্রাকৃতের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতেও মনে হয়, এই প্রাকৃতের ব্যবহার খুব প্রাচীন। কারণ তাতে যে সাতটি মুখ্য প্রাকৃতের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'বাহ্লীকী' বা বাহ্লীক দেশের প্রাকৃত। এই বাহ্লীক মনে হচ্ছে আফগানিস্থানের উত্তরস্থিত 'বল্‌খ' অঞ্চল। বাহ্লীক দেশ যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক-ভাবে যুক্ত ছিল তখনকার দিনে সে দেশের লোকদের ভাষা নাটকে ব্যবহার করা হত। ইতিহাস সে ছায়াচ্ছন্ন অতীতের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছে; তাই মনে হয় এই অতীত সুদূর অতীত। সে

যাই হোক, নাটকের ভিতর দিয়েই যে প্রাকৃত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিল তা মেনে নেবার বিপক্ষে প্রবল যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

নাটকের প্রাকৃত

খ্রীষ্টপূর্ব যুগের নাটক আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে কি না এ কথা ঠিক বলা যায় না। ভাস-কে স্বর্গীয় গণপতি শাস্ত্রী খ্রীষ্টপূর্ব বলে সিদ্ধান্ত করে গেলেও সকলে তা স্বীকার করেন নি। কাজেই আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'ধ্রুবা' গানগুলিকেই আপাতত প্রাকৃত সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বলে মেনে নিতে হবে। এই ধ্রুবা কথা থেকেই হয়তো পরবর্তী কালের 'ধ্রুপদ' কথাটির উদ্ভবহয়ে থাকবে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে তেমন সাদৃশ্য কিছুই এখন নেই, কেবল একটি বিষয় ছাড়া; সে হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রে বেশ বিচিত্র তালের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। নানা রকমের ধ্রুবা নানা বিচিত্র লয়ে বিচিত্র তালে গাওয়া হত, এবং এক হিসেবে এই তালই ছিল ধ্রুবা গানগুলির প্রাণস্বরূপ। নাট্যশাস্ত্রের ৩১-৩২শ অধ্যায়ে এর নিয়মাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ধ্রুবা গান অনেকটা একালকার পরিবেশ-সংগীতের (.background music) কাজ করত। এই ধ্রুবার মুখ্য কাজ ছিল অবস্থা-বিশেষে নায়ক-নায়িকার মানসিক ও হৃদ্‌গত পরিবর্তনের ভাবটিকে, তদনুরূপ আর-একটি ভাবের সুর-লয় সহকৃত প্রসারণের দ্বারা শ্রোতা ও দর্শকদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া; আর প্রাকৃতিক পরিবেশকে তাদের হৃদয়ঙ্গম করানোও ছিল এর আর-এক

কাজ। এসকল ছাড়াও ধ্রুবার অন্য ব্যবহার ছিল। নাট্যশাস্ত্রের ৩২শ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আছে। এ ধ্রুবা গান-সকল সুর-লয় সহকারে গাওয়ার জন্যে হলেও এগুলিতে কাব্যরসের অভাব ছিল না। সংস্কৃত কাব্যের অলংকার-বাহুল্য এবং কৃত্রিমতা এদের মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। বাইরের প্রকৃতি ও তৎসম্পর্কিত ঋতু-পর্যায়ের বৈচিত্র্য এবং তৎসহগামী মানবহৃদয়ের ভাবান্তর ছিল মুখ্যত এই গানগুলির বিষয়বস্তু। তাই এগুলির কোনো কোনোটি একালকার পাঠকগণকেও মুগ্ধ করবার মত।

নানা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত ধ্রুবাগুলির কিছু নমুনা নীচে দেওয়া যাচ্ছে—

মেঘণিরুদ্ধং পেকখিঅ বোম্মং।
পন্থিঅ-দারা অংসুকিলিন্না ॥

আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে দেখে পথিক-বধূর চোখ জলে ভিজে উঠেছে।

তড়িসণ্ণদ্ধং মেহসংরুদ্ধং।
জলধারেহিং রুদদীবণ্ডং ॥

যে আকাশ মেঘে ঢেকেছে এবং যাতে বিজুলীও জোড়া রয়েছে, সে যেন জলধারা বর্ষণ করে কাঁদছে।

কমলাঅরেসুং ভমরালএসুং।
মদমুক্কহত্থো পবিসেঈ হথী ॥

যে কমল-সরোবরে ভ্রমরগুলি বাসা বেঁধেছে তাতে এক মত্ত হস্তী প্রবেশ করছে।

গজ্জন্তে জলদা ণচ্চন্তে সিহিণো।
গাঅন্তে ভমরা রম্মে পাউসএ ॥

এই সুন্দর বর্ষাকালে মেঘগুলি গর্জন করছে, ময়ূরগুলো নাচছে এবং ভ্রমরগুলো গুণগুণ করছে।

জলদণাদরং সুণিঅ কুংজরো ।
ণদদি কাণণে পডিগআউলো ॥

মেঘের গর্জন শুনে প্রতিদ্বন্দ্বী হাতির শব্দ আশঙ্কা করে হাতিটি বন থেকে নিনাদ করছে।

পবণাহিঅআ তরুণা তরবো ।
কুসুমুগ্ গমএ বিহসন্তি বিঅ ॥

যে নূতন গাছগুলিতে ফুল দেখা দিয়েছে বাতাস সেগুলিকে কাঁপাচ্ছে; মনে হচ্ছে যেন তারা হাসছে।

সুরুচিরণয়ণং বরমণিণিঅরং ।
মম মদজণণং তব বদণমিদং ॥

তোমার মুখখানি, এবং মূল্যবান্ মণির মত সুন্দর তোমার চোখ-দুটি, আমাকে মাতাল করে তুলেছে।

হংসাগমণধীরং কাসাংসুঅবিচিত্তং ।
এদং সরদকালে রম্মং সুরহিতোঅং ॥

শরৎকালে জল সুন্দর এবং সুগন্ধি, এতে শান্ত হাঁসগুলো বেড়াচ্ছে এবং এ (শরৎকাল) যেন কাশফুলের কাপড় পরেছে।

হিমাহদে বণম্মি পণট্ঠপঙ্কতোএ ।
করেণুআ-বিহীণো উবেদি মত্তহত্থী ॥

শীতকালের বনে যেখানে পঙ্কজল শুকিয়ে গেছে, হস্তিনীবিহীন মত্ত হস্তী সেখানে এসে প্রবেশ করল।

কুসুমগন্ধবাহী সলিল-রেণুপুন্নো ।
রমণি বাদি বাদো মণসিজং জণেন্তো ॥

কুসুমগন্ধবাহী ও সলিলরেণুপূর্ণ চমৎকার বাতাস বইছে ও কামকে জাগিয়ে তুলছে।

বহুকুসুম-সোহিএ কমলবণ-সণ্ডএ ।
সহচর-সহাইণী পরিচরদি হংসবহূ ॥

বহু ফুলে শোভিত কমল-বনখণ্ডে নিজের সহচরটিকে সঙ্গে করে হংসী বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

পুলিণ-তলঙ্গণএ কমলণিধিবাসিণী।
পিঅঅমবাসগিহং বিসরদি সারসিআ॥

কমল-সরোবর-বাসিনী সারসী চড়ায় এসে তার প্রিয়তমের বাসাটি খুঁজছে।

রাহুপরাগহিঅসোহং চন্দং গহে ণিসমিউণ।
তারাগণো বিশুরুসোঅং তেজোংসুএহি রুদদীব॥

রাহুগ্রাসের ফলে চাঁদের শোভা চলে গিয়েছে শুনে তারাগুলি যেন নিতান্ত শোকভরে দীপ্তিরূপ চোখের জল ফেলছে।

গিরিচর-বারণরূবং খুভিদমহণ্ণহণাদং।
পডুপবণেণ বিধুদং ভমদি বলাহঅজূথং॥

প্রবল বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে মেঘগুলি আকাশে চলে বেড়াচ্ছে, তাদের দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ে' হাতির পাল, আর তাদের গর্জন হচ্ছে যেন ক্ষুব্ধ সমুদ্রের নিনাদ।

সসিকিরণ-লম্বহারা উডুগণ-কিদাবতংসা।
গহগণ-কিদঙ্গ-সোভা জুবদি বিঅ ভাদি রাঈ॥

চন্দ্রকিরণের হার ঝুলিয়ে, তারার শিরোভূষণ পরে' আর গ্রহগণের অলংকার অঙ্গে সাজিয়ে, রাত্রি যেন যুবতীর মত শোভা পাচ্ছে।

উডুগণকুসুমবদী গহগণকিদতিলআ।
রজণিকরণিভমুখী বজদি বিঅ অমু ণিসা॥

রাত্রি যেন নক্ষত্রের ফুল পরে গ্রহগণের তিলক এঁকে চাঁদের দিকে (অভিসারে) চলেছে।

গঅণতলংগণ-হিণ্ডণও কিরণসহস্স-বিভূসিদও।
বিহুণিঅ মেহপডংসুঅ উদয়দি চন্দণডো গগণে।

গগনতলচারী নটরূপী চন্দ্র কিরণসমূহে সজ্জিত হয়ে মেঘের পরদা ঠেলে গগনের (রঙ্গভূমিতে) এসে দেখা দিল।

বিজ্জুকসাহিং পহদং মরুদ্ধিং।
পরুদদি গয়ণং ভিসমিহ গদতারং ॥

মরুদ্‌গণ বিদ্যুতের কশাঘাত করছে বলে আকাশ তারা ঢেকে খুব কাঁদছে।

কুঞ্জং বিলোডিঅ গঅবরে সরে বিকসিঅম্মি গদে।
পংকঅং বিহাঅ ভমরজুবা ভমই ভমরীগণ-পরিগহিঅ ॥

কুঞ্জ ভেঙে গজবর বিকশিত সরোবরে প্রবেশ করলে পদ্ম ছেড়ে ভ্রমরযুবা ভ্রমরীগণের সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছে।

রজণীবিরমে অদিভীমরবো ভয়সংজণণো খগকোসিগও।
অণুবাষসএহি অবহত্থিদও পরিমগ্‌গই কোটরঅং তুরিদং ॥

রাত শেষ হয়ে গেলে ভয়-জাগানো ভয়ানক শব্দকারী পেচক-পক্ষী পশ্চাতে ধাবমান কাকগুলির তাড়া খেয়ে নিজের কোটর খুঁজছে।

পফুল্লফুল্লপাদবং বিহংগম-সোভিদং।
বণং পগীদছপ্‌পদং উবেই এস কোইলা।

যে বনে গাছগুলি ফোটা ফুলে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে ভ্রমরগুলি গান করছে, আর আর পাখি এসে যাকে শোভিত করেছে সেখানে কোকিলা এসে দেখা দিল।

মনে হয়, নাট্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত এই ধ্রুবাগুলি যে-কোনো নাটকে ব্যবহার করা চলত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালের নাট্য-প্রযোজকেরা নিজ নিজ নাটকে গাওয়াবার জন্য যে নূতন নূতন গান রচনা করাতেন তারও প্রমাণ আছে। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অপভ্রংশে রচিত যে গানগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলিই হচ্ছে এর নিদর্শন। এই অপভ্রংশ গানগুলি 'বিক্রমোর্বশী'র সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় এগুলি হয়তো কালিদাসের রচিত নয়; কোনো

নাট্য-প্রযোজকই হয়তো এগুলি রচনা করে থাকবেন, অথবা করিয়ে থাকবেন। কিন্তু যিনিই রচনা করে থাকুন, এই অপভ্রংশ গানগুলির সাহিত্যিক রস নগণ্য নয়।

বংহিণ পইং ইঅ অব্ভথিঅমি আঅক্খহি মং তা।
এত্থ বণ ভমন্তেঁ জই পইঁ দিট্‌ঠী সা মহ কন্তা॥
ণিসমাহি মিঅঙ্কসরিস-বঅণা হংসগঈ।
এ চিণ্‌হেং জাণীহিসি আঅকখিউ তুজ্‌ঝ মইং॥

হে পাখি, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি : বল, এই বনে বেড়াতে বেড়াতে তুমি আমার প্রিয়াকে দেখেছ কি না। শোন, তার মুখখানি হচ্ছে চাঁদের মত, আর গতি হচ্ছে হংসের, এই দুটি চিহ্ন থেকেই তাকে চিনতে পারবে, এই তোমাকে বলছি।

লএ পেক্‌খ বিণু হিঅএং ভমামি।
জই বিহি জোএঁ পুণি তহিং পাবিমি॥
তা রণ্ণে বিণু করমি ণিভন্তী
পুণু ণই মেল্লইঁ দাহ কলন্তী॥

লতে, আমি শূন্যহৃদয়ে বেড়াচ্ছি, যদি দৈবাৎ তাকে পেয়ে যাই তবে এই অরণ্যানী ছেড়ে অন্যত্র ভ্রমণ করব ; এই কৃতান্তস্বরূপা অরণ্যানীতে আর প্রবেশ করব না।

মোরা পরহুঅ হংস বিহঙ্গম
অলি গঅ পব্বঅ সরিঅ কুরঙ্গম।
তুজ্‌ঝহ কারণে রণ্ণ ভমন্তে
বহু বহু পুচ্ছিঅ মই রোঅন্তেঁ॥

আমি তোমার খোঁজে অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে, ময়ূর, কোকিল, হংস, অন্য পক্ষী, অলি গজ, সরিৎ এবং মৃগকে কেঁদে কেঁদে বার বার প্রশ্ন করেছি।

কেবল প্রাকৃত গানেই অভিনীত নাটকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হত তা নয় ;

নিচুস্তরের লোকদের মুখে তাদেরই চরিত্রের ও চলা-বলার নিখুঁত রূপায়ণের জন্যও ব্যবহৃত হত প্রাকৃত ভাষা। তাতে নাটকের রূপসমৃদ্ধি যে পরিমাণে বাড়ত সংস্কৃত ভাষায় তা কখনোই সম্ভবপর ছিল না। নীচে কবি ভাসের 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ' থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ভট—কো কালো হং ভট্টিদারিআএ বাসবদত্তাএ উদএ কীলিদুকামাএ ভদ্দবদী-পরিচারঅং গত্তসেবঅং ণ পেক্খামি। ভাব পুপ্ফদন্তঅ। গত্তসেবঅং ণ পেক্খসি। কিং ভণাসি—এসো গত্তসেবও কণ্ডিসমুণ্ডিগিণিএ গেহং পবিসিঅ সুরং পিবদি ত্তি গচ্ছহ ভাবো। (পরিক্রম্য) ইদং কুণ্ডিল সুণ্ডিগিণীএ গেহং জাব ণং সদ্দাবেমি। গত্তসেবঅ, গত্তসেবঅ!

(নেপথ্যে)

কো দাণিং এত্থ রাঅমগগে গত্তসেবঅ গত্তসেবঅ ত্তি মং সদ্দাবেদি।

ভট—এসো গত্তসেবও সুরং পিবিঅ পিবিঅ, হসিঅ হসিঅ মদিঅ মদিঅ জবাপুপ্ফং বিঅ রত্তলোঅণো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। এদস্স পুরদো ণ চিট্‌ঠিস্সং।

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দিষ্টো গাত্রসেবকঃ)

গাত্রসেবক—কো দাণিং এসো এত্থ রাঅমগ্‌গে গত্তসেবঅ গত্তসেবঅ ত্তি মং সদ্দাবেদি। পাণসালাদো ণিকন্তো দিট্‌ঠম্হি মম সুহূরেণ সুরুট্‌ঠেণ। অমুদজমলএণ ঘিদ-মরিঅ-লোণ-রুসিদে মংসখণ্ডে মুখে পক্খিত্তে অ। পুসা রজ্জই পীদাজই। অত্তা ণং দণ্ডুজ্জুআ হোই।

ধণ্ণা সুরাহি মত্তা ধণ্ণা সুরাহি অণুলিত্তা।

ধণ্ণা সুরাহি ণ্হাদা ধণ্ণা সুরাহি সংএবিদা॥

অধণ্ণা অত্তণো পুত্তদারাণং কট্‌ঠং পিট্‌ঠং সুণন্তা জে মূঢ়া ণরাঃ সুসমিদ্ধা সুরাভটাঅং ণ জোজঅন্তি। তা ণ জাণে জমলোএ বা ণরঅং অত্থি ণ ত্থি অ।

(চতুর্থ অঙ্ক—তার পরে একটি পদাতির প্রবেশ)

পদাতি—ভর্তৃদারিকা বাসবদত্তা জলকেলি করতে যাবেন বলে আমি কতক্ষণ ধরে ভদ্রবতীর পরিচারক গাত্রসেবককে খুঁজছি। ভাব পুষ্পদন্ত, গাত্রসেবককে দেখতে পাচ্ছেন না। 'কি বলছেন?' 'এই যে গাত্রসেবক কণ্ডিলশুঁড়িনীর ঘরে ঢুকে মদ গিলছে' আচ্ছা, আপনি

যান! (একটু চলে গিয়ে) এই যে কণ্ডিলশুঁড়িনীর ঘর। এবার একে হাঁকার দেওয়া যাক—ওরে গাত্রসেবক, গাত্রসেবক!

(নেপথ্যে)

কে এখন এই বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে, গাত্রসেবক গাত্রসেবক বলে চেঁচাচ্ছে?

পদাতি—এই যে গাত্রসেবক মদ গিলতে গিলতে, হাসতে হাসতে, টলতে টলতে জবাফুলের মতো রাঙা চোখ নিয়ে এদিকেই আসছে। এর সুমুখে দাঁড়াব না।

(তার পরে যথাবর্ণিত গাত্রসেবকের প্রবেশ)

গাত্রসেবক—কে এখন এই বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাত্রসেবক গাত্রসেবক বলে চেঁচাচ্ছে! পানশালা থেকে বার হতে গিয়ে রাগী শ্বশুরব্যাটা আমাকে দেখে ফেলেছে। সবে অমৃতভাণ্ডের সঙ্গে ঘি-মরিচ-নুন দিয়ে রাঁধা মাংসখণ্ড মুখে ফেলেছি। বৌ মানুষেরও এ খেলে ফূর্তি হয়; তবে শাশুড়ি অবিশ্যি তাকে লাঠি নিয়ে উঠবে।

বাহাদুর তারা যারা মদ খেয়ে মাতাল হয়, বাহাদুর তারা যাদের গায়ে মদ গড়িয়ে পড়ে, বাহাদুর তারা যারা মদে চান করে, বাহাদুর তারা যারা মদ খেয়ে চৈতন্য পায়।

আর কী তাদের বাহাদুরী—যারা নিজের মাগ-ছেলের কষ্ট-দুঃখের কথা ভেবে টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও মদের পুকুর তৈরী না করে। তার পর মনে হয় না যমলোকে নরক আছে বা নেই।

সংস্কৃত ভাষায় হাতির মাহুত মদ্যপায়ী গাত্রসেবকের এ সব উক্তি কি নাটকে শোভা পেত?

সাধারণ সংস্কৃত নাটকে যেখানে যেখানে বিদূষক চরিত্রটি বর্তমান,

সেখানেও প্রাকৃত ভাষাই এ চরিত্রটির মুখে মানানসই হয়েছে। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বিদূষকের উক্তিতে মাঝে মাঝে সেকালের গণ-সাহিত্যের আভাসও পাওয়া যায়। যেমন চতুর্থাঙ্কে গণিকা বসন্ত-সেনার আট-মহলা বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বিদূষক যখন ব'সে-থাকা একটি স্থূলাঙ্গিনী নারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, তখন চেটির সঙ্গে তার যে উক্তি-প্রত্যুক্তি হয়েছিল তা বেশ কৌতুকজনক। নীচে তা উদ্ধৃত করা গেল—

চেটি—অজ্জ, এসা অম্হাণং অজ্জআএ অত্তিআ।

বিদূষক—অহো সে কবট্ঠডাইণীএ পোট্টবিত্থারো। তা কিং এদং পবেসিঅ মহাদেবং বিঅ দুআরসোহা ইহ ঘরে ণিম্মিদা।

চেটী—হদাস মা এব্বং উবহস অম্হাণং অত্তিঅং। এসা খু চাউত্থিএণ পীডিঅদি।

বিদূষক—(সপরিহাসং) ভঅবং চাউত্থিঅ, এদিণা উবআরেণ মং পি বম্হণ আলোএহি।

চেটি—হদাস মরিস্সসি।

বিদূষক—(সপরিহাসং) দাসীএ ধীএ, ববং ঈদিসো স্হণপীণজঠরো মুদো জ্জেব।

সীধু সুবাসবমত্তিআ এআবত্থং গদাহি অত্তিআ।

জই মবই এথ অত্তিআ ভোদি সিআল-সহস্সস্স পজ্জত্তিআ॥

দাসী—ঠাকুর, ইনি হলেন আমাদের কর্ত্রীর মা।

বিদূষক—ও বাবা, এই কবট্ঠ-ডাইনীর আচ্ছা, একে মহাদেবের মূর্তির মত আগে ঘরে ঢুকিয়ে তবে কি দরজাখানি বানানো হয়েছে?

দাসী—হতভাগা বামুন, এমন উপহাস করো না আমাদের মা ঠাকুরুনকে! ইনি তিন দিন আড়া জ্বরে ভুগছেন।

বিদূষক—(পরিহাসের সঙ্গে) আরে দাসীর বেটি, এ রকম কোলা ও মোটাসোটা পেট নিয়ে মরাও যে ভালো।—

শীধু-সুরাসব পানে মত্ত হয়ে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে মা ঠাকুরুনের,

তাতে যদি মারা যান আজ তিনি, তবে হাজার শেয়ালের হবে বেশ ভরপেট খোরাক।

মৃচ্ছকটিকে বিদূষকের উক্তি ছাড়াও প্রাকৃতের সরস প্রয়োগ রয়েছে। সে হচ্ছে শকারের উক্তি। এই শকার চরিত্রটি খুব কৌতুকজনক। শকারের অর্থ রাজার শ্যালক, কিন্তু ঠিক বিবাহিতা স্ত্রীর ভ্রাতা অর্থে নয়। সেকালের রাজা-রাজড়াদের বহু পত্নীর সঙ্গে উপপত্নীও থাকত। এসব উপপত্নীদের অর্থাৎ তাদের মধ্যে যিনি রাজার বিশেষ প্রীতিভাজন হতেন, সে উপপত্নীর ভাইদের কেউ কেউ রাজার সঙ্গে সম্পর্কটা নিয়ে রাজপুরুষ এবং পৌরগণের কাছে খাতির-সম্ভ্রম আদায় করত এবং মাঝে মাঝে তাদের উপর জুলুমও করত। এজন্যে তাদের নাম হত শ-কার অথবা শ-যুক্ত সম্পর্ক (= শ্যালক)। 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রথম অঙ্কে দেখি, শকার নায়িকা বসন্তসেনার পিছনে ছুটছে, কিন্তু এই গুণবতী গণিকা, মূর্খ এবং অমার্জিত শকারকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তখন শকার একবার বলছে—

চিষ্ঠ বসন্ত শেণিএ চিষ্ঠ।
কিং যাশি ধাবশি পলাঅশি পক্খলন্তী।
বাশু পশীদ ণ মলিশ্শশি চিষ্ঠ দাব।
কামেণ ডজ্ঝদি হমে হড়কে তবশ্শী
অঙ্গাললাশিপডিদে মংশখণ্ডে।

দাঁড়াও বসন্তসেনা দাঁড়াও।

ওগো, কেন তুমি যাচ্ছ, ধাবিত হচ্ছ, পলায়ন করছ টলতে টলতে। বাসু, প্রসন্ন হও তুমি মরবে না, দাঁড়াও একবার। মুই বেচারী কামের দ্বারা দগ্ধ হচ্ছি যেমন দগ্ধ হয় জলন্ত অঙ্গাররাশির মধ্যে পড়ে-যাওয়া মাংসখণ্ড!

শকার—আর একবার বলছে—

মম মঅনমণঙ্গং মম্মহং বড্ঢঅন্তী
নিশি অ শঅণকে মে ণিদ্দঅং আক্খিবন্তি।
পশলশি ভঅভীদা পক্খলন্তী খলন্তী
মম বশমণুজাদা লাবণশ্শেব কুন্তী ।

দাঁড়াও বসন্তসেনা, দাঁড়াও।

আমার মদন, অনঙ্গ, এবং মন্মথ বাড়িয়ে, রাত্রিতে বিছানায় আমার নিদ্রাকে তাড়িয়ে দিয়ে, আমার বশে এসেও ভয়ভীতা হয়ে টলতে টলতে তুমি যেন রাবণের হাত থেকে কুন্তীর মত ছুটে পালাচ্ছ।

শকার পুনর্বার বলছে—

অম্হেহি চণ্ডং অহিশালিঅন্তী বণে শিআলী বিঅ কুক্কুরেহিং।
পলাশি শিগ্ঘং তুলিদং শবেগ্গং শবেণ্টঅং মে হলঅং হলন্তী।

শিয়ালী যেমন কুকুরগুলো দ্বারা তাড়িত হয়ে পালায়, তেমনি আমাদের দ্বারা কঠোর ভাবে তাড়িত হয়ে আমার হৃদয় বোঁটা-শুদ্ধ চুরি করে শীঘ্র ত্বরিত এবং সবেগে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ।

বসন্তসেনা যখন ভয় পেয়ে নিজ দাসীদের নাম ধরে ডাকছে 'পল্লবিকা' 'পরভৃতিকা', তখন শকারের ভয় হল, পাছে লোকজন এগিয়ে আসে। তাই সে বিটকে বললে, ভাব, বোধ হয লোকজন আসছে। কিন্তু যখন বিট বোঝাল যে অন্য কেউ আসছে না, এরা হচ্ছে বসন্তসেনার দাসীদুটি, তখন—

শকার—ইত্থিআণং শদং মালেমি। শূলে হগে—

বসন্তসেনা—(শূন্যমবলোক্য) হদ্ধি হদ্ধি কধং পরিঅণো বি পরিব্ভট্টো। এত্থ মএ অপ্পা সঅং জ্জেব রক্খিদব্বো।

বিট্—অন্বিষ্যতাম্ অন্বিষ্যতাম্।

শকারঃ—বসন্তসেণিএ, বিলব পরহুদিঅং বা পল্লবিঅং বা শব্বং এব বশন্তমাসং। মএ অহিশালিযন্তীং তুমং কো পলিত্তাইশ্শদি।

কিং ভীমশেনে জমদগ্গিপুত্তে কুন্তীশুদে বা দশকন্ধলে বা।
এশে হগে গেণ্হিঅ কেশহথে দুশ্শাশণশ্শণুকীদিং কলেমি॥

শকার—এক শ মেয়েমানুষ এলেও তাদের ফেলব মেরে। আমি হলাম গিয়ে বীর।

বসন্তসেনা—(আকাশে তাকিয়ে) হায়, হায়, লোকজন যে সরে গিয়েছে। এখন আমার নিজেকেই নিজে বাঁচাতে হবে।

বিট—খোঁজ করো, খোঁজ করো।

শকার—বসন্তসেনা, পরভৃতিকাকে ডাক, পল্লবিকাকে ডাক, অথবা সমস্ত বসন্ত কালকেই ডাক। আমি যখন তোমার পিছনে ছুটেছি তখন কে তোমাকে বাঁচাবে?

সে কি ভীমসেন, না জমদগ্নির পুত্র (পরশুরাম), না কুন্তীপুত্র (অর্জুন) অথবা দশস্কন্ধ (রাবণ)। এই তোমার চুলের মুঠি ধরে আমি দুঃশাসনের অনুকরণ করছি।

মৃচ্ছকটিক যে কালে রচিত হয়েছে তখনকার ভাষা প্রায় অপভ্রংশের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এমন অবস্থায় সংস্কৃতের ভিতর দিয়ে শকারের চরিত্রকে এত সরস ও সর্বজনবোধ্য রূপ দেওয়া চলত কি না সন্দেহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাটকের রচনায় সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব বহুদিন ধরে চলেছে। কেবল প্রাকৃতে রচিত নাটক তাই খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগে দেখা যায় নি। রাজশেখরই বোধ হয় এ বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক। তিনি শৌরসেনী প্রাকৃতে তাঁর 'কর্পূরমঞ্জরী' রচনা করে দেখিয়েছেন, সংস্কৃত ছাড়াও নাটক লেখার কাজ চলতে পারে। কিন্তু নাটকের প্রস্তাবনায় তাঁকে এজন্যে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। নীচে প্রস্তাবনার সে অংশটি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

সূত্রধর—(বিচিন্ত্য) তা কিংতি সক্কঅং পরিহরিঅ পাইঅ-বন্ধে পঅট্টো কঈ।

পারিপার্শ্বিক—সব্বভাসাচদুরেণ তেণ ভণিদং জ্জেব জহা—

অত্থবিসেসা তে চ্চিঅ সদ্দা তে চ্চেব পরিণমন্তু।

উত্তিবিসেসো কব্বং ভাসা জা হোউ সা হোউ॥

সূত্রধর—(ভেবে) তবে, সংস্কৃত ছেড়ে কবি কেন প্রাকৃতে রচনা করতে গেলেন এই নাটক ?

পারিপার্শ্বিক—সর্বভাষাচতুর সেই কবি বলেন—

প্রাকৃতে শব্দগুলি অন্যরূপ পরিণতি লাভ করলেও অর্থবিশেষ তাই থাকে ; আর উক্তিবিশেষ অর্থাৎ বক্তব্যই হল কাব্য, ভাষা যাই হোক-না কেন ?

কিন্তু রাজশেখর যাই বলুন-না কেন, তাঁর এ কথা খুব যুক্তিসংগত নয়। কারণ প্রাকৃতের মধ্যে যে স্বাভাবিক ধ্বনিমাধুর্য আছে, সংস্কৃতের মধ্যে তা খুব সুলভ নয়। অবশ্য রাজশেখরের সমসাময়িক রসিকজনেরাও তা জানতেন। তাই তাঁরা বলেছেন—

পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।

পুরিসমহিলাণং জেত্তিঅমিহন্তরং তেত্তিঅম্ ইমাণম্॥

সংস্কৃত রচনা (অপেক্ষাকৃত) কর্কশ ; প্রাকৃত রচনাই হচ্ছে সুললিত। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে প্রভেদ, এ দুয়ের মধ্যেও তাই।

রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' প্রাকৃতে লেখা হলেও সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত অন্য যে কোনো নাটকের চেয়ে কম সমাদর পায় নি। এর ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব প্রচুর থাকলেও প্রচলিত নানা প্রবাদবাক্যের ব্যবহার করে লেখক ভাষাকে লোকসাহিত্যের কাছে এনে ফেলেছেন। যেমন—

তং সুবণ্ণং জং কসবট্টিকাএ ণিব্বহদি।

তাই হল সোনা যা কষ্টিপাথরে উৎরায়।

সলিলসিত্ত সণগুণগণ্ঠী দিঢ়ং গাঢ়দরো ভোদি।

জলে ভিজানো শণের দড়ির গোরা আরও শক্ত হয়।

চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়ে তিনি এ নাটকে কিছু সৃষ্টিকৌশল

দেখিয়েছেন। যেমন ভৈরবানন্দের চরিত্রে। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

(প্রবিশ্য পটাক্ষেপেণ)

বিদূষক। আসণং আসণং।

রাজা। কিং তেণ।

বিদূষক। ভইরবাণন্দ দুবারে। উববিসৃসদি।

রাজা। কিং সো জো জণবঅণাদো অচ্চত্তুদসিদ্ধী সুণীঅদি।

বিদূষক। অধ কিং।

রাজা। পবেসঅ।

(বিদূষকো নিষ্ক্রম্য তেনৈব সহ প্রবিশ্য)

ভৈরবানন্দ। (কিঞ্চিন্ মদমভিনীয়)

মন্তো তন্তো ণ-অ কিংপি জাণে
ঝাণং-চ ণ কিংপি গুরুপ্পসাদা।
মজ্জং পিবামো মহিলং রমামো
মোক্‌খং চ জামো কুলমগ্‌গলগ্‌গা॥

অবি-অ

রণ্ডা.চণ্ডা,দিক্‌খিদা ধম্মদারা
মজ্জং মংসং পিজ্জএ খজ্জএ বা।
ভিক্‌খা ভোজ্জং চম্মখণ্ডং চ সেজ্জা
কোলো ধম্মো কস্‌স ণ ভাদি রম্মো॥

কিংচ

মুত্তিং ভণন্তি হরিবম্‌হমুহা-বি দেবা
ঝাণেণ বেঅপঢণেণ কদুক্কিআহিং॥
এক্কেণ কেবলমুমাদইদেণ দিট্‌ঠো
মোক্‌খো সুরঅকেলি-সুরারসেহিং॥

(পরদা ঠেলে প্রবেশ করে—)

বিদূষক—আসন নিয়ে এস। আসন নিয়ে এস।

রাজা—কি হবে তাতে ?

বিদূষক—ভৈরবানন্দ দরজায়। তিনি বসবেন।

রাজা—ইনিই কি সেই ব্যক্তি, লোকের কথায় যাকে অদ্ভুত সিদ্ধপুরুষ বলে শোনা যাচ্ছে।

বিদূষক—হাঁ তিনিই বটেন।

রাজা—তাঁকে নিয়ে এসো।

(বিদূষক বার হয়ে তাঁকে নিয়ে প্রবেশ করলেন)

ভৈরবানন্দ—(কিছু টলতে টলতে)

মন্ত্রও জানি না তন্ত্রও জানি না কিছু, আর ধ্যান সম্বন্ধেও সে কথা। তবে গুরুর প্রসাদে—মদও খাব, মহিলাদেরও সঙ্গ করব, আর লাভ করব কুলমার্গসম্মত মোক্ষ।

আর—

চণ্ডাল বিধবা হচ্ছে দীক্ষিতা ধর্মপত্নী, মদও পান করা চলছে, মাংসও খাওয়া যাচ্ছে, খাবার হচ্ছে ভিক্ষার অন্ন, আর চর্মখণ্ড হচ্ছে শয্যা। এই কৌলধর্ম কার না হবে পছন্দ ?

অধিকন্তু—

হরি ব্রহ্মা আদি দেবতার মতে মুক্তির উপায় হল—ধ্যান বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান। কেবল উমাপতি শিবের মতেই মোক্ষ মেলে—সুরত-কেলি এবং সুরারসের সঙ্গে একযোগে।

ভৈরবানন্দের এই কথাগুলি সবই সার্থক। হঠাৎ শুনলে যাকে মনে হয় ধর্মবিরোধী কথা, সে সকলের পিছনে আছে নির্মল সাধন-তত্ত্ব। কিন্তু নাটকীয় রসসৃষ্টির জন্যেই রাজশেখর এ কৌশল অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচিত প্রেমের তত্ত্ব, এ সকলের চেয়ে পাঠককে অনেক বেশি মুগ্ধ করবে। খুব নূতন না হলেও প্রেম সম্বন্ধে

তিনি দুটি বেশ পাকা কথা বলেছেন। বাহ্যিক সৌন্দর্য, এমনকি গুণও প্রেমের কারণ নয়; ব্যক্তিগত রুচিই হল এর মূল। আর প্রেমের দিক দিয়ে সম্রাট্‌পত্নী আর সাধারণ স্ত্রী এদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। ভালোবাসার জগতে সকলেই সমান। রাজশেখরের কবিতা-দুটি এই—

কিং গেঅণট্টবিহিণা কিমু বারুণীএ
ধূবেণ কিং অগুরুণো কিমু কুঙ্কুমেণ।
মিট্‌ঠত্তণে মহিলঅম্মি ণ কিংপি অণ্ণং
রুচিস্‌স অত্থি সরিসং পুণু মাণুসস্‌স॥
জা চক্কবট্টিঘরিণী জণগেহিণী বা
পেম্মম্পি তাণ ণ তিলং পি বিসেসলম্ভো।
জাণে সিরীএ জই কিজ্জদি কোবি ভেদো
মাণিক্কভূষণণিঅংসণ কুঙ্কুমেহিং॥

কি হবে গীত-নাট্য দ্বারা। কি হবে বারুণী (মদ্য) পান করে, কি হবে ধূপের বা অগুরুর ধোঁয়ায় বা কুঙ্কুমে, মেয়েদের মাধুর্য-সম্পাদনের ব্যাপারে মানুষের রুচির মত আর কিছুই নেই।

রাজচক্রবর্তীর পত্নীই হোক, আর প্রাকৃতজনের গৃহিণীই হোক, প্রেমের দিক দিয়ে এদের মধ্যে তিলমাত্রও প্রভেদ নেই, মনে হয় মাণিক্য ভূষণ বসন ও কুঙ্কুমাদির দ্বারা শোভিত দেহশ্রী কেবল যদি ভেদ জন্মায়।

রাজশেখরের পরেও দুয়েকখানি প্রাকৃত নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো বিশেষত্ব নেই।

প্রাকৃত মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত সাহিত্যের উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। এই প্রভাবের মুখ্য দৃষ্টান্ত প্রাকৃত মহাকাব্যগুলি। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত 'সেতুবন্ধ' বা 'রাবণবহো' (রাবণবধ) সর্বপ্রাচীন প্রাকৃত মহাকাব্য। এর কবি প্রবরসেন প্রাকৃত রসিকদের কাছে কালিদাসের মতো সমাদৃত। সুপ্রসিদ্ধ আলংকারিক আচার্য দণ্ডী (সপ্তম শতাব্দী) বলেন—

মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্॥

মহারাষ্ট্রদেশে দেশে ব্যবহৃত ভাষাই হল প্রধান প্রাকৃত। যে সেতুবন্ধাদি কাব্য সুভাষিতরূপ রত্নসমূহের সাগরসদৃশ আকর, সেসকল এই প্রাকৃতেই রচিত। আর সুপ্রসিদ্ধ বাণভট্টও তাঁর 'হর্ষচরিতে'র ভূমিকায় কবিকুলের প্রশংসা করবার সময় বলেছেন—

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥

(রামচন্দ্রের) কপিসেনা যেমন সেতু (বন্ধনের) দ্বারা সাগরের পরপারে গিয়েছিল তেমনি সেতুবন্ধ কাব্যের সাহায্যেও প্রবরসেনের কুমুদোজ্জ্বলা কীর্তি সাগরের পরপারে পৌছে। এই সাগরের পরপারের দেশগুলো হয়তো লঙ্কা যবদ্বীপ চম্পা কম্বুজ আদি রাজ্য। এসব দেশে সেকালে যথেষ্ট সংস্কৃতচর্চা ছিল।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যরসিকেরা সেতুবন্ধের এত তারিফ করলেও একালের বিদ্বৎসমাজ প্রবরসেনকে মেঘদূত-কুমারসম্ভব-রঘুবংশ-রচয়িতা কালিদাসের সমশ্রেণীস্থ বলে মানতে একান্ত নারাজ। কোনো কোনো বিদ্বান্ অনুমান করেন যে, কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় প্রবর-

সেন (ষষ্ঠ শতাব্দী) বিতস্তা নদীর উপর সেতু-নির্মাণের ঘটনাকে এই কাব্যের দ্বারা স্মরণীয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অপর বিদ্বানেরা বাকটক দ্বিতীয় প্রবরসেনকেই সেতুবন্ধের রচয়িতা বলে মনে করেন। যেহেতু এই রাজার অন্য কোনো সাহিত্যকীর্তি আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি, অনেকে মনে করেন যে, কাব্যখানি কোনো সভাকবির দ্বারা রচিত। তিনি হয়তো উপযুক্ত কাঞ্চনমূল্যে কাব্যখানিকে রাজার নামাঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। একালেও এ শ্রেণীর ঘটনা দুর্লভ নয়, কাজেই কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু যিনিই সেতুবন্ধের রচয়িতা হোন-না কেন, প্রাচীন সাহিত্য-রসিকজনের কাছে কাব্যখানির যে বিশেষ সমাদর ছিল এটা হয়তো নিতান্ত অকারণ নয়। এই কাব্যেব পঞ্চদশ সর্গে (আশ্বাসে) সীতার অন্বেষণ থেকে আরম্ভ কবে দশাননের সংহার পর্যন্ত রামায়ণের সমুদয় ঘটনা বেশ কাব্যকলার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। কবিব নিপুণ বাক্য-যোজনা ও কল্পনাশক্তির প্রভাবে রামায়ণের চিরপরিচিত কাহিনীও নূতন রসের আধার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে এমন কিছু কিছু স্থল আছে, যা আধুনিক পাঠকদেরও মনোরঞ্জন কববার মত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সমালোচকগণ সমগ্রভাবে এর গুণগ্রাম উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁদের মতে এ কাব্য খুব আড়ম্বরপূর্ণ ও অস্বাভাবিক অনুপ্রাসবহুল ভাষায় রচিত, এবং এর অলংকারগুলির মধ্যে দীর্ঘসমাস ও কষ্টকল্পনার একান্ত আধিক্য, যার ফলে শব্দাড়ম্বরের কাছে অর্থগৌরব হার মেনেছে। সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে এর সাদৃশ্য এত প্রবল যে, সাধারণ লোকের অবোধগম্য জটিল প্রাকৃত ভাষায় এ কাব্য রচনার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া ভার। মনে হয়, দুঃসাধ্য সাধনের শক্তি আছে এ কথা জানাবার জন্যেই কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

'গৌড়বহো' (গৌড়বধ) আর একখানি প্রাকৃত মহাকাব্য। এর লেখক বাক্‌পতিরাজ কনৌজের রাজা যশোবর্মণ দেবের সভাকবি ছিলেন। তিনি হয়তো নিজ পৃষ্ঠপোষক রাজার দেহান্তে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচনা করেন। সাধারণত এই মহাকাব্যখানিকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ মনে করা হয়, কিন্তু এ শুধু একখানি রাজপ্রশস্তিমূলক রচনা। এতে ইতিহাসের উপাদান নেই বললেই হয়। সাধারণ সংস্কৃত কাব্যের মত এই মহাকাব্যেরও ভূমিকা বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তুতি নিয়ে। তার পরে কবি, প্রাকৃত ভাষাও যে কেন কাব্যরচনার উপযোগী হতে পারে তার আলোচনা করে আসল কাব্যের আরম্ভ করেছেন। প্রথমেই অলংকারভারবহুল আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় যশোবর্মণের বর্ণনা। কবির কল্পনায় এই রাজা হয়েছেন বিষ্ণুসদৃশ। তার পরেই যশোবর্মণের দিগ্‌বিজয়-যাত্রার বর্ণনা। এ বর্ণনা শেষ করে কবি আত্মচরিতমূলক কয়েকটি কবিতায় দিয়েছেন তাঁর কাব্যরচনার ইতিহাস। এর থেকে জানা যায় যে, যশোবর্মণের সভার বিদ্বদ্বর্গ কবিকে রাজার চরিত্র রচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এখানেই কাব্যখানির আকস্মিক পরিসমাপ্তি।

যদিও কাব্যের নাম থেকে অনুমান হয়, যশোবর্মণের হাতে গৌড়-রাজের নিধনই এই কাব্যের বর্ণনার বিষয়, তবু কাব্যখানি থেকে জানা যায় না—কে ছিলেন এই গৌড়রাজ, কোথায়ই বা ছিল তাঁর রাজধানী, কেনই বা যশোবর্মণের সঙ্গে তাঁর দাঁড়িয়েছিল এমন পরম শত্রুতা। এসব কারণে মনে হয় গৌড়বহ কাব্যখানি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। যে বিরাট মহাকাব্যের রচনা বাক্‌পতির কল্পনায় ছিল, প্রাপ্ত গৌড়বহো তার ভূমিকা মাত্র। সেতুবন্ধ-রচয়িতার চেয়ে তাঁর কাব্যের কৃত্রিমতা অল্প এবং মনে হয় কাব্যগুণও কিছু বেশি। এতে আমরা মাঝে মাঝে সেকালের গ্রাম্য জীবনযাত্রার এমন কিছু কিছু দৃশ্য দেখতে পাই যার

তুলনা সংস্কৃত কাব্যগুলিতে দুর্লভ। যদিও বাক্‌পতি অনেকটা সংস্কৃত কাব্যের ধরনের লিখেছেন তবু তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যাড়ম্বর নেই। তিনি কোনো কষ্টকল্পিত এবং জটিল অলংকার তাঁর কাব্যে প্রায়শ ব্যবহার করেন নি। কেবল উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা আদি অলংকারে ভূষিত বাক্‌পতির রচনায় যে একটি অযত্নসুলভ সৌন্দর্য বর্তমান তা এই শ্রেণীর অন্য রচনায় একান্ত বিরল। দীর্ঘ-সমাসপ্রিয়তার কথা ছেড়ে দিলে তাঁর এই কাব্য রসিকজনকে তৃপ্তি দেবার মত।

এ দুখানি মহাকাব্য ছাড়া আরও প্রাকৃত মহাকাব্য আছে, কিন্তু সেগুলি সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদে রচিত হয় নি। সেগুলি রচনার উদ্দেশ্য ছিল জৈন ধর্মতত্ত্বের প্রচার। সব খাঁটি সাহিত্যেরই মূল উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে সমাজের কল্যাণসাধন, কাজেই ধর্মতত্ত্বপ্রচারের ফলেই এসব মহাকাব্যে উৎকর্ষের অভাব ঘটবার কথা নয়; কিন্তু কোনো সাহিত্যিক সজ্ঞানে যখন তত্ত্বকথা প্রচারের বা (আধুনিক কালের ভাষায়) প্রোপাগ্যাণ্ডা করবার মতলব নিয়ে কিছু লেখেন তখন তাতে সাহিত্যরস-স্ফূর্তির ব্যাঘাত ঘটে। জৈনদের প্রাকৃত মহাকাব্য-গুলি প্রায়শ সাধু বা তীর্থঙ্করদের জীবন অথবা কোনো প্রচলিত উপকথা ও পৌরাণিক কাহিনীর আধারে রচিত এবং জৈনধর্মতত্ত্বটি তার উপর বেশ স্পষ্টভাবে বিন্যস্ত। এই ধরনের সর্বপ্রাচীন প্রাকৃত মহাকাব্য হচ্ছে বিমলসূরীর 'পউমচরিঅ' (পদ্মচরিত্র)। এতে 'পদ্মে'র (বাল্মীকির আদি কাব্যের নায়ক রামের অপর নাম) চরিতকথা ১১৮টি সর্গে (উদ্দেশ) বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থখানিকে এই হিসাবে জৈন 'রামায়ণ' বলা যায়। এই কাব্যটি মহাবীরের প্রধান শিষ্য গোয়মের (গৌতম) উক্তিরূপে রচিত। গৌতম মহাবীরের উপদেশানুসারে এই পদ্মচরিত্র সেনিয়কে (শ্রেণিক বা বিম্বিসার) শোনাচ্ছেন। রামায়ণের এই প্রাকৃত ভাষায় লেখা অনুকৃতি সংস্কৃত কাব্যের ধরনে রচিত হলেও তা বাল্মীকির অমর

সৃষ্টির ব্যঙ্গানুকরণ মাত্র। জৈন পাঠকেরা অবশ্য তা পড়ে খুব খুশি হন, কারণ এতে রাবণ ও আর আর রাক্ষস সব হয়ে দাঁড়িয়েছেন জৈনতত্ত্বের গোঁড়া ভক্ত। বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ রচনা 'মেঘনাদবধ' কাব্যে মাইকেলের রাক্ষসকুলে পক্ষপাত দেখে যাঁদের খুবই চমক লাগে, তাঁরা আশা করি এই ইতিহাস জেনে আশ্বস্ত হবেন। মাইকেল রাক্ষসদের চরিত্র নূতনভাবে এঁকে এমন-কিছু অঘটন ঘটান নি।

স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসও জৈনদের হাতে রেহাই পান নি। হরিবংশের কাহিনীরও তাঁরা কম খোয়ার করেন নি। এ ধরনের সর্ব-প্রাচীন প্রাকৃত মহাকাব্য ধবল কবির লেখা 'হরিবংশ-পর্ব'। এতে কৃষ্ণ ও বলরামের কাহিনী জৈনপরিবেশযুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, এবং তার মাঝে মাঝে আছে জৈনতত্ত্ব ও জৈনধর্মের উপদেশের তীব্র ফোড়ন। এরই সঙ্গে রয়েছে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর ছেলেদের ইতিহাস এবং কৃষ্ণ-বলরামের বংশধরগণের কাহিনী। ধৃতরাষ্ট্র ও কর্ণের বংশধরগণ জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে তাঁদের পিতৃগণের দুষ্কার্যের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এই প্রাকৃত মহাকাব্যে। এবং এর অবসানে স্বর্গারোহণের বদলে পঞ্চ-পাণ্ডব সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করে নির্বাণলাভ করেছেন। এতে ভামহ দণ্ডী বাণভট্ট হরিষেণ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায় বলে মনে হয় এর রচনাকাল সপ্তম শতাব্দীর আগে নয়; এবং পুষ্পদন্ত নামে দশম শতাব্দীর কোনো কবি এর উল্লেখ করেছেন; কাজেই এ শতাব্দীর আগেই এর রচনা হয়েছিল।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গুণচন্দ্র গণী 'মহাবীরচরিয়' (মহাবীরচরিত) নামে এক মহাকাব্য রচনা করেন। নাম থেকে জানা যাচ্ছে যে, এর বিষয়বস্তু শেষতীর্থঙ্কর মহাবীরের পুণ্যচরিত্র। এর রচনার তিন বছর পরে দেবেন্দ্রগণী বা নেমিচন্দ্র এ ধরনের আর একখানি মহাকাব্য লেখেন। এর বিশেষত্ব এই যে, মাঝে মাঝে এতে অপভ্রংশ কবিতা ছড়ানো আছে।

জৈনেরা কৃষ্ণ এবং মহাভারতীয় বীরগণকে তীর্থঙ্কর নেমিনাথের সমসাময়িক মনে করে থাকেন। এই নেমিনাথের চরিত্র নিয়েও প্রাকৃত কাব্য লেখা হয়েছে। এদের মধ্যে একখানি আবার অপভ্রংশে রচিত। ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হরিভদ্র তার 'নেমিণাহচরিউ' (অপভ্রংশ) সমাপ্ত করেন। এতে তিনি সংস্কৃত কাব্যের আদর্শে নানা রোমান্টিক দৃশ্য এঁকে কাব্যকে গড়ে তুলেছেন। কবিসুলভ কারুকার্যে তাঁর এতটা ঝোঁক ছিল যে, তীর্থঙ্করের নিজস্ব জীবনকাহিনী তাঁর কাছে তেমন আমল পায় নি। নেমিনাথ আর তাঁর পত্নী রাজীমতীর পূর্বজন্মের কাহিনীতেই তাঁর কাব্যের আধাআধি ভরতি হয়ে গিয়েছে। এই নেমিনাথের জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সনৎকুমার, যিনি হলেন উক্ত পঞ্চদশ তীর্থঙ্করের সমসাময়িক। এই উপগল্পটিতে আছে রোম্যান্টিক বর্ণনার ছড়াছড়ি। এতে বর্ণিত দৃশ্যগুলি কখনো পৃথিবীর, কখনো বিদ্যাধর রাজ্যের। বহু প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে দুঃসাধ্য সাধন করে ও নানা যুদ্ধ জয় করবার পরে সনৎকুমার সর্বশেষে অতুলনীয় রূপবান রাজা হয়ে তিন লক্ষ বছর রাজত্ব করেন। তার পর হঠাৎ একদিন বার্ধক্য দশায় পৌঁছে তিনি ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে কঠোর তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। অবশেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে তিনি চলে যান সনৎকুমার-লোক নামক স্বর্গে।

দ্বাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে লেখা সোমপ্রভ-রচিত 'সুমতিনাথ-চরিত' পূর্বোক্ত ধরনে রচিত পঞ্চম তীর্থঙ্করের জীবনকাহিনী নিয়ে কাব্য। লক্ষ্মণ-গণীর রচিত 'সুপাসনাহচরিয়' ও সপ্তম তীর্থঙ্কর সম্পর্কে লেখা ঐ ধরনেরই কাব্য। এতে ৬৮টি অপভ্রংশ কবিতা আছে।

জৈন লেখকগণ ইতিহাস লেখার চেয়ে গল্প রচনা করতেই বেশি ভালোবাসতেন। তাঁদের অঙ্গ-উপাঙ্গ-গুলির টীকা যে কেবল ঐতিহ্যরাশিতে ও পৌরাণিক কাহিনীতে ভরতি তা নয়, তাদের মধ্যে অনেক অনেক

উপকথা ও অন্যান্য আখ্যান ছড়ানো আছে। আর তাঁদের 'পুরাণ' ও 'চরিত্র' নামধেয় রচনাগুলিতেও প্রায়শ নানা উপকথা এবং কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এসকল ছাড়াও জৈনরা সংস্কৃতে প্রাকৃতে এবং অপভ্রংশে গদ্যে পদ্যে এক বিরাট উপকথা-সাহিত্য রচনা করেছেন; কিন্তু সেগুলি গদ্যেই লেখা হোক বা পদ্যেই লেখা হোক, মহাকাব্যই হোক, খণ্ডকাব্যই হোক, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্মোপদেশের প্রচার। শুধু আনন্দ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি কখনো রচিত হয় নি।

অষ্টম শতাব্দীতে হরিভদ্র স্বরীর রচিত 'সমরাইচ্চকহা'কে লেখক 'ধর্মকথা' বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্মকথার অর্থ ধর্মসম্বন্ধীয় উপাখ্যান। এই কাব্যের নায়ক-নায়িকাগণ নানা দুঃসাহসিক কার্যসাধনের পর সংসার পরিত্যাগ করে তপশ্চর্যায় মন দিয়েছেন। আর কাহিনীর মাঝে মাঝে সুবিধা বুঝে লেখক প্রচুর ধর্মোপদেশ ছড়িয়েছেন। এর এক বিশেষত্ব এই যে, কাব্যটিতে উল্লিখিত নানা কাহিনীর পিছনে দেখানো হয়েছে কর্মফলের সুনিশ্চিত সংঘটন। নায়ক ও তাঁর প্রতিপক্ষের সামান্য ত্রুটিও তাঁদের পর-পর নয়টি জন্মের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। লেখক এই নয় জন্মের ঘটনাকে খুব সালংকারে বিবৃত করেছেন।

সমরাইচ্চকহা গদ্যে রচিত হলেও তার মাঝে আর্যা ছন্দে লেখা পদ্য ছড়ানো আছে। এর ভাষা তথাকথিত জৈন মহারাষ্ট্রী; কিন্তু পদ্যাংশের ভাষা জৈনদের অঙ্গউপাঙ্গগুলির সমশ্রেণীস্থ।

পুষ্পদন্ত নামক কবি অপভ্রংশে বহু কাব্য রচনা করে গেছেন। তাঁর আবির্ভাবের সময় হল দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। 'জসহরচরিউ' (যশোধর-চরিত্র) নামক কাব্যে তিনি জৈনদের মধ্যে জনপ্রিয় রাজা যশোধরের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই রাজার কাহিনী পূর্বোল্লিখিত সমরাইচ্চকহা'রও বিবৃত হয়েছে। পুষ্পদন্তও তাঁর পূর্বগামী কবিদের মত গ্রন্থের নানা স্থানে সুযোগ বুঝে ধর্ম-উপদেশ জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু

গ্রন্থের কাব্যরূপের কথা তিনি কখনো ভোলেন নি ; উপাখ্যানকে অযথা দীর্ঘ না করেও সংস্কৃত কাব্যসুলভ নানা চমৎকার বর্ণনা দ্বারা তিনি নিজ রচনাকে সুন্দর করে তুলেছেন। 'ণায়কুমারচরিউ'তে তিনি জৈনদের মধ্যে সুপরিচিত ণায়কুমার বা নাগকুমারের কাহিনীকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। জৈনদের মধ্যে নাগকুমার হলেন চব্বিশ জন কামদেব বা সবচেয়ে রূপবান পুরুষের অন্যতম। পুষ্পদন্ত তাঁকে ব্রহ্মণ্যদেবতা কাম মদন অনঙ্গ ঋষকেতু আদি নামেও অভিহিত করেছেন ; গ্রন্থকারের মতে তিনি পূর্বজন্মে শ্রীপঞ্চমীর উপবাস করেছিলেন বলেই এমন অপূর্ব সুন্দর দেহ লাভ করেছিলেন। এই কাব্যে অন্যূন চব্বিশ রকমের ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং গ্রন্থকার এতে সমসাময়িক ভারতবর্ষের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, ও নানা শ্রেণীর লোকের আচার ও ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। 'ণায়কুমারচরিউ'তে তৎকালীন ভারতবর্ষের যে নানা রাষ্ট্রীয় বিভাগের নাম আছে তা প্রাচীন ভূগোলের তথ্য হিসাবে মূল্যবান। এর সাহিত্যগুণও উপেক্ষণীয় নয়। পুষ্পদন্ত রচিত 'মহাপুরাণ' তেষট্টিখানি মহাপুরাণে বর্ণিত পৌরাণিক মহাপুরুষদের কথা নিয়ে লেখা ; কাজেই এর অপর নাম হচ্ছে 'ত্রিষষ্ঠি-মহাপুরুষ-গুণালংকার'। জৈনদের এই তেষট্টিজন মহাপুরুষকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়ে থাকে—(১) তীর্থঙ্কর, (২) চক্রবর্তী, (৩) বাসুদেব, (৪) বলদেব, এবং (৫) প্রতিবলদেব।

'ভবিসত্তকহা' একখানি রোম্যান্টিক শ্রেণীর মহাকাব্য। এখানি আগাগোড়া অপভ্রংশে রচিত। এর রচয়িতা ধনবাল (ধানপাল) ছিলেন জনৈক দিগম্বর জৈন উপাসক (গৃহীভক্ত)। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। কিন্তু একটি পরোক্ষ প্রমাণের বলে মনে হয় তিনি পূর্বোল্লিখিত হরিভদ্রসূরীর পরবর্তী। ভবিসত্তকহার লেখকের উদ্দেশ্য পঞ্চমীব্রতের অতুলনীয় মাহাত্ম্য-প্রচার। এই ব্রতের উদ্‌যাপন

কার্তিক ফাল্গুন এবং আষাঢ় এই তিন মাস ধরে চলে; পাঁচ বৎসর পালন করার পরে হয় এই ব্রত পরিসমাপ্ত। এই ব্রতের ফলশ্রুতির উদ্দেশ্যেই ভবিসত্তের (ভবিষ্যদত্ত) কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এই কাব্যের বস্তু হচ্ছে একটি উপকথা যার নায়ক ভবিসত্তকে নানা দুঃসাহসিক কাজ করে চলতে হয়েছে। বৈমাত্রেয় ভাইএর চক্রান্তে কোনো নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত ভবিসত্ত কোনো দেবতার অনুগ্রহে সেখানে আবিষ্কার করেন এক রাজকন্যাকে। রাজকন্যার সঙ্গে দশ বৎসর বসবাস করে তিনি হঠাৎ দেশে ফেরবার জন্যে উৎকণ্ঠা বোধ করেন। এমন সময় তাঁর সেই বৈমাত্রেয় ভাইএর জাহাজ সেই দ্বীপে ভিড়বার পর ভবিসত্ত সেই জাহাজে চড়ে দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে দুষ্ট বৈমাত্রেয় ভাই তাঁকে ফাঁসি দিয়ে শুধু রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তার পরে কোনো যক্ষের দয়ায় ভবিসত্ত কোনো দেবতার বিমানে চড়ে দেশে ফিরতে সমর্থ হন এবং বিবাহিতা স্ত্রী রাজকন্যাকে উদ্ধার করেন। কোনো অজ্ঞাতনামা কবির রচিত 'মলয়-সুন্দরীকথা' আর-এক খানি রোম্যাণ্টিক প্রাকৃত কাব্য। এও কোনো জনপ্রিয় উপকথার আধারে লেখা। এতে যে প্রচুর সংখ্যক অত্যাশ্চর্য অতিলৌকিক ঘটনা ও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে সেসকল বিস্ময়াবিষ্ট পাঠকমণ্ডলীর প্রায় শ্বাসরোধ করবার মত। উপকথা-সুলভ নানা কৌশলের সাহায্যে এতে রাজকুমার মহাবল এবং রাজকন্যা মলয়সুন্দরীর বার বার বিচ্ছেদ-ঘটনার ও পুনর্মিলনের আশ্চর্যজনক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এদের জীবনের প্রতিটি ঘটনার পিছনে পূর্বজন্মের কর্ম বর্তমান ছিল এবং পরিশেষে রাজপুত্র মহাবল হয়ে দাঁড়ালেন জৈন সাধু, আর রাজকন্যা মলয়সুন্দরী জৈন সাধ্বী, এই উপকথামূলক কাব্যটি জৈনগণের একটি প্রিয় আখ্যানকাব্য হয়ে রয়েছে। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা ধনেশ্বরের 'সুর-সুন্দরী-চরিউ'ও

আর-একখানি বিরাট রোম্যান্টিক মহাকাব্য। প্রাকৃত গদ্য ও পদ্যে রচিত 'কালকাচার্য-কথানক' নামক কাব্যখানি নিষ্ঠাবান্ জৈনেরা 'কল্পসূত্র' পাঠের অন্তে পাঠ করে থাকেন। এর চারটি পৃথক পাঠ পাওয়া যায়। তার থেকেই বোঝা যায় এর অসামান্য জনপ্রিয়তা। এর কাহিনী এসেছে প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে; খুব সম্ভব এর পিছনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিদ্যমান। রাজকুমার কালক জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে কেমন করে জৈনসংঘে মুখ্যস্থান লাভ করেন, তাই হল এই উপাখ্যানের বর্ণনার বিষয়। তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী সন্ন্যাসিনী সরস্বতীকে উজ্জয়িনীরাজ জোর করে নিয়ে নিজের অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখেছিলেন। কালক পাগল সেজে দেশের লোককে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন এবং শকস্থানে গিয়ে শক রাজার দ্বারা উজ্জয়িনী আক্রমণ করান। এর উপাখ্যানাংশের ভাষা বেশ সাদাসিধে, কিন্তু যেখানে যেখানে বর্ণনার দরকার হয়েছে, ভাষা সুবন্ধু ও বাণভট্টের ভাষার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই অপূর্ব কাব্যের রচনাকাল এবং গ্রন্থকার সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।

হেমচন্দ্র সূরীর (১০৮৮-১১৭২) 'কুমারপালচরিত' একখানি আলাদা কাব্য নয়। এটি হচ্ছে তাঁর 'সিদ্ধ-হেমচন্দ্র' নামক ব্যাকরণের প্রাকৃতাংশের দৃষ্টান্ত হিসাবে রচিত। এই কাব্য আট খণ্ডে বিভক্ত। এর প্রথম পঞ্চম সর্গে এবং ষষ্ঠ সর্গের কিয়দংশ ভরে রয়েছে কুমার-পালের রাজধানী অনহিলপুরের ঐশ্বর্য, জৈন মন্দিরগুলির সমৃদ্ধি, রাজার এবং তাঁর প্রজাকুলের জৈন ধর্মে অনুরাগ, ভোগচর্চা, ও বিলাসকলার সালংকার বর্ণনা। আর ষষ্ঠ সর্গে রয়েছে কুমারপালের ও কোঙ্কন-রাজ মল্লিকার্জুনের সেনাবাহিনীদুটির সংগ্রামের বর্ণনা। এই যুদ্ধে মল্লিকার্জুন পরাজিত ও নিহত হন। শেষের দুটি সর্গে নানা ধর্মোপদেশ ও ধর্মতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। প্রাকৃত-ব্যাকরণের সূত্রগুলির দৃষ্টান্তহিসাবে

লেখা এই কাব্যখানির কোনো বিশেষত্ব নেই। এখানি সংস্কৃত 'ভট্টিকাব্যে'র সঙ্গে তুলনীয়। এই দুখানি কাব্যের লেখককেই বিশুদ্ধ কাব্য রচনা ছেড়ে দিয়ে ছন্দে ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত রচনা করতে হয়েছিল এবং তাঁদের বিদ্যাবত্তা ও রচনাকৌশল বিস্ময় উদ্রেক করবার মত।

১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখা কনকামর মুনির 'করকণ্ড-চরিউ' জৈন সাধু করকণ্ডের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত এক অপভ্রংশ কাব্য। করকণ্ড বৌদ্ধদের দ্বারাও পূজিত ছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তাঁর পুণ্যচরিত্রের আদর। করকণ্ডের পিতা দধিবাহন ছিলেন চম্পার রাজা। জন্মের ঠিক আগেই তাঁর মা দৈবদুর্বিপাকে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়েন এবং শ্মশানভূমিতে হয় তাঁর জন্ম। মাতঙ্গ নামে এক শাপগ্রস্ত বিদ্যাধর তাঁকে কুড়িয়ে নিয়ে পালন করে। একদিন দণ্ডিপুরের রাজহস্তী করকণ্ডকে তুলে নিয়ে গেলে তিনি সেখানকার রাজা হন। সেখানে গিরিনগরের রাজকুমারী মদনাবলির ছবি দেখে তাঁর প্রতি করকণ্ডের অনুরাগের সঞ্চার হয়। দুজনের বিয়ে হতে কিছু বাধা হয় নি। তার পর চম্পার রাজা নিজ পুত্র বলে করকণ্ডকে চিনতে না পেরে তার বশ্যতা দাবী করেন। তার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ ঘটে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হলে উভয়ে পরস্পরকে চিনতে পারেন। চম্পার রাজা তখন পুত্রকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হলেন।

এবার করকণ্ড দক্ষিণদেশ জয় করতে বেরিয়ে সেখানকার কোনো জৈন গুহামন্দিরে তাঁর পালক বিদ্যাধরের সাক্ষাৎ পেলেন। এবং বিদ্যাধরের কাছ থেকে তিনি সেই জৈন মন্দিরের ইতিহাসও জানলেন। এই দক্ষিণ-দেশে থাকবার সময় হঠাৎ তাঁর রাণী মদনাবলি হলেন নিরুদ্দেশ। পূর্বোক্ত বিদ্যাধর তখন তাঁর শোক দূর করবার জন্যে তাঁকে শোনাতে লাগলেন নরবাহনদত্তের কাহিনী। তার পরে যখন তিনি সিংহল পর্যন্ত পৌছলেন তখন সিংহলরাজ তাঁর প্রতাপের কথা শুনে তাঁর হাতে

নিজ কন্যা রতিবেগাকে সমর্পণ করলেন। নবপরিণীতা রানীকে নিয়ে নৌযানে দেশে ফিরছেন, এমন সময় এক সামুদ্রিক জন্তুকে দেখে তাকে মারবার জন্তে অসি হাতে তিনি জলে ঝাঁপ দিলেন। জন্তুটিকে তিনি মারলেন বটে, কিন্তু কোনো বিদ্যাধর তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল। রানী রতিবেগা শোক করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে দেবী পদ্মাবতী সশরীরে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন যে, শীঘ্র তিনি স্বামীর দেখা পাবেন। শীঘ্রই দুজনের পুনর্মিলন হল। করকণ্ড দক্ষিণদেশ বিজয় সমাপ্ত করে ফিরলেন। এর মধ্যে কোনো বিদ্যাধরের অনুগ্রহে তিনি পূর্বপত্নী মদনাবলিকেও ফিরে পেলেন। এবার চম্পায় ফিরে এসে তিনি বহু বছর ধরে সুখে রাজত্ব করে অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

আরও ছোটোবড়ো নয়টি কাহিনী জুড়ে দিয়ে মূল কাহিনীকে যথেষ্ট দীর্ঘ করে তোলা হয়েছে। এতেও কাব্যখানির আকর্ষণ বেড়েছে। যদিও জায়গায় জায়গায় কবি, গুণাঢ্য কালিদাস ও বাণভট্টের প্রভাবে পড়েছেন, তবু তাঁর রচনায় মৌলিকতার অভাব নেই। যে রকম সরল ভাষায় তিনি তাঁর কাব্যখানি লিখেছেন তাতে এর উপাদেয়তা বিশেষ বেড়ে গিয়েছে।

সোমপ্রভ-রচিত 'কুমারপালচরিত' একখানি উপদেশমূলক কাব্য—গদ্য ও পদ্যে লেখা কতকগুলি কাহিনীর সংগ্রহ। এর ভাষা প্রাকৃত হলেও মাঝে মাঝে সংস্কৃতের প্রক্ষেপ আছে। ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থখানি রচিত। এতে পাঁচটি প্রস্তাব আছে। এদের বক্তা হেমচন্দ্র। প্রথম প্রস্তাবে আছে—দ্যূত, ব্যভিচার, পানদোষ, চৌর্য আদির নিন্দা। দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেবতা ও গুরু-পূজার প্রশংসা। তৃতীয় প্রস্তাবে দান, ধর্মাচরণ, তপস্যা ও ধ্যানের মাহাত্ম্য। চতুর্থ প্রস্তাবে জৈন গৃহস্থদের দ্বাদশ ব্রতের প্রশংসা। পঞ্চম প্রস্তাবে ক্রোধ অহংকার ছলনা ও লোভ এই চারি

ব্যসনের নিন্দা। এ সকল বিভিন্ন প্রসঙ্গের মোট তেতাল্লিশটি গল্প আছে এ কাব্যে। কিন্তু এদের কতকগুলি অন্য জৈন গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

উপকথা ও গল্প

নানা বিচিত্র গল্প ও উপকথার প্রচার ভারতবর্ষে বহুকাল ধরেই চলে আসছিল। খুব সম্ভব প্রাকৃতেই এগুলিকে সর্বপ্রথম সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয়। সুবন্ধু বাণভট্ট ও দণ্ডীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেও 'বৃহৎকথা' নামে গুণাঢ্য-রচিত এক সুবৃহৎ আখ্যানের খ্যাতি ছিল এবং সেকালকার পণ্ডিতজনেরা এই গুণাঢ্যকে বাল্মীকি ও ব্যাসের সমান কবি বলে মানতেন। এই মহাগ্রন্থ-খানি ছিল পৈশাচীতে লেখা। বইখানি যে কেন পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হয়েছিল তার সম্বন্ধে একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। প্রতিষ্ঠানের রাজা শাতবাহন একবার জলকেলি করতে গিয়েছিলেন। তখন রাজা কোনো রানীর গায়ে জল ছিটিয়ে দিলে রানী অনুনয় করে বলেছিলেন 'মোদকং দেহি দেব'।[১] রাজা এই সংস্কৃত ভাষার কথা বুঝতে না পেরে তাঁর জন্যে মিষ্টি খাবার আনিয়েছিলেন। রানী তখন তাঁকে অজ্ঞতার জন্য তিরস্কার করলে, রাজার মনে হল মহা দুঃখ, এবং তিনি এ বিষয় মন্ত্রীদের জানিয়ে প্রতিকার চাইলেন। তাঁর ছিল দুই মন্ত্রী, গুণাঢ্য ও কাত্যায়ন (বররুচি)। গুণাঢ্য যখন কোনো প্রতীকার-কল্পনা করতে পারলেন না, তখন কাত্যায়ন বললেন যে, তিনি এমন সংস্কৃত-ব্যাকরণ তৈরী করবেন, যা পড়ে ছমাসের মধ্যে রাজার সংস্কৃত-জ্ঞানে আর ত্রুটি থাকবে না। গুণাঢ্য তা শুনে বললেন যে, এ কাজ অসম্ভব। কাত্যায়ন যদি রাজাকে ছ মাসের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ করে তুলতে পারেন,

তবে তিনি সংস্কৃত বা প্রাকৃতে আর কোনো লেখাপড়া করবেন না। যথাকালে 'কলাপব্যাকরণ' রচনা করে কাত্যায়ন রাজাকে নির্ভুল সংস্কৃত-ভাষী করে তুললেন; তখন গুণাঢ্য নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে চলে গেলেন সন্ন্যাসী হয়ে। সেখানে বসেই তিনি রচনা করেন বৃহৎকথা, যার ভাষা সংস্কৃতও নয় আবার খাঁটি প্রাকৃতও নয়।

১ মা উদকং দেহি দেব—আমাকে জল দেবেন না। রাজা অর্থ করেছিলেন, আমাকে 'মোদক' (মিষ্টি) দিন্।।

প্রাকৃত ব্যাকরণে পৈশাচী-প্রাকৃতের লক্ষণ বর্ণিত হলেও প্রাপ্ত প্রাকৃত সাহিত্যে কোনো পৈশাচী রচনার সন্ধান মেলে না; আর গুণাঢ্যের সুবিখ্যাত গ্রন্থও এর মূলরূপে বিদ্যমান নেই। বহুশতাব্দী পরে কাশ্মীরের সোমদেব-ভট্ট বৃহৎকথা-অবলম্বনে সংস্কৃতে 'কথা-সরিৎ-সাগর' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তারি থেকে আমরা বৃহৎকথার স্বরূপ কেমন ছিল, তার কতকটা আন্দাজ করতে পারি। এ ছাড়াও সংস্কৃতে বৃহৎকথা নিয়ে আরো দুখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তাদের একখানি হল ক্ষেমেন্দ্রের (ইনিও কাশ্মীরি) বিরচিত 'বৃহৎকথামঞ্জরী'। আর একখানি বুধস্বামীর লেখা 'বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ'। পরবর্তী কালে নানা ভাষায়', একটি গল্পের কাঠামোতে নানা প্রসঙ্গে নানা গল্পের অবতারণা করে, যে বিরাট বিরাট গল্পগ্রন্থ[১] রচিত হয়েছে, সে সকলের আদি হল এ বৃহৎকথা। এ গ্রন্থের মূল গল্পের আরম্ভ বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর পরিণয়-কাহিনী ও তাঁদের পুত্র নরবাহনদত্তের জন্মকথা থেকে। এই মূল গল্পটি নরবাহনদত্তের কীর্তিকাহিনী নিয়ে; তিনি কোন্ কোন্ ঘটনার ভিতর দিয়ে একটির পর একটি পত্নী লাভ করে, সর্বশেষে বিদ্যাধর রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন, তাই হল গ্রন্থের বর্ণনীয়

১ যেমন আরব্য উপন্যাস, Gil Blas ইত্যাদি।

বিষয়। ভারতবর্ষে তৎকালে প্রচলিত অনেক গল্প-উপাখ্যান এই মূল আখ্যানে যোজনা করা হয়েছে। এমনকি 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'ও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। এ দুখানি বই মূল বৃহৎকথার অন্তর্ভুক্ত ছিল, অথবা পরে বই-দুখানি এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। খুব সম্ভব ভাস-কবি তাঁর উদয়নকথামূলক নাটক-দুখানির ('স্বপ্ন বাসবদত্তা' ও 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ) কথাবস্তু এই গুণাঢ্যের বৃহৎকথা থেকে নিয়েছিলেন। এ অনুমান সত্য হলে গুণাঢ্যকে অন্তত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলে ধরে নেওয়া যায়।

এর পরে প্রাকৃত সাহিত্যে আর বিশুদ্ধ গল্প-উপাখ্যানের সন্ধান মেলে না। জৈনেরা উপকথা ও লোকপ্রচলিত অন্যান্য গল্পগুলিকে নিয়ে ধর্মতত্ত্ব-প্রচারের উদ্দেশ্যে যেমন করে নানা কাব্য রচনা করেছিলেন তা আমরা দেখেছি। এসকল কাব্যের নাম তাঁরা দিয়েছিলেন ধর্মকথা। যেমন সমরাইচ্চকহা ভবিসত্তকহা মলয়সুন্দরীকহা ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপভ্রংশে 'কথাকোষ' নামে এক বৃহৎ আখ্যানভাণ্ডার রয়েছে। এও অনেকটা বৃহৎকথার মতই। দশম বা দ্বাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থখানি রচিত হয়। আংশিকভাবে সংস্কৃতে রচিত সোমচন্দ্রের 'কথামহোদধি'ও (১৪৪৮ খ্রীঃ) এক বৃহৎ আখ্যানকাব্য। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে হেমবিজয় 'কথারত্নাকর' নামে সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগরের অনুকরণে আর-এক বৃহৎ আখ্যানগ্রন্থ রচনা করেন। এতে মহারাষ্ট্রী এবং অপভ্রংশ কবিতার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতাও ছড়ানো রয়েছে।

গীতিকাব্য ও নীতিকবিতা

ভারতবর্ষে খুব প্রাচীনকাল থেকেই গীতিকাব্যের চর্চা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা পতঞ্জলির মহাকাব্যেও তার কিছু কিছু নিদর্শন

মেলে। কিন্তু প্রাকৃত গীতিকাব্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কিছু আগে রচিত নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্গত ধ্রুবাগানগুলি। এগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। এতে পরবর্তী সংস্কৃত ও প্রাকৃত গীতিকাব্যের আদিরস-বাহুল্য একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু এই ধ্রুবা-গানগুলির কিছু পরে রচিত হাল-নৃপতির সংগৃহীত 'গাথাসপ্তশতী'তে প্রাপ্ত গাথাগুলি সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। এগুলির মুখ্য আকর্ষণ আদিরস এবং এ আদিরস এত প্রকট যে, অধুনিক কালের রুচি অনুসারে এর অধিকাংশ সাধারণ পাঠকগণের কাছে অচল। এই হাল-নৃপতি দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর তীরস্থ প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়, কিন্তু তাঁর সময় সম্পর্কে পণ্ডিতেরা এখনো একমত হতে পারেন নি। হালের সংস্কৃত নাম ছিল হয়তো শাতকর্ণী। তিনি ছিলেন শাতবাহন-কুলে জাত। এজন্যে তাঁকে শাতবাহনও বলা হয়, কিন্তু নানা শিলালেখে একাধিক শাতবাহনের নাম মেলে; তাই কোন্ জন যে গাথাসপ্তশতী সংগ্রহ করেছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক, আর কেউ কেউ বলেন তার পরবর্তী। কিন্তু হালের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর মধ্যে ফেলার বিপদ এই যে, সে সময়কার শিলালিপির প্রাকৃতের সঙ্গে এর পার্থক্য সাংঘাতিক রকমের। অর্থাৎ এই শিলালিপিগুলির ভাষার তুলনায় হালের গাথাসপ্তশতীর ভাষা ঢের পরবর্তী কালের। এজন্যে এবং এ গ্রন্থে 'বন্দী' (মধ্য-পারসীক) এবং 'হোরা' (গ্রীক্) শব্দ দুটির ব্যবহার দেখে ওয়েবার (Weber) হালের গ্রন্থকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলতে অনিচ্ছুক। পণ্ডিতমণ্ডলী এমত মেনে নিয়েছেন। হালের সংগৃহীত এই গাথাসংগ্রহ আর্যাছন্দে রচিত সাত শ কবিতার সমষ্টি। তাই এর নাম গাথাসপ্তশতী। কিন্তু এই গ্রন্থের অনেক পাঠভেদ আছে। সব রকমের পুঁথির কবিতাগুলির

মধ্যে মিল নেই। সংখ্যার দিক্ দিয়ে মিল থাকলেও গরমিল নেহাত কম নয়। পূর্বোল্লিখিত ওয়েবার নানা পাঠযুক্ত অনেক পুঁথি ঘেঁটে যে সংস্করণ প্রায় ৭৫ বৎসর আগে প্রকাশ করে গিয়েছেন, তাতে এক হাজার গাথা রয়েছে। সেদিক দিয়ে দেখলে একে 'গাথা-সাহস্রী'ও নাম দেওয়া যেতে পারে। সাত শ'ই হোক আর হাজারই হোক, এই গাথাগুলি অন্যূন এক শ জন পুরুষ এবং মহিলা কবির রচনা। একজন টীকাকার তাদের নামও দিয়েছেন। মুখ্যত আদিরসের রচনা হলেও, হালের সমসাময়িক ভারতের জনগণের সহজ সরল সুখ-দুঃখ ও আনন্দবেদনার চিত্র হিসাবে এই গাথা-কাব্য পরম মূল্যবান্। এ চিত্র কিছু পরিমাণে অসম্পূর্ণ হলেও এ যে একান্ত খাঁটি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই হালের সংগৃহীত প্রাকৃত গাথাগুলির সাহিত্যিক মূল্য খুব উচ্চকোটির। এই গাথাগুলির মধ্যে রয়েছে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঋতুপর্যায়ের বর্ণনা, এবং সেসকলের প্রভাবের ফলে সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখের অকৃত্রিম অনুভূতির কথা। এতে কখনো প্রকাশ পেয়েছে হৃদয়াবেগের কারুণ্য, কখনো তার উদ্দাম বিলাসলীলা, কিন্তু কারুণ্যের কথাই বেশি। এতে কেবল পুরুষের উক্তিই নয়, তরুণী ও বর্ষীয়সী নারী, সখী-সহেলী, মা, মাসীপিসী এবং কন্যার হৃদয়-বেদনার অকৃত্রিম প্রকাশ রয়েছে। তারা কখনো তরুণ জনের কাছে, কখনো প্রেমিকের কাছে, কখনো অন্য তরুণীর কাছে, কখনো নিজের হৃদয়ের কাছে, হৃদ্গত অভিলাষ বেদনাবাহুল্য ও পরিহাস-কুশলতা প্রকাশ করেছে। বস্তুত অনেক বিষয়ই দেখা দিয়েছে এই গাথাগুলির রচনায়। তাদের উক্তি কখনো সোজাসুজি এবং কখনো ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে। কেবল বিষয়বস্তুর জন্যে নয়, এদের রচনাভঙ্গীর জন্যও গাথাগুলি সেকালের সাহিত্য-রসিকদের সমাদর পেয়েছে। এগুলির গুণাতিশয় সম্বন্ধে তাঁদের মতামত এত গোঁড়া ছিল যে, হাল বলেন—

অমিঅং পাউঅ কব্বং পঢিউং সোউং অ জে ণ আণন্তি।
কামস্স তত্ততন্তিং কুণন্তি তে কহং ণ লজ্জন্তি॥

প্রাকৃতকাব্য অমৃতস্বরূপ, তা যারা পড়তে বা শুনতে জানেন না, প্রেম-চর্চার প্রসঙ্গ করতে গিয়ে, কেন তাঁরা লজ্জা পান না।

নীচে এই সপ্তশতীর গাথাগুলির কিছু কিছু নমুনা তুলে দেওয়া যাচ্ছে—

ঘরিণীএ মহাণসকম্ম লগ্‌গ-মসিমইলিএণ হত্থেণ।
ছিত্তং মুহং হসিজ্জই চন্দাবত্থং গঅং পইণা॥

রান্নাঘরের কাজ করতে করতে কালিঝুলি মাখা হাত মুখে লাগিয়েছেন দেখে স্বামী স্ত্রীকে উপহাস করছেন, 'তোমার মুখখানি এবার চাঁদের সমান হল'।

রন্ধণকম্মণিউণিএ মা জুরস্থ রত্তপাডলসুঅন্ধং।
মুহমারুঅং পিঅন্তো ধূমাই সিহী ণ পজ্জলই॥

ওগো সেরা রাঁধুনী, রাগ কোরো না, তোমার রাঙা পাটলিফুলের মত মুখের ফুঁ-এতে যে সুগন্ধ আছে, তা পান করে অগ্নিদেব ধোঁয়াচ্ছেন, জ্বলে উঠছেন না।

অমঅমঅগঅণসেহর রঅণিমুহতিলঅ চন্দ দে ছিবস্থ।
ছিত্তো জেহিঁ পিঅঅমো মমংপি তেহিং বিঅ করেহিং॥

হে অমৃতময়, গগনের শিরঃশোভা, রজনীর মুখতিলক চন্দ্র, আমাকে সেই কিরণ দিয়ে ছোঁও, যে কিরণ দিয়ে আমার (প্রবাসী) প্রিয়তমকে ছুঁয়েছ।

আরম্ভন্তস্‌স ধুঅং লচ্ছী মরণং বি হোই পুরিসস্‌স।
তং মরণমণারম্ভে বি হোই লচ্ছী উণ ণ হোই॥

কোনো গুরুতর কাজে হাত দিলে, পুরুষের হয় লক্ষ্মীলাভ হবে, নয় মরণ হবে। কিন্তু যে কিছুতে হাতই না দেয় তার মরণ হবেই, কিন্তু লক্ষ্মী-লাভ হবে না।

কল্লং কির খরহিঅও পবসিইহি পিওত্তি সুণই জণম্মি।
তহ বড্ঢ ভঅবঈ ণিসে জহ সে কল্লং বিঅ ণ হোই॥

লোকের মুখে শুনেছি, কাল সেই নিষ্ঠুরহৃদয় প্রিয় ব্যক্তিটি বিদেশে যাবে। ভবগতি রাত্রি, এমন করে দীর্ঘ হও যাতে কাল আর না হয়।

অণ্ণমহিলাপসঙ্গং দে দেব করেসু অম্হ-দইঅস্স।
পুরিসা একন্তরসা ণ হু দোসগুণে বিআণন্তি॥

হে ঠাকুর, আমার প্রিয়তমের সঙ্গে অন্য মহিলার পরিচয় করিয়ে দাও। যেসকল পুরুষ একজনেরই রস পায়, (মানুষের) তারা দোষগুণ জানে না।

মুহমারুএণ তং কণ্হ রাহীআএ গোরঅং অবণেন্তো।
এতাণং বল্লবীণং অণ্ণাণং বি গোরঅং হরসি॥

হে কৃষ্ণ, তুমি মুখের ফুঁ দিয়ে রাধিকার চোখ থেকে যে গোরুর উড়ানো ধূলি দূর করছ, তাতে অন্য গোপীদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

ণুমেন্তি জে পহুত্তং কুবিঅং দাসা-ব্ব জে পসাঅন্তি।
তে ব্বিঅ মহিলাণং পিআ সেসা সামি ব্বিঅ বরাআ॥

কুপিতা স্ত্রীর সম্বন্ধে যারা প্রভুত্ব গোপন করেন এবং ক্রীতদাসের মত তাকে প্রসন্ন করেন, তাঁরাই হলেন মহিলাদের প্রিয়, অন্য হতভাগারা স্বামী (প্রভু) মাত্র।

সো ণাম সংভরিজ্জই পব্ভসিঅ জো খণং পি হিঅআহি।
সংভরিঅব্বং চ কঅং গঅং চ পেম্মং ণিরালম্বং॥

যে ক্ষণকালের জন্যও হৃদয় ছেড়ে গিয়েছে তাকেই স্মরণ করবার কথা। প্রেম যখন স্মৃতির বিষয় হল তখন সে হল নিরাশ্রয়।

অজ্জ বি বালো দামোঅরো ত্তি জম্পিএ জসোদাএ।
কণ্হমুহপেসিঅচ্ছং নিহুণং হসিঅং বঅবহূহিং॥

যশোদা যখন বললেন, আমার দামোদর এখনো ছেলেমানুষ, তখন কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে গোপবধূরা লুকিয়ে হাসতে লাগল।

জেণ বিণা ণ জিবিজ্জই অণুণিজ্জই সো কআবরাহো বি।
পত্তে ণগরদাহে উণ কস্‌স বি ণ বল্লহো অগ্‌গী ॥

যাকে ছেড়ে বাঁচা যায় না, অপরাধ করলেও তাকে অনুনয়-বিনয় করতে হয়। আগুন নগরকে পোড়ালেও, কে না তাকে প্রিয় মনে করে?

তং মিত্তং কাঅব্বং জং কির বসণম্মি দেসআলম্মি।
আলিহিঅ-ভিত্তি-বাউল্লঅং ব ণ পরম্মুহং ঠাই ॥

তাকেই বন্ধু করবে, যে দুর্দশা হলে যথাস্থানে যথাকালে সাহায্য করতে এগোয়, দেয়ালে আঁকা ছবির মত চুপ করে থাকে না।

সো অত্থো জো হত্থে তং মিত্তং জং ণিবন্তবং বসণে।
তং রূঅং জত্থ গুণা তং বিণ্ণাণং জহিং ধম্মো ॥

সেই হল অর্থ যা হাতে আছে, সেই হল মিত্র যে বিপদের সময়ে কাছে, সেই হল রূপ (দৈহিক সৌন্দর্য) যেখানে গুণ, আর সেই হল পাণ্ডিত্য যাতে রয়েছে ধর্ম।

বিণ্ণাণগুণমহগ্‌যে পুরিসে বেসণত্তং পি রমণিজ্জং।
জণণিন্দিএ উণ জণে পিঅত্তণেণাবি লজ্জামো ॥

যাঁর দুর্লভ গুণ ও পাণ্ডিত্য আছে এমন ব্যক্তির বিদ্বেষও সুন্দর, কিন্তু লোকে যাকে নিন্দা করে এমন লোকের ভালোবাসাও লজ্জাজনক।

কীবন্তি বিঅ ণাসই উঅএ রেহেব্ব খলঅণে মেত্তী।
সা উণ সুঅণম্মি কআ অণহা পাসাণরেহ ব্ব ॥

খলজনের সঙ্গে মৈত্রী জলে রেখার (আঁকা) মত, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যায় মিলিয়ে। আর সুজনের মৈত্রী হয় অক্ষয়, পাষাণে (আঁকা) রেখার মত।

তুঙ্গ চ্চিঅ হোই মণো মণংসিণো অন্তিমাসু-বি দসাসু।
অত্থমণম্মি বি রইণো কিরণা উদ্ধং চিঅ ফুরন্তি ॥

চরম দুর্দশায়ও মনস্বীজনের মন উঁচুই থাকে। অস্তকালেও সূর্যের কিরণ-জাল উপরের দিকেই বিচ্ছুরিত হয়।

ণ বিণা সব্ভাবেণ ঘেপ্পই পরমত্থজাণুও লোও।
কো জুণ্ণমঞ্জরং কঞ্জিএণ বেআরিঅং তরই॥

খাঁটি জিনিস ছাড়া পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ লোককে হাত করা যায় না। বুড়ো বেড়ালকে ভাতের ফ্যান দিয়ে কে ভোলাতে পারে ?

রণ্ণাউ তণং রণ্ণাউ পাণিঅং সব্বঅং সঅংগাহ্নং।
তহবি মআণ মঈণ অ আমরণান্তাইং পেম্মাইং॥

বনের ঘাস, বনের জল দুটোই নিজে দেখে খায়, তবু হরিণ আর হরিণীর প্রেম আমরণ থাকে বর্তমান।

জহ জহ জরাপরিগও হোই পঈ দুগ্গও বিরূঅা বি।
কুলবালিআণ তহ তহ অহিঅঅরং বল্লহো হোই॥

পতি যেমন যেমন বুড়ো হন, দুর্দশায় পড়েন এবং রূপহীন হন, কুলস্ত্রীদের ততই বেশি ভালোবাসা হয় তাঁর প্রতি।

ণ গুণেণ হীবই জণো হীরই জো জেণ ভাবিও তেণ।
মোত্তূণ পুলিন্দা মোত্তিআইঁ গুঞ্জাও গেহ্নন্তি॥

গুণ লোককে আকর্ষণ করে না, যে যা ভাবে তাতেই সে আকৃষ্ট হয়। যেমন, বর্বর পুলিন্দ মুক্তাফল ছেড়ে গুঞ্জাফলই কুড়িয়ে আনে।

বাহি ব্ব বেজ্জরহিও ধণরহিও সুঅণমজ্ঝবাসো ব্ব।
রিউরিদ্ধি দংসণমিব দুসহণীও তব বিওও॥

চিকিৎসক না পেলে রোগীর, জ্ঞাতি-কুটুম্বদের মধ্যে নির্ধনের, এবং শত্রুর সমৃদ্ধি দেখলে লোকের, যে দুঃসহ কষ্ট হয় তোমার বিরহে আমারও তাই হচ্ছে।

বসণম্মি অণুব্বিগ্গা বিহবম্মি অগব্বিআ ভএ ধীরা।
হোন্তি অহিণ্ণসহাবা সমেসু বিসমেসু সপ্পুরিসা॥

সৎপুরুষেরা বিপদে অনুদ্বিগ্ন, ঐশ্বর্যলাভে অগর্বিত, ভয়ের সময় ধৈর্যশীল, এবং ভালো মন্দ উভয় অবস্থাতে একই থাকে তাঁদের চরিত্র।

দুগ্গঅঘরম্মি ঘরিণী রক্খন্তী আউলত্তণং পইণো।
পুচ্ছিঅ দোহলসদ্ধা পুণোবি উঅঅং বিঅ কহেই॥

দরিদ্রের ঘরের গৃহিণী স্বামীকে ব্যাকুলতা থেকে বাঁচাবার জন্তে সাধের কথা বলতে গিয়ে কেবল জলের কথাই বলেন।

রোবন্তি ব্ব অবণ্ণে দুসহবইকিবণফংসসন্তত্তা।
অইতাবঝিল্লিবিরুএহিঁ পাঅবা গিম্হমজ্ঝহ্নে॥

গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলায় দারুণ রবিকিরণের স্পর্শে সন্তপ্ত বনের গাছগুলি যেন ঝিল্লিরবের ছলে কাঁদছে।

হসিএহিঁ উবালম্ভা অচ্চবচাবেহিঁ খিজ্জিঅব্বাইঁ।
অংস্থহিঁ মণ্ডণাইঁ এসো মগ্গো স্থমহিলাণং॥

হেসে ভর্ৎসনা, অতি যত্নের দ্বারা পীড়ন, চোখের জল ফেলে কলহ, এই সকল হল উত্তম মহিলাদের ব্যবহার।

হসিঅং অদিট্‌ঠদন্তং ভমিঅম্ অণিক্কন্তদেহলীদেসং।
দিট্‌ঠমণুবখিত্তমুহং এসো মগ্গো কুলবহূণং॥

হাসলে দেখা যাবে না দাঁত, বেড়াতে যাবে না ঘরের বাইরে, তাকাবে না মুখ তুলে, এইসব হল সৎকুলের বধূব লক্ষণ।

জং জং পুলোএমি দিসং পুরও লিহিঅ ব্ব দীসসে তত্তো।
তুহ পডিমাপডিবাডিং বহই ব্ব সঅলং দিসাঅক্কং॥

যে যে দিকে তাকাই, সামনেই দেখি তোমার ছবি। মনে হয় সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল (যেন) তোমার কত কত ছবি সাজিয়ে রেখেছে।

অসমত্তগুরুককজ্জে এত্থিং পহিএ ঘরং নিঅত্তন্তে।
ণব পাউসো পিউচ্ছা হসই ব কুডঅট্টহাসেহিং॥

পিসি, দরকারী কাজ না করে পথিককে বাড়ী ফিরে আসতে দেখে, নববর্ষা যেন কুটজ ফুল ফুটিয়ে অট্টহাস্য করছে।

অম্ববণে ভমরউলং ণ বিণা কজ্জেণ উস্সুঅং ভমই।
কত্তো জলণেণ বিণা ধুমস্স সিহাউ দীসদি॥

(তুমি বলছ বসন্ত আসে নি); কিন্তু আমের বনে ভ্রমরগুলো কি বিনা

কাজে উৎসুক ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে? আগুন না থাকলে কি ধুমের শিখা দেখা যায়?

তত্তো চ্চিঅ হোন্তি কহা বিঅসন্তি তহিং তহিং সমপ্পন্তি।
কিং মন্নে মাউচ্ছা একজুআণো গামো॥

তারি কথায় কথার শুরু, তারি কথায় কথা বাড়ে, আর তাকে নিয়েই কথার শেষ; মাসি, মনে হচ্ছে এই গাঁয়ে যেন কেবল একটিমাত্র যুবা-পুরুষ আছে।

জং জং আলিহই মণ আসাবট্টিহিং হিঅঅফলঅম্মি।
তং তং বালো ব্ব বিহী ণিহুঅং হসিউণ পমূহুসই॥

মন আশার তুলি দিয়ে হৃদয়পটে যা যা ছবি আঁকছে, বিধি অবোধ-মানুষের মত হেসে গোপনে সেসব ফেলছেন মুছে।

জে জে গুণিণো জে জে অ চাইণো জে বিডড্ঢবিণ্ণাণা।
দারিদ্দ রে বিঅক্খণ তাণ তুমং সাণুরাওসি॥

রে বিচক্ষণ দারিদ্র্য, যাঁরা যাঁরা গুণী, যাঁরা যাঁরা ত্যাগী, যাঁরা যাঁরা বিচক্ষণ বিদ্বান্, তাদের প্রতিই তোমার অনুরাগ।

ধণ্ণা বহিরা অন্ধা তে চ্চিঅ জীঅন্তি মাণুসে লোএ।
ণ সুণন্তি পিসুণবঅণং খলাণঁ রিদ্ধিং ণ পেক্খন্তি॥

ধন্য বধির ও অন্ধজনেরা, তারাই এই মনুষ্যলোকে বেঁচে আছে, কারণ পরশ্রীকাতর লোকদের কৃত নিন্দা, আর দুষ্টজনদের সমৃদ্ধি দেখতে হয়না তাদের।

সুঅণো ণ দিসই চ্চিঅ খলবহুলে ডড্ঢজীঅলোঅম্মি।
জহ কাঅসংকুলা তহ ণ হংসপরিবারিআ পুহবী॥

এই খলবহুল পোড়া সংসারে সজ্জন দেখাই যায় না। এই পৃথিবী কাকে যেমন ভরতি, হংসকুলের দ্বারা তেমন নয়।

সো বি জুআ মাণহণো তুমংপি মাণসৃহ্ন অসহণা পুত্তি।
মত্তচ্ছলেণ গম্মউ সুরাই উবরিং পুসসু হত্থং॥

সে যুবাও অভিমানী, আর মেয়ে, তুমিও মান সইতে পার না। কাজেই মাতাল হওয়ার ছল করে যাও (তার কাছে), মদের ছিটে লাগাও হাতে।

উণ্‌হো ত্তি সমথিজ্জই ডাহেণ সরোরুহাণং হেমস্তো।
চরিএহিং গজ্জই জণো সংগোবস্তো বি অপ্পাণং॥

হেমন্তকাল পদ্মকে দগ্ধ করে বলে লোকে তাকে উষ্ণ বলে জানে। নিজ চরিত্র গোপন রাখলেও কাজের ফলে তা প্রকাশ পায়।

জং কেঅবেণ পেম্মং জং চ বলা জং চ অত্থলোভেণ।
জং উবরোহণিমিত্তং ণমো ণমো তস্‌স পেম্মস্‌স॥

যে প্রেম হয় ছলে, যে প্রেম হয় বলে, যে প্রেম হয় অর্থলোভে, আর যে প্রেম হয় কারো উপরোধে, নমস্কার সেই প্রেমকে।

কারণগহিঅং পি ইমা মাণং মোএই মাণিণীজণস্‌স।
সহআরমঞ্জরী পিঅসহি ব্ব কণ্ণে সমল্লীণা॥

আমের মঞ্জরী প্রিয়সখীর মত কানের কাছে লেগে থেকে, মানিনী মহিলাদের সকারণ মানকেও দূর করে দিচ্ছে।

তহ হস জহ ণ হসিজ্জই তহ জম্প জহা পবপ্পিঅং হোই।
তহ জীঅ জহ লহসি জসং তহ মর জহ ণ উণ সম্ভবসি॥

তেমন করে হাস যেন লোকে তাতে না হাসে, তেমন করে কথা বল যেন পরের তা ভালো লাগে, তেমন করে বাঁচ যেন যশোলাভ হয়, আর তেমন করে মর যেন আর জন্ম না হয়।

অব্বো ণ আমি ছেত্তং খজ্জউ সালিবি কির-ণিবহেহিং।
জাণস্তা অবি পহিঅ পুচ্ছন্তি পুণো পুণো মগ্‌গং॥

(কোনো যুবতীর উক্তি) আমাকে আর ক্ষেতে যেতে বোলো না, শুক পাখিগুলিতে ধান খায় তো খেয়ে ফেলুক; পথিকেরা পথের সন্ধান জেনেও বার বার আমাকে তাই জিজ্ঞাসা করে।

জই দেব্ব তুং পসণ্ণো মা করিহিসি মজ্‌ঝ মাণুসং জম্মং।
জই জম্মং মা পেম্মং জই পেম্মং মা জণে দুলহে॥

হে ঠাকুর, আমাকে আর মনুষ্যজন্ম দান কোরো না, যদি মানুষ্যজন্ম দান কর তবে প্রেম দিয়ো না, যদি প্রেম দাও তবে তা যেন দুর্লভ জনের প্রতি না হয়।

রাইণ ভণই লোও জা কিল গিম্হম্মি হোন্তি মডহাও।
মহ উণ দইএণ বিণা ণ আণিমো কীস বড্ঢন্তি॥

লোকে বলে গ্রীষ্মের রাত্রি ছোটো হয়। প্রিয়বিরহে আমি কিন্তু জানতে পারি না (যে), তা কেমন করে বেড়ে যায়।

এক্কে অঅণে দিঅহা বীএ রঅণীও হোন্তি দীহও।
বিবহিআঅণো অপুব্বো এথ দুবে চেঅ বড্ঢন্তি॥

এক ছ মাসে দিন, আর এক ছ মাসে রাত বাড়ে (কিন্তু) বিরহীদের ছ মাস অপূর্ব, তাতে দিনরাত দুটিই বেড়ে যায়।

পইণা বণ্ণিজ্জন্তে অক্খাণঅসুন্দরীএ রূবম্মি।
ঈসা-মচ্ছরগরুঅং ঘরিণী হুংকারঅং দেই॥

পতি আখ্যান-বর্ণনার প্রসঙ্গে নায়িকার রূপ বর্ণনা করলে ঈর্ষা-রোষ-ভরে গৃহিণী তাতে হুংকার দিচ্ছেন।

কুলপালিআএ পেচ্ছহ জোব্বণলাঅণ্ণ বিব্ভমবিলাস।
পবসন্তি ব্ব পবসিএ এন্তি ব্ব পিএ ঘরং এন্তে॥

দেখ, কুলস্ত্রীর যৌবন-লাবণ্য ও বিভ্রমবিলাস, স্বামী প্রবাসে গেলে এসকলই নেয় বিদায়, আর স্বামী ঘরে ফিরলে এসকলই আসে ফিরে।

অব্বো কালস্স গই সো বি জুআ সরসকব্বদুল্ললিও।
পঢই পরাসরসদ্দং অম্হে বি ণিঅপইং গমিমো॥

হায়, কালের গতি, সে সরসকাব্য-চপল যুবা এখন পরাশরের স্মৃতি পড়ছে, আর আমিও নিজ স্বামীর সঙ্গে আছি।

জইআ পিও ণ দীসই ভণহ হলা কস্স কীরএ মাণো।
অহ দিট্ঠম্মি বি মাণো তা তস্স পিঅত্তণং কত্তো॥

যদি প্রিয়কে দেখতে না পাই তবে কার উপরে করব মান, আর দেখলে যদি মান করতে পারি, তবে প্রেমই বা কোথায় রইল?

জাণিমি কআবরাহং জাণিমি অলিআই ভণই সঅলাই।
অণুণেন্তে উণ জাণে কআবরাহং ব অপ্পাণং ॥

জানি সে অপরাধ করেছে, জানি সে যা বলছে তা সব মিথ্যে, কিন্তু সে যখন অনুনয় করে তখন মনে হয় আমারি সব অপরাধ।

অববাহ-সহস্সাইং ভরিমো হিঅএণং তম্মি অদিট্ঠে।
দিট্ঠম্মি উণ পিঅসহি এক্কং পি হু ণং ণ সংভবিমো ॥

তাকে না দেখলে তার সহস্র দোষের কথা স্মরণ করি। কিন্তু দেখলে পরে তার একটিও পড়ে না মনে।

গাথাসপ্তশতীতে যে গাথাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কখনো কখনো উপদেশমূলক হলেও প্রায়শ তাতে কবিত্ব আছে, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রাকৃতেও যেসকল তত্ত্বকথা রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে কাব্যরস দেখা যায়। এ শ্রেণীর প্রাকৃত রচনা প্রায় হয়েছিল অপভ্রংশ ভাষায়, অথবা শেষের দিকে প্রাকৃত যখন অনেকটা আধুনিক দেশভাষাগুলির রূপ নিতে শুরু করেছে। বাংলা দেশে এ ভাষার লেখক হয়েছিলেন অনেক। তাদের মধ্যে তিল্ল, সরহ, কাহ্ন আদি কয়েক জনের রচিত সাধনসংকেতমূলক অপভ্রংশ দোহা পাওয়া গিয়েছে। এই দোহাগুলির ছন্দে বিশেষত্ব আছে। যে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস দেশভাষার ছন্দের প্রধান লক্ষণ, তা এই কবিতাগুলিতেই হয়তো সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছে। এদের লেখকেরা ছিলেন প্রায়শ নবম-দশম শতাব্দীর লোক। এই দোহাগুলির কিছু কিছু নমুনা দেওয়া যাচ্ছে—

পর অপ্পাণ ভন্তি ম কর সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
তিহুঅণ ণিম্মল পরমপউ চিত্ত সহাবেঁ সুদ্ধ ॥

পর আপন এই ভ্রান্তি কোরো না, সকলই সর্বব্যাপী বুদ্ধ, ত্রিভুবন নির্মল (ও) পরমপদ এবং চিত্ত স্বভাবত শুদ্ধ।

তিত্থ তপোবণ ম করহু রে সেবা।
দেহসুচিহি ণ শান্তি পাবা ॥

তীর্থ তপোবনের সেবা কোরো না। দৈহিক শুচিতা দ্বারাও শান্তি পাবে না।

খণ আণন্দভেউ জো জাণই।
সো ইহ জম্মহি জোই ভণিজ্জই॥

ক্ষণিক আনন্দের রহস্য যে জানে, ইহজন্মেই সে যোগী নাম লাভ করে।

জাব ণ অপ্পা জাণিজ্জই তাব ণ সিস্‌স করেই।
অন্ধেঁ অন্ধ কঢ়াবই তিম বেগ্ন বি কুব পড়েই॥

যে পর্যন্ত আত্মাকে জানা যায় না, সে পর্যন্ত শিষ্য করবে না। যদি অন্ধ অন্ধকে নিয়ে চলে, তবে উভয়েই পড়ে কুয়ায়।

সঙ্কপাস তোডহু গুরুবঅণে
ণ্ণ সোণউ দীসই ণঅণে।
পবণ বহন্তে ণ্ণউ হল্লই
জলণ জলন্তে ণ্ণউ ডজ্‌ঝই।
ঘণ বরিসন্তে ণ্ণউ সে তম্মই
ণ উ বজ্‌ঝই ণউ খঅহি পইসই॥

(আত্মা সম্বন্ধে সরহ বলছেন) গুরুবচনের দ্বারা শঙ্কাপাশ ভগ্ন কর। (তাকে) কানে যায় না শোনা, নয়নে যায় না দেখা, বায়ু বয় কিন্তু তাকে উড়িয়ে নেয় না। আগুন জ্বলে কিন্তু তাকে দগ্ধ করে না। মেঘ বর্ষণ করে, কিন্তু তাকে ভিজায় না। না সে আহত হয়, না সে ক্ষয় পায়।

ণ উ তব্বাঅহি গুরু কহই ণ উ তব্বুজ্‌ঝই সীস।
সহজামিঅরসু সঅলজগু কাহু কহিজ্জই কীস॥

গুরু তাকে বাক্য বলেন না, শিষ্যও তাকে বোঝে না। সকল জগতে আছে এই সহজ অমৃত রস, কে কাকে বলবে?

বম্হণো হি ম জাণন্ত ভেউ
এবই পঢিঅই চউব্বেউ।
মট্টি পাণী কুস লই পঢন্ত

ঘরহী বইসি অগ্গি হুণন্তঁ ॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহহোমে
অকৃখি ডহাবিঅ কড়ুএঁ ধুমেঁ ॥

ব্রাহ্মণ ভেদ (রহস্য) জানেন না। এরূপেই চতুর্বেদ পড়া হয়। মাটি জল আর কুশ নিয়ে তাঁরা পড়েন। ঘরে বসে আগুনে হোম করেন। বিনা কাজে আগুনে ঘি ঢালেন, আর কটু ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে।

জই ণগ্গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোম পাডণে অথি সিদ্ধি তা জুবই ণিঅম্বহ।
পিচ্ছীগহণে দিট্‌ঠ মোক্‌খ তা মোবহ চমরহ।
উঞ্ছে ভোঅণেঁ হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গহ ॥

যদি নগ্ন থাকলে মুক্তি হয় তবে সে মুক্তি কুকুরের শিয়ালেরও, যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি তবে তা যুবতী-নিতম্বের, যদি পিচ্ছী গ্রহণে মুক্তি তবে তা ময়ূব এবং চমরী গরুর, আর উঞ্ছভোজনে যদি মুক্তি হয় তবে তা হাতির ও ঘোড়ার।

জল্লই মবই উবজ্জই বজ্ঝই
তল্লই পরম মহাসুহ সিজ্‌ঝই।
সরহেঁ গহণ গুহির ভাস কহিঅ
পসুলোঅ ণিব্বোহ জিম রহিঅ ॥

যাতে লোকে মরে, উৎপন্ন হয়, হত হয়, তাকে নিয়েই পরম মহাসুখ হয় সিদ্ধ। সরহ এই গভীর তত্ত্ব বলেছেন, তবু পশুলোক নির্বোধের মত এ সম্বন্ধে উদাসীন।

চিত্তে বদ্ধে বজ্‌ঝই মুক্কে মুক্কেই ণথি সন্দেহা।
বজ্‌ঝন্তি জেণ বি জড়া লহু পরিমুচ্চন্তি তেণ বি বুহা ॥

চিত্ত বদ্ধ হলেই লোক বদ্ধ হয়, চিত্ত মুক্ত হলেই হয় মুক্ত, এতে সন্দেহ নেই। মূর্খেরা যাতে বাঁধা পড়ে পণ্ডিতজন তারি দ্বারা হন মুক্ত।

এথ সে সুরসরি জমুণা এথ সে গঙ্গাসাঅরু।
এথ পআগ-বণারসি এথ সে চন্দ-দিবাঅরু ॥

খেত্ত পীঠ উপপীঠ এথ মই ভমই পরিট্‌ঠিঅও।
দেহা-সরিসও তিথ মই সুহ অণ্ণ ণ দিট্‌ঠও॥

এখানেই সুরসরিৎ (গঙ্গা) ও যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগরের সংগম, এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, এখানেই চন্দ্র সূর্য, ক্ষেত্র পীঠ উপপীঠ; তীর্থ সকল আমার মধ্যে থেকে ভ্রমণ করছে। দেহসদৃশ সুখদায়ক তীর্থ আমি আর দেখি নি।

মুক্কউ চিত্তগইন্দ কর এথ বিঅপ্প ণ পুচ্ছ।
গঅণগিরীণইজল পিঅউ তহিঁ তড বসউ সইচ্ছ॥

চিত্ত-গজেন্দ্রকে মুক্ত কর, এ বিষয়ে কার্যান্তরের খোঁজ কোরো না। সে গগনগিরির নদীজল পান করুক, আর তার তীরে স্বেচ্ছায় বাস করুক।

ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বণে জহি তহি মণ পরিআণ।
সঅলু ণিরন্তর ঠিঅ কহিঁ ভব কহিঁ ণিব্বাণ॥

ঘরে থেকো না, বনেও যেয়ো না, যে-কিছুতেই হোক মন স্থির কর। যিনি সম্পূর্ণ বোধিতে সর্বদা অবস্থিত, তাঁর কোথায় সংসার, আর কোথায় বা নির্বাণ?

জৈন আচার্য হেমচন্দ্র সূরী তাঁর প্রাকৃত-ব্যাকরণে অপভ্রংশ ভাষার নিয়মগুলির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে কতকগুলি গাথার উল্লেখ করেছেন। সেগুলির মধ্যে উপদেশমূলক কবিতার সঙ্গে মাঝে মাঝে সরস কাব্যও রয়েছে। তার কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া যাচ্ছে—

ভল্লা হুআ জু মারিআ বহিণি মহারা কন্তু।
লজ্জেজ্জন্তু বঅংসিঅহু জই ভগ্গা ঘরু এন্তু॥

ভালো হয়েছে বোন, আমার কান্ত (প্রিয় পতি) যে (যুদ্ধে) মরেছেন; যদি হেরে গিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন, তবে আমি সখিদের কাছে লজ্জা পেতাম।

জীবিউ কাসু ণ বল্লহউঁ ধণু পুণু কাসু ণ ইট্ঠু।
দোণ্ণি বি অবসর ণিবডিঅহং তিণসম গণই বিসিট্ঠু॥

জীবন কার না প্রিয়, ধন কার না ঈপ্সিত; কিন্তু প্রয়োজন এলে অসাধারণ পুরুষ এ দুটিকেই তৃণসম গণনা করেন।

সাহু বি লোও তডপ্ফডই বড্ডত্তণহো তণেণ।
বড্ডপ্পণু পরি পাবিঅই হত্থিং মোক্কলডেণ॥

সব লোকেই বড় হবার জন্যে ধড়ফড় করে, কিন্তু হাতের মুঠি খুললেই (অর্থাৎ দান করলেই) তবে বড়ত্বকে ধরবার শক্তি হয়।

অম্হে থোবা রিউ বহুঅ কাঅর এম্ব ভণন্তি।
মুদ্ধি ণিভালহি গঅণঅলু কই জণ জোণ্হ করন্তি॥

(যোদ্ধা নিজ স্ত্রীকে প্রবোধ দিচ্ছে)—আমরা সংখ্যায় কম, শত্রু অনেক বেশি, কাপুরুষেরা বলে এই কথা। হাবা মেয়ে, আকাশের দিকে তাকাও, কয়জনে মিলে এ জ্যোৎস্না সৃষ্টি করেছে?

মহু কন্তহু বে দোসডা হেল্লি ম ঝঙ্খহি আলু।
দেন্তহো হউং পর উব্বরিঅ জুঝ্ঝন্তহো করবালু॥

আমার কান্তের (প্রিয় পতির) দুটি নিশ্চিতই দোষ, সই, এ অভিযোগ ঢেকে কাজ নেই। তিনি যখন দান করেন তখন শুধু আমিই টিঁকে যাই, আর যখন তিনি যুদ্ধ করেন তখন কেবল অসিই পড়ে থাকে।

জই ভগ্গা পারক্কডা তো সহি মজ্ঝু পিএণ।
অহ ভগ্গা অম্হতণা তো তেং মারিঅডেণ॥

যদি শত্রুসেনা হেরে পালিয়ে থাকে, তবে সে আমার প্রিয়পতির পরাক্রমে; আর যদি আমাদের পক্ষ হেরে থাকে তবে তারই মারা পড়ায়।

ভমরা এত্থু লিম্বডইকে বি দিঅহডা বিলম্বু।
ঘণপত্তলু ছাআবহলু ফুল্লই জাম কঅম্বু॥

ভোমরা, এই নিম্ববৃক্ষে কিছু দিন অপেক্ষা কর, যাবৎ ঘনপত্রবান্ ছায়া-বহুল কদম্ব না ফুলে পূর্ণ হয়।

হিঅহি খুডুক্কই গোবড়ী গঅণি ঘড়ুক্কই মেহ।
বাসারত্তি-পবাসুঅহং বিসমা সংকডু এহু॥

হৃদয়ে বিঁধছে সুন্দরীর চিন্তা, আর আকাশে ঘুটঘুট করছে মেঘ; বর্ষারাত্রিতে প্রবাসযাত্রীর এই হল সংকট।

পুত্তে জাএ কবণু গুণু অবগুণু কবণু মুএণ।
জা বপ্পীকী ভুঁহড়ী চম্পিজ্জই অবরেণ॥

ছেলে থেকেই কি ফল, আর মরে গেলেই বা কি দোষ, যদি—তার বাপের জায়গা অন্যে দখল করে নেয় জোর করে?

ৱাসু মহাবিসি এউ ভণই জই সুইসথ পমাণু।
মাঅহ চলণ ণবন্তাহং দিবি দিবি গঙ্গাণ্হাণু॥

মহর্ষি ব্যাস বলেন—যদি বেদশাস্ত্রকে প্রমাণ বলে মানা যায়, তবে যারা মায়ের চরণে প্রণাম করে তারা প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের ফল পায়[১]।

পিঅসংগমি কউ ণিদ্দড়ী পিঅহো পরোক্খহো কেম্ব।
মই বিন্নি বি বিন্নাসিআ ণিদ্দ ণ এম্ব ণ তেম্ব॥

প্রিয়ের সঙ্গে একত্র থাকলেও নিদ্রা কোথায় যায় চলে? আর প্রিয়জন দূরে গেলেই বা নিদ্রা হয় কি ক'রে? এ ভাবে, আর ও ভাবে দুয়েতেই আমার নিদ্রা হয়েছে বিনষ্ট।

কন্তু জো সীহহো উবমিঅই তং মহু খণ্ডিউ মাণু।
সীহু ণিবক্খঅ গঅ হণই পিউ পঅবক্খসমাণু॥

কান্ত(প্রিয়পতি)কে যে সিংহের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয় তাতে আমার মান হয় খাটো, সিংহ মারে রক্ষকহীন গজগুলিকে, আর আমার প্রিয় মারেন পদাতিসহ গজগুলিকে।

কিব খাই ণ পিঅই ণ বিদ্দবই ধম্মে ণ বেচ্চই রূঅডউ।
ইহ কিবণু ণ জাণই জহ জমহো খণেণ পহুচ্চই দূঅডউ॥

কৃপণ না খায়, না পিয়ে, না খরচ করে তার টাকা ধর্মের উদ্দেশে; সে জানে না যে যমের দূত যে-কোনো সময় এসে পৌছতে পারে।

১ 'মায়ের পদতলেই স্বর্গ'—মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের বাণী এর সঙ্গে তুলনীয়।

জউ পবসন্তে সহু ণ গঅ ণ মুও বিওএ তস্সু।
লজ্জিজ্জই সংদেসতা দিন্তোহিঁ সুহঅজণস্স ॥

তাঁর সঙ্গে যে প্রবাসে যাই নি, আর তিনি প্রবাসে গেলেও যে মরি নি, এ জন্তে আমি প্রিয়তমকে সংবাদ পাঠাতে লজ্জিত হচ্ছি।

জাউ ম জন্তউ পল্লবহ দেক্খউ কই পঅ দেই।
হিঅই তিরিচ্ছী হউঁ জি পর পিউ ডম্বরইং করেই ॥

যাক্‌ ওকে যেতে বাধা দিয়ো না, দেখি কয় পা যেতে পারে; আমি তার হৃদয়ে আড় হয়ে আছি. প্রিয়তম শুধু যাবার ভান করছে।

'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামক অপভ্রংশে লেখা ছন্দোবিষয়ক বইয়ের মধ্যে যেসব উদাহরণ আছে তাদেরও সাহিত্যরস নগণ্য নয়। এগুলোর কোনো কোনোটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হলেও অন্ত-সব গুলি হয়তো তা নয়; সেগুলিকে হয়তো লেখকের স্বরচিত। এ বই খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে লেখা বলে মনে হয়। সুললিত ভাষায়, ছন্দে ও শব্দালংকারে এই কবিতাগুলি তুলনাহীন। এদেরও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

মাণিণি মাণহি কাইঁ
ফল এও জে চরণে পড়ু কন্ত।
সহজে ভুঅংগম জই
ণমই কিং করিএ মণিমংত ॥

মানিনি, আর কেন মান করে আছে? (মানের) ফল এই যে, কান্ত চরণে পড়ুক (তা তো পড়েছে)। সাপ যদি সহজেই মাথা নোয়াচ্ছে, তবে মণি (ও) মন্ত্র নিয়ে আর কি করবে?

জস্সু সীসই গংগা গোরি অধংগা
গিব পরিহরিঅ ফণিহারা,
কণ্ঠট্ঠিঅ বীসা পিংধণ দীসা
সংতারিঅ সংসারা।

কিরণাবলি কংদা বংদিঅ চংদা
ণ অণহি অণল ফুরংতা
সো সংপঅ দিজ্জউ বহুসুহ কিজ্জউ
তমুহ ভবাণীকংতা ॥

যাঁর শীর্ষে গঙ্গা, অর্ধাঙ্গে গৌরী, গলদেশে ফণীহার, কণ্ঠে বিষ, পরিধানে দিগ্বসন, যিনি সংসার থেকে করেন ত্রাণ, কিরণাকর চন্দ্র যাঁর ললাটে, জ্বলন্ত অনল যাঁর চোখে, সেই ভবানীপ্রিয় শিব দিন্ তোমাকে সুসম্পদ্, দিন্ তোমাকে বহু সুখ।

রণদক্খ দক্খহণু জিঅকুসুমধণু
অংধঅগংধবিণাসকরু।
সো রক্খউ সংকরু অসুরভঅংকরু
গিরিণায়রী-অদ্ধংগধরু ॥

যিনি রণদক্ষ, দক্ষহন্তা, কামবিজয়ী, অন্ধকবংশ-বিনাশকারী এবং যিনি অর্ধাঙ্গে গিরিসুতাকে ধারণ করে আছেন সেই অসুরকুল-ভয়ংকর শংকর তোমাকে রক্ষা করুন।

জো বংদিঅ সির গংগ হণিঅ অণংগ
অদ্ধংগহি পরিকর-ধরণু।
সো জোঈজণমিত্ত হরউ দুরিত্ত
সংকাহরু সংকর-চরণ ॥

যিনি গঙ্গাকে মাথায় রেখে মান দিয়েছেন, অনঙ্গকে হনন করেছেন, (নিজ) অর্ধাঙ্গে পরিবারকে ধারণ করেছেন সেই যোগিজন-বন্ধু শঙ্কাহরণ শংকরের চরণ তোমার পাপ হরণ করুক।

হম্মীর কজ্জ উজ্জল ভণহ
কোহাণল মহ মহ জলউ।
সুলতাণ সীস করবাল দেই
তেজ্জি কলেবর দিঅ চলউ ॥

হম্মীরের কাজে উজ্জল বলছেন, আমার মধ্যে ক্রোধানল জ্বলছে; স্থলতানের মাথায় খড়্গাঘাত করে আমি দেহত্যাগ করে স্বর্গে যাব।

রে ধণি মত্তমঅংগজগামিণি
খংজণলোঅণি চংদমুহী।
চংচল জুব্বণ জাত ণ জাণহি
ছইল সমপ্পহি কাই ণহি॥

অয়ি ধনি, মত্তমাতঙ্গগামিনি, খঞ্জনলোচনি, চন্দ্রমুখি, চঞ্চল যৌবন যে চলে যাচ্ছে, তা কি জানো? তবে কেন নিজকে সঁপে দিচ্ছ না চতুর পুরুষের কাছে?

ঢোল্লা মারিঅ ঢিল্লিমহ মুচ্ছিঅ মেচ্ছসরীর।
পুর উজ্জল্লা মংতিবর চলিঅ বীর হম্মীর॥
চলিঅ বীর হম্মীর পাঅভর মেইণি কম্পই
দিগমগ ণহ অংধার ধূলি সূরহ রহ ঝম্পই।
দিগমগ ণহ অংধার আণু খুরসাণক ওল্লা
দরমরি দমসি বিপকখ মারঅ ঢিল্লি মহ ঢোল্লা॥

দিল্লী মাঝে ঢোল পিটিয়ে ম্লেচ্ছদেব মূর্ছিত করে, সামনে মন্ত্রিবর উজ্জল্লকে নিয়ে বীর হম্মীর চললেন। বীর হম্মীর চললেন, তাঁর পদভরে মেদিনী কাঁপছে, ধূলি দিগ্‌মার্গ ও আকাশ আঁধার করছে, সূর্যকে ঢেকে ফেলছে; দিগ্‌মার্গ ও আকাশ আঁধার হল, খোরাসানের প্রতিনিধিকে আন, সত্বর বিপক্ষকে দমন করবে, দিল্লীমাঝে তুমিও ঢোল পেটাও।

ফুলিঅ মহু ভমর বহু রঅণিপহু কিরণবহু
অবঅরু বসংত।
মলঅগিরি কুহর ধরি পবণবহ সহব কহ
সুণু সহি ণিঅল ণহি কংত॥

ফোটা মহুয়া ফুলে অনেক ভোম্‌রা জুটেছে, চাঁদ প্রচুর কিরণ ছড়াচ্ছে, বসন্ত এসে পড়েছে, মলয়-গিরি-কন্দর থেকে পবন বইছে, শোনো সখি, কি করে এসব সইব, কান্ত যে নেই নিকটে।

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ সিঅল পবণ মণহরণ।
কণঅ পিঅবি ণচই বিজুবি ফুল্লিআ ণীবা।
পথব-বিথব-হিঅলা পিঅলা ণিঅলং ণ আবই॥

আকাশে মেঘ চলেছে, জল বর্ষণ করছে, মনোহারী শীতল পবন বইছে, সোনালী পীত রঙেব বিজুলী নাচছে, কদমফুল ফুটছে, পাথরের মত হৃদয় যে প্রিয়ের, সে এলো না এখনো।

বাঅা লুদ্ধ সমাজ খল
বহু কলহাবিণ সেবক ধুত্তউ।
জীবণ চাহসি সুকখ জই
পরিহব ঘব জই বহুগুণজুত্তউ॥

রাজা লোভী, সমাজ খল, স্ত্রী কলহকারিণী, সেবক ধূর্ত; যদি জীবনে সুখ চাও তবে বহুগুণযুক্ত গৃহও পবিত্যাগ কব।

সো মাণিঅ পুণ্ণবংত জাসু ভত্ত পংডিঅ তণঅ।
জাসু ঘবিণি গুণবংতি সোবি পুহবী সগ্‌গহ ণিলঅ॥

তাকেই মানি পুণ্যবান্ বলে, যার পণ্ডিতপুত্র ভক্তিমান্, যেখানে গৃহিণী গুণবতী সেখানে পৃথিবীই স্বর্গনিলয়।

উচ্চউ ছাঅণ বিমল ঘবা তরুণী ঘবিণী বিণঅপবা।
বিত্তক পূবল মুদ্দহরা ববিসা সমঅ সুকখকবা॥

ঘর পবিষ্কাব, ছাউনি পুরু, তরুণী পত্নী বিনীতা, বিত্তে পূর্ণ ভাণ্ডারঘর, এসকল থাকলেই বর্ষাঋতু সুখ দেয়।

ণচ্চই চংচল বিজ্জুলিআ সহি জাণএ
মম্মহ খগ্‌গ কিণীসই জলহব সাণএ।
ফুল্লকঅংবঅ অংবর ডংবব দীপএ।
পাউস পাউ ঘণাঘণ সুমুহি ববীসএ সএ॥

চঞ্চল বিজুলী নাচছে, সখি, মনে হচ্ছে কন্দর্প জলধর (রূপ) পাথরে খড়্গে শান দিচ্ছে, পুষ্পিত কদম্ব ও আকাশের ঘোরালো দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, সুন্দরি, বর্ষাকাল এসেছে, ঘন মেঘ এবার বর্ষণ করবে।

জই মিত্ত ধণেসা সস্সুর গিরীসা
তহবিহু পিংধণ দীস
জই অমিঅহ কংদা ণিঅলহ চংদা
তহবিহু ভোঅণ বীস।
জই কণঅসুরংগা গোরি অধংগা
তহবিহু ডাকিণি সংগ।
জো জসুহি দিবাবা দেব সহাবা
কবহু ণ হো তসু ভংগা॥

যদিও মিত্র কুবের শ্বশুর গিরীশ তথাপি পরিধানে দিগ্‌বসন; যদিও অমৃতভাণ্ডার চন্দ্র নিকটে তথাপি ভোজন (করেন) বিষ; যদিও কনক-বর্ণা গৌরী অর্ধাঙ্গ তবু সঙ্গে ডাকিনী, দৈব যাকে যে স্বভাব দিয়েছে কখনো তার অন্যথা হয় না।

কমলণঅণি অমিঅবঅণি।
তরুণি ঘরণি মিলই সুপুণি॥

কমলনয়না অমৃতভাষিণী তরুণী গৃহিণী সুপুণ্যের ফলেই মেলে।

ফুল্লা ণীবা ভম ভমরা দিট্‌ঠা মেহা জলসমলা।
ণচ্চে বিজ্জু পিঅ সহিআ আবে কংত কহু কহিআ॥

কদম ফুটেছে, ভ্রমর বেড়াচ্ছে, জল-শ্যামল মেঘ দেখা যাচ্ছে, বিজুলি নাচছে, প্রিয়সখি বল, প্রিয়তম কখন আসবে?

ওগগ্‌র ভত্তা রংভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুদ্ধসজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা ণালিচ গচ্ছা
দিজ্জন্তি কংতা খা পুণবন্তা॥

ওগ্‌রা ভাত (=খিচুড়ি) কলার পাতে গাইএর ঘি আর দুধ, তার সঙ্গে মৌরলা মাছ ও পাটের শাক, প্রিয়া দিচ্ছে, পুণ্যবান্‌ খাচ্ছে।

অইচল জোব্বণ দেহধণা
সিবিণঅ সোঅর বন্ধুঅণা।

অবসউ কালপুরী গমণা

পরিহর বব্বর পাপমণা ॥

যৌবন আর দেহসম্পদ্ অতিশয় চঞ্চল, জ্ঞাতিবর্গ স্বপ্নের মত অসার, যমালয়ে অবশ্য যেতে হবে। অতএব হে মূর্খ, মন থেকে পাপ দূর কর।

ণব মঞ্জরী সজ্জিঅ চূঅঅ গাছে

পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণে আছে।

জই এথি দিগন্তর জাইহি কংতা

কিঅ বম্মহ ণথি কি ণথি বসংতা ॥

আমের গাছে নূতন মঞ্জরী সেজেছে, নব কিংশুকবন ফুলে ভরেছে। যদি এ সময়ে প্রিয়তম প্রবাসে যায়, তবে কি মন্মথ নেই, না, বসন্ত নেই ?

সো জণ জণমউ সো গুণমন্তউ

জে কর পর-উবআর হসংতউ।

জে পুণ পর-উঅআর বিরুজ্ঝউ

তাক জণণি কি ণ থক্কউ বজ্ঝউ ॥

সেই (লোক) সত্যি জন্মলাভ করেছে এবং সেই গুণবান, যে সহাস্যমুখে পরের উপকার করে। যে পরোপকারের বিরুদ্ধতা করে, তার জননী কেন বন্ধ্যা থাকে নি ?

জহি ফুল্ল কেসু অসোঅ চম্পঅ মংজুলা

সহআর কেসব গংধলুদ্ধউ ভম্মবা।

বহ দক্খ দক্খিণ বাউ মাণহ ভঞ্জণা

মহুমাস আবিঅ লোঅলোঅণ বংঞ্জণা ॥

যে সময় সুন্দর কিংশুক অশোক চম্পাক আম্র ও বকুল ফুল ফোটে, ভ্রমরগুলি গন্ধে আকুল হয়, চতুর দখিন হাওয়া মানিনীদের মানভঞ্জন করে' প্রবাহিত হয়, সেই লোকের চোখজুড়ানো মধুমাস (এবার) এসেছে।

ফুল্লিঅ কেসু চংদ তহ পঅলিঅ

মঞ্জরি তেজ্জই চূআ

দক্খিণ বাউ সীঅ ভই পবহই

কংপ বিওইণি হীআ।

কেঅই ধুলি সব্ব দিস পসরই
পীঅব সব্বউ ভাসে
আউ বসংত কাই সহি করিঅই
কংত ণ থক্কই পাসে ॥

কিংশুক ফুটেছে, চন্দ্রও তেমনি সুপ্রকাশ, আমের গাছে বোল ধরেছে, দখিন-হাওয়া শীতল হয়ে বইছে বিরহিণীর হৃদয় কাঁপিয়ে, কেতকীরেণু সকলদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সব দিক হলুদে-পারা হয়েছে, বসন্তঋতু এলো, সখি কি করব, প্রিয়তম যে পাশে নেই ?

ণেত্তাণন্দা উগে্গ চন্দা
ধবলচমব সম সিঅকবৰিংদা
উগে্গ তাবা তেআ হাবা
বিঅস্থু কুমুঅ বণ পবিমল কংদা ।
ভাসে কাসা সব্বা আসা
মহুব পবণ লহু লহিঅ কবংতা
হংসা সদ্দে ফুল্লা বংধু
সবঅ সমঅ সহি হিঅঅ হবংতা ॥

নয়নানন্দ চন্দ্র উদিত হয়েছে, ধবল চামরের মত তাব কিরণজাল ; তেজোময় তারাগুলিও উদিত, পরিমলে ভরা কুমুদফুলগুলিও বিকশিত, সকল দিক কাশফুলে শোভিত, মধুর পবন বিলাসলীলায় প্রবাহিত, হাঁসগুলিও শব্দ করছে, বাঁধুলী-ফুলও ফুটেছে ; সখি, হৃদয়হরণ শরৎকাল (এবার) এলো ।

বপ্পঅ উক্কি সিরে জিণিহি লিজ্জিঅ
তেজ্জিঅ রজ্জ বণংত চলে বিণু
সোঅর সুন্দরি সংগহি লগ্গিঅ
মাব,বিরাধ কবংধ তহা হুণু ।
মারুই মিল্লিঅ বালি বিহত্তিঅ
রজ্জ সুগ্গীবহ দিজ্জ অকংটঅ

বংধু সমুদ্দ বিণাসিঅ বাবণ
সো তুঅ বাহব দিজ্জউ অভ্ভঅ ॥

বাপের কথা মাথায় নিয়ে যিনি রাজ্য ছেড়ে বনে প্রবেশ করলেন, সহোদর ও স্ত্রী যাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল, বিরাধ আর কবন্ধকে যিনি মারলেন, হনুমানের সঙ্গে যোগ দিয়ে যিনি বালিকে বধ করলেন, সুগ্রীবকে অকণ্টক রাজ্য দিলেন, সমুদ্র বন্ধন করে রাবণকে বিনাশ করলেন, সেই রাঘব তোমাকে অভয় দান করুন।

প্রাকৃতপৈঙ্গলের পরেই উল্লেখ করতে হয় অজ্ঞাতনামা জৈন কবির কৃত 'বজ্জালগ্‌গ' নামক প্রাকৃত-কবিতা-সংগ্রহের কথা। এ সংগ্রাহকের আবির্ভাব-সময় জানা যায় না। খুব সম্ভব তিনি একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। এ গ্রন্থেও গাথাসপ্তশতীর মত বিবিধ কবির রচনা স্থান পেয়েছে; এবং গোড়াতে এতেও সাত শত গাথা ছিল। কালক্রমে প্রক্ষেপের ফলে এ সংখ্যা ৭৯৫তে গিয়ে পৌঁছেছে। এ গ্রন্থের এক বিশেষত্ব এই যে, গাথাগুলি বিষয়ানুক্রমে সাজানো। এক-একটি বিষয়ের কবিতা একটি 'বজ্জা'র (ব্রজ্যার) অন্তর্গত। তাতেই গ্রন্থখানির নাম হয়েছে 'বজ্জালগ্‌গ' ('ব্রজ্যা' অনুসারে সাজানো গ্রন্থ)। এতেও গাথাসপ্তশতীর মতো বহু আদি রসের কবিতা আছে, তবে সমস্তই তাই নয়। সংগ্রহকার গাথাসপ্তশতী থেকে কয়েকটি গাথা চয়ন করলেও, আরও নানা জায়গা থেকে তিনি এতে নানা বিষয়ের বিচিত্র সুভাষিত ধরে দিয়েছেন। এই কবিতা-সংগ্রহের কিছু নমুনা দেওয়া যাচ্ছে।—

গ্রন্থের গোড়াতেই সংগ্রাহক এ গ্রন্থ পাঠের ফল জানিয়েছেন, যাতে লোকে পড়তে উৎসাহিত হয়।

এঅং বজ্জালগ্‌গং সব্বং জো পঢই অবসরম্মি সয়া।
পাইঅ কব্বঈ সো হোহিই তহ কিত্তিমন্তো ॥

এই সমগ্র বজ্জালগ্‌গ যিনি অবসর মত পড়বেন, তিনি প্রাকৃত কবি হবেন এবং কীর্তিলাভ করবেন।

মনে হয়, সংগ্রাহকের কালে প্রাকৃত-কাব্য কেন, সমুদয় কাব্যেরই, অনুরাগী লোক বিরল হয়ে আসছিল, তাই তিনি বলছেন—

দুক্‌খং কীরই কব্বং কব্বম্মি কএ পউঞ্জণা দুক্‌খং।
সন্তে পউঞ্জমাণে সোআরা দুল্লহা হোন্তি॥

কাব্য নির্মাণ কষ্টেই করা যায়, আর কাব্য তৈরী করে তার প্রয়োগেও দুঃখ, আর প্রযুক্ত কাব্য শোনবার লোকও দুর্লভ।

এখানে যে কাব্যপ্রয়োগের কথা রয়েছে তা হচ্ছে কবিতার আবৃত্তি। ভালো ভালো কবিতা রসিকসভায় পড়া হত, তার ফলেই কবির হত তৃপ্তি। পড়বার অনেক গুণের মধ্যে ছন্দ রেখে পড়াই ছিল প্রধান। এবিষয়ে ত্রুটি হলে সব হত মাটি; বিদগ্ধজনেরা ভ্রূকুটি করে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। কবি লিখছেন—

অবুহা বুহাণাং মজ্‌ঝে পঢন্তি জে ছন্দলক্‌খণবিহুণা।
তে ভমুহাখগগ্‌গিবাডিঅং পি সীসং ণ লক্‌খন্তি॥

যে নির্বোধ লোকেরা রসিক লোকদের মাঝে ছন্দোলক্ষণহীন কবিতা পাঠ করেন, তাঁরা শ্রোতৃবর্গের ভ্রূখড়্‌গে কাটা যাওয়া নিজের মাথার কথাটি টেরই পান না।

পাইঅ কব্বস্‌স ণমো পাইঅ কব্বং চ ণিম্মিঅং জেণ।
তাহং চিঅ পণমমি পটিউণ অ জে বিআণন্তি॥

প্রাকৃত কাব্যকে নমস্কার, আর নমস্কার তাঁকে যিনি প্রাকৃত কাব্য রচনা করেছেন এবং তাঁকেও নমস্কার যিনি তা ভালো করে পড়তে পারেন।

মহণম্মি সসী মহণম্মি সুরতরূ মহণসংভবা লচ্ছী।
সুঅণো উণ কহস্‌স/হং ণ জাণিমো কথ সংভূও॥

(সমুদ্র) মন্থনে চন্দ্র, সেই মন্থনেই কল্পতরু, আর লক্ষ্মীও জন্মেছেন

মন্থন থেকে, কিন্তু সজ্জন যে কোথা থেকে জন্মেছেন তা জানি না, এ কথা বলতেই হবে।

সুজণো ণ কুপ্পই চিচ্চয় অহ কুপ্পই মংগুণং ণ চিন্তেই।
অহ চিন্তেই ণ জম্পই অহ জম্পই লজ্জিরো হোই॥

সজ্জন কখনো রাগেন না, রাগলেও কারো অমঙ্গল চিন্তা করেন না, চিন্তা করলেও তা কথায় প্রকাশ করেন না, আর প্রকাশ করলেও লজ্জিত হন।

দিট্‌ঠা দুক্‌খং হবন্তি জম্পন্তা দেন্তি সঅলসোক্‌খাইং।
এঅং বিহিণা সুকযং সুঅণা জং ণিম্মিআ ভুবণে॥

দেখা হলে তাঁরা দুঃখ করেন দূর, আলাপ করে দেন সকল রকমের সুখ। সজ্জনদের সৃষ্টি করে বিধি জগতে এই সৎকার্য করেছেন।

ণ হসন্তি পরং ণ থুণন্তি অপ্পাণং পিঅসআই জম্পন্তি।
এসো সুঅণসহাবো ণমো ণমো তাণ পুরিসাণং॥

পরকে করেন না উপহাস, নিজের করেন না প্রশংসা, শত শত প্রিয়কথা বলেন, এই হল সজ্জনের স্বভাব। নমস্কার নমস্কার সে সকল পুরুষকে।

দোহিং চিঅ পজ্জত্তং বহুএহি বি কিংগুণেহি সুঅণাস।
বিজ্জুপ্‌ফুরিও বোসো মিত্তী পাহাণরেহ ব্ব॥

এ দুটিমাত্র গুণই যথেষ্ট সজ্জনের, আর বহুগুণের কি দরকার? তাঁদের ক্রোধ হচ্ছে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত, আর বন্ধুত্ব হচ্ছে পাষাণে (আঁকা) রেখার মত।

বে পুরিসা ধবই ধরা অহবা দোহিং পি ধারিআ ধরণী।
উবআবে জস্‌স মই উবঅবিঅং জো ণ পম্হুসই॥

দুটি পুরুষকেই ধারণ করেন ধরণী, অথবা এই দুটি পুরুষই ধরণীকে আছেন ধরে; এক, পরের উপকারে যার মন আছে, আর উপকার পেলে যিনি যান না তা ভুলে।

চন্দণতরু ব্ব সুঅণা ফলরহিআ জই বি ণিম্মিআ বিহিণা।
তহবি কুণন্তি পরত্থং ণিঅসবীরেণ লোঅস্‌স॥

বিধি যদিও চন্দনবৃক্ষকে ফলহীন করে সৃষ্টি করেছেন, তবু সে এ জগতে নিজ শরীর দান করে (তার) শত্রুর প্রয়োজন সাধন করে।

গুণিণো গুণেহিং বিহবেহি বিহবিণো হোন্ত গব্বিআ ণাম।
দোষেহি ণবরি গব্বো খলাণ মগ্গো চ্চিঅ অউব্বো॥

গুণের জন্য গর্বিত হন গুণী, ধনীর গর্ব ধনে, দুষ্ট লোকের গর্ব শুধু দোষ করবার সামর্থ্যে, অপূর্ব তাদের ধরণধারণ।

সন্তং ণ দেন্তি বারন্তি দেন্তঅং দিন্নঅং পি হরেন্তি।
অণিমিত্তবইরিআণং খলাণ মগ্গো চ্চিঅ অউব্বো॥

নিজের অর্থ থাকলেও দেয় না, অন্যকেও দিতে বারণ করে, দেওয়া বস্তুও হরণ করে, লোকের অকারণ শত্রু এই খলদের ধরণধারণ অপূর্ব।

তং মিত্তং কাঅব্বং জং মিত্তং কালকম্বলীসরিসং।
উঅএণ ধোঅমাণং সহাবরঙ্গং ণ মেল্লেই॥

তাকেই বন্ধু করবে, যে হচ্ছে কালো কম্বলের মত, বার বার ধোয়ালেও তার স্বাভাবিক রঙ ছাড়ে না।

দিঢলোহসংকলাণং অন্নাণং বি বিবিহপাসবন্ধাণং।
তাণং চিঅ অহিঅঅরং বাআবন্ধনং কুলাণস্স॥

দৃঢ় লৌহশৃঙ্খল বা অন্যান্য পাশবন্ধনের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় হচ্ছে সৎকুলজাত পুরুষের আলাপজনিত বন্ধুত্বের বন্ধন।

কত্তো উগ্গমই রবী কত্তো বিঅসন্তি পঙ্কঅবণাইং।
সুঅণাণ জত্থ ণেহো ণ চলই দূরট্ঠিআণং পি॥

কোথায় উদিত হন রবি, আর কোথায় বিকশিত হয় পদ্মবন, সজ্জনদের যে ভালোবাসা, তা দূরে থেকেও থাকে অবিচল।

সন্তেহি অসন্তেহি অ পরস্স কিং জম্পিএহিং দোসেহিং।
অত্থো জসো ণ লব্ভই সো বি অমিত্তো কও হোই॥

কি কাজ অন্যের দোষকীর্তনে, তা সে দোষ সত্যই হোক বা কল্পিতই হোক। তাতে অর্থও হয় না, যশও নয়, কেবল শত্রু বাড়ানো হয় মাত্র।

সীলং বরং কুলাও কুলেণ কিং হোই বিগঅসীলেণ।
কমলাই কদ্দমে সংভবন্তি ণ হু হুন্তি মলিণাইং॥

কুল থেকে শীল বড়, শীল না থাকলে কুলে কি করবে? কমল কর্দমে জন্মায়, কিন্তু কখনো মলিন হয় না।

জং জি থমেই সমত্থো ধণবস্তো জং ণ গব্বমুব্বহই।
জং চ সবিজ্জো ণমিরো তিস্থ তেস্থ অলংকিআ পুহবী॥

যিনি শক্তি থাকতে করেন ক্ষমা, ধনী হয়েও করেন না গর্ব, বিদ্যা থাকতে যিনি নম্র—এই তিন ব্যক্তি পৃথিবীর শোভা।

ছন্দং জো অণুবট্টই মম্মং রক্খই গুণে পআসেই।
সো ণবরিণ মাণুসাণং দেবাণ বি বল্লহো হোই॥

যে মতানুবর্তী হয়ে চলে, গোপনীয় কথা অপ্রকাশ রাখে, আর গুণের প্রশংসা করে, সে কেবল মানুষের নয় দেবতাদেরও হয় প্রিয়।

বেণ্ণি বি হুন্তি গঈও সাহসবন্তাণ বীব পুরিসাণ।
বেল্লহলকমলহত্থা বাঅসিরী অহব পব্বজ্জা॥

সাহসী পুরুষদের দুই গতি—এক কোমলকমলহস্তা রাজশ্রী অথবা প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস)।

মেরুং তিণং ব সগ্গং ঘরঙ্গণং হত্থছিত্তং গঅণতলং।
বাহলিআই সমুদ্দা সাহসবন্তাণ পুরিসাণং॥

মেরু হল তৃণ, স্বর্গ হল ঘরের আঙিনা, আকাশ হল হাতে-নাগাল-পাওয়া বস্তু, সমুদ্র হল ক্ষুদ্র নালা— সাহসী পুরুষদের কাছে।

সিগ্‌ঘং আরুহ কজ্জং পারদ্ধং মা কহিংপি সিঢিলেস্থ।
পারদ্ধসিঢিলিআইং কজ্জাইং পুণো ণ সিজ্‌ঝন্তি॥

শীঘ্র কাজ আরম্ভ কর, আরব্ধ কাজে কখনো শিথিল হোয়ো না। একবার আরম্ভ করে, কাজে শিথিল হলে তা আর সিদ্ধ হয় না।

ণমিঊণ জং বিঢপ্পই খলচলণং তিহুঅণং পি কিং তেণ।
মাণেণ জং বিঢপ্পই তণং পি তং ণিব্বুইং কুণই॥

খলজনের চরণে প্রণত হয়ে যদি ত্রিভুবনও অর্জন করা হয় তাতে কি

হবে? মানের সঙ্গে যা অর্জিত হয়, তা তৃণতুল্য হলেও তাতেই সুখ।

তা তুঙ্গো মেরুগিরী মঅরহরো তাব হোই দুত্তারো।
তা বিসমা কজ্জগই জাব ণ ধীরা পবজ্জন্তি॥

তখন পর্যন্তই মেরুশিখর দুর্লঙ্ঘ্য, তখন পর্যন্তই সমুদ্র দুস্তর, তখন পর্যন্তই কার্যপদ্ধতি বিষম, যে পর্যন্ত ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা তার দিকে অগ্রসর না হন।

সাহসমবলম্বন্তো পাবই হিঅঅচ্ছিঅং ণ সন্দেহো।
জেণুত্তমাঙ্গমেত্তেণ রাহুণা কবলিও চন্দো॥

সাহস করলেই লোকে হৃদয়ের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে; কেবল মাথাটি থাকা সত্ত্বেও রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করতে পেরেছে।

তং কিং পি সাহসং সাহসেণ সাহন্তি সাহসসহাবা।
জং ভাবিউণ দিব্বো পরম্মুহো ধুসই নিঅসীসং॥

যাদের সাহস আছে তেমন লোকে সাহসের দ্বারা কি জানি কি করে, এই ভেবে দৈব মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়ছে।

জহ জহ ণ সমপ্পই বিহিবসেণ বিহডন্তকজ্জপরিণামো।
তহ তহ ধীরাণ মণে বড্ঢই বিউণো সমুচ্ছাহো॥

যতই বিধিবশাৎ কার্যের সমাপ্তি বাধা পায়, ততই ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের উৎসাহ হয়ে দাঁড়ায় দ্বিগুণ।

হিঅএ জাও তথেব বড্ঢিঅ ণেঅ পঅডিও লোএ।
ববসাঅ-পাঅবো সুপুরিসাণ লক্খিজ্জই ফলেহিং॥

সৎপুরুষদের চেষ্টারূপ তরু হৃদয়েই জাত, সেখানেই বর্ধিত এবং লোকের কাছে অপ্রকাশিত; ফলের দ্বারাই কেবল তার কথা জানা যায়

ণ মহমহণস্স বচ্ছে মজ্ঝে কমলাণং ণেঅ খিরহরে।
ববসাঅ-সাঅরে সুপুরিসাণ লচ্ছী বসই॥

মধুসূদনের (বিষ্ণুর) বক্ষে, পদ্মের মধ্যে অথবা ক্ষীরোদসাগরে বাস করেন না লক্ষ্মী, তাঁর বসতি হচ্ছে সৎপুরুষগণের উদ্যমরূপ সমুদ্রে।

কো এত্থ সআ সুহিও কস্‌স ব লচ্ছীথিরাই পেম্মাইং।
কস্‌স বা ণ হোই খলণং ভণ কোহ ণ খণ্ডিও বিহিণা॥

সদা সুখী কে, কার বা সৌভাগ্যময় প্রেম স্থির, কার বা পতন না হয়, বল, বিধি না কাকে দুঃখ দিয়েছেন?

উন্নঅ ণীআ ণীআ বি উন্নয়া হন্তি তক্‌খণ চ্চেব।
বিহিপরিণম্মিঅকজ্জং হরিহরবম্হা ণ জানন্তি॥

যে উচ্চে ছিল সে নীচে নামে হঠাৎ, আর যে নীচে ছিল সে উপরে উঠে; বিধির কৃতকার্য হরিহর-ব্রহ্মাও জানেন না।

বিহিবিহিংঅং চিঅ লব্‌ভই অমঅং দেবাণ মহুমহে লচ্ছী।
রঅণাঅরম্মি মহিএ হবসস ভাএ বিসং জাঅং॥

সমুদ্রমন্থনের পর, বিধির বিধানেই দেবতাদের ভাগে অমৃত, মধুসূদনের ভাগে লক্ষ্মী, আর মহাদেবের ভাগে পড়ল হলাহল।

সচ্ছন্দং বোলিজ্জই কিজ্জই জং ণিঅমণস্‌স পডিহাই।
অজসস্‌স ণ বীহিজ্জই পহুত্তণং তেণ রমণিজ্জং॥

সচ্ছন্দে সে কথা বলে, সচ্ছন্দে সে কাজ করে যেটা হয় নিজের মনে, অযশেও কোনো ভয় নেই— এসবেই হল প্রভুত্বের শোভা।

গোমহিস তুরঙ্গাণং পসুণ সব্বাণ জুজ্জএ ঠাণং।
দড্ঢগইন্দাণ পুণো অহ বিঞ্‌ঝো অহ মহারাও॥

গোরু মোষ আর ঘোড়া, সব স্থানই এসব পশুর যোগ্য, কিন্তু পোড়া হাতির স্থান, হয় বিন্ধ্যপর্বত, না হয় শ্রেষ্ঠ রাজার পুরী।

মা জাণহ জই তুঙ্গত্তেণ পুরিসাণ হোই সোণ্ডীরং।
মডহো বি গইন্দো করিবরাণ কুম্ভত্থলং দলই॥

মনে কোরো না যে, খুব দীর্ঘ হলেই মানুষের বীরত্ব থাকে; সিংহ খাটো হলেও কুম্ভ বিদীর্ণ করে গজেন্দ্রের।

হরিণা জাণন্তি গুণা রন্নে বসিউণ গেঅমাহপ্পং।
তাণং চিঅ ণত্থি ধণং জীঅ বাহস্স অপ্পন্তি॥

হরিণেরাই গুণ জানে, অরণ্যে থেকেও তারা গীতের মাহাত্ম্য বোঝে; তাদের ধন নাই, তাই ব্যাধকে জীবন দান করে।

কঙ্কেল্লি-পল্লবে বেল্লমণোহরে জই বি ণন্দণে চরই।
করহস্স তহবি মরুবিলসিআই হিঅএ খড়ুকন্তি॥

উষ্ট্র যদি কঙ্কেল্লিত-পল্লবের মধ্যে লতাশোভিত নন্দনবনেও বিচরণ করে তবু মরুভূমিতে চরার সুখ তার হৃদয়ে খুটখুট করে।

মডহং মালইকলিঅং মহুর দট্ঠূণ কিং পবাহুত্তো।
এত্তো পসরই ভুবণন্তরাই গন্ধো বিঅন্তস্তো॥

হে মধুকর, মালতীর কলিটিকে ছোট দেখে কেন ফিরে যাচ্ছ? এর থেকে গন্ধ বার হয়ে যে, (সারা) ভুবনে ছড়িয়ে পড়বে।

কত্থ বি দলং ণ গন্ধং কত্থ বি গন্ধো ণ
এককুসুমম্মি মহুঅর বে তিন্নি গুণা ণ লব্‌ভন্তি॥

কোথাও পুষ্পদল বড়, কিন্তু গন্ধ নেই; কোথাও গন্ধ আছে কিন্তু যথেষ্ট মধু নেই; হে মধুকর, একই ফুলে তিনটি গুণ মেলে না।

হংসো মসাণমজ্‌ঝে কাও জই বসই পঙ্কঅবণম্মি।
তহ বি হু হংসো হংসো কাও কাও চ্চিঅ বরাও॥

হাঁস যদি শ্মশানে আর কাক যদি পদ্মবনে বাস করে, তবু হাঁস হাঁসই, আর কাক হতভাগা কাকই।

বে বি সপক্‌খা তহ বেবি ধবলষা বেবি সবববণিবাসা।
তহ বি হু হংসবআণং জাণিজ্জই অন্তরং গরুঅং॥

দুয়েরই পাখা আছে, দুইই সাদা, দুইয়েরই বাস সরোবরে, তবু হাঁস আর বকের মধ্যে পার্থক্য গুরুতর বলে জানা যায়।

জো জম্পিউণ জানন্তি জম্পিঅমত্তং চ জাণই অত্থং।
দেশো তেণ পবিত্তো অচ্ছউ গঅরং বসন্তেণ॥

যিনি কথা বলতে জানেন, কথা বলবা মাত্রই তার অর্থ বোঝেন তাঁর দ্বারাই সারা দেশ পবিত্র, থাকুন-না তিনি (শুধু) নগরে।

তং ণত্থি তং ণ হুঅং ণ হু হোসই জং চ তিহুঅণে সঅলে।
তং বিহিণা বি ণ বিহিঅং জং ণ হু গাঅং· ছইল্লিহং॥

সে বস্তু নাই, হয় নি, হবেও না এ তিন ভুবনে, আর বিধিও তা বিধান করেন নি, যা পণ্ডিত ব্যক্তিরা জানেন না।

অব্বো জাণামি অহং অত্তণ হিঅএণ অন্নহিঅআইং।
মা কো বি কহ বি রচ্চউ দুক্‌খুব্বহণাই পেম্মাইং॥

হায়, নিজের হৃদয় দিয়ে আমি অন্যের হৃদয় বুঝতে পারি, কেউ যেন এই দুঃখদায়ক প্রেমে লিপ্ত না হয়।

তাব চ্চিঅ হোই সুহং জাব ণ কীরই পিও জণো কোবি।
পিঅসংগে জেহি কও দুক্‌খাণ সমপ্পিও অপ্পা॥

সে পর্যন্তই সুখ যে পর্যন্ত না কেউ প্রিয় হয়েছে। প্রিয়জনের সঙ্গ যে করেছে, সেই নিজেকে দুঃখের কাছে সঁপে দিয়েছে।

দূরগএ বি কঅবিপ্পিএ বি অণ্ণথ বদ্ধরাএ বি।
জথ মণং ণ ণিঅত্তই তং পেম্মং পবিচও সেসো।

দূরে গেলেও, অপ্রিয় কাজ করলেও, অন্যকে ভালো বাসলেও যেখান থেকে মন ফেরে না তারি নাম প্রেম, আর সব পরিচয় মাত্র।

পেম্মস্‌স বিবোহিঅসংধিঅস্‌স পচ্চক্‌খদিট্ঠবিলিঅস্‌স।
উঅঅস্‌স্ ব তাবিঅ-সীঅলস্‌স বিরসো রসো হোই॥

একবার·বিরোধের পর যা জোড়া লেগেছে, আর যেখানে প্রত্যক্ষ দোষ দেখা গেছে সেই প্রেম ঠাণ্ডা করা গরম জলের মত বিরস।

উব্‌ভেউ অঙ্গুলী সা বিলআ জা মই পইং ণ কামেই।
সো কোবি জম্পউ জুবা জস্‌স মএ পেসিআ দিট্‌ঠী॥

আঙুল উঁচু করুক সে মেয়ে, যে কামনা করেনি আমার স্বামীকে। আর এ কথা বলুক কোনো যুবা যে আমি তার দিকে তাকিয়েছি।

তিহুঅণণমিও বি হরী নিবডই গোবালিআএ চলণেসু।
সচ্চং চিঅ ণেহণিরন্ধলেহি দোসা ণ দীসন্তি॥

ত্রিভুবন যাঁর কাছে প্রণত সেই হরি গোপ-বালিকার চরণে পড়েছেন; সত্যি কথা এই যে, যারা স্নেহান্ধ তারা দোষ দেখতে পায় না।

কণ্হো দেবো দেবা বি পত্থরা সুঅণু ণিম্মবিজ্জন্তি।
অস্সূহি ণ মউইজ্জন্তি পত্থরা কিংব রুগ্নেণ॥

(রাধার প্রতি) কৃষ্ণ হলেন দেবতা, হে সুন্দরি, পাথরের দ্বারাই দেবতা নির্মিত হয়। চোখের জলে পাথর ভেজে না, অতএব কেঁদে কি হবে?

মহুরারজ্জে বি হরী ণ মুঅই গোবালিআণ তং পেম্মং।
খণ্ডন্তি ণ সপ্পুরিসা পণঅপরূঢাই পেম্মাইং॥

মথুরার রাজা হয়েও হরি গোয়ালিনীদের প্রেম পরিত্যাগ করেন নি, সৎ-পুরুষেরা বহুকালের প্রেমকে (কখনো) নষ্ট করেন না।

বণঅতুরআহিরূঢো অলিউলঝংকারতূর ণিগ্‌ঘোসো।
পত্তো বসন্তরাও পরহুঅরবর ঘুট্ঠজঅসদ্দো॥

বন্য পত্রপুষ্পের ঘোড়ায় চড়ে, অলিকুল-ঝংকারের তূর্যধ্বনি করে ঋতুরাজ বসন্ত এসেছেন, কোকিলশ্রেষ্ঠ তাঁর জয়শব্দ ঘোষণা করছে।

পরিধূসরা বি সহআরমঞ্জরী বহউ মঞ্জরী ণাম।
ণীসেস পসূণপরম্মুহং কঅং জীএ ভমরউলং॥

খুব ধূসর রঙের হয়েও আম্রমঞ্জরীর মঞ্জরী নাম সার্থক। কারণ তাকে পেয়ে ভ্রমরকুলের অন্য ফুলের দিকে আর মন নেই।

রুন্দারবিন্দমন্দির মঅরন্দাণন্দিআলিরিঞ্ছোলী।
রণঝণই কসণমণিমেহল ব্ব মহুমাসলচ্ছীএ॥

বিশাল পদ্মগর্ভে মধু-আস্বাদনে আনন্দিত অলিকুল গুনগুন ধ্বনি করছে, মনে হয় যেন বসন্তলক্ষ্মীর কৃষ্ণমণিময় মেখলা বাজছে।

সুসই ব পঙ্কং ণ বহন্তি ণিজ্‌ঝরা বরহিণো ণ গচ্চন্তি।
তণুআঅন্তি গঈও অথমিএ পাউসণরিন্দে॥

পাঁক শুকিয়ে যাওয়ার মত হয়েছে, নির্ঝরগুলো আর তেমনি জল বহন করছে না, ময়ূরেরা নাচছে না, নদীগুলো শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, কারণ বর্ষা-রাজ বিদায় নিয়েছেন।

উজ্ঝস্থ বিসঅং পরিহরস্থ দুক্কঅং কুণস্থ ণিঅমণে ধম্মং।
ঠাউণ কণ্ণমূলে ইট্‌ঠং সিট্‌ঠং ব পলিএণ॥

ভোগের বস্তু পরিত্যাগ কর, দুষ্কর্ম ছাড়, নিজ মনে ধর্মের কথা ভাব, কানের কাছে পাকা চুলগুলি এই ভাল কথাগুলি বলছে।

জীঅং জলবিন্দুসমং উপ্পজ্জই জোতণং জরাএ।
দিঅহা দিঅহেহি সমা ণ হুন্তি কিং ণিট্‌ঠুরো লোও॥

জীবন জলবিন্দুর মত, যৌবনের পশ্চাৎ জরা এসে পড়ে। এক দিন আর দিনগুলির সমান হয় না—এই জগৎ কি নিষ্ঠুর।

ববিসসঅং ণরআউ তস্স বি অদ্ধেণ হুন্তি বাঈও।
অদ্ধস্স অ অদ্ধঅবং হবই জবা বালভাবেণ॥

বর্ষশত মানুষের আয়ু, তার অর্ধেক রাত্রি। আর এই অর্ধেকের অর্ধেক হরণ করে জরা ও বাল্যকাল।

ইহলোএ চ্চিঅ দীসই সগ্‌গো ণরও অ কিং পবত্তেণ।
ধণবিলসিআণ সগ্‌গো ণরও দালিদ্দিঅজণাণং॥

ইহলোকেই দেখা যায়, স্বর্গ এবং নরক; পরলোকে কি হবে? এখানেই ধনবিলাসীদের স্বর্গ, আর দরিদ্রদের নরক।

রাঅঙ্গণম্মি পরিসংঠিঅস্স জহ কুঞ্জরস্স মাহপ্পং।
বিঞ্ঝসিহরম্মি ণ তহা ঠাণেসু গুণা বিসট্টন্তি॥

রাজার আঙিনায় বাঁধা হাতির যেমন গৌরব, বিন্ধ্যপর্বতশিখরে তেমন নয়। স্থান অনুসারেই গুণের হয় উদয়।

বরতরুণিণঅণপরিসংঠিঅস্স জহ কজ্জলস্স মাহপ্পং।
দীবসিহরে বি ণ তহ ঠাণেসু গুণা বিসট্‌টন্তি॥

সুন্দরী যুবতীর চোখের কোণে কাজলের যে শোভা, দীপশিখায় তেমন নয়— স্থান অনুসারেই গুণের হয় উদয়।

জম্মন্তরং ণ গরুঅং গরুঅং পুরিসস্স গুণগণারোহণং।
মুত্তাহলং হি গরুঅং ণ হু গরুঅং সিপ্পিসংপুডং ॥

বিশেষ জন্মলাভের গৌরব নাই। পুরুষের গৌরব গুণগণের প্রাপ্তিতে, মুক্তাদলেরই গৌরব, শুক্তিসংপুটের গৌরব নয়।

ণিগ্‌গুণগুণেহি ণিঅণিগ্‌গুণত্তণং দেহি অম্হ সড্ঢীএ।
কলিকালে কিং কীরই গুণেহি পহুণো ণ ঘেপ্পন্তি ॥

হে নির্গুণ, এই নিজ গুণে তুমি অর্থের বিনিময়ে আমাকে নিজ নির্গুণত্ব দান কর। গুণ কলিকালে কি করতে পারে, যাঁদের হাতে ক্ষমতা তাঁরা গুণে আকৃষ্ট হন না।

কিং তেণ আইএণ ব কিং ব পসঅচ্ছি তেণ ব গএণ।
জস্স কএ রণরণঅং ণঅরে ণ ঘরাঘরং হোই ॥

হে সুন্দরী, সে এলেই বা কি, গেলেই বা কি, যার জন্যে নগরে বা ঘরে ঘরে চঞ্চলতা না দেয় দেখা?

ইঅরবিহংগম-পঅপন্তিচিত্তলং জথ পুলিণ পেরন্তং।
তথ সরে গহ জুত্তং বসিঅব্বং রাঅহংসাণং ॥

যে নদীপুলিনপ্রান্ত ইতর পাখিদের পায়ের দাগে বিচিত্র হয়ে আছে, তাতে রাজহংসদের বাস করা শোভা পায় না।

অলিঅং জম্পেই জণো জং পেম্মং হোই অথলোহেণ।
সেবালজীবিআণং কও ধণং চক্কবাআণং ॥

লোকেই মিথ্যাই বলে যে, অর্থলোভে প্রেম হয়, কারণ যারা শ্যাওলা খেয়ে বাঁচে, সেই চকাচকীর ধন কোথায়?

লচ্ছীএ বিণা রঅণাঅরস্স গম্ভীরিমা তহ চ্চেব।
সা লচ্ছীএ তেণ বিণা ভণ কস্স ণ মন্দিরং পত্তা ॥

লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়েও রত্নাকরের গভীরতা তেমনই রয়েছে। কিন্তু রত্নাকরকে ছেড়ে লক্ষ্মী কার মন্দিরে না গিয়েছেন?

রঅণাঅরচন্তেণ খি গন্তং চন্দেণ হরহ তিলঅত্তং।
জেণ উণ তস্স ঠাণে ণ জাণিমো কো পরিট্ঠবিও ॥

রত্নাকর চন্দ্রকে ছেড়ে দিলেও সে মহাদেবের তিলক হয়েছে, কিন্তু জানি না, রত্নাকর তার জায়গায় কাকে বসিয়েছেন ?

অত্থি অসঙ্খা সঙ্খা ধবলা রঅণাঅরস্স সংভূআ।
ন হু তাণ সদ্দলদ্ধী জা জাআ পঞ্চজন্নস্স ॥

সমুদ্র থেকে উদ্ভূত অসংখ্য ধবল শঙ্খ আছে, কিন্তু তাদের একটিরও ধ্বনি-সমৃদ্ধি পাঞ্চজন্যের মত নয়।

সাঅর লজ্জাএ কহণ মুও চিন্তাএ কহ ণ বিসণ্ণো।
পই হুন্তে বোহিথিঅহি কিও জলসংগহো অণ্ণো ॥

সাগর, তুমি চিন্তায় কেন বিষণ্ণ হচ্ছ না ? লজ্জায় কেন মরছ না ? তুমি থাকতেও জাহাজের লোকেরা অন্য জায়গা থেকে জল বয়ে নিয়ে যায় ?

জলণডহণেণ ণ তহা পত্থর ঘসণেণ খণ্ডণে তহ অ।
গুঞ্জাহলসমতুলণে জং দুক্‌খং হোই কণঅস্স ॥

আগুনে পোড়ানো, পাথরে ঘসাঘসি আর কাটাছেঁড়াতেও সোনার তত দুঃখ নয়, যত দুঃখ গুঞ্জাফলের সঙ্গে তৌল করাতে।

উঅণং ভুবণক্কমণং অত্থমণং একদিবসমজ্‌ঝম্মি।
সূরস্স বি তিণ্ণি দসা কা গণণা ইঅরলোঅস্স ॥

উদয়, ভুবন-পর্যটন আর অস্তগমন— এক দিনের মধ্যে সূর্যেরও এ তিনটি দশা, আর অন্য লোকের 'কা কথা'।

এক্কেণ বিণা পিঅমাণুসেণ সব্ভাবণেহ-ভরিএণ।
জণসংকুলা বি পুহবী অব্বো রণ্ণং ব পডিহাই ॥

হায়, সদ্ভাবে ও স্নেহে পূর্ণ একটি মানুষের অভাবে, এই লোকপরিপূর্ণা পৃথিবীও মনে হয় অরণ্যের মত।

—

গ্রন্থপঞ্জী

১. Natyaśastra VOL. II. *Bibliotheca Indica* ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ

২. Winternitz : *History of Indian Literature* VOL. II. Calcutta University.

৩. গাথাসপ্তশতী। কাব্যমালা সংস্করণ

৪. গাথাসপ্তসতী। Weber কৃত সংস্করণ

৫. প্রাকৃতপৈঙ্গল। *Bibliotheca Indica.*

৬. বজ্জালগ্‌গ। *Bibliotheca Indica.*

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রাকৃত উদ্ধৃতিগুলির বানানের জৈন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় নাই।
সর্বত্রই ন-কারের বদলে ণ-কার দেওয়া হইয়াছে।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয় ১॥০

ইতিহাস ২॥০, ৩৲

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথ্বীপরিচয় ১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব ২।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আহার ও আহার্য ১।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা ১॥০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয় ১॥০

পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন ২॥০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ ২॥০, ৩৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজাপার্বণ

